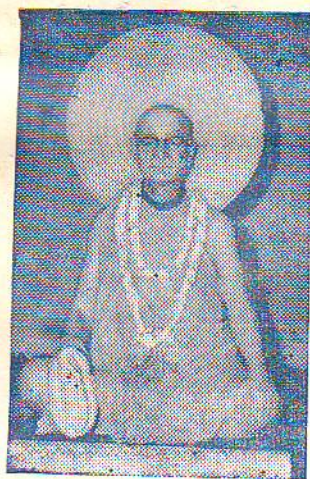


শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ



৩০শ বর্ষ { কাল্কট, ১৩৮৪ { ১ম সংখ্যা



সমাধি-মন্দিরে অর্চাবিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাकरणতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বকৃপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাकरणতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(ঐ)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্যাব্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

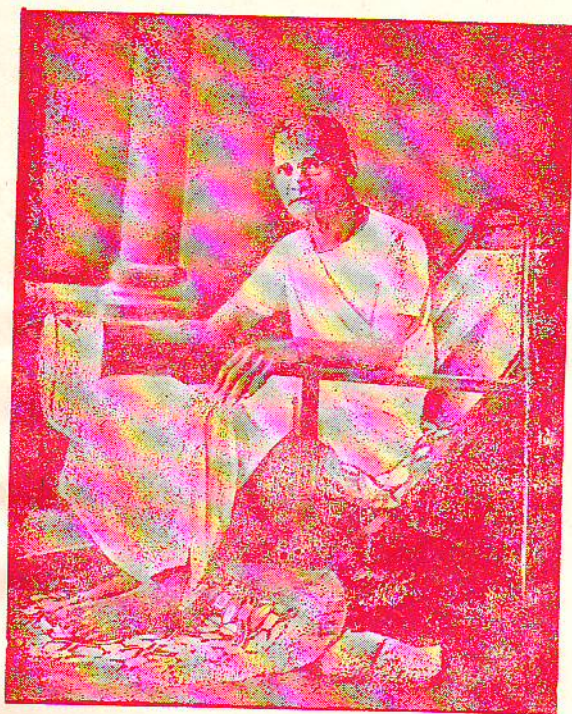
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবাক্তব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যাবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীরা) ।

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ন্তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাক ৪৯১ গোবিন্দ হইতে ৪৯২ মাধব,
বঙ্গাক ১৩৮৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৫ মাঘ,
খ্রীষ্টাক ১৯৭৮ মার্চ হইতে ১৯৭৯ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিজ্ঞান মহারাজ

প্রকাশক—

শ্রীমদ্বৈতচরণ শ্রীমদ্রাধিকারী, ভক্তিবাক্য

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ভৈরবপাড়া, অবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৭'০০ টাকা ॥*॥

ত্রিশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাক

১।	অত্যাচার—[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।২১
২।	অমরনাথ দর্শন—শ্রী—সামুদ্রে [বিবরণ]	৪।১৪৯, ৫।২০১, ৭।২৬৪
৩।	আদর্শ	১১।৪৯৭, ১২।৪৪৮
৪।	আদর্শ ভ্রাতার পত্র	৮।৩০৭
৫।	কপিল (৫) [দ্বাদশ বৈষ্ণব]	৪।১৪৫, ৫।১৮৬
৬।	‘কবি-হবি’ ও মহারাজ ‘নিমি’-সংবাদ [কবিতা]	১।১৭
৭।	কুসুমাজলি—শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে [কবিতা]	২।৭৬
৮।	কৃষ্ণ-সংহিতা-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৬৪
৯।	কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা- মহোৎসব—শিলিগুড়িস্থ শ্রী [নিমন্ত্রণপত্র]	১।৩৬
১০।	গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩২৩
১১।	গুরুপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা—শ্রীল [কবিতা]	১১।৪০৭
১২।	গোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্—সামুদ্রিক শ্রী শ্রী— [শ্রীল নিম্মঙ্গল- ঠাকুর-বিরচিতম্]	১।১, ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০৯
১৩।	গৌরচরণ-সরোজে দীনার বিজ্ঞপ্তি [কবিতা]	২।৫৯
১৪।	গৌরান্দ্র-প্রসঙ্গে—শ্রী [কবিতা]	৯।৩৩৩
১৫।	গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের পোরোহিত্য—শ্রী [কাটিয়াহাটে ধর্মসম্মেলনে]	২।৭২
১৬।	গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যভূষণ	২।৫১
১৭।	গৌড়ীয়ের ত্রিশ-বর্ষ	১।৩৮
১৮।	জগন্নাথ-প্রকাশ—শ্রী শ্রী [কবিতা]	৫।২০৪, ৬।২২৭, ৭।২৫৪, ৮।২৮৯
১৯।	জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রী শ্রী [নিমন্ত্রণ]	৫।২০৭
২০।	জন-সঙ্গ (৫) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৪৮
২১।	জড়-ভোগাগার	৯।৩৩৬
২২।	জ্ঞানদামুন্দরী দেবী—পরলোকে শ্রীযুক্তা [বিবরণ]	৯।৩৫৪
২৩।	ঝুলনযাত্রা—শ্রী [শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠে]	৭।২৭৪

- ২৪। দক্ষিণ ভারত-পরিভ্রম—প্রসঙ্গ [বিবরণ] ৬২৩৯, ৭২৭১, ৮৩০১
- ২৫। দক্ষিণ ভারত তীর্থদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ—সাদুসঙ্গে [পত্র] ১০৩৯১
- ২৬। দিব্যসূরি বা আল্‌বরবর্গের জীবনী (১)—[শ্রীল প্রভুপাদ] ৬২১৩,
(২) গোদাদেবী ৬২১৪, (৩) শ্রীবিষ্ণুচিহ্ন ৭২৪৫, (৪) শ্রীভক্তাঙ্গি—
বেণু ৮২৮১, (৫) শ্রীকুলশেখর ৯৩২১, (৬) শিশটকোপসূরি ১০৩৬০
- ২৭। দেবানন্দ গোড়ীয় মঠ পরিদর্শন—সরকারীপদস্থ-কর্মচারীর
[পত্র ও বিবরণ] ১০৩৮৫
- ২৮। দেবানন্দ গোড়ীয় মঠের জনসেবা—শ্রী [রাসঘাত্রাকালে] ১১৪২৫
- ২৯। দেবানন্দ গোড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের ত্রাণকার্য—
করালগ্রাসী বহুায় [প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ] ৮৩০৯
- ৩০। দৈন্ত [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১৮
- ৩১। নবদ্বীপাম-পরিভ্রম ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৩১১৭
- ৩২। নবদ্বীপধাম-পরিভ্রম ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব—শ্রী [পত্র] ১২৪৪৩
- ৩৩। নাথমুনি—শ্রীমন্ [শ্রীল প্রভুপাদ] ১১৩৯৬
- ৩৪। নাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীনামকীর্তনের নিভাত্ত—শ্রী ৮২৯৩
- ৩৫। নিরমাগ্রহ (৪) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৬২১৭
- ৩৬। পারিমাণিক সাময়িক পত্রের আদর্শ ও নীতি [শ্রীল প্রভুপাদ] ১২৪৩২
- ৩৭। পিছলদা গোড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৬২৩৭
- ৩৮। প্রকৃতি [প্রবন্ধ] ১১৩
- ৩৯। প্রভল (৩) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৫১৭১
- ৪০। প্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্—শ্রী [সাদুবাদঃ পাণ্ডবাদিকৃতম্] ৭২৪১,
৮২৭৭, ৯৩১৭, ১০৩৫৭, ১১৩৯৩, ১২৪২৯
- ৪১। প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বামন মহারাজের
আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা—শ্রীল [শ্রীমেঘালয়
গোড়ীয় মঠে] ১১৪২১
- ৪২। প্রয়াস (২) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪১২৮
- ৪৩। প্রশ্ন ও উত্তর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক
সিদ্ধান্ত কি ? [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১১৩৯৯
- ৪৪। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [(১) ঔষধ সেবন করা বিধি কিনা ? (২) মৎস্য
প্রভৃতি জলজ প্রাণীর জীবাত্মা আছে কি ? (৩) ঔষধার্থে
সুরাং পিবেৎ, তবে পণ্যার্থে অমেধ্য সেবন করা যাইতে
পারে কিনা ? ৯৩৪৭

- ৪৫। প্রশ্নোত্তর-স্তুতি -- (১) জীবের প্রকৃত ধর্ম ও কর্ম কি ? (২) এই সংসারচক্রে কি সুখ আছে ? (৩) বিশ্ব প্রপঞ্চে ভোগ্যপদার্থ কি ? (৪) জগৎ-প্রপঞ্চ মরীচিকার জলের স্থায় মিথ্যা ?] ১০।৩৭৫
- ৪৬। প্রশ্নোত্তর-স্তুতি [(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রভু ও গোপামিগণ বিশ্রুত্বই ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কেন ? (২) "দীক্ষা পূরুষচর্যা-বিধি অপেক্ষা না করে" শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য কি ? (৩) শ্রীরাধা-পাদ-পদ্মে তুলসী অর্পণ করিলে তুলসীসেবা হয় কিনা ? (৪) কৃষ্ণ আরাধা হইলে অন্যান্য বিষ্ণুমূর্তিকে দ্বাদশাঙ্গে ধারণের সার্থকতা কি ?] ৩।১১৩, ৬।২৩০, ৭।২৫৯, ৮।২৯৬, ৯।৩২৬
- ৪৭। বর্ণধর্ম ও দৈববর্ণাশ্রম ১।২১, ২।৬৩
- ৪৮। বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত [শ্রীল প্রভুপাদ] ১।৫
- ৪৯। বন্দনা-পঞ্চকম্ [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-মহারাজস্তু] ৩।৯৯
- ৫০। বহুতা [কবিতা] ৮।৩১৫
- ৫১। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা — শ্রী [শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে] ৪।১৫৫
- ৫২। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব — শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে [নিমন্ত্রণপত্র] ১।৩৬
- ৫৩। বিরহ-মহোৎসব [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ১০ম বার্ষিকী-বিবরণ] ৯।৩৫১
- ৫৪। বৈষ্ণব ও চৈতন্য-স্মৃতি [শ্রীল প্রভুপাদ] ৪।১২৪
- ৫৫। বৈষ্ণব-মত-পঞ্চক [শুদ্ধবৈষ্ণববাদ, শুদ্ধাঈতাবাদ, বিশিষ্টা-ঈতাবাদ, ঈতাবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব] ৭।২৬৯
- ৫৬। ব্যাসপূজা-মহোৎসব — শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণপত্র] ১০।৩৯০
- ৫৭। ব্যাসপূজা-মহোৎসব — শ্রী [বিবরণ] ২।৭৯
- ৫৮। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা — সাধুসঙ্গে [নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণপত্র] ৪।১৫২
- ৫৯। ভক্তি-যজ্ঞলি — শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের শুভ প্রকটবাসরে [কবিতা] ৪।১৪২
- ৬০। ভক্তি-কুসুমাজলি — শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীচরণ-কমলে ৩।১০৭
- ৬১। ভক্তি-কুসুমাজলি — শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবে [কবিতা] ১০।৩৭২
- ৬২। ভক্তি-পুষ্পাজলি — শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে [কবিতা] ৪।১৮১
- ৬৩। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ১০ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব [নিমন্ত্রণপত্র] ৭।৭৫

৬৪।	ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীল [নিমন্ত্রণপত্র]	৫।২০৭
৬৫।	ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি— ঠাকুর [প্রভুপাদের ভাষণ]	৫।২৬৪
৬৬।	ভক্তির স্বরূপ-বিবেক [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৪৩৭
৬৭।	ভক্তাজলি—শ্রীল গুরুপাদপদের আবির্ভাব-তিথিতে	২।৭৪
৬৮।	ভীম ও জরাসন্ধ—শ্রী	১২।৪৪১
৬৯।	মধ্বমুনি-চরিত—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪২, ৩।৮৫
৭০।	মানহানি ও মানদান	১১।৪১০
৭১।	মোহ-নিদ্রাভিভূত জীবের ভাবনা	৯।৩৪২
৭২।	রথযাত্রা-মহোৎসব— [নবদ্বীপ, চুঁচড়া ও শিলিগুড়ি মঠে]	৬।২৩৭
৭৩।	রাজর্ষি ভারত ও মহাত্মা রস্তুদেব	১।৩১
৭৪।	রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের সদস্য-সচিব অনাদিরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের পত্র	১১।৪২৮
৭৫।	জয় ও বিক্ষেপ	১১।৪০৪
৭৬।	লৌল্য (৬) [শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮২
৭৭।	শ্রদ্ধাজলিঃ—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোদামী-মহারাজমুখ্য	৩।১০০
৭৮।	শ্রদ্ধাজলি—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের তিরোভাব-তিথিতে [কবিতা]	১২।৪৪৮
৭৯।	শ্রদ্ধা-প্রস্থনাঙ্গলি—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোদামী মহারাজের [কবিতা]	৩।১০৬
৮০।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [বিজ্ঞাপন]	২।৭৮
৮১।	শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ-বিধি	১০।৩৮১
৮২।	শ্রীমদ্ভাগবত-সার [১০ম ও ১১-১২শ অধ্যায়-বিবরণ]	৫।১৯৩, ৬।২৩৩
৮৩।	সদাচার	১২।৪৪৫
৮৪।	সাম্যবাদ ও সেবাবিচার	৯।৩৩৪, ১০।৩৬৭, ১১।৪১৪
৮৫।	সন্দর্ভ-সার [বৎসল রস] প্রীতি—(৬০) ১।১০, (৬১) ৩৫৫, (৬২) ৩।৯৫, (৬৩) ৪।১৩৪, (৬৪) ৫।১৭৭, (৬৫) ৬।২২৪, ৭।২৫২	
৮৬।	সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্নৃহাপ্রভু— পুরুষোত্তমক্ষেত্রে	১।২৬, ২।৬৭, ৩।১০১, ৪।১৩৭, ৫।১৮২
৮৭।	Statement about 'Shri Goudiya-Patrika,	১।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

* ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।

* ধর্মঃ স্মৃষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথাস্থ যঃ ।

* নোৎপাদয়েদ্বদী রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম স্মৃষ্টিরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ	}	প্রচ্যুত, ১৯ গোবিন্দ, ৪৯১ গোবিন্দ মঙ্গলবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮৪ ; ইং ১৮।৩।১৯৭৮	{	১ম সংখ্যা
----------	---	--	---	-----------

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিশ্বমঙ্গল-ঠাকুর-বিরচিতম্]

অগ্রে কুরুণামথ-পাণ্ডবানাং

ভৃংশাসনেনাহতবজ্রকেশা ।

কৃষ্ণা তদাক্রোশদনন্যনাথা

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১॥

যখন কৌরব-পাণ্ডবদের সম্মুখে প্রকাশ্য সভামধ্যে ছুরায়া ভৃংশাসন কৃষ্ণার অর্থাৎ দ্রোপদীর বস্ত্র ও কেশ আহরণ (আকর্ষণ) করিতেছিল, তখন দ্রোপদী অনন্তগতি হইয়া “হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মধুকৈটভারে,

ভক্তানুকম্পিন্ ভগবন্ মুগারে ।

ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে বিষ্ণো ! হে মধুকৈটভহস্তা ! হে ভক্তানুকম্পহকারিন্ ! হে ভগবন্ মুগারে ! হে কেশব ! হে লোকনাথ ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! আমাকে ত্রাণ কর, ত্রাণ কর ॥২॥

বিক্রেতুকামাখিলগোপকন্যা,

মুরারিপাদার্পিতচিত্তবৃত্তিঃ ।

দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচদু,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩॥

কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিতচিত্তা গোপকন্যা দধ্যাদি বিক্রয়মানসে মোহবশতঃ দধিভৃগাদির নাম না করিয়া শুধু গোবিন্দ-দামোদর-মাধবের নাম হাঁকিয়া চলিয়াছেন ॥৩॥

উলুখলে সন্ততততুলান্শচ,

সংঘট্টয়ন্তো মূষলৈঃ প্রমুখাঃ ।

গায়ন্তি গোপো জনিতানুরাগ,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪॥

কৃষ্ণানুরাগিনী গোপিনী উলুখলে মূষলদ্বারা ধান্যাদি পেষণ করিতে করিতে ভৎপ্রমে মুগ্ধ হইয়া ‘গোবিন্দ-দামোদর মাধব’ বলিয়া গান করিতেছিলেন ॥৪॥

কাচিং করাস্মুজপুটে নিষগ্গং,

ক্রীড়াশুকং কিংশুকরত্নতুণ্ডম্ ।

অধ্যাপয়ামাস সরোরুহান্ধী.

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৫॥

কোন কমললোচনা উভয়করণদ্বয়ে স্থিত পলাশপুষ্পের ন্যায় রক্তিমবদন ক্রীড়াশুককে ‘গোবিন্দ-দামোদর-মাধব’ অধ্যাস করাইতেছিলেন ॥৫॥

গৃহে গৃহে গোপবধুসমূহঃ,

প্রতিক্ষণং পিঞ্জরসারিকানাম্ ।

স্বলংগিরং বাচয়িতুং প্রবৃত্তো,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৬॥

প্রতিগৃহে গোপবধূগণ তাহাদের পিঞ্জরস্থিত সারিকা পক্ষীকে নিরন্তর
'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' এই সুমধুর বুলি শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্ত থাকিতেন ॥৬॥

পর্য্যক্ষিকাভাজগলং কুমারং

প্রস্থাপয়ন্তোহখিলগোপকন্যাঃ ।

জগুঃ প্রবন্ধং স্বরতালবন্ধং,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৭॥

শয্যাস্থিত স্বীয় শিশুদিগের নিদ্রাকর্ষণের জন্ত সুর-তালের সহিত নিখিল
গোপকন্যাগণ 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' এই প্রবন্ধ গান করিতেন ॥৭॥

রামানুজং বীক্ষণকেলিলোলং,

গোপী গৃহীত্বা নবনীতচৌরম্ ।

আবালকং বালকমাজুহাব,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৮॥

বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কঙ্ককে গোপবালকদের সহিত ক্রীড়াচঞ্চলদর্শনে
তাহাদের মধ্য হইতে ননীচৌরকে ধরিয়া গোপী যশোদারানী বলিতে
লাগিলেন,—‘হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !’ একবার এস ॥৮॥

বিচিত্রবর্ণাভরণাভিরামে-

হৃতিধেহি বক্ত্রামুজরাজহংসি ।

সদা মদীয়ে রসনেহগ্ররঞ্জে,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৯॥

হে বিচিত্র-অলঙ্কার-শোভিতে সুন্দরি বদনকমলরূপিনি রাজহংসি !
মদীর জিহ্বাগ্রে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া অভিনেত্রীর ন্যায় সর্বদা
গীতালাপ করিতে থাক ॥৯॥

অক্ষাধিকৃঢ়ং শিশুগোপগৃঢ়ং,

স্তনং ধয়ন্তং কমলৈককান্তম্ ।

দম্বোধরামান মুদা যশোদা,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১০॥

মাতা যশোদারানী গোপশিশুরূপে গুচভাবে লীলাকারী ভগবান্ লক্ষ্মী-
কান্তকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্যপান করাইতে করাইতে, আনন্দসহকারে
'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন ॥১০॥

ক্রীড়ন্তুমন্তর জমাতুজ্জং স্বং,

সমং বয়শ্চৈঃ পশুপালবালৈঃ ।

প্রেম্ণা যশোদা সমুদাজুহাব,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১১॥

গোষ্ঠে বয়স্ গোপবালকগণসহ ক্রীড়ারত আত্মজ সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে মাতা
যশোদা আনন্দে প্রেমভরে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া আহ্বান করিতে
লাগিলেন ॥১১॥

যশোদয়া গাঢ়মূলুথলেন,

গোকৰ্ণপাশেন নিবধ্যমানঃ ।

রুরোদ মন্দং নবনীতভোজী,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১২॥

নবনীত প্রস্তুতকালে দধিতাণ্ড-ভঞ্জে ও গৃহস্থিত নবনীত মর্কটদিগকে
প্রদানের নিমিত্ত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মাতা যশোদা গাণ্ডিবন্ধন-বজ্রদ্বারা
উলুথলের সহিত নবনীতভোজী কৃষ্ণকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করায়, “হা গোবিন্দ !
হা দামোদর ! হা মাধব !” বলিয়া ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিলেন ॥১২॥

নিজাঙ্গনে কঙ্কণকেলিলোলং

গোপী গৃহীত্বা নবনীতচৌরম্ ।

উবাচ প্রেমাশ্রু পিধায়নেত্রে

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গনে যখন স্বহস্তকঙ্কণের সহিত ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন,
তখন গোপী যশোদারানী মাখনচৌরকে ধরিলেন এবং দুই হস্তে তাঁহার পদ-
লোচনদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন,—“হে আমার
গোবিন্দ ! আমার দামোদর ! আমার মাধব !” ॥১৩॥ (ক্রমশঃ)

বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত

বন্ধাবস্থা ও বিবর্ত

জীব বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত—এই তিনটি অবস্থায় অধিষ্ঠিত। ভগবানে এই অবস্থাভেদে অন্তর্য ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত। বন্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব মিথ্যা হয়। মায়াবাদী বলেন, প্রাকৃত বন্ধাবস্থা মিথ্যা, কিন্তু ভগবান্ ক্রীচৈতন্যদেব বলেন, নশ্বর (অর্থাৎ কালক্ষুদ্র)। জীব-সত্তায় বন্ধত্ব বিবর্তবাদের উদাহরণ অর্থাৎ স্থূল দেহকে দেহী-জ্ঞান বিবর্তবাদ-প্রসূত ; প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানান্তাবকেই বিবর্ত বলে।

ভগবানের শক্তি-পরিণত ত্রিবিধ জগৎ

ভগবান্ কখনই বন্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না, আবার বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাবভেদে তাহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গ বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বন্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাহার অন্তরঙ্গ শক্তি পরিণত হইয়া জড়-মায়াতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শক্তির মধ্যবর্তী তটস্থা-শক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন।

তটস্থ-শক্তি-পরিণত অণুচৈতন্য জীব

অণুচৈতন্য জীব তটস্থা শক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান কালে অন্তরঙ্গ শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড়-জগতে অবস্থান করেন, তখন তিনি বহিরঙ্গ বা মায়া শক্তির অধীন। জড়-জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থ শক্তির পরিণাম। যেক্রপ জল ও ভূমির মধ্যবর্তী গণিতাগত রেখাকে তট বলে, তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শক্তির অনির্বচনীয় অন্তঃস্থলে তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠান।

ভগবান্ শক্তিমান্ ও তাঁহার চারিটি বিশেষত্ব

বিভূ-চৈতন্য ভগবান্ তটস্থা শক্তিজাত নহেন। (এমন কি) তিনি যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন, তৎকালে তিনি তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবের স্থায় বন্ধভাবে লাভ করেন না। কেন না, শক্তি—শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্বশেষমুখীসম্পন্ন আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্যত্বত্বত্বৈত মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিটি বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবত্তা স্বরূপ

বিগ্রহ ; গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্শ্বদ ও তথাকার বস্তুসকল তদ্রূপ বৈভব
বিগ্রহ ; জীব তটস্থ বিগ্রহ এবং প্রধান, অধিতা ও মায়াময় । প্রধানের
পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থ ভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্ত-
ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক ।

জীবের অস্মিতা বিধান

ভগবান্ অনুরূপভাবে তদ্রূপ বৈভবে লক্ষিত হন, ব্যক্তিরূপে দেবীধামের
অস্তিত্ব সম্পাদন করেন ; তটধামে অনুরূপ ও ব্যক্তিরূপের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ
করিয়া জীবের অস্মিতা বিধান করেন ।

তটস্থ জীবের বন্ধাবস্থা

জীব তটধর্মবশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট ।
যখন তিনি প্রকৃতির অধীন, তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিঙ্গ-
শরীর বা মন তাহার আশ্রয়দাতা । জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বন্ধাবস্থা ।
সজ্জনগণ বলেন জীবের কৃষ্ণস্মৃতি বিস্মরণ হইলেই জীব ইহ ভগ্নতে নিজাস্থিত
অনুভব করেন, বস্তুতঃ তিনি কৃষ্ণদাস । অসৎ সাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি
রাহিতাই জীবের মুক্ত স্বরূপ । তাহুশ মায়াবাদিগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের
নিত্য অধিষ্ঠান নিজ বন্ধধর্মের প্রাবল্যে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না । সুতরাং
(কেবল) তটস্থ-ধর্ম-বর্ণন করিয়াই বিচার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন ।
(বস্তুতঃ) নির্বিশেষবাদের বুদ্ধি-চাতুরী তটস্থ ধর্মের অস্মুট বিকাশমাত্র ।

স্বরূপ ও শক্তি স্বীকার না করিয়া মায়াবাদী ভ্রান্ত

বেদান্ত-মতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থধর্মের স্পষ্টাভিধান লক্ষিত হয় ।
মায়াবাদী নির্বিশেষমত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্যস্বরূপ ও অননৈকধর্ম্য
বিকাশিনী শক্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তদ্রূপ বৈভবের নিত্য অধিষ্ঠান
ধারণা করিতে অসমর্থ হন । মায়াবাদীর ইহা আত্ম-বঞ্চনামাত্র, যেহেতু মায়া-
বাদীর মতে শক্তিমাত্রেরই প্রাকৃত, হের ও কালজ্ঞক । নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী
কখনই নিতামুক্ত হইতে পারেন না, তজ্জন্য তিনি বিবর্তবাদের আশ্রয়ে
আপনাকে জীবমুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন । আবার তাহুশ মিথ্যা
কল্পনাতে সত্য আরোপ করিয়া নিজবাদের অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করেন ।

নির্বিশেষবাদীর মত খণ্ডনে শ্রীল রামানুজের দুইটি যুক্তি

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নির্বিশেষ মতের অকর্মণ্যতা বুঝাইতে গিয়া দুইটি
কথার অবতারণা করিয়াছেন । প্রথমতঃ রামানুজ বলেন, নির্বিশেষবাদীর

কল্পিতমত প্রচারে সত্যতা নাই। যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিশ্বাস সত্য হয়, তাহা হইলে উপদেষ্টা ও উপদেশ গ্রহীতার মধ্যে ভেদ নিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নির্কিশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত সত্য উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যাবাদ উপদেশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ অক্ষমতাবশতঃ সত্য নিকূপণে অধিকার হয় নাই। জীবের বন্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্ত রাজ্যের স্বরূপ-পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বন্ধ-বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্ণন করিতে গিয়া নির্কিশেষবাদ গ্রহণপূর্বক তটাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হয়। তটাবস্থায় নির্কিশেষ মত অধিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না। সেখানে তাঁহার অস্থিতি পুনরায় মায়াশক্তির কবলে গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদের পার্থক্য প্রদর্শন

আজকাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাহাদেরও পণ্যদ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ক্রটি করেন না। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তা-স্রোত কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদে জীবের বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বন্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয়ের নিত্য সত্য অস্বীকৃত। নির্কিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না বা জানিয়াও সত্যের অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে চিৎ ও জড়-জগতের যুগপৎ স্থিতি

সাধুগণ বলেন, ভগবৎ-সংসারে অপ্রাকৃত সেবায নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি। মায়াবাদী বলেন, তটস্থ লক্ষণ লাভই মুক্তি। মায়াবাদীর কল্পিত নির্কিশেষ বিধি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ স্বীকার করেন না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তিবলে পূর্ণৈশ্বর্যো নিত্য বিরাজমান অপ্রাকৃত রাজা অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং তাহার অনুকরণে জীবের বন্ধ-সংসার বা দেবী-ধামরূপ মায়াশক্তি পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন। জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বন্ধ জীবের অবস্থাত্রয়, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান, তটস্থ শক্তিবিশিষ্ট, জীবের দেবীধামে বন্ধসংসার গ্রহণ, অবস্থাত্রয় লাভ করা নিত্যধর্ম।

— শ্রীল প্রভুপাদ

দৈন্য

শুদ্ধা ভক্তির বুদ্ধিক্রমে আনন্দদায়ক দৈন্যের প্রকাশ

দৈন্য বৈষ্ণবের ভূষণ। দীনতাবিহীন বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণবতার ভাগ মাত্র। ফলতঃ ভক্তিবুদ্ধির সহিত—আনন্দ-বুদ্ধির সহিত ভক্তের দীনতাও বাড়িয়া উঠে। জগতের সকলেই ভগবদ্বিষ্মুখ কদাচার-রত ; ভক্ত অতি শুদ্ধ, ভগবৎ-পরায়ণ, তথাপি তিনি আপনাকে ভক্তিহীন, অতি দীন মনে করেন। তিনি সর্বগুণ-ধাম সর্বোত্তম হইলেও, আপনাকে সর্বাধম বলিয়া জানেন। এক্ষণে দৈন্য ভক্তের একটি অলৌকিক ভাব। তাহা আনন্দদায়ক।

ভক্তের দৈন্য কপটতা নহে—হৃদয়ের আবেশ

ভক্তের অতি দৈন্য দর্শনে কেহ কেহ সংশয় করিয়া বলিতে পারেন—“ইহা তাঁহাদের কপটতা।” এটি কিন্তু বিষম ভ্রম। শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র যখন কৃষ্ণদাস অভিমানের আপনাকে তৃণাধিক নীচ জানিয়া ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেন, “আমি বড় দীন-হীন, তোমরা আমাকে কৃপা কর”—এই কথা বলিয়া যখন কাকুতি করিতেন, তখন অতিমাত্র পাষণ-হৃদয়ও গলিয়া যাইত, লৌহ সদৃশ চক্ষুতেও বারি দেখা দিত। সে-দৃশ্য একবার মানষ-চক্ষে দর্শন করিলে বৈষ্ণবের দীনতা, কপটতা বলিয়া বোধ হইবে না—বোধ হইবে তাহা ভক্তের অন্তর্নিহিত ভাব, ভক্তির আবেগে সবেগে হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে।

“দৈন্য”-শিক্ষায় শ্রীমন্নহাপ্রভু

শ্রীমন্নহাপ্রভু আমার প্রেম-বন্যায় জগৎ ডুবাইয়াছিলেন, শত শত পাষাণের হৃদয়-মকু ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, প্রেমাবেশে মগ্ন হইয়া যিনি নিরন্তর সাত্ত্বিক ভাব-প্রাপ্ত হইয়া কখন দাস্য, কখন রোদন করিতেন, তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া কেন বলিবেন—

ন প্রেমগন্ধোইন্তি দরাপি মে হরৌ

ক্লেদ্যামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতম্।

বংশীবিলাস্তাননলোকনং বিনা

বিভুর্নি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রেমের লেশমাত্রও নাই। তবে যে আমি তাঁহার জন্য ক্লেদন করিতেছি, তাহা কেবল আমার সৌভাগ্য জানাইতেছি মাত্র। যদি সত্যাই তাহাতে আমার প্রেম থাকিত, তাহা হইলে সেই বংশী-

বিলাসাননের শ্রীমুখ দর্শন না করিয়া আমি কিছুতেই বুঝা জীবন-ধারণ করিতাম না। অহো, কি আশ্চর্য্য দীনতা, কি মহান্ জীব! জগৎপূজা গৌর-ভক্তগণও দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের দৈন্য-কল্লিত-বসন, দৈন্য-নমিত বদন, এবং দৈন্য-নমিত বচন—সকলই দৈন্যের চূড়ান্ত আদর্শ এবং চরম শিক্ষা।

শ্রীনাম-সাধনের উপকরণ—দৈন্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি

পতিত-পাবন শ্রীগৌরাজ্ঞ জগতে শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, নাম দিয়াছেন। কিন্তু সে নাম-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ—দীনতা। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

তুণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীধঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক—৩)

অর্থাৎ তুণ যেমন সর্বজীব-কর্তৃক পদদলিত হইলেও অকাতরে অবনত-মস্তক হইয়া থাকে, বৈষ্ণবও তদ্রূপ সর্বোত্তম হইলেও আপনাকে সর্বোধম জানিয়া, আপনাকে সকলের পদানত হইবার যোগ্য বিবেচনার সর্বদাই দৈন্যপূর্ণ থাকেন।

বৃক্ষ যেমন নিজে রোদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া অপরকে ছায়াদানে সেবা করে, কাঠুরিয়া তাহাকে ছেদন করিতে থাকিলেও তাহাকে ছায়াদানে কাতর হয় না, নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবও সেইরূপ নিজে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অন্যকে রক্ষা করেন এবং অন্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইলেও তাহার উপকার করিতে পরাভুত হন না। নিজে অমানী হইয়া জগতের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি হরিনাম-সংকীৰ্ত্তনের অধিকারী।

আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে দীনতার অভাব

ভাগ্যহীন আমরা, তাই আজকাল আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে আর সে দীনতা দেখিতে পাই না। সকলেই যেন স্বীয় গুণপনা প্রকাশ করিবার জন্ত ব্যস্ত। আমি লক্ষ্য নাম করি, আমি বড় শুদ্ধাচারী, আমি বড় ভক্তিমান্—ইত্যাকার অভিমান-স্বচক বাক্যাবলীই যেন আজকাল বৈষ্ণবতার নিদর্শন হইয়াছে। এখন আর সহজে দণ্ডবৎ আসে না। দুইজনে দেখা হইলে আগে ‘দণ্ডবৎ করি কি না’—এই বিচারেই প্রায় দণ্ডবতের সময় অতীত হয়। ‘দণ্ড’ শেষে ‘ঐ পর্য্যন্ত’। এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া মনে ভয় হয়, পাছে কালধর্ম্য বৈষ্ণব-সমাজেও প্রবেশ লাভ করিল।

কপটতা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণের উপদেশ

আমাদের অভিমান কিসের ? মুহূর্ভঃ বিষম ভ্রম, প্রতিনিয়ত পদস্থলন, পদে-পদে ঘোর বিপদ, তথাপি কিসের এ অভিমান ? যিনি নাম প্রচারিতে জগতে আসিয়া নিরন্তর নাম করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তিনি বলিতেছেন—“আমার দুর্দৈব নামে নাচি অনুরাগ”। আর আমরা একবার একটু ‘নাম’ লইয়াই ঘোর অনুরাগী হইয়া পড়িলাম। ইহা সমান্য দুঃখের কথা নহে। অতএব আর কেন এ দুর্কৃদ্ধি ! যাহা বৈষ্ণবতার নিদর্শন, শ্রীগৌরাদের আচরণ, ভক্ত-জীবনের ভূষণ—সকলে মিলিয়া আইস, সমস্ত কপটতা পরিত্যাগ করিয়া সেই দৈন্ত্য-অনুভবে জীবন কৃতার্থ করি।

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষনী, ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৬০)

বংশসলরস

এই বংশসলরসে আলম্বন—লাল্যরূপে স্মৃতিমান বাৎসল্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, বাৎসল্যের আধার পিতাদি গুরুবর্গ, তাহাতে শ্রীমন্নরাকার শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন। গুরুবর্গের মধ্যে শ্রীবসুদেব, দেবকী, কুন্তী প্রভৃতি ভক্তাদি মিশ্রবংশসল, আর শ্রীনন্দ-যশোদা এবং তাহাদের সমবয়স্ক গোপগোপী প্রভৃতি শুদ্ধবংশসল। ইহাদের শুদ্ধ বাৎসল্যোপযোগী বৈদম্বী (পূতনা বধের পর পূতনার বক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া গোপীগণ সলিল স্পর্শ বা আচমন করিয়া নিজ অঙ্গে ও করে পৃথক-ভাবে বীজন্যাস করিলেন, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপৃষ্ঠে বীজন্যাস করিলেন)।

উদ্দীপনসমূহের মধ্যে গুণ—প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় লাল্যভাবোচিত গুণসমূহে শ্রীশুকদেবের উক্তি—

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মগ্নাশ্রীং জননীং হরিঃ ।

গৃহীত্বা দধিমস্থানং স্তম্বেষং প্রীতিমাবহন্ ॥ (ভাঃ ১০।৯৪)

স্তন্যকাম শ্রীহরি দধিমস্থানকারিণী জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া মস্থানও ধারণদ্বারা প্রীতি উৎপাদনপূর্বক তাহাকে নিষেধ করিলেন।

শৈশবচাপলা সম্বন্ধে শ্রীশুকোক্তি—

শৃঙ্গাগ্নিবংষ্ট্রাহিজলদ্বিজকণ্টকেভাঃ

ক্রৌড়াপরাবতিচলৌ যদুতো নিষেদ্ধম্ ।

গৃহাণি কর্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্তৌ

শেকাত আপতুরলং মনসোহনবস্থাম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮।২৫)

শ্রীযশোদা-বোহিনীর দুইটি সন্তান (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) অতিশয় চঞ্চল ও ক্রৌড়াপর হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে শৃঙ্গী (বঘাদি), দ্রংষ্ট্রী (কুকুরবানরাদি), সর্প, পক্ষী, অগ্নি, জল ও কণ্টক হইতে নিবারণ করিয়া রাখিতে কিম্বা গৃহকর্ত্ত করিতে জননীদ্বয় অসমর্থ হইয়া পড়িলেন । সুতরাং তাহাদের অস্তঃকরণ অনবস্থিত হইয়াছিল ।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বালচাপলা অবলোকন করিয়া সকলে শ্রীমতী যশোদার নিকট থাকিলেন । তিনি শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যের কথা শুনিতে অভিলাষিনী ছিলেন । গোপীগণ তাহার নিকট বলিলেন,—তোমার কৃষ্ণ অসময়ে বৎস সকল ছাড়িয়া দেয় । আমরা ক্রুদ্ধাব প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ চাসিতে থাকে । দধিমাখনাদি দ্রব্য কি প্রকারে চুরি করিতে হয় তাহা সে জানে, সেই প্রকারেই দধাদি চুরি করিয়া মর্কটগণকে (বানর) পাওয়ায়, তাহারা না খাইলে ফেলিয়া দেয় এবং দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে আর দ্রব্যাদি না পাইলে শিশুগণকে কাঁদাইয়া পলায়ন করে ।

এস্থলে যে গোপীগণের কথা বলা হইয়াছে তাহারা শ্রীব্রজেশ্বরীর সমবয়স্কা, আত্মীয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের পোতা ভ্রাতৃবধূ ।

কৌমারকাল ছাড়া অন্য সময়ে বিনয়, লজ্জা, প্রিয়বদন, সরলতা, দাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে শোভা পায়, তন্মধ্যে বিনয়ের উদাহরণ—

কৃষ্ণরানৌ পরিষজ্য পিতরাবভিবাচ্য চ

ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেমণা সাস্ত্রকণ্ঠৌ কুরুদহ ॥ (ভাঃ ১০।৮।৩৪)

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! কৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে মাতাপিতা ব্রজরাজদম্পতিকে আলিঙ্গন ও অভিবাচন করিলেন । তখন প্রেমে তাহাদের কণ্ঠ বাষ্পক্লান্ত হওয়ায় তাহারা কিছু বলিতে পারেন নাই ।

ইন্দ্রযাগ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ প্রভৃতির সম্মুখে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে বালক মনে করিয়াছিলেন বলিয়া সেই প্রগল্ভতা তাহাদের স্মৃতি হইয়াছিল । কান্তি, অবয়বসমূহের সৌন্দর্য্য, সর্বসম্পন্নঃ

পূর্ণকৈশোর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি গুণ সর্বদাই বর্তমান আছে। তন্মধ্যে কান্তির বর্ণনা—
কালেন ব্রহ্মতাল্লেন গোকুলে রামকেশবো।

জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহুতুঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮।২১)

অল্পকালেই রাম-কৃষ্ণ জাতুর্কর্ষণ না করিয়াই স্ববলে পদচালনা করিয়া গোকুলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাম-কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইলে শ্রীব্রজরাজ কর্তৃক পশুপালন-কার্য্যে উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন। বালাক্রীড়া সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি—

তাবজ্জি যুগ্মমনুকৃত্য সরীসৃপেষ্টৌ

ঘোষ প্রঘোষকচিরং ব্রজকর্দমেষু।

তন্মাদজটমনসাবহুস্য লোকঃ

মুধুপ্রভীতবহুপেয়তুরস্তি মাত্রোঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮।২২)

রামকৃষ্ণ উভয়ে চরণযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে হামাগুড়ি দিয়া কুটল-গতিতে কটি ও চরণদ্বয়ের কিঙ্কিনীনিদাসহ মনোহররূপে বারম্বার গমন করিতেন। সেই ধ্বনিতে তাঁহাদের মানস হ্রই হইত। কখন কখন ইত্যন্ততঃ গমনকারী লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন-চারি পদ গমন করিয়া মুগ্ধ ও প্রভীতের মত জননীসমীপে প্রত্যাগমন করিতেন।

তদনন্তর যে সময় রাম-কৃষ্ণের কোমারলীলা ব্রজাঙ্গনাগণের দর্শনযোগ্য হইল, তখন বৎসগণের পুচ্ছধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ইত্যন্ততঃ ধাবমান হইলে পুচ্ছ ধরিয়া তাঁহারা আকৃষ্ট হইতেন। তদদর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণ কৌতুক-বশতঃ গৃহকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আনন্দে হাস্য করিতেন।

অনন্তর বাৎসপারসের অহুভাবদকল মধ্যে উদ্ভাসর বর্ণিত হইতেছে। উদ্ভাসর অর্থে লালন, শিরোব্রাণ, আশীর্বাদ, হিতোপদেশ দান। হিত-প্রবর্তনার্থ তর্জন, প্রলোভন জগ্য বৃথা হাস্য, দুষ্ট জীবাদি হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা, তৎকার্য্যে প্রকারান্তর ভাবনা।

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—উদার বুদ্ধি নন্দ মহারাজ মথুরা হইতে আসিয়া নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন। তাঁহার মস্তকাব্রাণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণ নন্দভবনে আসিয়া “চিরঞ্জীবী হও” বলিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপরে পরস্পর হরিদ্রাচূর্ণ তৈল ও জল সিঞ্চন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবলরাম যমুনা তীরে বালকগণের সহিত যখন ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন শ্রীযশোদা দূর হইতে ডাকিয়া বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! কমলনয়ন! হে বাপ আমার এস, স্তন পান কর; আর খেলায় কাজ নাই, ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছ। এখন ভোজন করা উচিত।

লালনাদি যেসকল অশুভাবের কথা বলি হইল, সে-সকল সাধারণ বংশল-গণেরও থাকে, তবে মাতা-পিতাতে বিশেষরূপেই থাকে। মাতাপিতাতে হিতসাধনের জন্য তর্জনাদি,—একদিন শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিলেন; বালকগণের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া যশোদাকে নিবেদন করিল যে, কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। তখন যশোদা তর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,— হে অসংযতেন্দ্রিয়! তুমি একান্তে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ কেন? তোমার সঙ্গীরা ও তোমার অগ্রজ একথা বলিতেছে। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্ত্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

প্রকৃতি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই,—

‘ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃষতে মচরাচরম্’।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যে-প্রকৃতি, বর্তমান প্রবন্ধের উহা আলোচ্য বিষয় নহে।

এক্ষণে অভিলষিত বিষয়বস্তু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রকৃতি শব্দের অর্থ বাসনা (সংস্কার), স্বভাব ও স্বরূপ। এই প্রকৃতিবিষয়ের অনুধাবন করিব। জগতে বহু জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—‘ইল্পত্ যায না ধু’লে, স্বভাব যায না ম’লে; ‘অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি’ অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠকে (কয়লা) জল বা কোন রাসায়নিক দ্রব্যদ্বারা পরিকৃত করিবার শত চেষ্টা করিলেও তাহার কৃষ্ণবরণ পরিত্যক্ত হয় না। মানুষও তদ্রূপ ভগবদন্ত গাত্তবর্ণ ও স্বীয় স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারে না। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে অনু-সন্ধান করিলে দেখিতে পাই,—

“যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ ভুবতিক্রমঃ।

খা যদি ক্রিয়াতে রাজা স কিং নাস্মাতুপানহম্?”

অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কুকুবকে যদি রাজসিংহাসনে বসিতে দেওয়া হয়, তবে সে কি চক্ষু-পাতুকা ভঞ্জে বিরত হয়? না, তাহা হয় না। চক্ষুর আশ্বাদন সে ভুলিতে পারে না। এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে, তাহার নিজ স্বভাবানুযায়ী কৰ্ম্ম করে। অন্য কেহ তাহাকে স্বমত হইতে বিচলিত করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিলেন, 'তুমি বলিতেছ যে, আমি আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধ করিব না, কিন্তু জানিও তোমাকে একদিন মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে হইবে। কারণ প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে।

পুনশ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে কৰ্ম্মযোগের মধ্যে উল্লেখ আছে,—

সংগং চেষ্টিতে দ্বগ্যাঃ প্রকৃতে জ্ঞানিবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ (গীঃ ৩।৩৩)

অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ স্বভাবের অনুকূল কার্য্য করিয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিলেও স্ব-স্বভাবের অনুগমন করিতে বাধ্য হয়, উহার বাতিক্রম হয় না।

মনে করুন, যদি একজন শিক্ষিত দরিদ্রকে কোন দসু্যদলপতি প্রতি রাতি সহস্র মুদ্রা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, সে কি ঐ প্রাপ্তিযোগকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারে? কখনই পারে না। বাল্যকাল হইতে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করিয়াছে যে, চুরি না দসু্যবৃত্তি করা মহাপাপ, তবুও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনকে সুখী করিবার জন্ত ঐ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দারুণ অর্থ কচ্ছতার যুগে অর্থলোভ তাহাকে বিকল প্রেরণা দিবে, যতই তাহার ধর্ম্ম বা নীতিজ্ঞান থাকুক না কেন। প্রকৃতি জ্ঞানলোপ করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে পাপকর্মে নিয়োজিত করিবে।

সর্বশেষে শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই ক্লান্ত হইব। 'স্বভাব-তদ্বোধি জনঃ স্বনামমুবর্ততে' (ভাঃ ১০।২৪।১৬) অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বভাবের (প্রকৃতির) অধীন হইয়া তাহার অনুবর্তন করিয়া থাকেন।

অতএব সবিশেষ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরম করুণাময় শ্রীভগবানের প্রবোজকতায় প্রযোজ্যকর্তা মানুষ (জীবমাত্রই) পূর্বসংস্কার কৰ্ম্মক পরিচালিত হইয়া অবশ্য কার্য্য করিতেছে। মহাজনের পদে দেখিতে পাই,—

'নিজ বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।

তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥

শ্রীভগবান্ একমাত্র নিয়ন্তা, তাঁহার নিয়ন্তৃত্বাধীনে চরাচর বিশ্বের প্রত্যেকেই তাঁহার নির্দিষ্ট কর্মফল ভোগ করিতেছে।

পূর্বজন্ম-সংস্কার ফলে কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনীয়ার, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ নাট্যশিল্পী, কেহ বা কবি হইয়া সংসারে আসিতেছেন। ইঁহারা সমা- সমাজে শিক্ষিতের মানদণ্ডে কেহ কি নগণ্য বা মূর্খ? কখনই নহে। যিনি ডাক্তার, তিনি অস্ত্রোপচার দ্বারা বা নবাবিল্লত ঔষধ প্রয়োগে কত মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে জীবন দান করিতেছেন এবং দেহের Anatomy (শরীর ব্যবচ্ছেদ- বিজ্ঞা ও Physiology'র (শরীর-বিজ্ঞান) জ্ঞান অর্জন করিয়াও অপূর্ব শিল্পী বা বৈজ্ঞ যে ভগবান, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না; যিনি ইঞ্জিনীয়ার, তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি আর কতটুকু? প্রাকৃতিক সৃষ্টির যিনি ইঞ্জিনীয়ার (যন্ত্রশিল্পী) তাঁহার সৃষ্টিকুশলতা ধারণাতীত, অক্ষজ জ্ঞানাতীত, তবুও তাঁহার পাদপদ্মে ইঁহাদের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আবার দেখুন যিনি কবি, তাঁহার কবিতার ছন্দে-ছন্দে, ভাব-ভাষার মাধ্যমে শ্রীভগবান্ ও তত্ত্বজ্ঞের প্রতি কতই না প্রগাঢ়া ভক্তি 'ফলাও' করিয়া দেখাইতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ অন্তরে ভক্তির লেশমাত্রও নাই। লৌকিক জগতে ভাষা ও ভাব-তরঙ্গের মূর্ছনায় মস্তা- বাসীকে মুগ্ধ করিতে পারিলেও পরমাত্মার প্রীতিবিধান সূচুভাবে হয় না। লোককে কপটতার সাতাষো প্রতারণিত করিয়া নিজেই প্রবলিত হন। প্রকৃতিই (স্বভাবই) ইহার একমাত্র কারণ। শাস্ত্রে পাই,—

“পূর্বজন্মার্জিতা বিজ্ঞা পূর্বজন্মার্জিতং ধনম্।

পূর্বজন্মার্জিতং কর্ম্ম অগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥”

অর্থাৎ পূর্বজন্মার্জিত ধন, বিজ্ঞা ও কর্ম্ম পরবর্তী জন্মে অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়, দেহধারী জীবসকল তাহার অনুবর্তন করে।

ইহার সত্যতা প্রমাণস্বরূপ শ্রীল বলদেব বিজ্ঞাভূষণ প্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীল বলদেব বিজ্ঞাভূষণ প্রভুর উক্তি :—অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্তা পৃথিবী দুর্দাসনাময়ী প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির অহঙ্কাট জ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত দণ্ড-প্রদানের বিষয় জানা সত্ত্বেও সেই কর্ম্ম করে। সেখানে শাস্ত্রোক্ত নিগ্রহ বা দণ্ডবিষয়ে জানিলেও সংপ্রসঙ্গভ্রমের কি করিবে? দুর্দাসনার প্রাবল্যেহেতু তাহা হইতে নিবৃত্তিত করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সংসঙ্গযুক্ত হইলে

প্রকৃতির প্রাবল্য থাকিলেও তাহাকে নিবর্তিত করিতে পারে। “সন্তু এবাস্তু
ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ” অর্থাৎ সজ্জনেরাই উহার মনের বিরুদ্ধাসক্তিকে
উদ্ধিয়ারা ছেদন করিতে পারেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন,—এইরূপ পাপ কৃত হইলে নরক-
গতি ও রাজদণ্ড-প্রাপ্তি হয়, ইহা জানিয়াও এবং কুশল বা নিন্দা হইবে এইরূপ
বিবেকবান হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির চিরন্তন পাপাভ্যাসজনিত দুঃখভারের সদৃশ
বা অনুরূপ চেষ্টাই করিয়া থাকে, অতএব প্রকৃতি বা স্বভাবকে গমন বা
অনুসরণ করে। অশুদ্ধচিত্ত জনগণকে নিষ্কাম কর্মযোগ এবং শুদ্ধচিত্তগণকে
জ্ঞানযোগ সংস্কার ও প্রতিবোধিত করিতে পারে, কিন্তু অশুদ্ধচিত্তগণকে
নহে। সেই সমস্ত পাপিষ্ঠস্বভাব ব্যক্তিকেও যদৃচ্ছাক্রমে আমার কৃপাজনিত
তত্ত্বিযোগই উদ্ধার করিতে সমর্থ। যদুক্তং স্থানে—“অহো ধন্যোহসি দেবর্ষে
কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ নীচোহপ্যুৎপুলকো লেভে লুক্কো রতিমুচ্যতে।” অর্থাৎ
হে দেবর্ষে, আপনি ধন্য, আপনার কৃপায় ক্ষণকাল মধ্যে নীচ ব্যাধও উৎপুলক
হইয়া ভগবচ্চরণে রতিলাভ করিয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবৃতি,—বিদ্বান্ পুরুষ আত্ম-অনাত্ম বিচার-
পূর্বক প্রাকৃত গুণ-কর্মকে সহসা ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসধর্ম আশ্রয় করিলেই
তাহার মঙ্গল হইবে—এরূপ মনে করিবে না। জ্ঞানবান হইলেও বন্ধজীব
স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে, সহসা নিগ্রহ করিলেই যে,
প্রকৃতি পরিত্যাগ হয়, তাহা নহে। বন্ধজীবগণ সহজেই বহুকালান্ত
চেষ্টারূপা প্রকৃতিকেই অবলম্বন করিবে। এই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই
যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া তদনুযায়ী কর্মসকল একটু সতর্কতার
সহিত করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগলক্ষণযুক্ত বৈরাগ্য যে-পর্যন্ত হৃদয়ত
না হয়, সে পর্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্মযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা,
যেহেতু স্বধর্মপালন ও স্বধর্ম সংস্কার উভয়ফলই যুগপৎ সম্ভব।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্তিত যে, প্রকৃতি দ্রুতিক্রমা হইলেও সংসঙ্গযুক্ত
হইয়া তত্ত্বিযোগসহকারে বৈরাগ্য অবলম্বন-দ্বারা তাহাকে নিবর্তিত করিতে
পারা যায়।

—ত্রিদিবিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ উদ্ধমন্ত্রী মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি-হবি' ও

মহারাজ 'নিমি'-সংবাদ

নিমিরাজ যজ্ঞ করে 'বিদেহ'-নগরে ।
নব-ঋষি গেলা তথা হেন-অবসরে ॥
প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে ।
করযোড়ে পুছে তবে বিনয়-বচনে ॥
মুণ্ডি যদি শুনিবারে হও যোগ্যপাত্র ।
তবে সবে ভাগবত-ধর্ম্য कह মাত্র ॥

নিমির বচন শুনি' মহামুনিগণে ।
প্রশংসিয়া বোলে,—'রাজা, শুন সাবধানে' ॥
'কবি' বোলে,—আমি-সবে এই মাত্র বুঝি ।
যেন-তেন মতে কৃষ্ণপদযুগ ভজি ॥
সবে ওই পাদপদ্ম অভয়-কল্যাণ ।
মহাভয়-বিনাশন, দুঃখ-পরিত্রাণ ॥
দেহ, গেহ, সূত, দার অসত্য-ধেয়ানে ।
চিত্তগত উদ্বিগ্ন বারে দিনে দিনে ॥
একচিত্ত হয় কত নানা-পরকারে ।
অভয়চরণ সন্তে দুঃখ-প্রতিকারে ॥

যত যত উপায় कहিলা নারায়ণে ।
মূর্খজন-পরিত্রাণ হয় যাহা হনে ॥
সেই ভাগবত-ধর্ম্য জানিহ নিশ্চয় ।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ পাই—কহিল নির্ণয় ॥
যে-ধর্ম্য আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ ।
যে-ধর্ম্ম থাকিলে কিছু নহে বিঘ্নপাত ॥
এ-ধর্ম্ম আশ্রয় করি' মুদিত-নয়নে ।
সুপথ তেজিয়া করে কুপথে গমনে ॥

শ্রুতি, স্মৃতি দুই শাস্ত্র—বিপ্রে'র লোচন ।

এক না থাকিলে বলি—কাণা এ-ব্রাহ্মণ ॥

দুই না থাকিলে 'অন্ধ' বলি যে তাহারে ।

হেন বিপ্র হয় যদি, তথাপি না পড়ে ॥

হেন ভাগবত-ধর্ম ঈশ্বরের বাণী ।

ইহাতে সংশয়-বুদ্ধি করে কেহো জানি ॥

যে-যে কর্ম করে যেবা কায়-মন-চিন্তে ।

সহজ-স্বভাবে কিবা করে বুদ্ধিগতে ॥

সকল ইন্দ্রিয়গণ-বাক্য-অহঙ্কারে ।

লৌকিক, বৈদিক কর্ম যেবা যত করে ॥

সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ ।

ঈশ্বরে কহিল—এই ভাগবত-ধর্ম ॥

'ঈশ্বর ভজিলে কিবা আছে প্রয়োজন ?

জ্ঞান হৈলে হয় সব বিপদ-খণ্ডন ॥'

'হেন যদি বল, রাজা, কহিব তোমারে ।

কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো সংসার না তরে ॥

ঈশ্বরবিমুখ জনে হয় দেবমায়া ।

'তুগ্রিও-মুগ্রিও'—ভেদবুদ্ধি করে দেহ পাগ্রিও ॥

তা'থে শত্রু-মিত্র হয়—এ-সব কল্পনা ।

তবে শোক, দুঃখ, ভয়, অশেষ-ভাবনা ॥

'মুগ্রিও দেহ'—হেন হয় বুদ্ধি-বিপর্যায় ।

তে-কারণে হয় তা'র নানা দুঃখ-ভয় ॥

যাঁহার মায়ায় হয় এত বিড়ম্বন ।

এ-বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজে বৃদ্ধজন ॥

'গুরু সে ঈশ্বর, আত্মা' করয়ে ভাবনা ।

কৃষ্ণ-গুরু এক করি' করে উপাসনা ॥

দুই হেন বস্তু নাহি বিচার করিতে ।
 যেন স্বপ্নে মনোরথ মিলয়ে ভাবিতে ॥
 এ-সব সকল দেখ মনের বিলাস ।
 মন নিরোধিলে সব ভয় যায় নাশ ॥
 এ-সব দুর্গম-পথ ভজন-শক্তি ।
 তে-কারণে কহি রাজা, সুগম-ভক্তি ॥
 কৃষ্ণের মঙ্গল-কর্ম-জনম-চরিত ।
 শুনিব শ্রবণ ভরি' যে হয় পণ্ডিত ॥
 উচ্চস্বরে নাম-গুণ করিব কীর্তন ।
 লাজ, ভয় পরিহরি' করে পর্যটন ॥
 মনের আসক্তি ছাড়ি' রহে যথা-তথা ।
 সে-জন বৈষ্ণব, রাজা, জানহ সর্বথা ॥
 শ্রবণ, কীর্তন, ব্রত, সঙ্কল্প যাহার ।
 শ্রবণ-কীর্তনে চিত্ত দ্রবয়ে তাহার ॥
 উচ্চস্বরে হাসে, ক্ষেপে করয়ে রোদন ।
 উচ্চস্বরে গায়, ক্ষেপে ঘন গরজন ॥
 উনমত্তবত নাচে লোকবাহু হৈয়া ।
 লোক-বেদ, লাজ-ভয় সব তেয়োগিয়া ॥
 আকাশ, পবন, বহি, মহী, জ্যোতি, জল ।
 নদ-নদী, তরুগণ, পর্বত, সাগর ॥
 সকল কৃষ্ণের তনু জানিবে গেয়ানে ।
 প্রণাম করিব সব বিনয়-বিধানে ॥
 যদি বল, বহু-জন্ম তপোযোগ করি' ।
 এমত দুর্লভ-জ্ঞান লভিতে না পারি ॥
 কেবল কীর্তন-মাত্রে হেন দিব্যজ্ঞান ।
 এক জন্মে হয় এত, না হয় প্রমাণ ॥
 হেন যদি বোল রাজা, কহিব মরমে ।
 ভজিতে থাকুক, মাত্র শ্রবণ-কীর্তনে ॥

ভক্তিযোগ-অনুগত তত্ত্বজ্ঞান ক্ষুরে ।
 বিষয়-বৈরাগ্য তিন বাঢ়ে এককালে ॥
 ভোজন করিতে যেন গরাসে গরাসে ।
 তৃষ্টি-পুষ্টি হয় যেন, ক্ষুধাও বিনাশে ॥
 এইরূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে ভজিতে ।
 বিষয়ে বৈরাগ্য হয় ভকতি সাধিতে ॥
 অনুভব তত্ত্বজ্ঞান করয়ে উদয় ।
 তবে শান্তিরস পাঞা শান্ত হৈয়া রয় ॥

নিমিরাজা বলে—‘শুন, মহাযোগিগণ !
 কিরূপ ভক্তের চিহ্ন, কি তাঁ’র লক্ষণ ?
 কি বোলে, কি করে তাঁ’রা কি ধর্ম আচার ?
 ‘হরি’ বোলে,—“শুন রাজা কহিএ তোমার ॥

সর্বভূতে আত্মভাব, এক নারায়ণ ।
 সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে-জন ॥
 ভাগবতোক্তম এই জানিহ নিশ্চয় ।
 ভকত-মধ্যম তবে করিব নির্ণয় ॥

ঈশ্বরে করয়ে প্রেম, ভকতে মিত্রতা ।
 দীন-হীন-জনে কৃপা, বিপক্ষে ত্যাগিতা ॥
 এই সে জানিহ রাজা, ভকত-মধ্যম
 প্রাকৃত-ভক্তের শুন, কহিএ লক্ষণ ॥

প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি করি’ ।
 ভক্তজন না পূজে ঈশ্বর-বুদ্ধি ধরি’ ॥
 প্রাকৃত-ভকত তা’থে জানিব বিদিতে ।
 ত্রিবিধ ভকত, রাজা, কহিল সাক্ষাতে ॥

বর্ণধর্ম ও দৈববর্ণাশ্রম

পরমহংস—প্রতিষ্ঠিত। তিনি বালকের আকারে, বৃদ্ধের আকারে বা স্ত্রী-পুরুষ—যে কোন আকারে, স্লেচ্ছকূলে বা ব্রাহ্মণকূলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। দুনিয়ার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মাপকাঠি-দ্বারা পরমহংসকে মাপা যায় না। গুরুদেবের উপর গুরুগিরি চলে না, কেবল তাঁহার বাণীর সেবানুগত্য-দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হয়।

বর্ণাশ্রমে লিঙ্গ বা চিহ্নের ধারণ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের দ্বারা পরিচিত হন। কিন্তু এই লিঙ্গ বা চিহ্নই সর্বস্ব নহে, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থের ভিক্ষাবৃত্তিরূপ লিঙ্গ (ভাঃ ১১।১৮।২৫), গৃহস্থের বৈধ স্ত্রীর সহিত বাস (ভাঃ ১১।১৮।৪৩), ব্রহ্মচারীর উপনয়ন, গুরুকূলে বাস ও বেদাধ্যয়নাদি বাহ্য চিহ্ন মাত্র। ‘সর্বেযাং মনুশ্যামনম্’ (ভাঃ ১১।১৮।৪৩) অর্থাৎ সকলের পক্ষে আমার উপাসনাই একমাত্র উদ্দেশ্য—এই মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল লিঙ্গ বা চিহ্ননিষ্ঠা দৈববর্ণাশ্রমের বিচার নহে, ইহা সাধারণ স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন।

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষণে যো বৃত্তিমুপজীবতি।

স লিঙ্গিনাং হরতো ন স্তির্যগ্যোনৌ প্রজায়তে ॥ (মন্ ৪।২০০)

চিহ্নধারণের অমুপযোগী হইয়া তত্তচ্চিহ্ন গ্রহণপূর্বক তত্তদ্ব্যক্তি-দ্বারা জীবিকা অর্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্যগ্যোনি লাভ করে। অত্রিও বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মস্বত্রেণ গর্বিতঃ।

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরদ্যুতঃ ॥ (অঃ সং ৩।৭২)

যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা উগবতত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ ‘পশু’ বলিয়া খ্যাত হয়।

এইসকল প্রমাণ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, লিঙ্গনিষ্ঠা-মাত্র বর্ণাশ্রমের লক্ষণ নহে। অবশ্য বর্ণাশ্রমের ব্যভিচার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য অধোক্ষজ-বিয়ুসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইলে লিঙ্গ বা চিহ্নকেই ‘সর্বস্ব’ বলিয়া স্থাপন করিবার একটা যুক্তি ও স্পৃহা বন্ধজীবগণের মধ্যে স্বাভাবিকী হইয়া উঠে। উহা স্রীমদ্ভাগবতের ‘বেণুভিন্ন ভবেদ্যতিঃ’ (ভাঃ ১১।১৮।১৭), ‘বিপ্রত্রে সূত্রমেব হি’ (ভাঃ ১২।২।৩) অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণ-বর্ণ-নির্ণয়ে সূত্ররূপ চিহ্নই কারণ হইবে, শমদমাদি গুণোপেত বিয়ুসেবা-প্রযুক্তি

কারণ হইবে না' এবং 'লিঙ্গমেবামশ্রমখ্যাতাবল্যোন্মাপত্তিকারণম্' (ভাঃ ১২।২।৪) অর্থাৎ 'ব্রহ্মচর্যাদি চতুর্বিধ আশ্রমের পরিচয় বিষয়ে ও এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার-বিষয়ে দণ্ড, অজিন প্রভৃতি চিহ্নসমূহই একমাত্র কারণ-স্বরূপ হইবে' প্রভৃতি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অদৈব-বর্ণাশ্রমের মধ্যে লিঙ্গই সর্বস্ব ও মুখা এবং অধোক্ষজ-বিয়ুঃ-সেবা মৌখিক, কপটতাপূর্ণ ও লোকের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপের কৌশলমাত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অতএব যাহারা অধোক্ষজ-সেবাভিলাষী নিম্নিঞ্চন ভাগবত-পরমহংসের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের বিচারে যেন লিঙ্গকেই সর্বস্ব জ্ঞান না করা হয়। অপরকুলোদ্ভূত ব্যক্তিবিশেষ হরি-ভজন-স্পৃহা প্রদর্শন করায় আচার্য্য তাহাকে 'তত্তেনৈব বিনির্দ্দেশেৎ' বাক্যের মর্যাদা স্থাপনের জন্য এবং ভজনকারীকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসের আনুগত্য-ময় চিহ্নে চিহ্নিত করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তিনি যদি আচার্য্যসেবার অভিনিবেশ হইতে বিক্ষিপ-বশতঃ মনে করেন যে, বরকুলের সহিত সমান আসন প্রাপ্তি বা সামাজিক উন্নতি লাভ করিবা আমি ধন্য হইলাম, তাহা হইলে তাহার বিচার এই কর্মমার্গের শুদ্ধশোণিতের অন্তর্গত বিচারে আবদ্ধ থাকিল এবং বৈষ্ণবকে কর্ম-মার্গীয় বরকুলের অন্তর্গত বস্তু মাত্র বিচার করায় তচ্চরণেও অপরাধ ঘটিল। আবার বরকুলে আবিভূত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, অপরকুলে আবিভূত আচার্য্যের রূপালব্ধ ভজনকারী ব্যক্তি তাহা হইতে নিম্ন, তিনি ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়া বৈষ্ণব হওয়ায় সোনার সহিত সোহাগার মিলন হইয়াছে আর অপর-কুলোদ্ভূত আচার্য্যের রূপালব্ধ ভজনকারী ব্যক্তি কাংসা হইয়া কথঞ্চিৎ কাঞ্চনরূ লাভ করিলেও তাহার সহিত সোহাগার সন্মেলন নাই—পুত্রবাং তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন, তাহা হইলে ঐরূপ বিচার কর্মমার্গেরই অন্তর্গত বিচার-বিশেষ ও ভজনোন্নতির প্রতিবন্ধক অপরাধময় চিন্তাস্রোত।

সেদ্রুপ আশ্রম-সম্বন্ধেও যদি গৃহস্থের উপর ব্রহ্মচারীর বা ব্রহ্মচারীর উপর গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, কিংবা গৃহস্থের উপর সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীর উপর গৃহস্থ প্রভৃতি কামনা করেন অর্থাৎ কেবল লিঙ্গ-মাত্র লইয়া মারামারি করেন, তাহা হইলে সেদ্রুপ বিচারও দৈব-বর্ণাশ্রমের বিচার হইবে না, তাহা কর্মমার্গীয় আশ্রম-বর্ণাশ্রমের বিচারের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে। সাধারণ বিচারে গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, ভুক্তবৈরাগী অপেক্ষা অভুক্ত বৈরাগী শ্রেষ্ঠ, বৈধস্ত্রীগামী গৃহস্থ

অপেক্ষা বীৰ্য্যধারণকারী ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ। স্বতরাং সম্যাসী গৃহস্থের উপর প্রভুত্ব করিবেন বা গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী শিক্ষা দিবেন,—এই সকল বিচার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও কর্মমার্গীয় বাহুলিঙ্গগত বিচার। ইহাদের মূলে অধোক্ষজ-সেবাভিলাষী পরমহংসের আনুগত্যময় সেবার বিচার নাই। দৈববর্ণাশ্রমের বিচার ঐরূপ নহে, তথায় লিঙ্গকেই সর্বস্ব জ্ঞান করা হয় না, পরমহংসানুগতোর তারতম্যকেই সমস্ত বিচারের নিকট পাথর বলিয়া স্বীকার করা হয়। বাহ্য লিঙ্গে কেহ সম্যাসীই থাকুন, গৃহস্থই থাকুন কিম্বা বানপ্রস্থ অথবা ব্রহ্মচারীই হউন, তাহাতে কিছু আপেক্ষা নাই। আশ্রয়-বিগ্রহের ও বিষয়-বিগ্রহের অর্থেতুকী সেবায় কাহার অকপট অকৃত্রিম অহুগাগ কতটা বেশী, তাহাই সে-স্থলে লক্ষের বিষয়। সে-স্থানে আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত সম্প্রদায় একজনের উপর আর একজন প্রভুত্বকারী হইবেন না, সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত হইয়া, তাঁহার মূল কীর্তনের দোহার হইয়া একতানে আশ্রয়-বিগ্রহের ও বিষয়-বিগ্রহের সেবার অনুশীলন করিবেন। আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ অর্থাৎ ‘আমার প্রভুর প্রভু যে মহাপ্রভু’, তাহাই আমার উপাস্য; কিন্তু “আমার মহাপ্রভু” বা “আমার গৌরাদ্ধ” নহে। “আমার প্রভুর যে মহাপ্রভু” ‘আমার গুরুদেবের যে গৌরাদ্ধ’, ‘আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ’, তাহাই আমার উপাস্য; কিন্তু যেখানে আমার উপাস্য বিষয়-বিগ্রহ হইবে, সেখানেই অভক্তি বা অদৈব-প্রবৃত্তি। যে বর্ণাশ্রমে ‘আমি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পরিতোষণ করিব’—এইরূপ কণ্ঠতামস বিষ্ণুতোষণের মৌখিক আড়ম্বরমাত্র আছে, তাহা অদৈব বর্ণাশ্রম। আর যেস্থলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবাভিলাষী পরমহংসের অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের অনুশীলনের কথা আছে, তাহাই দৈব-বর্ণাশ্রম। আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ, সেই বিষয়-বিগ্রহের স্বথের চেষ্টা যেস্থলে নিরন্তর প্রকাশিত, তাহাই মঠ। ইহাই দৈববর্ণাশ্রমের নিগূঢ় তত্ত্ব। বিষ্ণু হইতে স্বরূপশক্তি বিয়োগ বা বিচ্ছেদ করিলে সেই বস্তুটি চিন্মাত্র নির্কিশেষ ব্রহ্মের ধারণা বা নিগূঢ় ক্রীতবাদ—যাহা আসুর বর্ণাশ্রমের শেষ পরিণতি। আসুর বর্ণাশ্রমিগণও অনেক সময় বিষ্ণুপুরাণের—“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পূমান্।

বিষ্ণুরাধ্যতে পন্ডা, নাশ্তন্ততোষকারণম্॥”

—শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের বিষ্ণু (১) কর্মফল বাধ্য, কল্পিত, ভোগ্যবস্তু! বিষ্ণু কখনও ভোগ্যবস্তু হন না, তিনি এক অদ্বিতীয় ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহারই ভোগ্য, বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোকের বিষ্ণু—অধোক্ষজ বিষ্ণু।

প্রত্যেক পাঞ্চরাত্রিককে দৈববর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইতেই হইবে ; কিন্তু আমরা ভাগবতমার্গীয় অর্থাৎ ঐকান্তিক নিকপট নামানুশীলনপর কার্য্যকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত করিতে পারি না। আসুর-বর্ণাশ্রম হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্যই দৈববর্ণাশ্রম। দৈববর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসী যেন মনে না করেন যে, নামানুশীলনপর ও সম্পূর্ণ শরণাগত অথচ বাহ্যচক্ষে যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি হইতে তিনি বড়। নামানুশীলনপর প্রকৃত ভজনানন্দীর সামান্য কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে ঐরূপ শতশত দৈববর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসীও ধন্যতিধন্য হইতে পারেন ; কারণ অকৈতব ভগবদ্ভজনই সেই সন্ন্যাসীরও আদর্শ।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। জোর করিয়া পরিত্যাগ করিলেও মঙ্গল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়ী ও ঘোষিৎসঙ্গী গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইতে হইবে, তাহাও নহে। অনর্থযুক্তকে অনুকূল সংসঙ্গ ও পরমহংসের সঙ্গ লাভ করিতে হইবে। আবার গৃহস্থের পোষাকেও পরমহংস অবস্থান করিতে পারেন। কাহারও প্রকৃতি ভজনপর পুরুষাভিমান আছে কি না—ইহাই তাঁহার পরমহংসের মাপকাঠি। পরমহংস অকিঞ্চন অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগত।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৃহস্থ থাকাই সমীচীন মনে করিয়া যদি দেহাসক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে গৃহব্রত-ধর্ম্মই প্রবল হইয়া যাইবে। গার্হস্থ্যের ন্যায় ব্রহ্মচারিত্ব, সন্ন্যাসিত্ব, বনচারিত্বও সেবাশ্রুতিকে যাহাতে আবরণ না করে তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ আবরণ উপস্থিত হইলেই বিদ্বা ভক্তির ও নানা প্রকার মৎসরতার বা দান্তিকতার উদয় হইবে।

দন্ত ও মৎসরতা ভ্রাতা ও ভগ্নীর ন্যায় অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থের উপর মৎসরতা প্রকাশ করিলে কিম্বা গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর উপর মৎসর হইলেও কিম্বা সন্ন্যাসী মৎসর ও দন্তপরায়ণ হইলে ক্রোধের অনুকূল অনুশীলন হইবে না।

একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধ করিলে গৃহব্রত বা তথাকথিত গৃহস্থ থাকিবার প্রবৃত্তি বন্ধমূল হয়। মদনমোহনই সমস্ত ইচ্ছার মালিক। যে-স্থলে আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্রা, সে-স্থলেই সংসার। প্রতিমুহূর্ত্তেই অপ্রকৃত মদনমোহনের যে নবনবায়মান কামোৎসবের ইচ্ছা হইতেছে, তাঁহার সেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা properly adjust করিতে হইবে।

মদনমোহনের ইচ্ছার সহিত বাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে adjusted হইয়াছে, তিনিই পরমহংস, তিনিই অকিঞ্চন।

পরমহংসের আনুগত্য যতটা অধিক হইবে, ততটা বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠার প্রতি ক্রমে ক্রমে ঐদামীন্দ্ৰ উপস্থিত হইবে, কিন্তু অকাল-পক্কতা বা কোনপ্রকার বাভিচার উপস্থিত হইবে না। বর্ণাশ্রমের গতি বহুদূর পর্যন্ত নহে : তাহা আমাদিগকে কুঞ্চলোকে লইয়া যাইতে পারে না। অথচ অনর্থযুক্ত/বস্ত্রাধ বর্ণাশ্রম ত্যাগ করাও যায় না, করিলে নিশ্চয়ই পাপ হইবে। পরমহংসের সাহচর্যে যতটা অধোক্ষজসেবার গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে থাকে, ততটা অকিঞ্চনতার প্রতি আকর্ষণ উপস্থিত হয়। তখন অধোক্ষজ-সেবকের এতটা গুরুত্ব উপলব্ধি হয় যে, অধোক্ষজ-সেবারহিত দৈক্ষা জন্মেও বিকার উপস্থিত হয়।

এইসকল কথা বুঝিতে ভুল করিলে আবার অনর্থযুক্তগণের নানাপ্রকার অশ্লুবিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কলিযুগে দৈক্ষাজন্মের দ্বারাই বর্ণাশ্রম সিদ্ধ হয়। কলিযুগে আগমপঞ্চরাত্রের পথই প্রশস্ত।

অনেকে গৃহস্থাশ্রমকে নিরাপদ মনে করেন, কিন্তু তাহার দায়িত্বের কথা চিন্তা করেন না। আপাতভোগসিক্তি নিরাপদ অবস্থা নহে। দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের 'আমার কন্যার কি হইবে, আমার পুত্রের কি হইবে'—এইরূপ বিচারের প্রাবল্য নাই : 'তাহারা হরিভজন করিতেছেন কি না'—কেবল-মাত্র এই দৃষ্টিরই প্রাবল্য আছে। যে-স্থলে পুত্র বা কন্যা অথবা আত্মীয়জন অধোক্ষজ-সেবার অনুকূল নহে, মনে মনে তাহাদের সঙ্গে পরিত্যাগ করিতেই হইবে ; নতুবা গৃহত্যাগ হইয়া যাইতেই হইবে। 'মনে মনে পরিত্যাগ করা' অর্থ তাহাদের প্রতি আসক্তি ও মোহের পরিত্যাগ,—তাহাদের প্রতি ক্রোধী হইয়া বাতিরেকভাবে তাহাদের প্রতি অত্যাশঙ্ক হওয়া নহে। যাহারা অনুকূল নহে, তাহাদের কথা 'চুপ্ চুপ্' করিয়া ধামাচাপা দিয়া রাখা বা বৈষম্যবর্ণণ পাছে সকল গুপ্ত কথা জানিতে পারেন, গোপনে তাহাদিগের অন্যায় কার্য চালাইতে দাও, আমি তৎপ্রতি অনাসক্ত'—এইরূপ কপটতা থাকিলে গৃহস্থাভিমাত্রীও দৈববর্ণাশ্রম হইতে চ্যুতি অনিবার্য। তাহাকে দুইদিন পরেই হউক বা পূর্বেই হউক, অভক্তিপর স্মার্তের ক্রৌতদাস হইয়া যাইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত হরিজন মহারাজ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

একদিন মহাপ্রভু পরমানন্দভরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভট্টাচার্য্যের সঙ্গেই তাঁহার ভবনে আগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং অপর একটি আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

সার্বভৌম—কৃষ্ণচৈতন্য ! বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। আপনি নবীন সন্ন্যাসী ; সুতরাং আপনার নিরন্তর বেদান্ত-শ্রবণ করা উচিত।

“বেদান্তবাক্যে সৃদা বমন্তো, তিষ্ঠান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তুঃ।

অশোকমন্তুঃকরণে চরন্তুঃ, কোপীনবন্তুঃ খলু ভাগ্যবন্তুঃ ॥”

মহাপ্রভু—আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। আপনি আমাকে যে উপদেশ করিবেন, তাহাই আমি পালন করিব।

মহাপ্রভুর এই বাক্যে সার্বভৌম বিশেষ আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুকে বেদান্ত-শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। ‘বেদান্ত’ বলিতে লোকে পূর্ব্বে বাদরায়ণ-সূত্রের শঙ্কর-প্রণীত শারীরক-ভাষ্যকেই জানিত। সূত্রকর্ত্তা বাদরায়ণ স্বয়ং তাঁহার সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কিম্বা সাত্তত আচার্য্যগণ যে-সকল ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনেকেই অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন। শ্রীগৌরমুন্দের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম ও শঙ্কর-বেদান্তের পীঠস্থান বারাণসীর সন্ন্যাসীগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য এবং বেদান্ত-জিজ্ঞাসার চরম ফলস্বরূপ শ্রীভাগবত বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক জগতে সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই সকল লীলা করিয়াছিলেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রমাগত সাত দিন শঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী বেদান্ত-শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ভাল-মন্দ কিছুই না বলিয়া মৌনভাবে তাহা শ্রবণ-মাত্র করিতে থাকিলেন। অষ্টম দিবসে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে সিজ্ঞাসা করিলেন,—

সার্বভৌম—কৃষ্ণচৈতন্য ! আপনি আজ সাত দিন ধরিয়া বেদান্ত-শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু আপনার মুখে ভাল-মন্দ কোন মতামতই এ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। আপনি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বুঝিতেছেন, কি না বুঝিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমি অত্যন্ত মূর্থ; আপনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রবণ করিতেছি। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য শ্রবণ মাত্র করি। কিন্তু আপনি যে অর্থ করিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

সার্বভৌম—ভাল, আপনি যদি না-ই বুঝেন, তাহা হইলে বুঝিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করা উচিত; পরিপ্রশ্ন বাতীত কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু আপনি কেবল শ্রবণ করিয়া মৌনী থাকেন। আপনার হৃদয়ে কি আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

মহাপ্রভু—বাস-সূত্রের অর্থগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া মন বড়ই বিকল হয়। সূত্রের সংজ্ঞা শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

“অল্লাঙ্করমসন্ধিঞ্চং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।

অস্তোভমনবজ্ঞং চ ‘সূত্রং’ সূত্রবিদো বিদুঃ ॥”

বাস-সূত্রে সূত্রের এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্র-বোধ ব্যাখ্যান-সাপেক্ষ। ব্যাখ্যান পঞ্চ-লক্ষণ-বিশিষ্ট।

“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-যোজনা।

আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥”

পদচ্ছেদ অর্থাৎ ব্যাখ্যাতব্য-বাক্যের মধ্যে যে-সকল বাক্য সম্মিলিত-ভাবে আছে, সেগুলিতে পৃথক করিয়া নির্দেশ করা; পদার্থোক্তি—যে পদের যেকোন অর্থ, তাহা প্রকাশ করা; বিগ্রহ,—সেই বাক্যে কোন সমাস থাকিলে তাহার বাক্য রচনা করা; বাক্য-যোজনা,—অন্বয়মুখে বাক্য রচনা করা এবং আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি, আশঙ্কা বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে তাহার সমাধান, মীমাংসা বা নিরসন করা—ব্যাখ্যানের এই পঞ্চ লক্ষণ।

এই ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সংক্ষেপে এবং ভাষ্যে সবিস্তারে আলোচিত হইয়া থাকে। ভাষ্যের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

“সূত্রার্থো বর্ণাতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণান্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥”

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারি-পদসমূহ-দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত-পদসমূহও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাই “ভাষ্য” নামে অভিহিত।

সূত্রের ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিতেছে। আপনার কথিত ভাষ্য সূত্রের মুখ্য-অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া কল্পিত গৌণার্থ-দ্বারা মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে।

সার্কভৌম—আপনি এতক্ষণ চূপ করিয়াছিলেন, এখন দেখি পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছেন! ‘মুখ্যার্থ’ বলিতে আপনি কাহাকে নির্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য-অর্থ, তাহাই বেদবাস নিষ্কৃতস্বরে উদ্দেশ্য করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আপনি গৌণার্থ কল্পনা করিলেন। অভিধা-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া মুখ্য অর্থ হয়; কিন্তু অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা-দ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছেন।

সার্কভৌম—আপনি কাহাকে মুখ্য-প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন?

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমার বা আপনার কচি-অনুসারে কোন বস্তুকে স্বীকার বা অস্বীকারই যে “প্রমাণ” বলিয়া গণিত হইবে, তাহা নহে। কারণ, মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী; সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ-অনুমান প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদি-সিদ্ধ-পুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত সার্কলৌকিক অলৌকিক-জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্বাঙ্গীত, সর্বাশ্রয়, সর্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন বস্তুর বিজ্ঞানলাভেক্সু-পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি-বাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র; কিন্তু ‘শব্দ’ ও ‘গোময়’ তন্মধ্যে গণিত হইয়া শ্রুতি-বাক্য-বলে মহা পবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

সার্কভৌম—ভাল, আপনি ‘অভিধা’ ও ‘লক্ষণা’র কি লক্ষণ নির্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—শব্দ-কদম্ব শ্রবণমাত্রেই যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা শব্দের অভিধাবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। যেমন, “কৃষ্ণং হুগবান্ স্বয়ম্”—এই কথা শুনিগামাত্রই প্রতীত হয় যে, “কৃষ্ণেন্দ্রই স্বয়ং হুগবান্”; অপরদিকে “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” অর্থাৎ গঙ্গাতে ঘোষ-পল্লী—এই শব্দের অভিধা-ক্রমে-প্রাপ্ত অর্থ প্রসিক্ত হয় না, কারণ জলপ্রবাহে ঘোষ-পল্লী অবস্থিতি থাকিতে পারে

না বলিয়া লক্ষণা-শক্তি-দ্বারা গঙ্গাতীরে ঘোষ-পল্লী বুঝিতে হয়। সহজ অর্থে 'অভিধা' বলা যায়। যে স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেখানে অভিধা-শক্তির কার্য্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ হয়—একপ স্থলেই অভিধা কার্য্য করে। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—“শ্রামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছামং প্রপদ্যে।” অভিধারিত্ব দ্বারা এই বেদ-বাক্যের যখন ন্যায়-সিদ্ধ অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তখন আচার্য্য শঙ্করের সহিত ‘শ্রাম’ শব্দের “হৃদ-ব্রহ্মত্ব” কেন অস্বীকার করি? মুক্ত পুরুষের স্বভাবতঃ শ্রীশ্রামদুন্দরের যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন; তাহাই এই বেদ-বাক্যের সিদ্ধ অর্থ।

সার্বভৌম—লক্ষণা বহু প্রকারের; সুতরাং লক্ষণামাত্রেরে অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বে কার্য্যকরী নহে, ইহা বলা যায় না।

মহাপ্রভু—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিকৃতা, আধুনিকা প্রভৃতি যত প্রকার লক্ষণাই থাকুক না কেন, সকল প্রকার লক্ষণাই অধোক্ষজ-বস্তু-নির্ণয়ে কোন কার্য্য করে না; বরং উহার তাহাতে নিযুক্ত হইলে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

সার্বভৌম—আপনি দেখি বিপরীত বাক্য বলিতেছেন। জগদগুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, অনির্দেশ্য-তত্ত্বে অভিধা-বৃত্তি কার্য্য করে না, অতএব সেখানে লক্ষণা-দ্বারাই বেদার্থ নির্ণয় করা উচিত।

মহাপ্রভু—শ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। শব্দ-শক্তি-বিচার ইহাই নির্ণীত আছে যে, যেস্থলে অভিধা অঙ্গীকৃত হয় না, সেখানে লক্ষণার স্থল নাই। যেখানে গ্রাম নাই, সেখানে সীমার তর্ক কেন? জনক বাতীত পুত্রোৎপত্তি কিরূপে হয়? বিতর্ক এই যে, অনির্দেয়-বস্তুতে যখন অভিধা-দ্বারা শব্দ কার্য্য করে না, তখন অভিধার সহায় স্বরূপ লক্ষণা কি করিবে? অতএব লক্ষণাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আগু-বাক্যের অভিধা-শক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-বস্তু অবেষণ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির কার্য্য। ব্যাস-সূত্রের অর্থগুলি স্বতঃপ্রকাশ স্বর্গের অপ্রতিরূদ্ধ নির্মূল কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান; কিন্তু হ-কপোল-কলিত-ভাষ্টি-মেঘ-খণ্ড তাহা লোক-লোচনের নিকট আচ্ছাদিত করিয়াছে।

সার্বভৌম—আপনি পূর্ব্ব বলিয়াছেন, উপনিষদ-প্রতিপাদ্য অর্থই সূত্র-কারে বেদান্তে নিবদ্ধ হইয়াছে; আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনি ভাষ্টির নিন্দা করিয়া কি পরোক্ষ-ভাবে শ্রুতিকেই নিন্দা করিতেছেন না?

মহাপ্রভু—বেদ এবং তদনুগত পুরাণ-সমূহ ব্রহ্মকেই নিকল্পণ করিয়াছেন “বৃহত্ত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ ব্রহ্ম”। ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব-ধর্ম-বশতঃ পরমেশ্বর লক্ষণে লক্ষিত হন। বৃহদ্ বা পরিপূর্ণ বস্তুতে জীব স্ব-কপোল-কল্পনা বশে কোন শক্তির অভাব লক্ষ্য করিলে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণতা বা বৃহত্ত্ব অস্বীকার করা হইল। ঈশ্বরকে তাঁহার সর্বৈশ্বর্যের পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন না করিলে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে, আর তাঁহাকে সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন করিলে সেই বৃহদ্-ব্রহ্ম-বস্তুই স্বয়ং ভগবদ্ভূপে প্রকাশিত হন। অতএব ‘ব্রহ্ম’ ও ‘ঈশ্বর’—ইহারা ভগবত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ-ভগবান্ সর্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সর্বিশেষ; তাঁহাকে ‘নিরাকার’ বলিয়া আখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। অপিচ, সর্বৈশ্বর্যাপূর্ণ ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র-শক্তিক্রমে ভগবান্ একইকালে সর্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মের পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।

“জ্ঞানেন্দো দ্বিবিধঃ প্রাক্তো মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রভেদতঃ।

অমূর্ত্তশ্চাত্মো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দেইচুতো মতঃ।

অমূর্ত্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞানরূপঞ্চ নিগূর্ণঃ।

স্ব-স্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্ম চেতি সত্যং মতম্।

অমূর্ত্তমূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ববিচারতঃ।

ভেদস্ত্ব কল্পিতো বেদৈর্মণিতত্ত্বজসোরিব।”

সার্কভৌম—আপনার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শ্রুতি-বাক্যের সহিত অসঙ্গতি হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম—“অপানিপাদ”, ‘অচক্ষু’, ‘অকর্ণ’; আর আপনি যে-সকল প্রমাণ উদ্ধার করিলেন, তাহা পুরাণ ও স্মৃতি-শাস্ত্রাদির প্রমাণ। আমার শ্রুতির মুখ্য প্রমাণ অস্বীকার করিয়া পুরাণাদির গৌণ-প্রমাণ-বাক্য-সমূহ স্বীকার করিতে পারি না। উক্তও হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গরীমসী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

রাজর্ষি ভরত ও মহাত্মা রত্নিদেব

পূর্বকালে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এতদূর সদাচারপরায়ণ ও স্বধর্ম্যে নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁহাকে লোকে 'রাজর্ষি' বলিত। আমরা অধুনা যে-বর্ষে বা দেশে বাস করিতেছি এই স্থানের নাম পূর্বে অজনাভ ছিল। মহারাজ ভরত রাজ্য হইবার পর ভরতের নামানুসারে ইহার নাম ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। রাজর্ষি ভরত নির্দিষ্টকাল রাজত্ব করিয়া হরি আরাধনা করিবার জন্য গ্রহশাস্ত্রম ত্যাগ করিলেন এবং পুলহাশ্রমে গমনপূর্বক নিবিষ্টচিত্তে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আশ্রমটী সরিষরা গণ্ডকী নদীর উপকূলে বিরাজিত ছিল। ঐ নদীতে শ্রীনারায়ণশীলা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। এমন পবিত্র স্থানে ভরত বাস করিতেন। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে ত্যাগী ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুমুম, কিসলয়, তুলসী, জল এবং ফলমূলদির উপহার-দ্বারা নিবিষ্ট-চিত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। তিনি সর্বদা শুদ্ধ সংযত বিষয়াভিলাষরহিত, উপরত ও শান্তভাবে সেই স্থানে বিরাজ করিয়া সর্বদা ভগবদারাধন-তৎপর ছিলেন। ক্রমে তাঁহাতে এরূপ ভগবৎসেবামুগ্ধাগলক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল যে, তাঁহাতে কম্প-অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত হইতে থাকিল। একদিন তিনি গণ্ডকী মহানদীতে স্নানাদি সমাপনপূর্বক তটিনীর কূলে উপবেশন করিয়া 'প্রণব' জপ করিতেছিলেন। এমন সময় একটি গর্ভবতী হরিণী পিপাসিতা হইয়া জলপানেচ্ছায় সেই জলাশয়ের সমীপে আগমনপূর্বক জলপানে রত হইলে অদূরে একটি সিংহ ভৎসর গর্জন করিয়া উঠিল। একে হরিণীর হৃদয় স্বভাবতঃ ব্যাকুল, তাহাতে আবার নির্জ্জন-উপবনে প্রতিধ্বনিত লোকভয়ঙ্কর সিংহনিবাদ চকিতস্বভাবা হরিণীকে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলা করিয়া তুলিল। তখনও পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই, হরিণী সচকিতনেত্রে প্রাণভয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভৎক্ষণাৎ উল্লাসনপূর্বক নদী উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইল। এইরূপ চেষ্টায় হরিণীর গর্ভপাত হইল এবং ভৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দীনা হরিণীর গর্ভস্থ শাবকটী নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। ভগবদারাধনারত ভরত নদীতীরে বসিয়া এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন কোন্ পাষণ্ডহৃদয় আছে, এমন কোন্ প্রাণী 'মামুষ' নাম ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছেন, যাহার হৃদয় এইরূপ চিত্তে বিগলিত না হয়! ভরতেরও তাহাই হইল। ভাগবত-প্রবর ভরত হরিণ শাবকটীকে রক্ষা করিবার জন্ত ভগবদারাধনা হইতে বিরত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—“নুনং হার্ষাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণমুহুদ এবস্বিধার্থে

স্বার্থানপিগুরুতরানুপেক্ষন্তে ।”—(ভাঃ ৫।৮।১১—) উপশমশীল আৰ্য্য সাধুগণ দীনজনের সুহৃদ, তাঁহারা দীনব্যক্তিকে দয়া করিবার জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভারত মাতৃপিতৃহীন নিঃসহায় হরিনশাবকটিকে স্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া পরম যত্নে উহার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি ভারত শুদ্ধ ভগবদারাধনার জন্য দুস্ত্যজ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, গৃহসুখ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনী হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভগবৎসেবার জন্য প্রবল হইতে প্রবলতর পিপাসা না জাগিয়া দরিদ্রতায় বা জীবে নারায়ণ বুদ্ধি হইল ! প্রকৃতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি হইল ! প্রকৃতিদেবীও সময় বুঝিয়া ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। ভারত ভগবচ্চরণে প্রাকৃতবুদ্ধি করাতে হরিসেবা হইতে বিচ্যুত হইলেন। দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি অদ্বয়তত্ত্ব-শ্রীভগবানের সেবামাধুরী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দ্বিতীয়বস্ত্ত প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া বিচার করিলেন—

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?”

হরিন অর্থাৎ মায়াই তখন তাঁহার ঈশ্বর হইয়া পড়িল। তিনি হরিসম্বন্ধ-জ্ঞান হারাইলেন। মায়াকে ঈশ্বরী করিয়া ভারত পতিত হইলেন। ‘মৃগ’ ভাবিতে ভাবিতে দেহান্তে ভারতের মৃগ-শরীর প্রাপ্তি ঘটিল।

রাজর্ষি ভারত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পূর্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতিবশতঃই তাঁহার ঐরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদীর ন্যায় চিরাপরাধী ছিলেন না। মায়াবাদিগণ যে প্রকার নারায়ণে দারিদ্রতা অর্থাৎ ভগবানে মায়ার আরোপ করিয়া থাকেন অথবা ভগবানের নিত্য চিদ্বিলাসকে অনিত্য ও মায়িকজ্ঞান করিয়া থাকেন ও নির্বিশেষ আত্মবিনাশকেই শ্রেষ্ঠপদবী বলিয়া কল্পনা করেন, ভগবদ্ভক্ত ভারত সেইরূপ বিচারক ছিলেন না। কেবল দুষ্কৃতি-বশতঃ তাঁহার সাময়িক বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার হৃদয় মায়া-বাদী ও নির্ভেদজ্ঞানীর ন্যায় নাস্তিকতা দ্বারা বজ্রসম কঠিন ছিল না। তাই ভাগবত ভারত কিছুকাল পরে তাঁহার দুষ্কৃতির ফল বুদ্ধিতে পারিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন,— কি কষ্ট ! আমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি যে জন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন পুণ্যারণ্যে অবস্থানপূর্বক একান্তভাবে শ্রবণ, মনন, সংকীৰ্ত্তন, আরাধনা, অহুসরণ প্রভৃতি ভক্তিযোগে অভিনিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকালও বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া

বহুকালে সর্পিভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মন স্থাপিত ও স্থিরকৃত করিয়া-
ছিলাম তাহা সেই মৃগশাবকের সঙ্গে ভগবান্ হইতে একেবারে নিঃসৃত হইয়া
অ'সিয়াছে অহো! আমি কি মূর্খ! (ভাঃ ৫।৮।৩২-৩৩)

আচার্য্য শ্রীজীব গোষামিপাদ এই ভারতের চরিত্র-চিত্র হইতে আমা-
দিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, “যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণদাস জীবকে কৃষ্ণসেবায়
নিযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল তাহাদের দৈহিক উপকার বা
শুশ্রূষাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিম্বা যাঁহারা “আগে দৈহিক উপকার,
পরে ভগবানের সেবা”—এইরূপ বিচার করিয়া জীব-সেবা, সমাজ-সেবা,
পরোপকার প্রভৃতির ছল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-
দশাই প্রাপ্ত হন। এইরূপ উপদেষ্টৃগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট, অসদ্-
বস্ত্তে আসক্ত সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ হুঃসঙ্গ। উহাদের সঙ্গ করিলে ভগবদ্ভক্তি
হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবের নাস্তিকতা বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা নিজদিগকে যতই
‘আন্তিক’ মনে করুন না কেন, দেশের, সমাজের হিতৈষী ভাবুন না কেন,
তাঁহাদিগের সঙ্গ ভগবদ্ভক্তিপথের পরম অন্তরায়। যাঁহারা ভগবৎসেবা-
পরায়ণ, তাঁহারাই যথার্থ পরোপকারী। তাঁহাদের মত জীবে দয়ার্দ্র আর
কেহই নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেইরূপ পরোপকার করিবার জন্তই সমগ্র জীবকুলকে
শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

“ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।

জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার ॥”

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুর সেই দ্বার আদর্শই দেখাইয়াছেন—

“জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।

সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ ॥”

পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন প্রভুই প্রকৃতপক্ষে জীবের জন্ত ব্যাকুল—

বৈরাগ্যযুগ্তজিরসং প্রযত্নৈরপায়য়নামনতস্পদুমঙ্গম্।

কৃপানুধিযঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ (শ্রীজীব)

শ্রীশ্রীজীবের উপদেশ শ্রবণ করিলেই জীব চিহ্নিলাস ভগবৎসেবা এবং
ভগবৎপ্রেমরূপ পরমধন লাভ করিয়া দারিদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন—

“তত্র সাধকানাং যত্নু যথা তরোন্মূলনিবেচনেন ইত্যাদৌ তদন্যোপাস-
নানাং পুনরুত্থমূলক্ষ্যতে তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্রতত্তদৃষ্টোপাসনানামেব অত্র তু

তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবতুপাসনামেব বিধীয়তে । তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব
সংপাद्यতে । তচ্চান্যত্র বটতি রাগদেহাশ্লেষার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ । অতএব
কেবলাভূতাত্মকম্পয়া ভগবদর্চনং ত্যক্তবতো ভরতন্যাস্তরাযঃ ।” (ক্রঃ সন্দর্ভ
৩২৯২৯)

অপরদিকে আর একটি চরিত্র দর্শন করুন । পূর্বকালে রস্তিদেব নামক
একজন নরপতি ছিলেন । তিনি মহাবদান্য ও দানশীল মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত
ছিলেন । তিনি ভারতের ন্যায় সম্রাট ছিলেন না, তিনি একজন বৈষ্ণবগৃহস্থ
ছিলেন । তাঁহার বিত্ত নিরন্তর সদ্ব্যয়ে নিযুক্ত ছিল । তিনি স্বয়ং উপবাসী
থাকিয়াও অপরকে সর্বদা বিষ্ণুনৈবেদ্য-দ্বারা পতিভূক্ত করিতেন । সময়ে
সময়ে এমন হইত যে, ঐ নরপতি সমুদয় বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া
সপরিবারে উপবাসী থাকিতেন । এমন কি জলমাত্র পান না করিয়াও তাঁহার
মাসাধিককাল গত হইত । তিনি প্রাণিনির্জিহ্মেষে সকলকে শ্রীহরির অশেষ
শ্রীমহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহাদের আত্মার নিত্য কল্যাণ বা শুভানুখী সুকৃতি
উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন । তাঁহার প্রার্থনা ছিল—

ন কাময়েহং গতিমীশ্বরংপরমাষ্টদ্বিযুক্তামপুন ভবং বা ।

আর্তিং প্রপদ্যেইখিল দেহভাজ্যামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যতুংখা ॥ (ভাঃ ৯২১৮)

—আমি ভগবানের সমীপে যোগীদের কণ্ঠা হ্রিমাди অষ্ট-সিদ্ধিসম্বন্ধি ও গতি
অথবা জন্মান্তরবহিত মুক্তি এ সকল কিছুই কামনা করি না । আমার প্রার্থনা
এই যে, আমি যেন জীবের হৃৎকের ভোক্তরূপে দেহির অন্তঃস্থিত হইয়া
তাঁহাদের সমস্ত হৃৎক প্রাপ্ত হই, যাচাতে আমি হইতে জীবের ভগবদ্বিমুখতা-
রূপ সমস্ত হৃৎক বিদূরিত হয়, তাহাই আমার প্রার্থনা । রস্তিদেবের এতাদৃশ
পরহৃৎকে আর্দ্র-হৃদয় দর্শন করিয়া তাঁহার ধৈর্য্য-পরীক্ষার্থ বিষ্ণুমায়া তাঁহার
নিকট বহু বহু ব্রহ্মাদি দেবগণেরও লোভনীয় পদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন ।
কিন্তু মহারাজ রস্তিদেব সেই সমস্তের প্রতি দূর হইতে দণ্ডবৎবিধানপূর্বক
নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে চিত্তসংলগ্ন করিয়াছিলেন,—

“স বৈ তেভ্যো নমস্কৃণা নিঃসঙ্গে বিগতস্পৃহঃ ।

বাসুদেবে ভগবতি তজ্জা চক্রে মনঃ পরম্ ॥” (ভাঃ ৯২১১১)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু রাজর্ষি ভারত ও মহারাজ রস্তিদেবের চরিত্রদ্বয়
দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ভারত শ্রী-পুত্র-রাজ্য-গৃহকর্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও
কেবল জীবের দৈহিক কষ্ট নিবারণের জন্য কারুণ্য প্রদর্শন করিতে ভগবৎসেবা

হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন আর মহারাজ রত্নদেব সর্বজীবকে বাসুদেব সাক্ষীকৃত দর্শন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদ-দ্বারা ভগবৎসেবক-স্বত্রে তাহাদের আত্মার কল্যাণ বিধান এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাহাদের ব্যবহারিক দুঃখ বিদূষিত করিবার চেষ্টা করিয়া মায়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতার শাস্ত্রানুসারে যোগিগণের বাঞ্ছিত অনিমাди সিদ্ধি বা কৈবল্য-সুখও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি এই সকল বস্তুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্ট ছিলেন এবং জীব-গণকে ভগবৎসহজি বস্তুজ্ঞানে তাহাদের আত্মার কল্যাণ বিধান করিবার জন্ত বিষ্ণুপ্রসাদ-দ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐক্লপ কার্য্য 'বাসুদেব-সম্বন্ধসংগিত' হওয়াতে ভক্তাস্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর রাজর্ষি ভরতের কার্য্য-চেষ্টা কেবল 'ভূতানুকম্পা'-মাত্র হওয়াতে উহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ মায়া কার্য্য হইয়া তাঁহাকে ভজন হইতে পাত্তিত করিয়াছিল—

“কেবলজীবকারুণ্যং খলু বিঘ্নায় ভবতি ভরতবৎ। যো মোক্ষদানাদরঃ সোহপি তৎকারুণ্য-বিভাবনময় ভক্তিকৃতা।” (ক্রমসন্দর্ভ ৯২১।৫-৮)

দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্তব্যক্তিগণের ভ্রমাত্মক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনারা নাস্তিকতাকে আত্মাহন করিবেন না। নারায়ণে দরিদ্রতা আরোপ করিবেন না। ভগবান্কে মায়ায় সঞ্চিত মিথ্য ইহার ভ্রুবন্ধি পোষণ করিবেন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এইক্লপ ভগবচ্চরণে অপরাদ্ধী ব্যক্তিগণ জগতের নিকট জীবমুক্ত পুরুষ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনারা নিরন্তর অচ্যুতের সেবায় নিযুক্ত থাকুন। বৃক্ষমূলে জল-সেচন করিলে পত্র-পুষ্প-শাখা-প্রশাখা সমস্তই সঞ্জীবিত ও কুসুমিত হইয়া আপনাদিগকে অমৃতফল প্রদান করিবে। প্রাণে আহার প্রদান করুন। আপনাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকিবে। আপনারা নিখিলজীবকে ভগবৎ-সম্বন্ধে দৃষ্টি করুন। ভাবন্তু জগৎকে কায়মনোবাক্যে সেবা করুন। ভগবদ্ভক্তি এবং গুণে উদাসীন জীবগণকে স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাম জানিয়া মহাপ্রসাদ নির্মালা, হরিকথাকীর্তন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের স্মৃতি উৎপাদন করুন। কোন না কোন দিন তাহাদের শুভদিনের উদয় হইবে। তাঁহারা যথার্থ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন।

শিলিগুড়ি শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রী শ্রীগুরু-গোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)

শক্তিগড়, জগন্নাথ ঘাট

পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আগামী ১৬শে বৈশাখ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ (ইং ১০ই মে, ১৯৭৮ খৃঃ)
বুধবার, শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথি-
উপলক্ষে শিলিগুড়ি মহরসু সমিতির অগ্রতম শাখা শ্রীকেশব গোস্বামী
গোড়ীয় মঠের নবনির্মীয়মান শ্রীমন্দির পঞ্চমোদিতম শ্রীল গুরুপাদ-
পদ্ম নিত্যশীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীস্বীউ এবং
শ্রী জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাদেবীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।
এতদুপলক্ষে ১৬শে বৈশাখ, বুধবার হইতে ২৮শে বৈশাখ, শুক্রবার
(ইং ১০.৫।৭৮ হইতে ১২।৫।৭৭) পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমন্দির-
প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্মসভা ও নগর-
সঙ্কীর্ণনাদি সমিতির বর্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে।
সমিতির ও বিভিন্ন মঠের প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে
বক্তৃতা করিবেন।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্গব যোগদান
করিলে সমিতির সদস্যগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই
মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-
দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-
সেবোন্মুখী সূকৃতি অর্জিত হইবে। দৈনন্দিন বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী
পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইতি—১১ই ফাল্গুন, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ; ইং ২৬।২।৭৮

শুদ্ধভক্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—অনুষ্ঠান-সূচী—

২৫শে বৈশাখ (১০।৫।৭৮), মঙ্গলবার —

শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা—প্রাতঃ ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত

অধিবাস—সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত

কীর্তন—সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত

শ্রীমন্তাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ।

২৬শে বৈশাখ (১০।৫।৭৮), বুধবার —

মঙ্গল আরতি—প্রাতঃ ৪টায়

সঙ্কীৰ্তন ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ—প্রাতঃ ৬টা হইতে ৭-৩০টা পর্য্যন্ত

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—প্রাতঃ ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত

প্রসাদ বিতরণ—দ্বিপ্রহর হইতে বৈকাল ৩টা পর্য্যন্ত

সন্ধ্যারতি—সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত

ধর্ম্মসভা—রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ।

২৭শে বৈশাখ (১১।৫।৭৮), বৃহস্পতিবার —

মঙ্গলারতি, নগর সঙ্কীৰ্তন ও পাঠ-কীর্তন—প্রাতঃ ৫টা হইতে

১০টা পর্য্যন্ত

সন্ধ্যারতি ও ধর্ম্মসভা—সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত

ছায়াচিত্রে গৌরলীলা—রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ।

২৮শে বৈশাখ (১১।৫।৭৮), শুক্রবার —

মঙ্গলারতি, নগর সঙ্কীৰ্তন ও পাঠ-কীর্তন—প্রাতঃ ৪টা হইতে

১০টা পর্য্যন্ত

সন্ধ্যারতি ও ধর্ম্মসভা—সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত

ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলাদি—রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ।

জ্ঞেয়্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিহাণী শ্রীমন্তকিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

গোড়ীয়েৰ ত্ৰিংশ-বৰ্ষ

আশ্ৰয় ও বিষয়ভেদে গোড়ীয়েৰ অপ্রাকৃতত্ব

“শ্ৰীগোড়ীয়-পত্ৰিকা” শুভ ত্ৰিংশ-বৰ্ষে প্ৰবেশ কৰিলেন। প্ৰাকৃত কাল-গণনাৰ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বৰ্ত্তমান—এই তিনিটি অংশ দেখিতে পাওঁয়া যায় ; কিন্তু অপ্রাকৃত ক্ষেত্ৰে এইৰূপ আংশিক বিচাৰ নাই। তথ্য নিত্য-বৰ্ত্তমান-কালই প্ৰচলিত ; কাৰণ সেৱা, সেৱক ও সেৱা নিত্য হওয়ায় লীলাও নিত্য হৈছে। আশ্ৰয়-বিষয়ভেদে ‘শ্ৰীগোড়ীয়’ নিত্যলীলাসুৰভ। —“নিতাই-এৰ চৰণ সতা, তাহাৰ সেৱক নিতা” ; ইটাই গোড়ীয়েৰ বৈশিষ্ট্য।

শ্ৰীগুরু-গোড়ীয়েৰ সেৱাৰ পুনৰাবৃত্তিগুণে জয়গান

একোনাংশ-বৰ্ষে শ্ৰীশ্ৰীখোৱ-ৰাধা-বিনোদবিহাৰীজীউকে বঞ্চে ধাৰণপূৰ্বক শ্ৰীপত্ৰিকা তাহাদেৰ অন্তৰঙ্গ প্ৰেষ্ঠজনকে হৃদয়-গুহায় লুকাইত ৰাখিয়া-ছিলেন। তাহাৰই শুভেচ্ছা লটখাট তাহাৰ মৰ্মবাণী জগদ্বাসীৰ নিকট একবৰ্ষকাল প্ৰকাশ ও প্ৰচাৰ কৰিতে কাৰ্পণ্য কৰেন নাই। গুরু-গোড়ীয় “না বদ স তমপ্ৰিয়ম্”—এই “তুম্ভি চূপ চাম্ভি চূপ” নীতি বা সুবিধাবাদেৰ প্ৰশ্ন্যদাতা না হইয়া অকৈতব বাস্তব-সত্যোৰ কথা অচৈতন্য বিশ্বে তাৰদ্বাৰে কাৰ্ত্তন কৰিয়াছেন, কৰিতেছেন ও কৰিবেন। শ্ৰীপত্ৰিকাৰ বিভিন্ন প্ৰবন্ধাদিহি তাহাৰ জাজ্জল্যমান উদাহৰণ। সৎ-এৰ সতিত অসত্যেৰ compromise (পনিবনা) কোনদিনই হইতে পাৰে না—যেৰূপ জড়বাদীৰ সতিত আত্ম-কলাপকামীৰ কখনও মিলন সম্ভৱ নয়। জগতেৰ নাস্তিক-সম্প্ৰদায়ই আত্মকিৰণ মসৃণল, তাহাৰা জুনিয়াৰ ছোট-বড় সকলকে অস্বীকাৰ কৰাই চৰম বাহাতুৰী বলিয়া মনে কৰেন। আত্মসুৰিতা, দীৰ্ঘ-হিংসা-মাংসৰা গভীৰভাবে তাহাদেৰ হৃদয় অধিকাৰ কৰিয়া থাকে ; সামগ্ৰিক বা আত্যন্তিক মঙ্গল-চিন্তা তাহাদেৰ পক্ষে কিৰূপে সম্ভৱ ? গোড়ীয়েৰ কৰুণা-বিতৰণশীল উজ্জল কিৰণ কখনই তাহাদেৰ দৃষ্টিগোচৰ হইবাব নয়—“উলূকে না দেখে বৈছে সূৰ্যোৰ কিৰণ।”

অপ্রাকৃত লেখনীই জীবেৰ আত্যন্তিক মঙ্গললাভেৰ হেতু

বিগত বৰ্ষে প্ৰকাশিত “গোড়ীয় দৰ্শনেৰ ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য”-নামক দাৰ্শনিক প্ৰবন্ধ স্মৃতি পাঠকবৰ্গকে প্ৰচুৰ আনন্দ দান কৰিয়াছে। “তত্ত্ববিবেক বা সচ্চিদানন্দানুভূতি” ও দাৰ্শনিক জগতে তুলনাত্মক অবদান বা বৈশিষ্ট্য ; ছাত্ৰশ বৈষ্ণৱ-মহাজনাৰ অপ্রাকৃত ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত প্ৰভৃতিও প্ৰকাশিত হইতেছে। “বিশ্বমিলনে শ্ৰীচৈতন্যদেৱ” প্ৰবন্ধে তাহাৰ অবদান বিশেষভাবে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। তুলনামূলক আলোচনাগুলিও বিশেষ চিত্তাকৰ্ষক ও হৃদয়গ্ৰাহী। এতদ্বাতীত পৌৰাণিক আখ্যায়িকা এবং প্ৰশ্নোত্তৰ-মূলক প্ৰবন্ধাদিও পাঠকবৰ্গেৰ কুচিকৰ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নিত্যগুণগণেৰ উপদেশ-নিৰ্দেশ সৰ্বকালেই গ্ৰহণীয়

শ্ৰীপত্ৰিকায় বহুপূৰ্বে প্ৰকাশিত জগৎগুরু শ্ৰীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সৱধতী প্ৰভুপাদ, শ্ৰীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰ, শ্ৰীল ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশৱ গোস্বামী মহাৰাজেৰ

অপ্রাকৃত লেখনী-প্রসূত তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূৰ্ণ প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের জন্য অনেকেই বিশেষ অনুরোধ করায় ঐগুলি ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইতেছে। সময়ান্তরে পৃথক গ্রন্থকারে ঐনকল তুলিত ও চম্পাপা প্রবন্ধগুলি প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। ইহাতে শ্রীপত্রিকার পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ এবং সুদী পাঠকবর্গ সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন।

মহাপুরুষগণের লেখনীতেও জীবের অশেষ কল্যাণ-চিন্তা

আজকাল অনেকেই উপন্যাস ও নাটকাদি পাঠে অভ্যস্ত। পারমাথিক অপ্রাকৃত সাহিত্যিক মহাজন গোস্বামীবর্গ, এমনকি ‘সপ্তম গোস্বামী’ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও যথং ‘প্রেম-প্রদীপ’-নামক পারমাথিক উপন্যাসাদি রচনা করিয়া ঐরূপ পাঠকবর্গের পারমাথিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। তজ্জন্ম আমরাও শ্রীপত্রিকায় পারমাথিক নাটক প্রকাশের প্রয়াস পাইতেছি। আমরা বিশ্বাস করি,—“মহাজনের বিচারই প্রকৃত পথ”, এবং তাহাতেই জীবের অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বা বিবর্তবাদেৰ আশ্রয়—আত্মঘাতের তুল্য; আত্মকল্যাণকামী জীবের তাহা কখনই অবলম্বনীয় নয়।

সমন্বয়বাদী ও নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী—সকলেই নাস্তিক

সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদী ও চিচ্ছূড়-সমন্বয়বাদী—তাই একই গোষ্ঠীভুক্ত। সমন্বয়বাদী যথেষ্টাচারী; তাহারা সাহিত্য, রাজনিক, তামসিক ভাবের একাকারত্ব দেখিতে চাহেন। গীতা-ভাগবত এইরূপ অযৌক্তিক বিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মানরের ইচ্ছানুসারে ধর্মের সৃষ্টি হয় নাই। শাস্ত্রে শুদ্ধভক্তি ও শ্রীভগবৎপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ভোগবাদ ও ভক্তি এক নহে। নির্বিশেষবাদ কল্পনা প্রসূত—স্ব-পর-বন্ধনাবিশেষ নাস্তিকাবাদ।

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু ও গোস্বামিগণের মায়াবাদ-খণ্ডন

মায়াবাদ ও অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও ষড়্গোস্বামীগণের শিক্ষা নহে। ইহারা সকলেই অভক্তি-মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। মায়াবাদকে বিদ্বাদ্বৈতবাদ বলা হয়। “দেহে আত্মবুঝি হয় বিবর্তের স্থান”—নশ্বর দেহ কখনই আত্মপদবাচ্য হইতে পারে না। দেহাত্মাদীর ত্রিতাপযন্ত্রণাই লাভ হয়। জীব ব্রহ্মকবাদী—নাস্তিক পাষাণী। মূর্খ ও পাপীগণই এইরূপ উদ্ধত জীবকে বহুমানন করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালে, বিশেষতঃ তাহার লীলাসম্ভোপনের পর এইরূপ বহুমুখী নাস্তিকতা ও আসুরিক-ভাব জগৎকে আক্রমণ করিয়াছিল। যদি ষড়্গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণানুগ সারস্বত গোড়ীয় গুরুবর্গ এ ধরায় না আসিতেন, তবে অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন এই জগতের কি দুর্দশা হইত, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমরা গোড়ীয় গুরুবর্গের জয়গান-পূর্বক আমাদের নব-বর্ষের বক্তব্য সমাপন করিতেছি। তাহারা সর্বদা আমাদিগকে কলির বিবিধ উৎপাত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন—ইহাই তাহাদের শ্রীপাদপদে সকাঙ্ক্ষ প্রার্থনা।

FORM- IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER
“SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhav.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name—Do
Nationality—Do
Address—Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of Tridandi-Swami Shri
individuals who own the Shrimad Bhakti vedanta
newspapers and partners Raman Maharaj, President-
or share holders holding Acharyya, on behalf of Shri
more than one percent of Goudiya Vedanta Samiti.
the total capital.—

I, *Nabajogendra Brahmachari* hereby declare that
the particulars given above are true to the best of my
knowledge and belief.

Sd/-Nabajogendra Brahmachari
Signature of Publisher.

Dated—25. 2. 78.

শ্রীশ্রীগোবিন্দো জয়তঃ

ন বৈ পুংনাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্সা তুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আসন্ন-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূত্বরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ } গর্ভোদশায়ী, ২১ বিষ্ণু, ৪৯২ গৌরাদ
শুক্রবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৮৪ ; ইং ১৪।৪।১৯৭৮ } ২য় সংখ্যা

সান্নিহাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিশ্বমঙ্গল-ঠাকুর-বিরচিতম্]

গৃহে গৃহে গোপবধূকদম্বাঃ

সর্বের মিলিত্বা সমবায়যোগে !

পুণ্যানি নামানি পঠন্তি নিত্যং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৪॥

শ্রীবন্দাবনস্থ গোপবধূগণ স্ব-স্ব-গৃহে একত্র মিলিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধবা'দি পবিত্র নাম নিত্য পাঠ করেন ॥১৪॥

মন্দারমূলে বদনাভিরামং

বিশ্বাধরে পুরিতবেণুনাদম্ ।

গো-গোপ-গোপীজনমধাসংস্থং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৫॥

যাঁহার মুখমণ্ডল মনোমুগ্ধকর এবং যিনি কদম্বরক্ষতলে ধেমু-গোপ-গোপীগণে পরিবৃত্ত হইয়া শোভমান ; তাঁহার বিশ্বফলসদৃশ অধরাস্থিত বেণু হইতে ‘গোবিন্দ’ ‘দামোদর’ ‘মাধব’ এই নামসকল ধ্বনিত হইতেছে ॥১৫॥

উথায় গোপ্যোহপররাত্রভাগে

স্মৃতা যশোদাস্মৃতবালকেলিম্ ।

গায়ন্তি প্রোচৈচ্চর্দধি মন্থয়ত্যো

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৬॥

নিশান্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ যশোদাস্মৃত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করতঃ দধি-মন্থনকালে ‘গোবিন্দ’ ‘দামোদর’ ‘মাধব’ এই নাম উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকেন ॥১৬॥

জঙ্কোহথ দত্তো নবনীতপিণ্ডো

গৃহে যশোদা বিচিকিৎসরন্তী ।

উবাচ সত্যং বদ হে মুরারে

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৭॥

একদিন গৃহে পূর্বসন্ধিত নবনীত নিজে অল্প ভক্ষণ করিলেন এবং কিয়দংশ বানরগণকেও দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দিক্চিত্তা মাতা যশোদা পুত্রকে বলিলেন,—হে মুরারে ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! সত্য করিয়া বল নবনীত কোথায় ? কে ভক্ষণ করিয়াছে ? ॥১৭॥

অভ্যর্চ্য গেহং যুবতিঃ প্রবৃদ্ধ

প্রেমপ্রবাহা দধি নির্ম্মমস্থ ।

গায়ন্তি গোপ্যোহথ সখীসমেতা

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৮॥

প্রেমাপ্লুতহৃদয়ে মাতা যশোদা গৃহ পরিত্যক্ত করিয়া দধি মন্থন করিতে বসিলেন । এমন সময় গোপীগণ সখীপরিবেষ্টিত হইয়া ‘গোবিন্দ’ ‘দামোদর’ ‘মাধব’ এই নাম গান করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

কচিং প্রভাতে দধিপূর্ণপাত্রে

নিষ্কিপ্য মন্থং যুবতী মুকুন্দম্ !

আলোক্য গানং বিবিধং কেরোতি

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৯॥

কোন এক প্রাতঃকালে যশোদাদেবী দধিপূর্ণপাত্রে মন্থনদণ্ড নিষ্কেপ করিতে যাইবেন, এমন সময় শযোপরি বালক মুকুন্দের উপর দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে বিহ্বল হইয়া ‘ও আমার গোবিন্দ’, আমার ‘দামোদর’, আমার ‘মাধব’ বলিয়া গান করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

ক্রীড়াপরং ভোজনমজ্জনার্থং

হিতৈষিণী স্ত্রী তনুজং যশোদা

আজুহবৎ প্রেমপরিপ্লুতাক্ষী

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২০॥

প্রেমবিভোরলোচনা হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাতা যশোদা বয়স্ফগণসহ ক্রীড়ারত পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন,—হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! স্নান ও ভোজন করবে, এস ॥২০॥

সুখংশয়ানং নিলয়ে চ বিষ্ণুং

দেবর্ষিমুখ্যামুনয়ঃ প্রপন্নাঃ ।

তেনাচ্যুতে তন্ময়তাং ব্রজন্তি

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২১॥

শ্রীনন্দগৃহে সুখে শায়িত বিষ্ণুকে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিয়া নারদাদিপ্রমুখ মুনিগণ তদীয় চরণে শরণাগত হইলেন এবং ‘হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !’ বলিতে বলিতে অচ্যুত ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ॥২১॥

বিহায় নিদ্রামরুণোদয়ে চ

বিধায় কৃত্যানি চ বিপ্রমুখ্যাঃ ।

বেদাবসানে প্রপঠন্তি নিত্যং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২২॥

শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ অরুণোদয় সময়ে শয্যাত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বেদপাঠ করণে ‘গোবিন্দ—দামোদর—মাধব’ নাম নিত্য প্রকৃষ্ট-রূপে পাঠ করেন ॥২২॥

বৃন্দাবনে গোপগণাশ্চ গোপোঃ।

বিলোক্য গোবিন্দ-বিয়োগখিন্নাম্।

রাধাং জগুঃ সাক্ষ্যবিলোচনাভ্যাং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৩॥

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দবিরহ-কাতরা শ্রীমতী রাধারানীকে দর্শন করিয়া গোপ-গোপিগণ 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' বলিয়া সাক্ষ্য-নয়নে গান করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

প্রভাতসঞ্চারগতা নু গাব-

স্তদৃ রক্ষণার্থং তনয়ং যশোদা ।

প্রাবোধয়ৎ পাণিতলেন মন্দং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৪॥

প্রভাতকালে ধেনুগণ বনগমনে উদ্ভূত হইলে তাহাদিগকে রক্ষার জন্ত নিদ্রিত কৃষ্ণকে যশোদাদেবী করতলের মূহ আঘাতে জাগরিত করিয়া বলিতেন,—“হে আমার গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! গাভীগণকে চরাইতে যাও বাবা !” ॥২৪॥

প্রবালশোভা ইব দীর্ঘকেশা

বাতাম্বুপর্ণাশন-পূতদেহাঃ ।

মূলে তরুণাং মুনয়ঃ পঠন্তি

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৫॥

বায়ু, জল, পত্রভূক্ত পবিত্রদেহ ও প্রবালরত্নবর্ণ দীর্ঘ জটাধারী মুনিগণ তরুতলে বসিয়া “হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !” নাম পাঠ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

এবং ক্রবাণা বিরহাতুরা ভৃশং

ব্রজস্থিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ ।

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুহুঃ সুস্বরং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৬॥

শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণবিরহে সাতিশয় কাতর হইরা লোক-লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক “হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !” বলিয়া সুস্বরে কঁাদিতে লাগিলেন ॥২৬॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীমধ্বমুনি-চরিত

(জন্ম, দেশ ও কাল)

দেশের পারিপার্শ্বিক পরিচয়

উত্তরে হিমালয় এবং অন্য দিক্‌ত্রে সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ডে ভারতবর্ষ। ভারতের মধ্যদেশে হিমাগিরি অবস্থিত। বিস্তার উত্তরাংশ আৰ্য্যাবৰ্ত্ত এবং দক্ষিণভাগ দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে পূর্বাচল ও পশ্চিমাচল নামে দুইটি গিরি-শ্রেণী বিরাজমান। পশ্চিমাচলকেই সংস্কৃত ঐতিহ্যে ‘সহ-পর্বত’ বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সহ গিরিমালার পশ্চিমে তিনটি প্রদেশ আছে। বোম্বাইর দক্ষিণাংশ হইতে কোন্‌কান্, তদক্ষিণে ক্যানারা এবং তাহার দক্ষিণে কেরল রাজ্য। কোন্‌কান্, ক্যানারা এবং কেরল—এই প্রদেশত্রয়ের পশ্চিম-সীমা পশ্চিম-সাগর বা আরব সমুদ্র-দ্বারা আবদ্ধ। কোন্‌কান্ প্রদেশের ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের গ্রাম্য। বর্তমান সময়ের মালেশবার জিলা এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় শাসনাধীন রাজ্যদ্বয় কেরলাস্তর্গত ভূমি।

ক্যানারা প্রদেশ সম্প্রতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর ক্যানারা জিলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ক্যানারা জিলা মাদ্রাজ বিভাগে অবস্থিত। উত্তর ক্যানারায় কেবল ক্যানারিজ ভাষা প্রচলিত আছে, পরন্তু দক্ষিণ ক্যানারায় ক্যানারিজ, তেলেগু এবং মলায়লম্—তিন ভাষাই প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ক্যানারা জিলায় আটটি তালুক ও দক্ষিণ ক্যানারায় পাঁচটি তালুক বা উপবিভাগ আছে।

উড়ুপী তালুকের দূরত্ব

দক্ষিণ ক্যানারার উত্তরাংশে খোশালপুর বা কুণ্ডাপুর তালুক। তদক্ষিণে উড়ুপী তালুক, তদক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক। ম্যাঙ্গোলোরের পূর্বে পুত্তুর বা উল্লিননুগড়ি তালুক এবং দক্ষিণ কাষাডগড় তালুক। দক্ষিণ ক্যানারা ১৪ অংশ ৩১ কলা উত্তর অক্ষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫।৩১ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট আছে। কলিকাতা হইতে ক্যানারা জিলা ৫৬ মিনিট পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ কলিকাতায় ১২টার সময় তথায় ১১টা ৪ মিনিট হয়।

উড়ুপী তালুকের প্রধান নগর উড়ুপী

দক্ষিণ ক্যানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গোলোর। উহা ম্যাঙ্গোলোর তালুকের অন্তর্গত এবং নেত্রাবতী নদীর উপর স্থিত। কাষাডগড় চন্দ্রগিরি বা

পশ্চিমী নদীর উপরে। উড়ুপী তালুকের প্রধান স্থান উড়ুপী। উড়ুপী তালুকের উত্তরাংশে কুণ্ডাপুর, পূর্বাংশে মহিশূর রাজ্য, দক্ষিণে ম্যান্ডোলোর তালুক এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

উড়ুপীর নিকট পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত তীর্থপঞ্চক

বর্তমান উড়ুপী নগরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে পাজকাক্ষেত্র নামে একটি জনপদ ছিল। উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্র সমুদ্রকূলে কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি পাজকাক্ষেত্র নির্জন ত্যক্তপল্লী। এখানে দণ্ডতীর্থ নামে এক পুষ্করিণী আছে এবং বিমানগিরি নামে পর্বতের উপর দেবী দুর্গার মন্দির আছে। বিমানগিরির পাদদেশে উপত্যকায় পাজকাক্ষেত্র। পৌরাণিক-গণের নির্দেশে সহ্যাদ্রিতে ত্রেতাযুগে পরশুরাম নির্জন বাস করেন। উড়ুপী ও তন্নিকটবর্তী পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত ক্রোশব্যাপী স্থানমধ্যেই পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, গদাতীর্থ, এবং বাণতীর্থ বিরাজমান। এই সকল তীর্থ, তীর্থ-যাত্রীর এখনও পরম শাস্তির কেন্দ্র।

উড়ুপীর অপর নাম রজতপীঠপুর

উড়ুপী নগরে চন্দ্রমোলেস্বর শিবমূর্ত্তি বহুকাল হইতে আছেন। গ্রামের নাম উড়ুপী চন্দ্র-মোলেস্বর হইতে উদ্ভূত। ‘উড়ুপ’-শব্দে ‘চন্দ্র’ এবং উড়ুপী বলিয়া ‘চন্দ্র-মোলেস্বর’কেই সাধারণতঃ স্বল্লীক্ষরে লক্ষ্য করা হয়। এই উড়ুপী নগরই রজতপীঠপুর বলিয়া আখ্যাত হয়। এখানে অনন্তেশ্বরেরও এক মন্দির পূর্বকাল হইতে আছে। অনন্তেশ্বর ও চন্দ্র-মোলেস্বরের মন্দির উভয়ই পূর্বমুখী ও একটি অপরটির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

শ্রীঅনন্তেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি—নৈব-চক্ষে শিব ও

নৈব-চক্ষে পরশুরাম

সহ্য-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকূণবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কোন্কান্, কেহ বা সারস্বত এবং অল্প কেহ বা শিবাল্লী বলিয়া নিম্ন ব্রাহ্মণশাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্কান্ ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নছেন। ক্যানারি ভাষায় ‘শিবাল্লী’ বা ‘শিববেল্লী’ শব্দে ‘শিবের রূপা’ বুঝায়। ইঁহারা রজতপীঠ-পুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তেশ্বরের মূর্ত্তি লিঙ্গমূর্ত্তি, কিন্তু অনেকে বলেন, পরশুরাম স্বয়ং ঐরূপে রৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কেহ কেহ বলেন, অনন্তেশ্বর বিষ্ণুমূর্ত্তি।

শৈবগণ শিব-বুদ্ধিতে শিব-সহস্রনাম এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-বুদ্ধিতে একই অনন্তেশ্বরের বিষ্ণু-সহস্র-নাম দ্বারা পরিতোষ বিধান করেন। বিষ্ণু-বিগ্রহ যেকোন অন্যত্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে পূজিত হন, অনন্তেশ্বর তাদৃশ নহেন। ইঁহার তন্ত্র-মতে পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ক্যানারার এই সকল গ্রামে ভূত-প্রেতেরও উপাসনা অতীব প্রচলিত আছে। এ প্রদেশে বিষ্ণুমন্দির বা বিষ্ণুবিগ্রহ-সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

তুলুব রাজ্য ও কুম্ভা নগরী

কাষাডগড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি বা পদ্মস্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের অধিবাসীগণের ভাষা টুলু। শিবাল্লী ব্রাহ্মণগণ টুলু ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন।

কাষাডগড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে কুম্ভা নামী নগরী, এখানে রেলওয়ে স্টেশন আছে। এই নগরী পূর্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধশালিনী ছিল। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইঁহাদের অধীনেই ম্যাঙ্গোলোর ও উডুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্ভার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট বৃত্তিভোগ করিয়া রাজা বলিয়া পরিচিত আছেন।

শ্রীশ্রীমন্ যধ্বাচার্য্যের জন্মস্থান

রজতপীঠপুর বা শিবাল্লী বা উডুপী গ্রামের সন্নিহিত পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমন্ যধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্যালোক দর্শন করেন। পাজকাক্ষেত্রে অতীতপিতৃ তাঁহার জন্মস্থান নির্দিষ্ট আছে। তাঁহার অভ্যুদয় কালের পর্ণকুটীরাদিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন সেবক কর্তৃক পরে পাষণনির্ম্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। তবে পাথরের ঘর ক্ষুদ্র ও গল্পীটি জনহীন; পূর্বের স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র অতীতপিতৃ বর্তমান আছে।

শ্রীমধ্বমুনির পিতা মধ্যগেহের প্রার্থনা

উডুপী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি ক্রেশে শুদ্ধ-বিত্তার্জনপূর্ব্বক পতিব্রতা পত্নীর সহিত দিনপাত করিতেন। সাংসারিক বিচারক্রমে পুত্রই পিতার পারত্রিক মঙ্গলের হেতু জ্ঞান করিয়া অনন্তেশ্বরের নিকট দেবসদৃশ একটি অপত্য লাভের প্রার্থনা করেন। এই দম্পতির দুইটি পুত্র হইয়া অকালে পরলোকগত হওয়ায় এবং দরিদ্রতাবশতঃ উডুপী গ্রামের বাসস্থান ত্যাগপূর্ব্বক পাজকাক্ষেত্রে গমন করেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা

ছিল, কিন্তু নৈষ্ঠিক বিপ্রপুঙ্গব পুত্রার্থী হইয়া প্রত্যহই উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের নিকট আগমন করিতেন। ইহার ফলে এক বিষুবৎ সংক্রান্তির দিনে অসংখ্য লোক কোন পর্বোপলক্ষে অনন্তেশ্বর-মন্দিরে সমাগত হইলে এক সাধু মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভের ধ্বজোপরি উঠিয়া উচ্চরবে অনতিকাল মধ্যে বায়ুর অবতারণার প্রসঙ্গ প্রচার করিলেন। তাহাতে 'মধ্যগেহ' তাঁহার বর প্রার্থনা সিদ্ধ হইল বুদ্ধিতে পারিলেন।

মধ্যগেহ-নামের উদ্দেশ্য

পাঙ্গকাক্ষেত্রে আরও কতিপয় সমজাতীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এক বংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি একটা পল্লীতে বাস করিলে পূর্বের বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী, মাঝের বাড়ী, পার্শ্বের বাড়ী প্রভৃতি সংজ্ঞা-দ্বারা পরস্পরের বাড়ীর কর্তৃপক্ষগণকে সংজ্ঞিত করা হয়। এই প্রকার সংজ্ঞা পূর্বেও দেওয়া হইত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পিতৃদেবও এইরূপ সংজ্ঞাক্রমে 'মধ্যগেহ' বলিয়া কথিত হন। অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ নামকরণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। শ্রীমধ্বমুনির পূর্বপুরুষগণ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। পাঙ্গকাক্ষেত্রে ভট্ট-পল্লীর মধ্যগেহ ভট্ট পরম সদাচার-নিপুণ এবং আশুষ্ঠানিক বিপ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মধ্যগেহ ভট্টের নাম মধেজী ভট্ট; তুলু ভাষায় নডুভনুতিন্নর অর্থাৎ মাঝের বাড়ী।

শ্রীমধ্বের পূর্ব নাম বাসুদেব, মাতা বেদবিদ্যা

তৎকালে তুলুব দেশে বিষ্ণুবিগ্রহের বিরল অধিষ্ঠান ছিল। বিশেষতঃ শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুল সাধারণ-বিচারে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বিপ্র বলিয়া পরিচিত। এই কুলে আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য উদ্ভূত হন। পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যা অনন্তেশ্বরের কৃপায় দেবোপম পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তনয়ের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন। বাসুদেবের মাতৃদেবী বেদবিদ্যা, কাহারও মতে বেদবতী সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পূর্বের বাড়ী মাঝের বাড়ীর সন্ত-প্রসূত সুকুমার শিশুর জন্ত এক দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যগেহ ভট্ট শিবাল্লী ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবান্ বিষ্ণুতে তাঁহার যথেষ্ট মতি ছিল। পুত্রের নামকরণে বাসুদেব সংজ্ঞাই তাহার বিশিষ্ট পরিচয়। এই কুলে বিষ্ণুর পারতম্য ও সর্বশ্রেষ্ঠতা জ্ঞান কিছুকাল হইতে পুষ্টলাভ করিতেছিল, ইহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

মধ্বের আবির্ভাবক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাবের অভাব

যদিও শ্রীরামানুজাচার্য্য মধ্বজ্ঞানের দুই শতাব্দী পূর্বে অবৈষ্ণব-মত নিরসন পূর্বক লোক-সমাজে নারায়ণের সর্বোত্তমতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সহ্যাদ্রির পশ্চিম বিভাগে তৎকালীয় রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতালোক প্রবেশ করে নাই। সহ্যাদ্রির প্রাক্ প্রদেশ কর্ণাট ও চোল দেশে রামানুজ-প্রভাব নানাধিক অদ্বৈতপন্থীগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্যই শিথিল করে। শঙ্করের অহং-ত্রফোপাসনার কুফল অচ্যুতপেক্ষা স্বীয় গুরুর নিকট হইতে অন্তিমকালে গোপনভাবে শ্রুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভাগবত-সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধ্বাবির্ভাব-কালের পূর্বেও তুলুব দেশে লক্ষিত হয়।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে পঞ্চরাত্র অপেক্ষা ভাগবতের প্রাবল্য

শ্রীমধ্বাবির্ভাবের পূর্বে হইতে আমরা পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া থাকি। পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রাধারণ-বিধি প্রবর্তিত ছিল, পরন্তু ভাগবতগণ গোপীচন্দন বা মৃত্তিকা দ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এক্ষণেও তুলুব দেশে মধ্ব-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহারমত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তুলুব দেশীয় ভাগবত-সম্প্রদায় মধ্বগণের ন্যায় মুদ্রাদি ধারণ করেন না। মধ্ব জ্ঞানের পূর্বে রামানুজীয় পাঞ্চরাত্রিক মত সহ্যাদ্রির পশ্চিমে প্রাবল্য লাভ না করিলেও তথায় ভাগবত সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর-মতের প্রবল বিস্তৃতি, অনেকটা রামানুজীয়গণের পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম এবং ভাগবত-সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে খর্ব্বিত হয়। শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদয়কালের পূর্বেই কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

বৈষ্ণবের জন্ম—কর্মফলাধীন নহে

কর্মফলবশে যে-প্রকার অবৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণপূর্বক নিজ যোগ্য কর্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনাবশে পুনরায় কর্ম-যোগ্য শরীর পাইয়া কর্মফল লাভ করেন, নিত্য বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ তাদৃশ নহেন। জীবের দৌভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। কখনও বা বৈকুণ্ঠস্থ নিজ পার্শ্বদগণকে ধরাধামে অবতারণপূর্বক লৌকিক তত্ত্ব গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। যে-কালে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্মের প্রবলতা হয়, তৎকালে ভগবান্ মর্ত্য জীবলোকে শুভাগমনপূর্বক ধর্ম স্থাপন করেন। যেরূপ

শ্রীরামাশুজীষ পূর্বতন সিদ্ধমূরিসকল বৈকুণ্ঠ হইতে কালে কালে অবতীর্ণ হইয়া হরিকৈষ্কর্ঘ্যের প্রভাব অজ্ঞান জীবহৃদয়ে বিকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সকল বৈষ্ণবগণের নিত্য-স্বরূপ আছে। বৈকুণ্ঠস্থ নিত্যস্বরূপ, সিদ্ধিকালে আপনা হইতেই পরিষ্কৃট হয়। সেই নিত্য পার্শদতত্ত্বের অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে পরিচিত হন।

নির্কিশেষবাদী কৰ্ম্মফলবাধ্য

নির্কিশেষবাদী বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া নিকিতে সোহং প্রভৃতি ভাবমাত্র অবস্থিত বিশ্বাস করেন। সুতরাং নির্কিশেষ-বাদের অধীনে যে সকল কৰ্ম্মফলবাদী জগতে উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য স্বনাম, স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া নাই, কেবল মায়া বা কুণ্ডা দ্বারা পরিমিত হইয়া তাঁহারা কৰ্ম্মফল ভোগ করেন। অবৈষ্ণবগণের নিত্য পরিচয়ে সোহং ভাব আবদ্ধ, তজ্জন্ম তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া মায়া রাজ্যে ভ্রান্তিবশতঃ কৰ্ম্মফল মাত্র ভোগের যোগ্য।

আচার্য্য মধ্বমুনির দেহ নিত্য, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের দেহ অনিত্য ও মিথ্যা

আমাদের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, মনু, জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় কৰ্ম্মফল-নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে। বিশেষতঃ নির্কিশেষবাদীগণের মতে চিন্ময়-বিগ্রহ বা পদিচয়াদি বিশেষ সমূহ কুণ্ডা রুতিঃ ক্রিয়াবিশেষ। স্বর্গ-নিরয়াদি ধামে দেব-কীটাদি দেহ নশ্বর ও মায়াজাত মিথ্যা। সেজন্ম শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে নির্কিশেষবাদীগণ শঙ্করাবতার নির্দেশ করিলেও তাদৃশ রুদ্র মহাশয়ের অনিত্য দেহ মিথ্যামাত্র জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্ক তাদৃশ নহে।

মধ্বাচার্য্য ঋতুরাজ বসন্তের অবতার নহেন

আদিত্যপুরাণ নামে এক উপপুরাণের মধ্যে ৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়ে কোন বৈষ্ণব-বিরোধী নির্কিশেষবাদী দ্বীপ বড়রিপুর চাক্ষুণ্যে মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়া নিজ হৃদিত স্বার্থের পরিণোষণ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ঋতুরাজ বসন্তের অবতার বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। (ব্রহ্মসংহতাঃ)

— শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

স্ব-রচিত গ্রন্থেও আত্ম-পরিচয় নাই

বলদেব মহাশয়ের ইতিবৃত্ত আমরা কোন স্থানেই পাঠ করিতে পাই না। কোন গ্রন্থেই তাঁহার কথা কিছুই লেখা নাই। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা তাঁহার কৃত বেদান্তস্বত্রভাষ্য, গীতাত্মভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদ্-ভাষ্য পাঠ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী-কৃত স্তবমালায় শ্রীবলদেবকৃত ভাষ্যও আমরা পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত স্তম্ভক প্রভৃতি আর কএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও আমরা দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থেই এই মহানুভব নিজের বিশেষ পরিচয় দেন নাই। স্থানে স্থানে কেবল মুরারিকে স্বপূর্ব্ব চতুর্থদৈশিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

খণ্ডাইত বংশে জন্ম ও বিদ্যাভ্যাস

আমি যখন শ্রীপুরুষোত্তমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীবলদেবকৃত ব্রহ্মস্বত্রভাষ্য পাঠ করি। তখন অনেকগুলি বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বলদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, বলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে খণ্ডাইত বংশে জন্মগ্রহণ করত অল্প বয়সেই তীর্থ-ভ্রমণে এবং বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন। চিল্লা-হ্রদের অপর পারে কোন বিহঙ্গবসতিস্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে ন্যাযশাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করত অনেক দিবস বেদসকল অধ্যয়ন করেন। বেদাধ্যয়নের পর নহীশ্বর প্রভৃতি দেশে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাক্ত-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তভাষ্য ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হন।

আত্ম-পরিচয় গোপন ও সর্ববৈদান্তিকগণের পূজা-লাভ

বেদান্ত-বিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আঘাত্য প্রভৃতি দেশে যে-যে স্থলে বেদান্তের চর্চা ছিল সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রভূত পূজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও ধর্ম্ম-প্রচারে অধিকার নাই বলিয়াই তিনি সংসারে স্বীয় বর্ণ-পরিচয় গোপন করত বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সকল লোকেরই পূজা পাইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজ-মান ছিলেন।

বলদেবের পুনরায় গুরুকল্পণ

ঐ সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলদেবের ন্যায় রত্নকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিজ্ঞা ও পারমাথিক বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশাস হইয়া তৎকালস্থিত মুরারির প্রশিষ্ঠ শ্রীরাধাদামোদর দাস পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে বলদেব সর্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্তশাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ঘট-সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চান। ‘গৌড়ীয় মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বাতীত ঐ গ্রন্থে অস্ত্রের অধিকার নাই,’ ইহা শুনিয়া বলদেব একটু দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীরাধাদামোদরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাধাদামোদর কাণ্ডকুড়-বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করত বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুইজনের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছাক্রমে বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি স্বীয় মাধ্বাচ্ছায় বজায় রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া গৌড়ীয় মাধ্বী-সম্প্রদায় অভিমানে আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন।

নবদ্বীপ দর্শন ও বৃন্দাবনে স্থিতি

‘আহা ! বলদেবের ন্যায় বৈদিক পণ্ডিত যখন গুরুরূপায় লব্ধকৃষ্ণপ্রেম হইয়া হরিনাম-বলে মত্ত হইলেন, তখন কি আর তাঁহার জড়ীয় অভিমান থাকিতে পারে ? এখন তিনি শ্রীপুরষোত্তমক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করত শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন-কল্পে

বলদেবের জয়পুর যাত্রা

সেই সময়ে জয়পুরে একটি গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজাগণ তৎপূর্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকটি মহান্ত-বৈষ্ণব ঐ সময়ে জয়পুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সদাচারী রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি বিচারের জন্ত শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত

লইয়া ঘাইবার চেষ্টা কৰিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্ৰীগোবিন্দজীৰ মৰ্যাদা রক্ষা কৰিবার জন্তু ব্যাকুল হইয়া শ্ৰীবিষ্ণুনাথ চক্ৰবৰ্ত্তী মহাশয়কে জয়পুর ঘাইতে অনুরোধ কৰিলেন। চক্ৰবৰ্ত্তী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্ত্ৰেষণ কৰিতে আজ্ঞা দিলে শ্ৰীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্ৰহ কৰিয়া আনিলেন। চক্ৰবৰ্ত্তী মহাশয় বিচাৰ কৰিয়া শ্ৰীবলদেবকে আপনা হইতে অধিক পণ্ডিত এবং বেদ-বেদান্তে পারদৰ্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন।

বলদেবের জয়লাভ, ভাষ্য-রচনা ও

‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধি-প্রাপ্তি

বলদেব হস্তে কমণ্ডলুঃ গলদেশে চিরা-কান্ধা ও কটিতে কোপীন-বহির্বসন-মাত্র একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কাৰ্য্যের জন্য গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন কৰিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে কৰিলেন না। তথাপি শ্ৰী-সম্প্ৰদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ কৰাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, “হে পণ্ডিতবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত?” বলদেব বলিলেন, “আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃতভাষ্য লইয়া বিচাৰ কৰিব।” তখন তাঁহারা বলিলেন—“মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্ৰীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্ৰীগোবিন্দজী কি শ্ৰীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন?” বলদেব দেখিলেন যে, শ্ৰীমধ্বভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তিনি কথেকদিবসের অবসর লইয়া শ্ৰীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীৰ আজ্ঞাক্ৰমে সূত্ৰভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্ৰ-নামভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন, পরে সভায় বিচাৰ কৰিয়া শ্ৰী-বৈষ্ণব-দিগকে নিরন্তৰপূৰ্বক শ্ৰীরাধাগোবিন্দজীৰ সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে ‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধি দেওয়া হয়।

শেষ জীবন—বৃন্দাবনে শ্ৰীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে

সেই বৃহৎ কাৰ্য্য সাধন কৰিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্ৰীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া শেষ জীবন শ্ৰীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের অধ্যক্ষ-কাৰ্য্যে অতিবাহিত করেন। অপরাপর গ্রন্থ ঐ সময়েই রচনা করেন। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাই যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। পাঠকগণ আরও বাহা পান, তাহা সংগ্ৰহ কৰিবেন।

বলদেবের কাল ও গুরুপরম্পরা

শ্রীমন্নুহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যেই বলদেব ঐ বৃহৎকার্য সাধন করেন। তাঁহার গুরুদেবের পরমগুরু শ্রীমুরারি। মুরারির গুরু রসিকানন্দ। তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ, যাহাকে অল্প বয়সে ‘দুঃখী কৃষ্ণদাস’ বলিত। সুতরাং বলদেব শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। শ্রীশ্যামানন্দ ঐ পরিবারের কুলদেবতা। বিষ্ণাভূষণ মহাশয় দুইশত বৎসর পূর্বে স্বীয় কার্যসমূহ করিয়াছিলেন। কোন কোন অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীবলদেবকে দেখিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার অবতার শ্রীগোপীনাথ মিশ্রই

বলদেবরূপে অবতারণ

বিষ্ণাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটি নক্ষত্রবিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্নুহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদদিগের-মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত স্তব্রভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্তারূপে পরে বিষ্ণাভূষণ মহাশয় প্রাহুভূতি হন। বৈষ্ণববাক্য সকলই সত্য হইতে পারে এবং কথাটি সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ধাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীগৌর গোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্ণ্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক-প্রণালী ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

প্রীতি-সন্দর্ভ-৬১

হিতসাধনার্থ তর্জনাতির দৃষ্টান্ত—দধিভাণ্ডভঞ্জনরূপ চাপল্যের পর শ্রীকৃষ্ণ জননীর নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে নয়নের কজ্জল বিগলিত হইয়াছিল। বামহস্তের পৃষ্ঠভাগ-দ্বারা চক্ষুদ্বয় মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন। তৎপরে পুত্রকে ভীত জানিয়া পুত্রবৎসলা মাতা যষ্টি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সন্তানের হিতার্থে মাতাপিতার তর্জন ও বিশ্বাদ ঔষধ পান করাইবার মত শ্রীকৃষ্ণের সুখ অতিক্রম করিয়া তাঁহার আয় সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টাও অনুভাব-বিশেষ। তাহার দৃষ্টান্ত—

শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছিলেন, এমন সময়ে জলপু চুল্লীর উপর স্থাপিত হৃৎকাক্স অগ্নিতাপে উদ্গলিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া পুত্রের স্তন্যপানে অতৃপ্তি থাকিলেও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া বেগে চুল্লীর নিকট গমন করিলেন।

শ্রীব্রজেশ্বরীর গৃহ-সম্পত্তি-সংরক্ষণের প্রযত্ন অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের আয়োগ্যতির জন্ম। তাহাতে আবার গোপজাতির অল্প সম্পত্তি থাকিলেও হৃৎকাক্স হইতে যে সম্পত্তি হয়, তাহাতে তাঁহাদের মহান্ আগ্রহ স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্ত হৃৎকাক্স এই আগ্রহ বাৎসল্যের চেষ্টা-বিশেষ। তরঙ্গসমূহের দ্বারা সমুদ্রের বৃদ্ধি প্রতীতির ন্যায় যশোমতীর এই চেষ্টা বাৎসল্য পোষণ করিতেছে। এসম্বন্ধে ব্রজেশ্বরীর মানসিক ভাব—এই শিশু এখন নিজ সম্পত্তির রক্ষা জানে না। সুতরাং তাহার সম্পত্তি রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। তিনি প্রীতিহীন। বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনাদর করিয়া হৃৎকাক্সের জন্ত যত্নবতী হন নাই, তাহা বাৎসল্যের অনুভাব-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ-গুণগান করিতে আগিলে জননীর গুণমুগ্ধ করিতে হইয়াছিল। সেজন্য স্নেহবশে ক্ষয়িত গুণ পান করাইতে-ছিলেন। ইহা দ্বারা স্বাভাবিক গাঢ় স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই তাদৃশ চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণের দধিভাণ্ড ভঞ্জে যশোদার বাহ্যে কোপাভাস দেখাইলেও শ্রীকৃষ্ণের চাপল্য দর্শনে মাতার আত্মদাই স্মৃতিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণদেবের উক্তি—শ্রীযশোদা চুল্লী হইতে সুতপ্ত দুগ্ধ অবতারণ করিয়া পুনরায় দধিমহ্নন স্থানে আগমন করতঃ দেখিলেন দধিতাপ্ত ভগ্ন হইয়াছে। তিনি তাহা পুত্রেরই কৰ্ম্ম বলিয়া বুঝিলেন। অথচ তাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে মাতা হাস্য কারিতে লাগিলেন।

দুঃখেও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলাইবার জন্য হাস্যাদিও বাৎসল্যের অনুরোধ। যথা—যমলাক্ষ্মী ভক্তনের পর বৃষ্ণের পতন-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর ব্রজরাজ বৃষ্ণ-পতনস্থানে আসিয়া দেখেন—শ্রীকৃষ্ণ উদ্বলিত বদ্যাবস্থায় উদ্বলিত আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ইহাতে শ্রীমদ্র মহারাজ দুঃখিত হইলেও পুত্রকে ভুলাইবার জন্য হাস্য করিলেন এবং পুত্রের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তিনি দুঃখিত ভাব প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে দেখিয়া জননীর তাড়ন-ভৎসনাদির জন্য কাদিয়া অধীর হইবেন এইজন্ত হাস্যমুখে তিনি পুত্রের বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থ দেবাদিপূজাও বাৎসল্যের অনুরোধ। যথা—পুত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য উদারচেতা নন্দ বিষ্ণুর আরাধনা ও স্মৃতমাগধাদির যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীবিষ্ণু প্রীত হইলেন, তাহাতে আমার পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইবে—এই সঙ্কল্পই উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া মাতাপিতা ব্যতীত অন্য বৎসল-গণের পক্ষে সেই কার্য্যের অনুরূপ কারণ ভাবনাও বাৎসল্যের অনুরোধ-বিশেষ। যথা,—ভৃগাবর্ষ নদের পর ব্রজবাসিন্দগণ বলিতে লাগিলেন,—অহো! অতি আশ্চর্য্য! এই বালক রাক্ষস কর্তৃক মৃত্যুকালে নিষ্কিপ্ত হইয়াও পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হিংস্র প্রাণী নিজ পাপেই বিনষ্ট হইয়াছে। সাধু শ্রীকৃষ্ণ সমদর্শী বলিয়া ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইলেও তাহার মাতাপিতা সেই কার্য্যের অনুরূপ কারণ ধারণা করিতেন। তদুদ্যত—মৃত্যু-লীলায় ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের উদরে প্রসঙ্গ ও দর্শন করিয়া তাহা কি সপ্ন বা দেবমাহা অথবা নিজ পুত্রের স্বাভাবিক প্রভাব মনে করিলেও তাহা অসম্ভব মনে করিয়া উহা পরমেশ্বর-সৃষ্টি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহা উৎপাত বিশেষ ধারণা করিয়া তন্নিবৃত্তির জন্য শরণ্যরূপে তাহারই শ্রীচরণকমল আশ্রয় শ্রেষ্টকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। “অহং মমাসৌ পতিরৈব মে স্মৃত।” ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে সাক্ষাৎভাবে নির্দেশ করিয়া, তথাপি যাহার

মায়ায় আমার এই বিশ্বরূপ দর্শনরূপ কুমতি, সেই দৈশ্বরই আমার গতি, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর “ইথাং বিদিততত্ত্বায়াং” শ্রীকৃষ্ণবাক্যে যে তত্ত্বশব্দ আছে, তাহার অর্থ পুত্রত্ব। “শ্রীকৃষ্ণেই দৈশ্বররূপে যে আবির্ভাব, সেই ভগবানের অচিন্ত্য চরণকমলে প্রণতা হই” ব্রজেশ্বরীর এই বাক্যোক্ত অনুসন্ধানও যাহাতে পর্য্যবসিত সেই দৈশ্বররূপই উক্ত শ্লোকেও পদবয়ে ব্যঞ্জিত। পরবর্ত্তি শ্লোকে ব্যক্তনোদ বৈষ্ণবীময়াং ইত্যাদি বাক্যে “বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন।” তাহাতে মায়াশব্দে বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার-বাক্যে স্বরূপশক্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীতে বাৎসল্য প্রীতির চরণ সীমা। শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কার্য দেখিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবে নিষ্পন্ন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেও তাঁহারা মনে করেন উহা অন্য কারণে হইয়াছে। ইহাই হটল প্রীতির বিশেষত্ব।

শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী বাতীত অল্প বৎসলগণ তাদৃশ কার্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে না পারিয়া অন্যরূপ কারণ মনে করিতে পারেন। তৃণাবর্ত্ত-বধলীলায় তৃণাবর্ত্ত-বধ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই ঘটয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহাদের উক্তি—পাপী তৃণাবর্ত্ত নিষ্ক-পাপে মরিয়াছে, আর সাধু উদারতা গুণে কৃষ্ণ রক্ষা পাইয়াছে। অর্থাৎ তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল সেই পাপে সে মরিয়াছে — শ্রীকৃষ্ণ সাধু বলিয়া দৈবপ্রভাবে রক্ষা পাইয়াছে। এতলে তৃণাবর্ত্তের মৃত্যুর এবং শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার অন্য কারণ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় উহা শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাবেই ঘটবার বথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও ব্রজজনের বাৎসল্যপ্রেম-প্রভাবে তাহা ধারণ হয় নাই।

মৃত্তক্ষণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখদ্বারে উদর-মধ্যে বিশ্বদর্শন করিয়া—

কিং স্বপ্ন এতদ্ব্যুত দেবমায়া

কিঞ্চা মদমো বত বুদ্ধিনোহঃ।

অথো অমুচ্যেব মমার্ভকণ্ড

যঃ কশ্চনোৎপ্তিক আত্মযোগঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪০)

ইহা কি স্বপ্ন না দেবমায়া? কিঞ্চি আমার বুদ্ধির ভ্রান্তি? অথবা আমার পুত্রের কোন স্বাভাবিক ঐশ্বর্য? এই শ্লোকে যশোদা বিশ্বরূপ দর্শন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ঘটনাই স্থির করিয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই মনে করিলেন ইহা সম্ভব নহে। যে-কৃষ্ণ আমার ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার এমন প্রভাব হইতে পারে না। তজ্জন্য বলিলেন—

অথো যথাবল্লবিতর্ক গোচরং

চেতোমনঃ কৰ্ম্মবচোভি-রঞ্জসা।

যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে

সুদুর্বিভাব্যং প্রণতান্মি তৎপদম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪১)

যিনি চিত্ত, মন, বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা যথার্থরূপে বিষয় হন না। ইহাকে আশ্রয় করিয়া, ইহা হইতে এই বিন্দুমাত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে, যিনি ইহার প্রীতির হেতু,—সেই ভগবানের অচিন্ত্যকমলে প্রণত হই।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনে যোগিগণ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। শ্রীব্রজেশ্বরী তাঁহাকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া যে-আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহার নিকট উহা অতি তুচ্ছ। এজন্য তিনি বিশ্বরূপ দর্শনকে উৎপাতের মত মনে করিয়া তন্নিস্তির জন্য পরমেশ্বরের শ্রীচরণে শরণাগতি প্রকাশ করিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উদর-মধ্যে যা যশোমতী ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেও কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার দৈশ্বর-বুদ্ধি জন্মে নাই। ইহাতে তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাব সূচনা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে তাঁহার পুত্রভাব কিছুমাত্রও অপনীত হয় নাই, তাহা “অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিস্তপা সতী। গোপ-গোপাশ্চ সহগোবদাশ্চ মে যন্মাযয়েথাং কুমতিঃ স মে গতিঃ” অর্থাৎ আমি যশোদা নাম্নী গোপী, এই ব্রজেশ্বর আমার পতি, আমি ব্রজেশ্বরের অখিল সম্পত্তির রক্ষাকারিণী পত্নী। এই কৃষ্ণ আমার পুত্র, এ সকল গোপ-গোপী, গোবদা আমার—আমার এইরূপ কুমতি ইহার মায়ায় হইয়াছে সেই ভগবান্ আমার গতি।

এইরূপে কিছুতেই ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্য প্রেম অপনীত না হওয়া দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বরূপ তিরোহিত করিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌরচরণ-সরোজে দীনার বিজ্ঞপ্তি

“ওঁ অজ্ঞানভিমিরাক্ষ্য জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

ফাল্গুনী পূর্ণিমা-শনী গগণেতে প্রকাশিল ।

দশদিক আলো করি শ্রীগৌরানুপ্রভু এল ॥

(যবে) কাদিতেছে জীবগণ, কঁাদে বসুমতী ।

ব্রহ্মা শিব-দেবগণ করিতেছে স্তুতি ॥

অতি ছরাচারী সব অসুরের গণ ।

ভক্তগণে করে সদা অতীব পীড়ন ॥

গীতা-ভাগবত আর বেদ নাহি মানে ।

উপহাস করে সদা ভক্ত সাধুগণে ॥

কুতর্ক করিয়া শুধু করে আশ্ফালন ।

‘হরি’ নাহি মানে, করে ভক্তে অপমান ॥

এই সব দেখি তবে অদ্বৈত-গোসাই ।

সবে মিলি যুক্তি করে আনিতে নিমাই ॥

সচন্দন-তুলসী দিয়া পূজে গঙ্গাজলে ।

ভক্ত-দুঃখ নিবেদন করে চোখের জলে ॥

হৃদ্যার করয়ে সদা এস প্রভু বলে ।

রক্ষা ভক্তগণে প্রভু, দুর্জনে-কবলে ॥

তোমার প্রতিজ্ঞা প্রভু এবে রক্ষা কর ।

দুর্জনে শাসিয়া তুমি ভক্তে ত্রাণ কর ॥

দুর্জনে শাসিতে, আর সজ্জনে রক্ষিতে ।

যুগে যুগে অবতীর্ণ হও ত ধরাতে ॥

এবে এসে অবতীর্ণ হও তুমি ভবে ।

কলিহত জীবগণ তবে রক্ষা পাবে ॥

কলির পীড়নে জীবের দুর্দশা দেখিয়া ।

গোলোকবিহারী হরি গোলোক ছাড়িয়া ॥

সাক্ষপাঙ্গ-অঙ্গ সব সঙ্গিতে লইয়া ।
 কলিরে শাসিতে প্রভু আইল ধাইয়া ॥
 জগন্নাথ মিশ্র ঘরে শচীর উদরে ।
 অবতীর্ণ হ'লো প্রভু নদীয়া নগরে ॥
 শুভক্ষণে শুভলগ্নে পূর্ণিমা-তিথিতে ।
 গৌরশশী অবতীর্ণ হইল ধরাতে ॥
 অকলঙ্ক চন্দ্র আসি উদিত হইল ।
 সকলক্ষ চন্দ্রে তাই রাহতে গ্রাসিল ॥
 গোলোকেতে প্রেমধন গোপোনেতে ছিল ।
 জীব-উদ্ধারিতে প্রভু এবে সঙ্গে নিল ॥
 সেই হেতু প্রভু মোর গ্রহণের ছলে ।
 'হরি হরি' বোলায় সবে অতি কুতূহলে ॥
 সঙ্কীর্ণন-সহযোগে আত্ম প্রকাশিল ।
 কলিহত জীব সব প্রেমেতে ডুবিল ॥
 রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে পাগলের প্রায় ।
 জীবের উদ্ধার লাগি ঘুড়িয়া বেড়ায় ॥
 পাণ্ডিত্যভিম্যানী সব অভক্তের গণে ।
 কৌশলে জিনিয়া ভুক্ত কৈল নিজজনে ॥
 পাণ্ডিত্য ভুলিয়া সবে হাসে কাঁদে গায় ।
 প্রেমে মাতোয়ারা সবে ভূমিতে লোটায় ॥
 একপে জগতে আসি প্রেম করি দান ।
 কলিহত জীবগণে করিলেন ত্রাণ ॥
 দেশে দেশে পাঠালেন নিজজন যত ।
 নিজশক্তি প্রদানিয়া তারিতে জগৎ ॥
 গুরুরূপে ফিরে সবে দেশ-দেশান্তরে ।
 হরিনাম-মহামন্ত্র দেয় ঘরে ঘরে ॥
 যারে দেখে তারে বলে—ভজ গৌরহরি ।
 অকুল পাথারে তবে পাবে প্রেম-তরি ॥

জাতি-কুল নাহি মানে সবে য়েঁচে দেয় ।
 গোলোকের প্রেমধন জগতে বিলায় ॥
 প্রেমের বশায় তবে জগত ভাসিল ।
 পতিত পামর দীন কিছু না বাছিল ॥
 দয়ালের শিরোমণি শ্রীগৌরানন্দ রায় ।
 এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ??
 সে-হেন সময়ে প্রভু জন্ম না পাইলু ।
 গৌরানন্দের নাট আমি হেরিতে নারিলু ॥
 পুনঃ প্রভু সেই দিন ফিরিয়া আসিল ।
 কলির প্রভাবে দেশ ভক্তিশূন্য হ'ল ॥
 কঁাদে বসুমতী, আর কঁাদে ভক্তগণ ।
 পুনঃ আসি দেখা দাও পতিত-পাবন ।
 কলির রাজত্ব এবে, কলির শাসনে ।
 অসহায় জীবগণ অতীব পীড়নে ॥
 কঁাদিতেছে অবিরত 'হা গৌরানন্দ' বলে ।
 উদ্ধারহ আমি' প্রাণে এবে ধরাতলে ॥
 তবে ত জানিব তুমি দয়াল ঠাকুর ।
 তুমি বিনা আর কেবা হুঃখ করে দূর ??
 অধর্ম্যে ছাইল দেশ ধর্ম্য অস্তমিত ।
 পাপীরা করিছে এবে সাধুরে পীড়িত ॥
 অসহ্য পীড়নে সবে কঁাদে উভরায় ।
 পুনঃ আসি দেখা দাও ওগো দয়াময় ॥
 শরীর নিকটে তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে ।
 এই কলিযুগে পুনঃ আসিবে বলিলে ॥
 “আর দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্ণনারত্তে ।
 হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥
 মোর অর্চামূর্তি, মাতা, তুমি সে ধরনী ।
 জিহ্বাক্রপা তুমি, মাতা, নামের জননী ॥”

সে প্রতিজ্ঞা এবে তুমি করহ পালন ।
 তবে ত হইবে পুনঃ ধর্ম-সংস্থাপন ॥
 সাধুগণ ভ্রাণ পাবে কলি-হস্ত থেকে ।
 প্রেমে মাতোয়ারা হবে, হা গৌরাজ ডেকে ॥
 প্রেমবন্তা আসি পুনঃ ভাসাবে জগত ।
 পলাবে ছরন্ত কলি ভয়ে হ'য়ে ভীত ॥
 আশাপথ চেয়ে আছি ওগো দয়াময় ।
 সেই শুভদিন কবে হইবে উদয় ॥
 এসব যাতনা আর সহিতে না পারি
 শীঘ্র আসি দেখা দাও, ওগো গৌরহরি ॥
 তুমি বিনা অভাগীর কেহ নাই আর ।
 'পতি-বান্ধব-রক্ষক'—তুমিই আমার ॥
 কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া ।
 অধমা দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া ॥
 পতিত-পাবন, তুমি পতিত-উদ্ধার ।
 এইবার এ পামরে করগো নিস্তার ॥
 ভক্তসঙ্গে দিও বাস জনমে জনমে ।
 সেবা-সুখ দিও প্রভু এ দুঃখী অধমে ॥
 গুরু-সেবা করি যেন অতি সযতনে ।
 মতি যেন থাকে মোর গৌরাজ-ভজনে ॥
 গুরু-গৌরাজের কৃপা লভিয়া এজন ।
 সতত করিতে পারে ধুগল-সেবন ॥
 আর যেন হ'তে পারি বৈষ্ণবের দাস ।
 জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ ॥
 কৃপা করি' গৌরহরি ! পুরাও বাসনা ।
 অধমা পাতকী করে সদা এ' প্রার্থনা ॥

—শ্রীমতী উমারাগী দেবী, ভক্তিপ্রভা

বর্ণধর্ম ও দৈববর্ণাশ্রম

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারস্থ কোন কোন ব্যক্তি বা সকলেই যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া সদ্গুরুচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন এবং বাহিরে দীক্ষিতের চিহ্নমাত্র ধারণ করেন অথচ হৃদয়ে কপটতা সংরক্ষণ করেন, তবে তাঁহারা সকলেই শুদ্ধ হইয়া গেলেন,—একপ বিচার করিতে হইবে না, পরন্তু অস্তরে তাঁহাদের কোনরূপ সঙ্গ করিতে হইবে না। ভোগের জন্ত তাঁহাদের অসংসঙ্গ ও কপটতাকে সংরক্ষণ করা এবং মনে প্রাণে তাঁহাদের সঙ্গ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্ত তাঁহাদের সঙ্গ না করিয়া অস্তরে তাহাদের নিকট হইতে সর্বাভাৱে পৃথক থাকিতে হইবে—যুক্ত-বৈরাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থই যদি যুক্ত-বৈরাগী (সন্ন্যাসী) না হন, তবে দৈববর্ণাশ্রম হইতে বিচ্যুতি অবশ্যজ্ঞাবী। যাহারা যুক্তসন্ন্যাসী না হইয়া পড়েন, তাঁহারা শীঘ্র বা বিলম্বে স্মার্তের পদ-লেহন করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন।

পিতা না থাকিলে যেমন ‘পুত্র’ বলা যায় না, সেকরূপ ভক্তি না থাকিলে বৈরাগ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ভক্তি হইতে বৈরাগ্য যখন স্বতন্ত্র-রূপে অবস্থান করে, তখন তাহা বন্ধার পুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ মাত্রে পর্যাবসিত হয়।

লিঙ্গ বা চিহ্নের উপর ততক্ষণই আস্থা রাখা যায়—যতক্ষণ তাহা হরি-ভক্তনের সহায় হয়। লিঙ্গ বিসর্জন দিলেই যে হরিভক্তি হইবে, তাহা নহে। সতীসাক্ষীর কপালে সিঁথিতে সিন্দূর থাকে, হস্তে লৌহবলয় থাকে, কোন কোন সময়ে বারবণিতারও তাহা থাকে, সেজন্ত সতীর সেই চিহ্নগুলি বা চিহ্নধারণ যে দোষণীয়, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, অধোক্ষজ-সেবা-বিহীন কেবল লীঙ্গনিষ্ঠা বৃথা ও অনর্থকারী।

পরমহংসানুগত্যে প্রত্যেককেই যুক্ত-সন্ন্যাসী হইতে হইবে। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী পরম-হংসের আনুগত্য-ব্যতীত কেহই যুক্ত-বৈরাগ্য সংরক্ষণ করিতে পারে না। পরমহংস আচার্য্যের নিতা আনুগত্য-ব্যতীত ব্রহ্মচারী মায়াচারী হইয়া যায়, গৃহস্থ গৃহব্রত হইয়া যায়, বনচারী মনে-মনে গৃহচারী হয় এবং সন্ন্যাসী বাস্তবশী হইয়া পড়ে।

দৈববর্ণাশ্রমের সমাজ কর্মজড়মার্গের জাতিকুল বা গড্ডলিকা লইয়া হইবে না। ব্যক্তিগত নিষ্কণ্ট হরিভজনকারী ব্যক্তির বহুকে অর্থাৎ সমষ্টিকে লইয়াই সেই সমাজ গঠিত। সেই সমাজ বা সমাজই মঠ। হাসপাতালরূপ গৌড়ীয় মঠে বা আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিকিৎসাধীন রোগী অবস্থান করে। তদনুসারে চিকিৎসকেরও ভারতম্য আছে। সেই চিকিৎসকগণ মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারীর মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্রতা আছে, সকলেই একশ্রেণীর নহেন। কনিষ্ঠাধিকারী চিকিৎসক হইতে পারেন না।

জাতশ্রদ্ধা মংকথাসু নির্দিষ্টঃ সর্বকর্মসু।

বেদ হুঃখান্নপান্ কামান্ পরিত্যাগেইশানীশ্বরঃ ॥

ততো ভজতে মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিষ্ঠঃ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ হুঃখোদকান্শ্চ গর্হয়ন্ ॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাহসকুনুনে।

কামা হৃদয়া নশ্রুন্তি সর্বৈ ময়ি হৃদি স্থিতে ॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭—১৯)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচার অবলম্বনপূর্বক যিনি বিষয়কে অমঙ্গলকর জ্ঞানিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহা ভোগ করেন, অথচ, বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি দৈববর্ণাশ্রম হইতে যে বহিষ্কৃত, তাহা নহে। অনর্থ ছাড়িতে পারিতেছেন না বলিয়া হৃদয়-দৌর্জল্যবশতঃ কাম, এমন কি, ছুই-একটি পাপজনক কার্যও অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইতেছে (অপরাধ নহে—অপরাধীর নিষ্কৃতি নাই) বলিয়াই যে তিনি দৈববর্ণাশ্রম হইতে পতিত হইবেন, তাহা নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিশেষ দণ্ড আছে। সেই অনর্থযুক্ত ব্যক্তির জীবন ‘জাতশ্রদ্ধা মংকথাসু’ শ্লোক অনুসারে নিয়মিত। সেইরূপ সংসঙ্গে হরিকথায় রুচি-বিশিষ্ট অথচ অনর্থনিবন্ধন অজ্ঞাতসারে কদাচিৎ স্থলিতপদ ব্যক্তিকে কর্ম-কাণ্ডীয় পাপীর সঙ্গে সমান বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে না; কারণ, তাহার হৃদয়-দৌর্জল্য থাকিলেও তিনি অধোক্ষজ-সেবা করিতেছেন না। এইজন্য প্রাকৃত স্মার্ত-সমাজের পাপীর গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে ফেলা যায় না। তিনি বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী নহেন বলিয়া মনু, অতি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ বা যম তাঁহার বিচারক ও দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা নহেন। হরিকথায় জাতশ্রদ্ধা দুর্জল ব্যক্তিকে চৈত্রেয় ও মহান্তগুরুরূপে ভগবান্ উদ্ধার করেন। তিনিই অটকতব হরিনামানুশীলনের একমাত্র যোগ্যপাত্র (অধিকারী)।

কৃষ্ণ-ভজন করিতে করিতে লিঙ্গের প্রতিমান শিথিল হইয়া পড়ে । তখন শঙ্কাকারে অধোক্ষজের সেবা হইতে থাকে । অধোক্ষজ-সেবকের কথা, তাঁহার শীল বা চরিত, তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা, এই সকলের অনুগমন করিবার জন্য তাঁহার রুচি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয় । অধোক্ষজ-সেবকের আশ্রিত হইয়া তাঁহার অনুগমন বা শ্রুত কথা অনুযায়ী নিজের জীবনকে properly adjust করিবার স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে হইবে । ইহাতেও গুরু ও বৈষ্ণবের রূপাই একমাত্র অবলম্বন । গুরু ও বৈষ্ণবের রূপার দ্বারে সর্বদা দীন-দরিদ্র ভিক্ষুক হইতে না পারিলে স্ব-স্ব-দান্তিকতার দ্বারা হরিভক্তনে আন্তি উপস্থিত হয় না ।

দৈববর্ণাশ্রমীর সমাজ গঠনের জন্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভু যে ‘সংক্রীয়া-সার-দীপিকা’ গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা বৈষ্ণব-জগতে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে একটা dead letter বা sealed book এর মত করিয়া রাখিলে দৈববর্ণাশ্রমের অভ্যুদয় হইবে না । শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য কি পরিশ্রমই না স্বীকার করিয়াছেন । বহু চেষ্টায় সহস্রে সংক্রীয়া-সার-দীপিকা প্রতিলিপি করিয়া আনিয়াছিলেন । সেই গ্রন্থটিকে sealed book করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে কর্মকাণ্ডের স্রোতেই গা’ ভাসাইয়া দিতে হইবে । দশবিধ সংস্কার কেবল মনে মনে থাকিবে, বাহিরে কিছু প্রকাশিত হইবে না,—তাহা নহে ।

দৈববর্ণাশ্রমের মধ্যে আর একটি সমস্যা এই যে, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ছাদশ-বর্ষ বা ততোধিক কাল বাস করার পর সমাবর্তন করিয়া বিবাহাদি করিলে কি তাহা অশ্রায় হইবে ? এই কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, যদি পুরুষাভিমান প্রবল না হয় এবং হরির সেবার অমুকূল হয়, তবে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হইতে পারেন । কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে নহে । ভোক্তা বুদ্ধিতে যখনই কেহ ইহার অমুকরণ করিবে, তখনই তাহার পুরুষাভিমান প্রমাণিত হইবে । কৃষ্ণের যোষিৎ অভিমানে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে ব্যাঘাত বা বিরংসা হইতে বৃথিলাভ ঘটে না । সৎগুরুর নিকট দীক্ষিত অবস্থায় যে ব্রহ্মচারিত্ব, তাহাতে আর নূতন করিয় গ্রহণ বা ত্যাগের কথা নাই । দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর গ্রহণ বা ত্যাগে স্পৃহা মায়ায় একটি চাঞ্চল্য মাত্র । দীক্ষিতের নূতন করিয়া কর্মার্পণ নাই । দীক্ষার পূর্বে যিনি বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র । কিন্তু দীক্ষিত আর নূতন করিয়া সংসার-

পতনের অভিলাষী হইবেন না। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীযুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন আর শ্রীযুনাথদাস গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে 'লোক দেখান মর্কট বৈরাগ্য' করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসের সম্বন্ধে সেইরূপ বিচার নহে। শ্রীনিবাসানন্দ প্রভুর বিবাহ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিবাহ বা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ পিতৃ মহাপ্রভুর সন্ত্যাস গ্রহণ-লীলা সাধারণ ভোগ বা ত্যাগের আদর্শ নহে।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে বাবার-প্রবৃত্তি ও তাহার মূলে যে মনোদম্ব, তাহাকে সংসঙ্গে হরিকথার দ্বারা নিগ্রহ করিতে হইবে। “কৃষ্ণেরই শাস্ত্রী সন্তোষ-বৃত্তি, তাহার অসৎ অনুকরণ করিও না”—এই কথা পুনঃ পুনঃ কর্ণে শ্রবণ করিতে করিতে মনকে নিগৃহীত করিতে হইবে। তখন মনন-ধর্ম্য হইতে জ্ঞান পাওয়া যাইবে। সর্বদাই অমল পারমহংস-ধর্ম্যকে একমাত্র আদর্শ রাখিতে হইবে। পরমহংসের উপাসনার শেষ গতি—স্বরূপশক্তি-বিলাসী কৃষ্ণের পরিচর্যা-লাভ, আর দৈববর্ণাশ্রমীর শেষগতি ঐশ্বর্য্যময় বিষ্ণুর পরিচর্যালাভ। কৃষ্ণের পাঁচটি রসের রসিকগণই পরম-সাগ্রাহী বা উত্তম পরমহংস। নিজেকে যতটা অধোক্ষজের যোষিৎ বলিয়া উপলব্ধি হইবে, ততটাই পুরুষাভিমান সঙ্কুচিত হইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানুষ ব্যক্তির সম্মুখ করিতে করিতে বাবার-প্রবৃত্তির মূল বীজটি নষ্ট হইয়া যাইবে।

পরমহংসের দামাশুদাসের অভিমান (আত্মগত্যা) মূলে বাঁহারা লিঙ্গ গ্রহণ করেন তাঁহাদের সেই বিচারটি অমানী ও মানদেরই বিচার। বাঁহারা দ্রাব্য, আধ্যাত্মিক ও পাপাচারী, তাঁহারা ই পরমহংসগণের বর্ণাশ্রম ও লিঙ্গ-ধারণকে দস্ত বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ পরমহংস কোন বর্ণাশ্রমের লিঙ্গ স্বীকার বা না স্বীকার করিয়াও অন্তরে ও বাহিরে, সর্বকালে সর্বদেশে অকৈতব কৃষ্ণভজনই করেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বলেছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিতে যুনে।

হরিসেবানুকূলেব সা কার্য্য্য ভক্তিমিচ্ছতা ॥

[হে যুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অন্তর্ধান করে, ভক্ত্যভিলাষি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাগাতে হরি-সেবার অনুকূল হয় সেইরূপ করিবেন।]

— ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বেদান্ত-বাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্বে প্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠার পর)

মহাপ্রভু—যে-সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্কিশেষ বলিয়া কীর্তন করেন, তাহারা কেবল ‘প্রাকৃত-বিশেষ’ নিষেধ করিয়া “অপ্রাকৃত-বিশেষ” স্থাপন করেন—

“যা মা শ্রুতিজ্জলতি নির্কিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়ো বগীয়ঃ সবিশেষমেব ॥”

যে-যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে ‘নির্কিশেষ’ বলিয়া করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। ‘নির্কিশেষ’ ও ‘সবিশেষ’—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্কিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”—(তৈঃ ভূঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ইহাই পাওয়া যায় যে, এই ‘চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়’। এই সব বেদবাক্য-দ্বারা পর-ব্রহ্মের ‘অপাদান’, ‘করণ’ ও ‘অধিকরণ’-কারকত্বরূপ তিন প্রকার লক্ষণ জানা যায়। এই তিন প্রকার নিত্য লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। “বহু স্যান্” (তৈঃ উঃ ব্রঃ—৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন “স ঐক্ষত” (ঐতঃ উঃ—১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও ময়নের সৃষ্টি হয় নাই। অতএব, ভগবান্ যে-মনে চিন্তা করিলেন, যে-ময়নে প্রকৃতির প্রতি দীক্ষণ করিলেন, সেই “মন” ও “ময়ন” প্রাকৃত-সৃষ্টির পূর্বেই ছিল। সুতরাং পরমব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল, ইহা—সর্ববেদসম্মত।

সার্বভৌম—উপনিষদ্-বাক্যে সর্বত্র ‘ব্রহ্ম’ শব্দই পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু—সেই ‘ব্রহ্ম’-শব্দে বিভূচিৎ বা বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্।

সার্বভৌম—বেদে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই কেন ?

মহাপ্রভু—বেদে উল্লেখ আছে, তবে বেদ-বাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদ-বাক্যের তাৎপর্য জগতে বুঝাইবার জন্তই পুরাণবাক্যে বেদ-

তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। বেদার্থ-পূরণকরী ও প্রাগ্‌বক্ষ্যুগে প্রকাশিত বলিয়া ‘পুরাণ’ অর্থাৎ ‘প্রাচীন’-নাম। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—“ইতিহাস-পুরাণাত্ম্যং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ” অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে। যাহা বেদ নয়, তাহা-দ্বারা বেদের পূরণ হইতে পারে না। যেমন সুবর্ণ-বলয়ের কোন অংশ-পূরণের প্রয়োজন, সীসকের দ্বারা কখনই তাহা পূরণ হইতে পারে না। পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি সাত্ত্বিক তন্ত্রসমূহ বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশিত ও বিস্তারিত করেন বলিয়াই বেদ হইতেও পুরাণের অধিকতর গৌরব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; যথা নারদীয়ে,—

“বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে ।

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্কে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥

পুরাণমত্থা কৃত্বা তিৰ্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ ।

সুদাস্তোইপি সুশাস্তোইপি ন গতিং কচিদাপ্নুয়াৎ ॥”

হে বরাননে ! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি, কারণ নিখিল বেদ-তাৎপর্য্য পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুদাস্তই হউক, আর সুশাস্তই হউক, যে-ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে অন্যপ্রকার মনে করে, সে তিৰ্য্যগ্‌যোনি লাভ করে ; কখনই তাহার উত্তমগতি লাভ হয় না।

সার্কভৌম—আপনি পুরাণের মাহাত্ম্য বলিতেছেন, কিন্তু পুরাণও ব্রহ্মকে নির্কিশেষ-চিন্মাত্র-তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

মহাপ্রভু—অদ্বয়-জ্ঞানের শুদ্ধ ও নিঃশক্তিক-প্রতীতিই—ব্রহ্ম। জড়মধ্যে প্রবিষ্ট শুদ্ধ আত্মময় প্রতীতিই—পরমাত্মা। অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণ সর্বিশেষ-প্রতীতিই—ভগবান্। ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—শ্রীপতি নারায়ণ, আর মাধুর্য্য প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—রাধানাথ কৃষ্ণ। শ্রীগীতায় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে স্ব-মুখে বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাবাস্য চ ।

শাস্ততস্ত চ ধর্ম্মস্য সুখসৈকান্তিকস্ত চ ॥

সর্বিশেষ-তত্ত্ব-স্বরূপ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্ম-রূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক-সুখ-রূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নিগূঢ় সর্বিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বামি-চরণও এই অর্থই করিয়াছেন,—“ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা বনৌভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনৌ-

ভূত প্রকাশ এবং সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিতার্থঃ ।” ‘আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা’—এই অর্থে ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি । যে রূপ ঘনীভূত-প্রকাশই সূর্য্যমণ্ডল, সেই রূপ । ‘প্রতিষ্ঠা’-শব্দে পর্য্যাপ্তিও হইতে পারে । কোষকার বলেন,—‘পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা’ ।

“পরাকৃতমনস্বন্দং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ।

সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বদং বন্দে নন্দাঙ্গজং মহঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুত করিয়া বলিলেন,—

“অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥”

‘অহো ! নন্দরাজ-প্রমুখ পঞ্চরসাস্থিত ব্রহ্মবাসিগণের মহাসৌভাগ্যের বলিহারি যাই ; পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে আবিভূত হইয়াছেন ।’

সার্বভৌম—‘অপানি-পাদ’ শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে ‘নিরাকার’ ‘নির্কিংশেষ’ বলিয়াছেন, তখন জানিতে হইবে যে, স্বগুণ-ব্রহ্ম সেই নিগুণ-ব্রহ্মেরই গোণ প্রতিতীমাত্র । অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নির্ভিকার, নিরঞ্জন, অদ্বৈত, অমেঘ ব্রহ্মই মায়া-মল্লু্যরূপে নন্দ-যশোদার পুত্র বা গোপগণের মিত্র হইয়া থাকেন ।

মহাপ্রভু—আপনি শ্রুতি-বিরুদ্ধ-কথা বলিতেছেন । ‘অপানিপাদ’ শ্রুতি-মস্ত্রে জড়-বিশেষ নিরসনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই উদ্দিষ্ট হইয়াছে । আদৌ ব্রহ্মের “প্রাকৃত-হস্ত পদ নাই” বলিয়া পরে “শীঘ্র চলেন এবং সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন”—এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে বলিয়া ব্রহ্মের নিত্য সর্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন । এই শ্রুতির মুখ্য-বৃত্তিতে সর্বিশেষত্ব ও গোণ-বৃত্তিতে নির্কিংশেষত্ব । আপনি শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণ-বৃত্তিতে অন্যায়রূপে ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব নিষেধক নির্কিংশেষত্ব স্থাপন করিতেছেন । মায়াবাদিগণ ব্রহ্মের নিত্য সর্বিশেষ রূপে ‘মায়ার বাদ’ উঠাইয়া ব্রহ্মকে ‘নিত্য নিরাকার’ বলিয়া স্থাপন করেন ; পরন্তু শ্রুতির সিদ্ধান্ত-মতে সেই ব্রহ্ম—ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আনন্দবিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান । মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে ‘নিঃশক্তিক’ বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু শ্রুতি বলেন,—

“ন তস্মৈ কার্য্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতঃ ।

পরাস্মৈ শক্তিব্রহ্মৈবৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ ।

সেই কক্ষের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য নাই। যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ — পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব অড়দেহ যেক্রপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসঙ্গে সর্বত্র থাকিতে পারে না, সেক্রপ নয়। কক্ষ-বিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্বদা সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বন্দাবনে নিত্যশীলা-বিশিষ্ট। এক্রপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অত্ৰ কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্তা-শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্তাতা এই যে, পরিমিত-জীব-বুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্তা-শক্তির নাম — ‘পর্য শক্তি’। এক হইয়াও স্বাভাবিকী শক্তি — জ্ঞান (সম্বিং), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) - ভেদে বিবিধ। এই পর্য শক্তি বিচিত্রানন্দ-সম্বন্ধিনী; সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটি প্রভাবের পরিচয়-মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম — চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পর্য প্রোক্তা ক্ষেত্রজাথা তথাপর্য।

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্য তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।

যা যা ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা।

সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজিতা।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যমান বর্ততে॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিং ত্রয়োকা সর্বসংশ্রয়ে।

হ্লাদিতাপকরী মিশ্রা ত্রয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পর্য, ক্ষেত্রজা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা-বিশিষ্ট। বিষ্ণুর পর্য-শক্তিই ‘চিচ্ছক্তি’; ক্ষেত্রজা-শক্তিই জীবশক্তি—যাহা মায়া-রূপে ‘অবিদ্যা’ হইতে ‘অপর্য’ অর্থাৎ ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কর্মসংজ্ঞা-রূপে অবিদ্যা-শক্তির নাম ‘মায়া’। ক্ষেত্রজ-শক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি ‘সর্বজ্ঞ’ হইয়াও মায়া-বৃত্তিরূপে অবিদ্যা-দ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিল-তাপ নিতা ভোগ করিতেছে। অতএব সেই ‘ক্ষেত্রজা’-নামী শক্তি অবিদ্যা-কুষ্ঠা-বৃত্ত হইয়া সর্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্তমান থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি—মধ্যমা, এবং অবিদ্যা-কর্ম-সংজ্ঞিতা মায়া-শক্তি—অধম। জীবশক্তি মায়া-দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ

চিহ্নকিরতি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসার-তাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কৰ্ম-চক্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন। হে ভগবন্, সৰ্ব্বশ্রয়, নিগুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিং' ত্রিবিধ-ব্যাপারই চিন্ময়। মায়া-বশযোগ্য চিংকণজীব মায়াবিস্ত হইয়া, মাযার ত্রিগুণ আশ্রয়পূৰ্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী', ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছে; কিন্তু সৰ্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্মলা ও নিগুণস্বরূপে একাকার। বেদবাক্যে অনেক-স্থলে এই পরা শক্তির প্রভাব-ত্রয়ের বর্ণন আছে; যথা—

চিহ্নকিরতি-বিষয়ে শ্বেতাস্বতরে—

“ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিষ্ণে নিষেদুঃ।

যন্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিত্ত্ব ইমে সমাসতে ॥”

ঋগ্বেদে যে অক্ষর পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্-দ্বারা কি করিবেন? যাহারা সেই তত্ত্ব জানেন, তাহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগুটাম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥”

এক শক্তিমান্ দেব, কাল ও জীবের সহিত প্ৰভাবাদিকারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ঐক্যজ্ঞাত্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজ প্রভাব-দ্বারা সংবৃত্তা শক্তিকেই ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইয়া নিখিল-কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

জীবশক্তি-বিষয়ে শ্বেতাস্বতরে—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সক্রপাঃ।

অজো হ্যেকো জুহমানোইনুশেতে জহাতোনাং ভুক্ত-ভোগামজোহন্তঃ ॥

মতু, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, এই প্রকার জননীস্বরূপা সমানরূপা, এক অজা-নারী প্রকৃতিকে অন্য এক অজপুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ভাগ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

কাটিয়াহাটে বিরাট সাংস্কৃতিক ধর্মসম্মেলনে

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-

* আচার্য্য মহারাজের পৌরহিত্য

“যে জিনিষ সব সময়ে একই অস্তিত্ব রক্ষা করে, তাকে বলে সনাতন। বৈদিক-ধর্মের অপর নামই সনাতন ধর্ম। হিন্দুধর্ম সনাতনধর্মকে লক্ষ্য করে না। সনাতন হিন্দুধর্ম যদি বলি, তবেই যথার্থ অর্থ হয়। বৈদিক ধর্ম—সকলের ধর্ম বা জীবাত্মার ধর্ম।”

চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট সহরের পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত কাটিয়াহাট স্কুল খেলা-মাঠে আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলনের শেষদিন ১৯ ফাল্গুন, ১৩৮৪-এ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুজিবেদান্ত বামন মহারাজ উল্লিখিত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, স্বয়ং নারায়ণ হ'চ্ছেন বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর-ই রচনা। তিনি এই শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁর মঙ্গল হয়।

শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, শাস্ত্র হ'চ্ছে ভগবানের সংবিধান। পারমাখিক সংবিধানকে শাস্ত্র বলে। মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র জন্মগ্রহণ করতে চাননি মায়াগ্রন্থ হওয়ার আশঙ্কায়। অবশ্য পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, বাঁচার জন্তু খাচ্চ। খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। নীতি, আদর্শকে বাদ দিলে পশুত্ব নীত হয়। ধর্মোচরণ করলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, এ ধরনের ধারণার প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানিয়ে দেন, ধর্মোচরণ করলে মানুষ মোটেই দুর্বল হয় না; আর এ ধারণাটা ভুল। ভারতবাসী জন্মসূত্রে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। কলির বয়স হ'চ্ছে পাঁচ হাজার বছর। অর্থাৎ বাপরের শেষদিকে কলির সুরু। ঋষিদের দর্শন—পূর্ণ-দর্শন। তা'র-ভাবে বুঝতে হয়। ভগবান্ 'পজেটিভ', শক্তি 'নেগেটিভ'। প্রকৃতিবাদীরা বলেছেন, প্রকৃতি হ'তে পৃথিবীর সৃষ্টি। মুক্তি চাইলে ভগবানের সাধন-ভজন করতে হবে। তাঁর মধ্যে চালাকী চাতুরী নেই এবং নিরুপায়ে ভগবদ্ভজন করেন তাঁকে বলে ভাগবত।

তিনি বলেন, ব্রহ্মলোকে Intern (অন্তরীণ) করে রাখা হয়। দর্শন গেলে আবার ফিরে আসতে হয় এই পৃথিবীতে। লৌকিক কর্মের দ্বারা

স্বর্গলাভ হয়। শ্রীবাসদেব, স্বয়ং নারায়ণ। যখন, তখন তাঁর কথা মাথা পেতে নিতে হবে। বেদ মানতে হলে তাঁর আদর্শ ও নীতিকে মেনে চলতে হবে। তখন মানতে হবে ভগবানকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি গুরু। আর তিনিই হলো শক্তিমান বিগ্রহ। গুরু হলো তত্ত্বদর্শন। গুরু শ্রীভগবানের সেবা ও শিক্ষা দান করেন। কারণ তাঁর মধ্যে আছে সৃজনীশক্তি। যথার্থভাবে বাচার পথ হলো একটা। যা' ভাগবতে, উপনিষদে আছে—তাহা ভক্তি-মার্গ। ভক্তিকে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই।

শ্রীল মহারাজ ১৫০ মিনিটকাল অমূল্য ভাষণ রাখেন। অজানা বিষয়ের মধ্যে ছিল (১) বৈষ্ণব কাকে বলে (২) অশক্তের নিন্দা (৩) দেব-দেবী ও ভগবানের উপাসনা (৪) কৃষ্ণভক্ত (৫) জীব-তত্ত্ব (৬) মন্বন্তর ও অতিদেয়, প্রয়োজনতত্ত্ব (৭) শ্রীনামতত্ত্ব (৮) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ ও বাণী (৯) ব্রহ্মা, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি। শ্রীতারাশদ সরকার প্রধান অতিথি থাকেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত কীর্তন ও বন্দনায় অংশ গ্রহণ করেন ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্তুজিবেন্দ্রাশ্রম গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী, সর্বশ্রী শ্রীকান্ত সরকার, সূর্যাস্ত সরকার, গোষ্ঠে সরকার, লক্ষীকান্ত সরকার এবং আরও অনেকে। শ্রীল মহারাজের ভাষণ এত উচ্ছাস ও ভাবগভীর হইয়াছিল যে, দীর্ঘ সময় ভাষণ দিলেও সভা ছিল একদম শান্ত।

শ্রীল আচার্যদেব পূঁড়ার শ্রীহরেক্ষনাথ সরকার মহাশয়ের বাসভবনে তিনদিন অবস্থান এবং বাজিতপুরে এক সভায় ভাগবতের আলোচনা করেন। সম্মেলনে যোগদানের সময় শ্রীল মহারাজকে কীর্তন সহযোগে কাটিয়াহাট-অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দীর্ঘ ৫ (পাঁচ) মাইল পথের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ভক্তবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। শঙ্খধ্বনি উঠে প্রতিনিয়ত। শোভাযাত্রায় ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিকগণ।

এরপর মহারাজ চপাচিত্রের মাধ্যমে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর লীলা ব্যাখ্যা করেন, যা' ভাব, ভাষা এবং পরিবেশন অসংখ্য শ্রোতাবর্গকে মুগ্ধ করেন। কাটিয়াহাট অনুষ্ঠানে সমগ্র সভাস্থলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না এবং সকলেই তাঁর ভাষণ অত্যন্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ, বিজ্ঞানভূষণ

সাংবাদিক, পি, টি আই

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ৮০তম বর্ষপূর্তি

আবির্ভাব-তিথিপূজা-বাসরে

ভক্ত্যঞ্জলি

মাঘের কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিরে পূজি আজি সমাদরে,
একদা শ্রীগুরু এ' তিথি আলম্বি' উদিত ধরণী' পরে ।
কলিহত জীবের উদ্ধারার্থে প্রকটিত তিনি হেথা,
'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নামে তাঁরে বন্দে ভক্তেরা সর্বথা ।
গুণমধ্যে তিনি উদিত হ'লেও সত্তা তাঁর অপ্রাকৃত,
নিগুণ বস্তু হয়ে তিনি সদা ভক্ত কাছে প্রতিভাত ।
মায়িক বস্তু হয়ে অবিরত, কভু গুরুত্ব নাহি তার,
নিগুণ বস্তুই গুরুত্ব বলে, গুরু হয় সবাকার ।
নিগুণ বস্তু শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রিত সেবক হ'লে,
মায়িক জীবের সর্বানর্থ টুটে শ্রীগুরু-করুণা-বলে ।
নিগুণ ক্ষেত্রেই নিগুণ শ্রীগুরুর সতত অধিষ্ঠান,
দেবানন্দ মঠে শ্রীগুরু-পূজায় সঁপি তাই মন-প্রাণ ।
বাজিতেছে আজ খোল-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা শত শত,
ধূপ-দীপ ও গন্ধ পুষ্পাদিতে চারিদিক আমোদিত ।
গঙ্গা-সলিলে কল-উচ্ছ্বাসে শোঁনা যায় গুরুর স্তুতি,
শুক-সারী গাহে শ্রীগুরু-মহিমা আজি মহানন্দে মাতি' ।
জয় গুরুদেব—ধ্বনি ওঠে সদা আকাশ-বাতাস ভরি'
মোদের হৃদয় নাচে আনন্দে তাঁর লীলা-কথা স্মরি' ।
তাঁহার শ্রীগুরু-সেবন-মহিমা র'বে সদা অগ্নান,
'শ্রীপ্রভুপাদে'র' রক্ষিলা একদা তুচ্ছ করি' নিজ-প্রাণ ।
গুরু-সেবার তরে আত্মত্যাগেও কুণ্ঠা ছিল না তাঁর !
সারাটি জীবনে বহিলা অক্লেশে শ্রীগুরু-সেবার ভার !
'কুরেশের' মত শ্রীগুরুদেবের জীবন রক্ষার তরে,
পীড়ন-অপবাদ সহে তিনি নিজ পুনিকিত অন্তরে ।
গুরু-সেবা ছাড়া শ্রীহরি-সেবায় নাহি কোন সার্থকতা,
শ্রীগুরু-সেবকই সর্বোত্তম বলি' শাস্ত্রে ঘোষিত সদা ।

‘পদ্মপাদ’ একদা মার্জনা চাহে গুরু সেবকের কাছে,
 শ্রীগুরুদেবের সেবকই ধন্য যুগে যুগে ধরা-মাঝে ।
 ঋষিরাও একদা গুরু-সেবকের করুণা-প্রার্থী হ’য়ে,
 নৈমিষারণ্যে শুনে ভাগবত স্মৃত-গোশ্বামীর আশ্রয়ে ।
 তেগতি মোদের শ্রীগুরুদেবের প্রভুপাদ-সেবা হেরি’,
 যোগি-ঋষিগণ শুনে হরি-কথা তাঁহার চরণ ঘেরি’ ।
 শ্রীগুরুদেবের অপ্ৰাকৃততত্ত্ব সং শিষ্যই শুধু জানে,
 শ্রীগুরু-তত্ত্ব কভু বুঝা নাহি যায় ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে ।
 শাউরী-আউলাদি-সম্প্রদায়ের মত খণ্ড খণ্ড করি’
 শ্রীগৌর-সিদ্ধান্ত প্রচারিলা তিনি সমগ্র ভারত জুড়ি’ ।
 ‘বৈষ্ণব-বিজয়’-গ্রন্থ লিখিলা মায়াবাদ দূরিবারে,
 পৃথিবীতে তাঁর হেন স্মকীর্তি র’বে যুগ যুগ ধরে ।
 ‘শ্রীমদ্ভাগবতের’ প্রতিটি শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা করি,—
 কহিলা মোদের সবার উপরে রয়েছে ব্রজের হরি ।
 ‘সুনীচ’ না হ’লে শ্রীহরি-ভজনে শুধু কপটতা ভরা,
 বাস্তব মঙ্গল নাহি হয় কভু শ্রীগুরু-করুণা ছাড়া ।
 ‘শ্রী-ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়’ কভু অবৈদিক নয়,
 গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে রহে সর্ব ঐতিহ্য সমন্বয় !
 শ্রীগৌরাজই স্বয়ং ভগবান্—আমরা সবাই ভূত্যা,
 পাষণ্ড দলি’ সদা প্রেমামৃত প্রচার—গৌড়ীয়-কৃত্য ।
 অনর্থরাশি হৃদয়ে থাকিতে পাষণ্ডত্ব নাহি যায়,
 ভজনে হৃদয় শুদ্ধ হইলেই দিব্য প্রেমালোক ভায় !
 তাঁর অসংখ্য উপদেশ-মাঝে আজি যাহা মনে ভাসে,
 স্মরি’ তাহা সদা নমি পুনঃ পুনঃ তাঁর পূত পদ-পাশে ।
 কটিল হৃদয়ে পূজিলে গুরুরে, শ্রীগুরু হয় না প্রীত,
 যথা তুর্য্যোদনের অর্ঘ্য লয়নি ভগবান্ শ্রীকেশব ।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর

সেবকাধম—

৩ গোবিন্দ, ৪৯১ গৌরাক্ষ

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

পরমারাধ্যতম জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
 পরমহংসস্বামী আচার্যকুলতিলক ১০৮ শ্রী
 শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
 আনির্ভান-নাসনের কুসুমাজলি

১। শ্রীশ্রীলীলাচলেশ্বর রথারোহণপূর্বক স্মন্দরাতল গমনের প্রাক্কালে
 যাহার আবির্ভাব-গৃহের সম্মুখে তিন দিন যাবৎ রথারোহণাবস্থায় থাকিয়া
 আপন গলার মালা-দ্বারা আশীর্বাদ করেছিলেন, সেই অতিমর্ত্য মহাপুরুষ
 শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যাহার গুরুদেব এবং তিনি
 যাহাকে 'কৃতিরত্ন' ও অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া তারশ্বরে ঘোষণা করেছেন,
 তিনিই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু আমার প্রভু।

২। যিনি যে-কার্যের জন্য এ জগতে এসেছিলেন, আবার সেই কার্যের
 জন্তই ইহলোক হইতে অপ্রকট হয়েছেন সেই জগদগুরু আমার প্রভু; সেই
 পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আমি নিরন্তর উপাসনা করি। তিনি যে
 কার্যের জন্য এসেছিলেন সেই কার্যের জন্তই চলে গিয়েছেন, তাহার প্রমাণ—

৩। কতিপয় সেবকাভিযানী ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা ও স্বতন্ত্রতাবশতঃ
 তাহার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ সংঘটন করিয়া নিরয়গামী হইতেছে দেখিয়া দুঃখ
 প্রকাশ করিতে করিতে নিজের ইচ্ছানুসারে অন্তর্দান-লীলা আবিষ্কার
 করেছেন, সেই জগদগুরু আমার প্রভু; সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে
 আমি নিরন্তর ভজনা করি।

৪। পরজগতে যুথেশ্বরীর প্রতি যুথদিগের একনিষ্ঠতা ও সেবা সাফাৎ
 নৃত্তি ধারণ করিয়া এ জগতে তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
 ঠাকুরের প্রতি নিষ্ঠা ও সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের
 কর্তব্য, — এই আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই জগদগুরু আমার প্রভু;
 আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

৫। শ্রীশ্রীমুগা প্রভু আবির্ভাবকালে চন্দ্র-গ্রহণচ্ছলে এই জগৎ শ্রীশ্রীরাধা-
 কৃষ্ণ নামামৃতে প্লাবিত করেছিলেন, সেই নামামৃত পান করে নিরপরাধী
 জীব অমরত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু এটো মহাপুরুষ গ্রহণচ্ছলে অন্তর্দানকালে
 নরপরাধি সেবক ও নরদ্বীপবাসীকে অশ্রু বিসর্জন করাইয়াছেন, সেই জগদ-

গুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ।

৬। ঘাঁহার সমাধিস্থকালে সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীরাধা-ঠাকুরাণী আপনগলার মালা প্রদান করিয়া কর্ণবাধা মরণশীল মানবের সহিত তুলনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই জগদগুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ।

৭। যিনি উর্জ্জ্বত বা নিয়মসেবার প্রাক্কালে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, উর্জ্জ্বশ্বরী শ্রীশ্রীরাধাণীর দাসী-অভিমানের সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নিয়মিত একনিষ্ঠ ভাবে সংখ্যানাম ও সেবা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীশ্রীদামোদরের সেবা লাভ করা যাইতে পারে,—এই শিক্ষা যিনি প্রদান করিয়াছেন সেই জগদগুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরমোপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ।

৮। সেবকে সেবকে মৌহর্দ দেখিলে যিনি পরম আনন্দিত হইতেন, কিন্তু পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখিলে বজ্রের ন্যায় কঠোর ভাব অবলম্বন করিতেন, সেই জগদগুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ।

৯। ইহ জগতে যে'টি হাস্যাস্পদ, পরজগতে সেইটিই অতি উত্তম, পরজগতে যে'টি, হাস্যাস্পদ এই জগতে সেইটিই অতি উত্তম,—এই কথা বলিতে বলিতে যিনি তাঁর অস্বর্দশা প্রাপ্ত হইতেন সেই জগদগুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ।

১০। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যে-কথা বলিবার ভক্ত জগতে এসেছিলেন, তাঁর অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করিবার জন্য শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীকীউ প্রকট করিয়া সেবক-সেব্য অভিন্নাত্মা ও হারও বহু গুঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন সেই জগদগুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ।

১১। এই মহাপুরুষের নিকট যে কোন ব্যক্তি দানান্য কিছু সেবা করিয়া সেবার বিনিময়ে নিজ নিজ মনোভিষ্ট ফল কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই কামনার বস্তুগুলি প্রদান করিয়া বঞ্চনা করেন, সেই বঞ্চনোত্তম জগদগুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ।

১২। যিনি দৈন্যের ক্ষুদ্র সেবাকে বহুমানন্ করিতেন এবং দাস্তিকের
বহু সেবাকেও অতি নগণ্য মনে করিতেন, সেবকগণের নিকট যিনি অত্যন্ত
দৈন্যের বিগ্রহ ছিলেন এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের বিদ্বৈষিগণের প্রতি
শানিত অস্ত্রের মত ছিলেন, সেই বজ্রাদপি কঠোরানি, মৃদুনী কুসুমাদপী
জগদগুরু আমার প্রভু; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে
নিরন্তর ভজনা করি।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাসাভিলাষী —

শ্রীভগবানদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত

গীতাভূষণ-ভাষ্যসহ

[মূলশ্লোক, অবয়বানুবাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত
“বিদ্বদ্রঞ্জন” ভাষাভাষ্য এবং বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী, অধ্যায়-
সূচী, মঙ্গলাচরণ ও গীতামাহাত্ম্যাদি সমন্বিত ।]

সাধারণ বাঁধাই—১৫.০০

বোর্ড বাঁধাই—১৮.০০

শ্রী শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ত্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রী শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিগত ১৪ই ফাল্গুন (ইং ২৬/২/৭৮), রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরমহংসকুলচূড়ামণি আচার্য্যাকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিপূজা হইতে ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৮/২/৭৮), মঙ্গলবার হইতে ভগদ্বক্তা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট চিহ্নিলাস ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রী শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা ও তদঙ্গিভূত পূজা-পঞ্চকাদি এবং বিরাট মহোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩ই ফাল্গুন, সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির, শ্রীসমাধি-মন্দির, শ্রীচরিত-সঙ্কীৰ্ত্তন-নাট্য-মন্দির, তোরণাদি বিভিন্ন পত্র-পুষ্প-পতাকা-দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীকীৰ্ত্তন-মণ্ডপে অধিবাস-দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ। তিনি উপস্থিত বৈষ্ণবগণকে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে প্রজ্ঞতির যে-প্রয়োজন তাহাতে সকলে উল্লাসের সহিত এগিয়ে আসায় তাঁহা-দিগকে আন্তরিক শুদ্ধা নিবেদন করেন। কারণ, “গুরুর সেবক হয় মায়া জাপনার”—এই বাণীকে কেন্দ্র করিয়া সেবক-সেবোর নিত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করতঃ সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

১৪ই ফাল্গুন, ব্রাহ্ম-মুহূৰ্ত্তে মহাশরতি হইলে কীৰ্ত্তনমুখে নগর-পরিক্রমণ করা হয়। পরে শ্রীমঠে গুরুষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-গীতিকা কীৰ্ত্তন হইলে পূজাপাদ শ্রীল ভক্তিবাদ্য নারায়ণ মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরু-তত্ত্ব আলোচনা করেন। পূর্বাহ্নেই শ্রীগুরুপূজা ও তদঙ্গিভূত পূজা-পঞ্চক অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যাহ্নে অঞ্জলি প্রদান ও বিবিধ উপকরণাদি কীৰ্ত্তনমুখে নিবেদন হইলে বিভিন্ন মঠ হইতে আগত বৈষ্ণববৃন্দ এবং আগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

ঐদিন অপরাহ্নে এক মহতি-সভার আয়োজন হয়। এই সভায় ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথমে শ্রীল গুরুপাদপদ্মে আর্তি নিবেদনের বিহীন কবিতা-প্রবন্ধাদি পঠন হয়। পরে যথাক্রমে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্রহ্মচারিগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মে অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল শ্রোতী মহারাজ তাঁহার সতীর্থের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়া বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন করান। তদনন্তর কীর্তনমুখে সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮/২/৭৮) সোমবার প্রাতে যথারীতি মঙ্গলারতি হইলে বিভিন্ন বন্দনাদি কীর্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠ করেন। এই দিনেও সন্ধ্যায় সভার আয়োজন হয় এবং পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বক্তৃতাবলী বাণী-সংরক্ষণ (Tape Recorder) যন্ত্র হইতে পরিবেশন করা হয়। পরে বৈষ্ণবগণ শ্রীবাসদেব-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।

১৬ই ফাল্গুন (ইং ১/৩/৭৮) মঙ্গলবার দিনেও প্রভূষে মঙ্গলারতি ও কীর্তনাদি যথারীতি হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ পাঠমুখে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন। মহাত্মে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলোখ্যোপরি পুষ্প জলি দেওয়া হয় এবং সহস্রাধিক আগত জনসাধারণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই দিনেও সন্ধ্যায় সভার আয়োজন হয়। এই সভায় সমিতির আচার্য্যপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা-প্রবন্ধাবলী পাঠান্তে তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। তদনন্তর ছায়াচিত্র-যোগে গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বিষয় ও শিক্ষামূলক-ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়।

বলা বহুল্য, সমিতির সকল কেন্দ্রেই উক্ত উৎসব বিশেষ ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে বিশদ বিবরণ দিতে নাপারায় আমরা দুঃখিত।

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

*	স বে পুংসাং পরো বন্দ্যো যতো ভক্তিৰধোকজে ।	*
ধর্মঃ স্নুষ্টিতঃ পুংসাং বিধক্‌সেন কথাস্থ যঃ ।		নোৎপাদয়েদ্যদি এতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
ক	অহৈতুকপ্রতিদত্তা যয়ান্না সুপ্রদীদতি ।	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসর
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিগ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম অর্চকপে পাজে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ	সঙ্কর্ষণ, ২২ মধুসূদন, ৪৯২ গৌরাক সোমবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৮৫ ; ইং ১৫।৫।১৯৭৮	৩য় সংখ্যা
----------	--	------------

সান্ন্যাসাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিষ্ণুমঙ্গল-ঠাকুর-বিরচিতম্]

গোপী কদাচিৎ মণিপিঞ্জরস্থং

শুকং বচো বাচয়িতুং প্রবৃত্তা ।

আনন্দকন্দ ব্রজচন্দ্র কৃষ্ণ

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৭॥

গোপী শ্রীধাধিক। কোন এক সময়ে মণিপিঞ্জরমধ্যস্থ শুক পক্ষীকে 'হে
আনন্দকন্দ ! হে ব্রজচন্দ্র ! হে কৃষ্ণ ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে
মাধব !' নামসহ শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্তা হইলেন ॥২৭॥

গোবৎসবালৈঃ শিশুকাকপক্ষং .

বধন্তুমন্তোজদলায়তাক্ষম্ ।

উবাচ মাতা চিবুকং গৃহীত্বা

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৮॥

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে কোন এক গোপবালকের গণ্ডস্থলস্থিত কেশের সহিত ধেনুবৎসের পুচ্ছ বন্ধন করিতে দেখিয়া মাতা যশোদা পুত্রের চিবুক ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ও গোবিন্দ ! ও দামোদর ! ও মাধব !” এ কি হইতেছে ॥২৮॥

প্রভাতকালে বর বল্লবোষা

গোরক্ষণার্থং ধৃতবেদ্রদণ্ডাঃ ।

আকারয়ামাসুরনন্তমাত্তং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৯॥

প্রভাতকালে শ্রিয় বয়সুগণ বেদ্রদণ্ডহস্তে গুচ হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত, আদিপুরুষ কৃষ্ণকে আহ্বান কবিত্তে লাগিলেন—হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! গোধন চরাইতে যাবে এস ॥২৯॥

জলাশয়ে কালিয়মর্দনায়

যদা কদম্বাদপতন মুরারিঃ ।

গোপাঙ্গনাশচুক্রুশ্বরেতা গোপা

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩০॥

যখন মুরারি কৃষ্ণ কালিয়নাগকে মর্দন করিবার নিমিত্ত কদম্ববৃক্ষ হইতে কালিঘ্রুদে নিপতিত হইলেন, তখন গোপ-গোপীগণ “হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

অক্রুরমাসাত্ত যদা মুকুন্দ

শচাপোৎসবার্থং মথুরাং প্রবিষ্টঃ ।

তদা স পৌরৈর্জয়তীত্যভাষি

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩১॥

যখন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্ধজোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অক্রুরের সহিত মথুরায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন মথুরাবাসী “হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !” তুমি জয়যুক্ত হও, তুমি জয়যুক্ত হও, এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৩১॥

কংসস্ত্য দূতেন যদৈব নীতে।

বৃন্দাবনাস্তাদ্ বসুদেবসুহৃদ।

করোদ গোপী ভবনস্ত্য মধ্যে

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩২॥

যে-সময় কংসদূত অক্রুর বসুদেবহৃত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেলেন, তখন গোপী অর্থাৎ শ্রীরাধিকা নিজ ভবনে “হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

সরোবরে কালিয়নাগবদ্ধং

শিশুং যশোদাতনয়ং নিশম্য !

চক্রলু-ঠন্ত্যঃ পথি গোপবালা

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৩॥

যখন গোপবালকগণ শুনিলেন যে, কালিয়হুদে শিশু যশোদাসহিত কালিয়-নাগকর্তৃক বেষ্টিত হইয়াছে, তখনই পশ্চিমধো “হায় গোবিন্দ ! হায় দামোদর ! হায় মাধব !” বলিয়া ভূমিতলে লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

অক্রুরযানে যত্ববংশনাথং

সংগচ্ছমানং মথুরাং নিরীক্ষ্য ।

উচুবিয়োগাং কিল গোপবালা

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৪॥

অক্রুরের রথারূঢ় যত্নপতি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাভিমুখে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণ-বিরহে গোপবালকগণ বলিতে লাগিলেন, “হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! তুমি আমাদেরকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে ?” ॥৩৪॥

চক্রন্দ গোপী নলিনীবনাস্তে

কৃষ্ণেন হীনা কুসুমেশয়ানা ।

প্রফুল্লনীলোৎপললোচনাভ্যাং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৫॥

প্রফুল্লকমললোচনা শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণবিরহে পদাশ্রয়িত কুসুম-শয্যায় শায়িত হইয়া “হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

ମାତାପିତୃଭ୍ୟାଂ ପରିବାର୍ଯ୍ୟମାନା

ଗେହଂ ପ୍ରବିଷ୍ଠା ବିଳାପ ଗୋପୀ ।

ଆଗତ୍ୟ ମାଂ ପାଳୟ ବିଶ୍ଵନାଥ

ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ॥୩୬॥

ପିତାମାତା କର୍ତ୍ତୃଂ ନିଷିଦ୍ଧ ହୃଦ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀମତୀ ବୃଷଭାନୁନନ୍ଦିନୀ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ
କରତ: “ହେ ବିଶ୍ଵନାଥ ! ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ! ହେ ଦାମୋଦର ! ହେ ମାଧବ ! ନିନ୍ଦ୍ର ଆସିଛି
ଆମାଙ୍କେ ରକ୍ଷା କର ଓ ପାଳନ କର” ଏହି ବଳିଆ ବିଳାପ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୩୬॥

ବୃନ୍ଦାବନସ୍ଥଂ ହରିମାନ୍ତୁବୁଦ୍ଧା

ଗୋପୀଗତା କାପି ବନଂ ନିଶାୟାମ୍ ।

ତତ୍ରାପ୍ୟାଦୃଷ୍ଟ୍ଵାତିଭୟାଦବୋଚତ୍

ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ॥୩୭॥

ବୃନ୍ଦାବନନାଥ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦାବନେହି ସତତ ବିରାଜମାନ ମନେ କରିଷା କୋନ ଏକଦିନ
ନିଶାକାଳେ ଗୋପୀ ବନଗମନ କବତ: ତଥାୟ ତାହାର ଅଦର୍ଶନେ ଅତିଭୟେ “ହା
ଗୋବିନ୍ଦ ! ହା ଦାମୋଦର ! ହା ମାଧବ !” ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଷା ଆହ୍ଵାନ କରିତେ
ଲାଗିଲେନ ॥୩୭॥

ସୁଖଂ ଶୟାନା ନିଲୟେ ନିଜେହ୍ମି

ନାମାନି ବିକ୍ଷୋଃ ପ୍ରବଦନ୍ତି ଯତ୍ନାଃ ।

ତେ ନିଶ୍ଚିତଂ ତନ୍ମୟତାଂ ବ୍ରଜନ୍ତି

ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ॥୩୮॥

ସେ-ସକଳ ଯତ୍ନବାମ୍ନୀ ନିଜ ଗୃହେହି ସୁଖେ-ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦେ ଥାକିଷା “ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ! ହେ
ଦାମୋଦର ! ହେ ମାଧବ !” ବଳିଷା ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ-ଭଗବାନେର ନାମ ଗାନ କରେନ, ତାହାର
ସହାହି ନିଃସନ୍ଦେହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ତନ୍ମୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ॥୩୮॥

ନା ନୀରଜାଞ୍ଜୀବଲୋକ୍ୟ ରାଧାଂ

କରୋଦ ଗୋବିନ୍ଦବିୟୋଗଧିଗ୍ନାମ୍ ।

ସଖୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲୋଽଂପଲ୍ଲୋଚନାଭ୍ୟାଂ

ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ॥୩୯॥

କୋନ ସଖୀ କମ୍ପଲ୍ଲୋଚନା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କେ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦବିୟୋଗବିଧୁରା
ଦେଖିଷା “ହା ଗୋବିନ୍ଦ ! ହା ଦାମୋଦର ! ହା ମାଧବ !” ବଳିତେ ବଳିତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ-
କମ୍ପନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୩୯॥ (କ୍ରମଶଃ)

শ্রীমধ্বমুনি-চরিত

(পূর্বে প্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠ-বায়ুর অবতার

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণকল্মষশু চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন মত আমরা দেখিতে পাই যে, বৈকুণ্ঠ-ধাম এবং গোলোক-ধাম উভয় নিত্যাশ্রয়ই বায়ু কর্তৃক ধৃত আছে। যেমন দেবীধামে বায়ু মকুতাখ্য দেব বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠ-ধারণ সেবায় সৰ্বদা নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, ঐন্ডের বায়ু বা দেবলোকের মকুদেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহে।

বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম অরা-মৃত্যুহরং পরং।

বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদৃদ্ধিমুত্তমম্ ॥

ন বর্ণনীয়ং কথিত্তিবিচিত্রং রত্ননির্মিতম্।

গে লোক বিষয়ে “উদ্ধিং বৈকুণ্ঠভোঃগমাং” এবং “বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্মিতং স্বচ্ছয়া বিশেষঃ” প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত-বাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ-ধারণ-সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমধ্বগণ বলেন,—তাহাদের আচার্য্যপাদ বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমধ্বকে প্রাণনাথ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

দেবগণের প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণের আদেশে

বায়ুদেব মধ্বের আবির্ভাব

তুলুব ও অন্যান্য প্রদেশে যেকাশে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী শঙ্কর মতাবলম্বিগণ এবং শৈবসমূহ, ভাগবত-সম্প্রদায়ের গর্ভে বাস্ত ছিল, তদদর্শনে বিরিক্টিপ্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া-কলাপে উদ্ধৃত অধিবাসিবর্গের মঙ্গলের জন্য শ্রীনারায়ণের সমীপবর্তী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠধারক প্রাণনাথ বায়ুদেব তুলুবদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

বাসানুচর মধ্ব দ্বাপরে ভীম, ত্রেতাযুগে হনুমদেহ-ধারী

ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠপতির সহচর হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধারক হনুমদেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্বারকাধীশের সহচর হইয়া সেই মকুদেব ভীম-রূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন। আবার কলিতে বিষ্ণুর আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের অন্তর হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য-রূপে সেবা করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল বিচারে বিভিন্ন মতবাদ

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল বিচার সৰ্ব্ববাদীসম্মত নহে। এই কাল-বিষয়ক গবেষণায় আমরা সৰ্ব্বাগ্রে ছয়টি মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীভাণ্ডারকার ও শ্রীপদ্মনাভাচার্যের মত

(১) শ্রীভাণ্ডারকার-দৃষ্টে পূর্বে মঠ-তালিকা এবং বায়ুপুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন—বাইম্পত্য বর্ষনিক্রপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ-তালিকায় শকাব্দের উল্লেখ নাই। পর পর মঠতালিকার গণনাদ্বারা অনুমান-ক্রমে শকাবর্ষাদি নিক্রপিত হইয়াছে।

অদমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য সম্প্রতি উড়ুপীঠ পণ্ডিতকুলকে আহ্বানপূর্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাदि হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বী বর্ষে মন্দের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থে—মাঘী শুক্লা সপ্তমী বিলম্বী বর্ষে মন্দের জন্ম, আবার অন্য শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়াদশমীতে জন্ম হয়।

‘সংকথা’ নামক গ্রন্থের মত

(২) উড়ুপীঠে এক মঠস্বামিগণের এবং উত্তরাটী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠ-তালিকা। ‘সংকথা’ নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও স্বামিরাও লিখিত গ্রন্থ, যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাধকব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, সেট তালিকায় শ্রীমন্দের অভ্যুদয় কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। মাক্ষপণ্ডিতগণ এই তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দেহান হইতে পারেন নাই।

মধব-প্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়-গ্রন্থের মত

(২) শ্রীমদ্বাচস্পতী মধবপ্রণীত মহাভারত তাৎপর্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রায়শো রাক্ষসার্শেচ ব ভুয়ি কৃষ্ণভুমাগতে।

শেষা যাস্তুষ্টি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে

গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে ॥১০০॥ (তাঃ নিঃ ৯ম অধ্যায়)

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সন্থংসরাণাস্ত কলৌ পৃথিব্যাং।

জাতঃ পুনর্বিপ্রতঃ স ভীমো দৈর্ঘ্যানিগূঢ়ং হরিতভুমাং ॥১০১॥

(তাঃ নিঃ ৩২শ অধ্যায়)

মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে-কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে শ্রীমদ্বাচস্পতী ৪৩০০ কলাব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুঃসহস্রাব্দে কলি-শতাব্দীতে তাহার উদয়কাল নিক্রপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রায়শ্চৈ তাহার উদয়কাল—এরূপ কথার নির্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাহার জন্ম হয়—একথা

ভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্বমঠ তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায়, পরমঠ তালিকার নিরূপিত শক ও স্মৃত্যর্থসাগর-লিপিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয়পূর্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণদেশে বার্ষিক্যতার্যের যথেষ্ট প্রচলন পূর্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাব্দ লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যাককে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ-ক্যানারা-জিলা-ম্যাহুয়েল-গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যাক ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমন্দের আনির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণপূর্বক উড়ুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই।

শ্রীগোপীনাথরাও এবং উদ্ধবাচার্য্যের মত

(৪) শ্রীমেচ্ছলারি স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও “দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণব-মন্দির লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণাখণ্ডে” শ্রীমন্দের উদয়কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন,—

কলৌ প্রবৃতে বৌদ্ধাদি মতং বা মানুজং তথা ।

শকে ত্রেকোনপঞ্চাদশদ্বিগতাদে সহস্রকে ॥

নিরাকর্ষুং মুখ্যায়ুঃ সন্মতস্থাপনায় চ ।

একাদশশতে শাকে বিংশত্যষ্টযুগে গতে ॥

কৃষ্ণাতীরস্থ বাইফেত্র নিবাসী বালাচার্য্য তত্ত্বজ উদ্ধবাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ-প্রণীত মঙ্গমূল গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“উৎসন্নায়ুঃ পুনর্নিরূপয়িতুং রৌপ্যপীঠে সূপীঠে মধ্যগেত সুগেহে জাবিগাম ভগবান্ দশশততমশকশতকে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ। উক্তমেচ্ছলাদি নৃসিংহাচার্য্য-কৃত-স্মৃত্যর্থসাগরে।” নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমন্দের আনির্ভাব কাল।

প্রস্তর-ফলক-দ্রব্য ও অধ্যাপক কিলহর্নের মত

(৫) শ্রীমহর্ষি তীর্থের প্রস্তর ফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিকেল বিভাগ কর্তৃক যেরূপভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্থামী কলিঙ্গ রাজ্যের শিশুর্জাজের অধিভারক থাকিয়া নানাপ্রকার মতিমা বিস্তার করিতেছেন। পুরুষোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দ তীর্থের নিকট মহর্ষি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন।

আনন্দতীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ডদ্বারা সূপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপন্ন লাভ করেন। আনন্দতীর্থের বাকা বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎপাদপন্নদানে সক্ষম। এই শিলালিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অদ্যাপক কিলবর্ণ এই প্রস্তর ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ, ১২৮১ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। কুয়াঁচল, চিকাকোলে এবং সিংহাচল নৃসিংহ মন্দিরে ফলকদ্বয়ও নরহরি তীর্থের তথ্য অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিজ্ঞারণ্য, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ ও বেদান্ত দেশিক সমসাময়িক

(৬) বিজ্ঞারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গগিরি মঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীমাক্ষ চতুর্থ শিষ্য অক্ষোভ্যের সমসাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।

বিজ্ঞারণ্যমরণানীমক্ষোভ্য মুনিরচ্ছিন্নং।

আবার বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর রাজের অনুবোধে বিজ্ঞারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার-মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্তদেশিক বৈভবপ্রকাশিকা গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ-বিজয়ে জয়তীর্থের সতিত বিজ্ঞারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্বক বিচার করিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞারণ্য জয়তীর্থ, অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক একই সময়ের ব্যক্তি।

উল্লিখিত ছয়টি মতের সংক্ষেপ ও সার

উপরিউক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে—

(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে জন্ম।

(২) শকাব্দা ১০৪০।

(৩) ১১২১ শকাব্দের পর কোন বর্ষে।

(৪) শকাব্দা ১১০০।

(৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্বে মঞ্চের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর ফলকদ্বয় প্রমাণ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায় যে বিজ্ঞারণ্য, মঞ্চশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

উক্ত মতবাদিগণের পরস্পর বিরোধ

ইতিহাস প্রমাণ, এই প্রমাণের মধ্যে কোনটী গ্রহণ করা কর্তব্য তদ্বিষয় একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে :—

প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকলগুলিরই পোষণ করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণগুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে পরিভাগ করিতে হয়।

তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহ বিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

মধ্বের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাবতীয় মতের সমালোচনা

এই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির বিরুদ্ধ আক্রমণযোগ্য, তাহার পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তরফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত দিল্লী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই।

পূর্বমুঠ তালিমায় শকের উল্লেখ না থাকায়, স্মৃত্যর্থসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিলিখিত শকের সহ পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত কালের সহ পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না।

শ্রীমধ্ব-লিখিত ত্রাণার্থ-নির্ণয় গ্রন্থে কাল বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, অথবা অর্থান্তর যোগ্যতাক্রমে ৪৩০০ কলাক লোক-কথিত

বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কালবিষয়ে সন্দেহতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

স্মৃত্যর্থসাগর রচনাকালে লোক-মুখে বিলম্বী বর্ষে মধবের জন্মাদ শ্রবণ করিয়া অসম্মানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধবজন্মকাল নিক্রপিত হইয়া থাকিলে, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধব-লিখিত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইতিহাসদের সহ সামঞ্জস্যভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তরফলক পরে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, প্রস্তর ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর-ফলক-প্রমাণ নির্বিবাদে ক্রব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ঐতিহ্য সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ক্রব সত্য বলা যাইতে পারে না।

১১৬০ শকাব্দেই মধবের প্রকৃত জন্ম

যাহা হউক, প্রমাণগুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তি সত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীমধবাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ-তালিকা বা স্মৃত্যর্থসাগরের বিরোধী হইলেও অন্য চারিপ্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে। পঞ্চাস্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পঞ্চদশ শ্রীমধবাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটি প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে। অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধব-লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক। ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির ১২০৩ শকের পূর্বে নবহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির নিকট গৃহীত-সন্ন্যাস অক্ষোভ্যতীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত দেশিকের সম-সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকভাবে পূর্ব পূর্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। তাঁহারাও এই দুইটির সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দেই এক বাক্য স্থির করিতে পারিতেন।

-- শ্রীল প্রভুপাদ

অত্যাহার

ভক্তি-সাধনে “অত্যাহার”-শ্লোকের পালন একান্ত আবশ্যক
শ্রীমঙ্গল-গোষ্ঠামী স্বকৃত উপদেশামৃত-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন—

“অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজ্ঞানো নিয়মাগ্রহঃ ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ যদ্ভুক্তিৰ্ভক্তিবিনশতি ॥

(উপদেশামৃত-২)

এই শ্লোকের গুঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন । যিনি বিস্তৃত ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক । যিনি এই উপদেশ-পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হ্রি-ভক্তি নিতান্ত দুর্বল । শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য যাহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি । এই শ্লোকে (১) অত্যাহার, (২) প্রয়াস, (৩) প্রজ্ঞান, (৪) নিয়মাগ্রহ, (৫) জনসঙ্গ ও (৬) লৌল্য—এই ছয়টি ভক্তি-বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে । এই ছয়টি বিষয় পৃথক পৃথকরূপে বিচার করিব । এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল ‘অত্যাহার’ শব্দটির অর্থ আলোচিত হইতেছে ।

‘অত্যাহার’-শব্দের অর্থ অধিক ভোজন-মাত্র নহে

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ‘অত্যাহার’-শব্দে এস্থলে ‘অধিক ভোজন’-মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয় । উপদেশামৃত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বাচো বেগঃ মনসঃ ক্রোধবেগঃ

জিহ্বাঃ বেগমুদরোপস্থ-বেগন ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সৰ্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাত্মকঃ ॥

যিনি ধৈর্যের সহিত বাচ্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, ও উপস্থের বেগ, সহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন । এস্থলে জিহ্বার বেগই—ভোজ্য বস্তুর আশ্বাদন স্পৃহা এবং উদরের বেগই—অধিক ভোজন স্পৃহা । দ্বিতীয় শ্লোকে ‘অত্যাহার’ শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ-গ্রন্থে দ্বিকল্পদোষ আসিয়া পড়ে । সুতরাং পরম গভীর শ্রীরূপ গোষ্ঠামীর ‘অত্যাহার’ শব্দের অগ্র তাৎপর্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠক-বর্গের কর্তব্য ।

‘ভোজন’-এর অর্থ—পক্ষেন্দ্রিয়ে বিষয়-ভোগ

ভোজনই ‘আহার’-শব্দের মূখ্যার্থ বটে, ভোজন শব্দেও পক্ষেন্দ্রিয়ার দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস, এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি বিষয়-পক্ষকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত-বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য। বিষয়-ভোগ ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবারাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয়। সুতরাং ‘বিষয়-ত্যাগ’—এই পরামর্শ কেবল কল্পনাক্রমে হইতে পারে, কখনই কার্যে পরিণত হইতে পারে না।

ভক্তির অনুকূল কর্মের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ কর্তব্য

ভগবান্ অজ্ঞানকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্মকং ।

কার্য্যতে হুবশঃ কর্ম্ম সর্কঃ প্রকৃতিজৈস্তৃণৈঃ ॥

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ (গী: ৩।৫-৬)

[অর্থাৎ—অন্তর্দৃষ্টি পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল করিতে থাকে; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দিষ্ট চিন্তাশোধক কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। চিন্তা যাহার শোধিত হয় না, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে; অতএব সেই মুঢ়কে ‘মিথ্যাচারী’ বলা যায়।]

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহিমুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয়। অতএব শরীর-কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।

যুক্ত বা পরিমিতভাবে বিষয়-গ্রহণের উপায়

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন :—

নাতান্ন তস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনন্ততঃ ।

ন চাতিষণ্ণশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চাক্ষুর্ন ।

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টেস্ত কৰ্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ (গী: ৬।১৬-১৭)

নৈব কিঞ্চিং কৰোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যান্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ তিচ্ছন্নশ্লান্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥

প্রলপন্ বিস্মজন্ গুল্লন্ নিষন্নিমিষন্পি ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ (গী: ৬।৮-৯)

[অর্থঃ—অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় । যুক্তাহার ও যুক্তবিহারশীল, কৰ্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা-দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হব । কৰ্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও স্বাসাদি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ ‘আমি কিছুই করি নাই’—এরূপ মনে করেন । প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মীষণ ও নিমীষণ কার্য্যকালে মনে করেন—আমি যে জড়দেহে আছি, তাহাই এ-সকল করিতেছে ; অবিদ্যা-বদ্ধ ‘আমি এইসকল কার্য্যে নির্দ্ধারণ ও মনন মাত্র করিতেছি । আত্মযথাত্মা সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে’ ।]

অতি-ভোজন, অত্যল্প-ভোজন, অতি-নিদ্রা, অল্প-নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না । কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয় । তাহার প্রকার এই যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না,—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে ।

কৰ্ম ও জ্ঞান ত্যাগ করিলে শুদ্ধিযোগ সিদ্ধ হয়

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান-পক্ষে অধিক কার্য্য-প্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধাত্মকুল হইতে পারে । গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কৰ্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানঙ্গ ত্যাগ করতঃ আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয় ।

যুক্ত-বৈরাগ্য ও জীবনযাত্রা-বিধি

অত এব শ্রীকৃপ রসামৃতসিকুতে বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাইমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসংকে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ ।

মুমুক্শুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্তু কথ্যতে ॥

(ভ: র: সি: ১।২।১২৫-২৬)

[অর্থাৎ—কৃষ্ণেতর বিষয়ানুষ্ঠানশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণের সম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবামুকুল বিষয়মাত্র অবলম্বন করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে । মুমুক্শুগণ শাস্ত্র, শ্রীমুক্তি, মহাপ্রসাদ, গুরু প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই ফল্তু-বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয় ।]

উক্ত দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন । তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়-ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে । কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূল-রূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে তাহা অত্যাহার নয় । ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপক্ষে যুক্তাহার হইবে । তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে । শ্রীমদ্ভগবৎপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর । ভাল ভাল ভক্ষাদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না । স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর—ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি । যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর । অধিক বা অল্প আহরণে সন্তুষ্ত হইবে না । অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন । উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না ।

অত্যাহার-দমন নিত্য এবং জিহ্বা ও উদরবেগ দমন—

নৈমিত্তিকী ক্রিয়া

(উপদেশামৃতে) প্রথম শ্লোকে—জিহ্বা ও উদরের বেগ গহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনে লাগসা এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য-দ্রব্য অত্যন্ত বাগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হন । তাহা একটি প্রাকৃত বেগ । যখন যেক্রপ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন । দ্বিতীয় শ্লোকে—যে অত্যাহার ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা একটি ভক্তি সাধনের নিত্য নিয়ম । পূর্ব্বসী নৈমিত্তিক, শেষসী নিত্য ।

গৃহী ও গৃহত্যাগীর অত্যাহার পৃথক্

ইহাতে আর একটি কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব-ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম-সঞ্চিত ও ধর্মোপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎসেবা, ভাগবৎসেবা, কুটুম্বভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি সাধনে ও কৃষ্ণ কৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয় ও অত্যাহার, এবং অধিক উপার্জন ও অত্যাহার, ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়নাতাই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। ভাল বস্ত্র পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণ ভজন করিলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

প্রীতি-সন্দর্ভ-৬২

শ্রীকৃষ্ণরূপ ঐশ্বর্য্য-মাদুর্য্যাপূর্ণ তত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান্ হইলেও তিনি যশোদা-নন্দন। যখন অসমোদ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রকট করেন, তখনও তিনি যশোদানন্দনই থাকেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব। শ্রীযশোদা এই তত্ত্বই অবগত হইয়াছিলেন। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদরমধ্যে বিশ্বদর্শন করিতেছেন, তখনও তাঁহাকে পুত্ররূপে দেখিতেছেন ও জ্ঞাতিতেছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকটনের কোন গৌরব নাই। সেইজন্য বিহু ঈশ্বর বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন বলা হইয়াছে।

এই ঈশ্বর কে? তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন। তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ। তাঁহা হইতেই শ্রীযশোদা বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহাকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে প্রণাম করিতেছেন। অবশ্য তিনি জানিতেন না যে, এই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ। এক আবির্ভাবে যশোদা-নন্দনরূপে থাকিয়া অন্য আবির্ভাবে পরমেশ্বররূপে জননীকে বিশ্বদর্শন করান, অচিন্ত্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই বিশ্বপ্রদর্শন-প্রসঙ্গেই

শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরমধ্যে বিশ্বদর্শন আপনাকে দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন।

ইহা বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য নহে, ভগবচ্ছক্তি ; তাহা বুঝাইবার জন্যই “বাতনোং বৈষ্ণবীমায়াং” বলিলেন। এই বৈষ্ণবী মায়া শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা-স্বরূপ শক্তি।

মায়া অর্থে দয়াও হইতে পারে। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যিনি বিশ্বদর্শন করাইয়াছেন, তাহার দয়া। পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বাৎসল্যপ্রীতি। তথা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ফ্লাদিনীর পরিপাক বিশেষ বলিয়া ঐক্য নির্দেশ।

শ্রীযশোদা বাৎসল্যপ্রীতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর-রূপ আবির্ভাব অসমোদী ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিয়া সেই প্রীতি-সমুদ্রে বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরে যখন দেখিলেন যে, সেই প্রীতি বিকৃত হইবার নহে, তখন সেই বিক্ষোভ ঘুরাইয়া ফেলিলেন। ইহাই পুত্রস্নেহময়ী মায়া-বিস্তারের তাৎপর্য্য।

এস্থলে শ্রীযশোদার বাৎসল্য প্রীতির নিকট শ্রীকৃষ্ণের অসমোদী প্রভুত্ব পরাজয় স্বীকার করিল।

মুগ্ধকণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বিষয়কর পারমৈশ্বর্য্য দর্শনেও ব্রজেশ্বরীর পুত্র-ভাবের নিশ্চলতা দেখা গিয়াছে।

এইরূপ—“অপি স্মরতি নঃ ক্ষেমা মাতরং সুহদঃ সখীন্।

গোপান্ ব্রজ্ঞাশ্রনাথং গাবো বন্দাবনং গিরিম্ ॥

অপ্যাখ্যাস্ততি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সত্বদীক্ষিতম্।

তহি ব্রজ্যাম তদ্বক্তং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥ (৬: ১০।৪৬।১৮-১৯)

শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় উদ্ধব ব্রজে গমন করিলে শ্রীব্রজরাজ উদ্ধবকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে, তাহার মাতাকে, সুহদ, সখা, গোপগণে, সেই ব্রজ, গোসকল, বন্দাবন ও গোবর্দ্ধনের কথা কি তাহার মনে আছে? গোবিন্দ কি স্বজনগণকে দেখিবার জন্য একবার আসিবে? আহা! তাহার বদন, সুন্দর নাসা ও স্নানিতা নয়ন কবে দেখিব?

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজের যে স্বাভাবিক পুত্রভাব, তদনুসারেই তিনি এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীউদ্ধব ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর প্রশংসাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বলিলেন—

যুবাং শ্লাঘাতমৌ নুনং দেহিনামিহ মানদ।

নারাঘণেহখিলগুরৌ যং কৃতামতিরীচনী ॥

এই শ্লোকে বিজ্ঞ শিরোমণি শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাদভাবেই 'নারায়ণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহা শুনিয়াও ব্রজরাজের পুত্রত্ব বিচলিত হয় নাই। সারারাত্রি তিনি উদ্ধবের নিকট কক্ষপ্রতি পুত্রত্ব পোষণ করিয়া তদীয় বিচ্ছেদজনিত দুঃখ বর্ণন করিয়াছেন, তাই উদ্ধব তাঁহাকে সাহুনা দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি দৈশ্বরবুদ্ধি জন্মে নাই—পুত্রত্বই অবিচলিত ছিল।

শ্রীব্রজরাজ শ্রীউদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের দৈশ্বর্য কথ্য শুনিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহামুনি গোপী চতুর্দিকে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছিলেন এবং তথায় তিনি শ্রীবসুদেবপুত্র বলিয়া প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি ব্রজরাজ দম্পতির শ্রীকৃষ্ণপ্রতি পুত্রত্ব অবিচলিত ছিল। ব্রজরাজ ও তদীয় ব্রতেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ যে দৈশ্বর বা বাসুদেবের পুত্র একথা মনে করিতে পারেন নাই। কেবল নিজের পুত্রই মনে করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ব্রজরাজ দম্পতিকে কৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে আলিঙ্গন ও অভিষাদনপূর্বক প্রেমে বাস্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া যৌনভাবে দণ্ডায়মান হইলেও নন্দ-যশোদা পুত্রদ্বয়কে স্থায়ী আসনে বসাইয়া পৃথক পৃথকরূপে উভয়কে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক বিশেষভাবে শোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীবাসুদেব পরম সমাদরে পরিজনবর্গের সহিত ব্রজরাজ-দম্পতিকে তাঁবুতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে দুইপার্শ্বে বসাইয়া দুই বাহুদ্বারা উভয়কে আলিঙ্গন করেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিলেও ব্রজরাজদম্পতির সঙ্কোচ হয় নাই। বাৎসল্যপ্রভাবে তাঁহাদের পুত্রবুদ্ধিই ছিল এবং আট বৎসরের বালকের মতই দেখিতেছিলেন। এইরূপে নিজ উরুপরে পুত্রদ্বয়কে বসাইয়া দীর্ঘবিচ্ছেদ-দুঃখ দূর করিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব ব্রজে কয়েকমাস বাস করিয়া কৃষ্ণকথা বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর এরূপ বহুকথা তাঁহাদের নিকট বলিয়াছিলেন। যখন শ্রীউদ্ধব মধুগায় প্রস্তানোচ্চ হইলেন, তখন শ্রীব্রজরাজ বলিয়াছিলেন,—মনসো বৃন্তয়ো নঃ স্ত্যঃ কৃষ্ণপাদানুজাশ্রয়াঃ।

বাচোহভিধায়িনীর্নান্নাং কায়ন্তং প্রহ্লাদীষু ॥

কর্মভির্ভ্রাম্যমানানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া ।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতিনঃ কৃষ্ণ দৈশ্বরে ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬-৬৭)

আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদাস্তায় হউক, আমাদের বাক্য তাঁহার নামকীৰ্ত্তনে এবং দেহ প্রণামাদিতে রত হউক। আমরা কৰ্ম্মবশতঃ দৈশ্বারদ্য যে কোন ঘোষিতে ভ্রমণ করি না কেন, যে-সকল পুণ্যকৰ্ম্ম ও দান করিয়াছি তদ্বারা যেন পরমেশ্বর কৃষ্ণে আমাদের মতি হয়।

এতলে শ্রীব্রজরাজের অভিপ্রায়,—হে উদ্ধব! কৃষ্ণকে আমরা পুত্র বলিয়াই জানি, তবু তুমি যদি তাহাকে দৈশ্বর বলিতেছ, তখন তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। শ্রীকৃষ্ণ দৈশ্বর হইলেও আমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র দৈশ্বর হইলেও তিনি দশরথের পুত্র হইয়াছিলেন। দশরথের তাঁহাতে বিশেষ অমুরাগ ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ শঙ্কায়ই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের কিন্ত এত কঠোর প্রাণ যে, তেমন গুণনিধি পুত্রের দীর্ঘ বিচ্ছেদ সহ করিয়াও প্রাণ ধারণ করিতেছি।

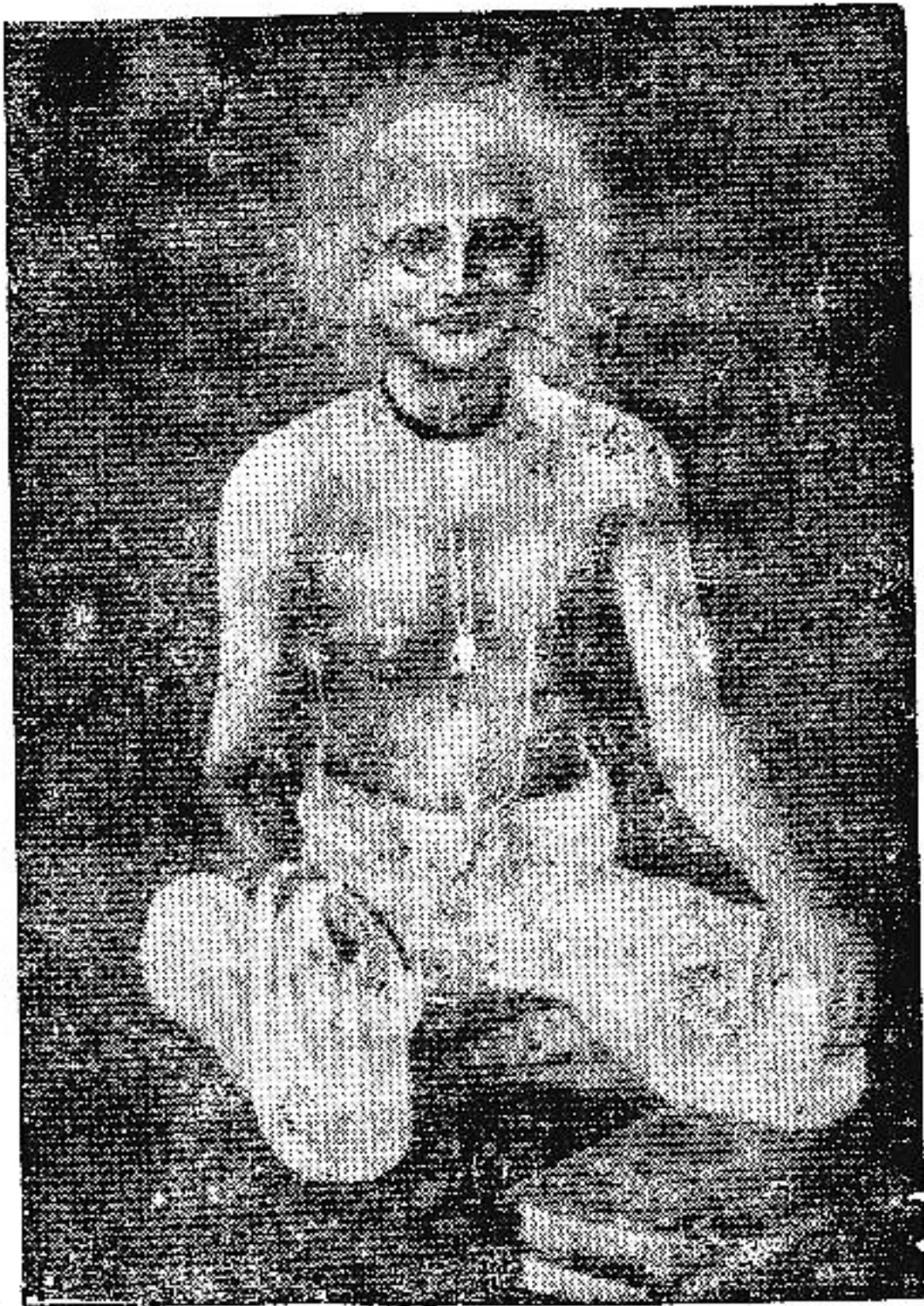
শ্রীকৌশল্যা-দশরথ হইতে শ্রীনন্দ-বশোদার প্রেম কয় ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণ অংশী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা আশ্বাদনের ভক্ত অপেক্ষাকৃত অধিক প্রীতিসম্পত্তি প্রযোজন। ব্রজরাজদম্পতির সেই প্রীতিসম্পদ প্রচুর ছিল বলিয়াই তাঁহার। যৎ ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদে শ্রীদশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণবক্ষা কিরূপে করিলেন? তত্বত্তর—ব্রজখণ্ডের বৈশিষ্ট্য। শ্রীদশরথের প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা শ্রীব্রজরাজের প্রাণবক্ষা করা অতীব কষ্টকর হইয়াছিল। কৃষ্ণবিচ্ছেদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তথাপি মুহুমূর্ত্তঃ প্রাণবিধোগের শঙ্কা থাকিলেও বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন—আমি মরিলে কৃষ্ণ পিতৃহীন হইবে—পিতৃশোকে তাহাকে ক্রন্দন করিতে হইবে, আর ব্রজে আসিয়া সে যখন দেখিবে তাহার পিতামাতা নাই, তাহা হইলে ত্রিভুগং শূণ্য দেখিবে, কেই বা তাহার আদর করিবে? সুতরাং অমোদিগকে বাচিতে হইবে তাহার সুখের ভক্ত—তাহার সাস্থনার ভক্ত। এই মনে করিয়া ব্রজরাজদম্পতি কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিধুর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের যে রতি প্রার্থনা করিলেন, তাহা অমুরাগ-ময়ী, অমুরাগাভাবময়ী নহে।

“মনসো ব্রতয়ো যঃ স্মা” শ্লোকদ্বয়ের সমীচীন ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী-প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

—পত্রিকা-কাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্তকিঙ্করদেব শ্রোতী মহারাজ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদগুরু ঔবিসুপাদ-১০৮ শ্রী
 শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজস্য
 বন্দনা-পঞ্চকম্



নমো ঔবিসুপাদায় নত্যানন্দস্বরূপণে ।
 অতিমর্ত্যচরিত্রায় জগদগুরুবরায চ ॥১॥
 সরস্বতীপ্রিয়ায় বৈ কৃতিরতন-ধারিণে ।
 শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥২॥
 রাধাবিনোদ-লীলায়াং মঞ্জরীমথি-রূপিণে ।
 গৌরপ্রেমার্ণবে সদা সম্বরণবিলাসিনে ॥৩॥
 রাধাদাস্যামৃতাস্বাদু যো রূপানুগলার্দ্দুলঃ ।
 তমহং সন্ততং বন্দে শ্রীল-কেশব-স্বামিনে ॥৪॥
 নমস্তে গুরুদেবায় আচার্য্য-ব্যাসরূপিণে ।
 স্বভক্তবৎসলায় চ নিত্যমঙ্গলদায়িনে ॥৫॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা শ্রীভক্তিবাদাস্ত হরিজনেন

নিত্যানীলাপ্রবিষ্টে ঔবিসুপাদ অষ্টোত্তরশতত্ৰী-
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজস্য

৮০তম বর্ষপুত্রি-আবির্ভাব-বাসরে

শ্রীকাকালিঃ

শ্রীকেশবেষ্টদেবায় ভক্তিপ্রজ্ঞান-নামিনে ।

বিশুদ্ধভক্তিসিকান্ত-মূর্ত্যুগ্রহরূপিনে ॥

গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীরূপানুগবর্তিনে ।

মায়াবাদ-তমোদ্রায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥

যক্ষ-রক্ষ-কিন্নরাধিনায়ক,

সততং ত্রিভুবন-সন্তারক,

সুর-নর-মনঃ শংবিধায়ক,

গুরো হুমন্তে পদানুজদ্বন্দ্বম্ ॥১॥

নিখিল-পাষণ্ড-গজৈকসিংহ,

সদ্যঃ কলিযুগ-কল্মষাপহ,

অতাস্তুত বৈকুণ্ঠবার্তাবহ,

গুরো হুমন্তে পদানুজদ্বন্দ্বম্ ॥২॥

ভবান বৈ 'বজ্রাদপি কঠোরানি

নিশ্চিতং মূহুনি কুসুমাদপি,

ইতাদর্শস্তিব কাপি ন দৃষ্টঃ,

গুরো হুমন্তে পদানুজদ্বন্দ্বম্ ॥৩॥

অদৃষ্টপূর্বে গুবৈর্বকনিষ্ঠস্বঃ,

ধরণীতলে চ বিচিত্রমেতৎ,

প্রাতঃস্মরণীয়োহস্ত ত্বচ্চরণং,

গুরো হুমন্তে পদানুজদ্বন্দ্বম্ ॥৪॥

দঙ্কহেমনিন্দিত-কাস্তিধর,

দীর্ঘবাহুশোভিত-কলেবর,

চিরং প্রফুল্লানন-শ্যামীবর,

গুরো হুমন্তে পদানুজদ্বন্দ্বম্ ॥৫॥

হে বিশ্বশরণাগতপালক,
জগজ্জনস্ত সন্তাপহারক,
ভক্তবৎসলৈকগতিদায়ক,

গুরো হুমন্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৬॥

কৃপয়া বেদান্ত-মূর্ত্তপ্রতীক,
মায়াবাদ-তিমির-বিনাশক,
অপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-নিরাসক,

গুরো হুমন্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৭॥

ত্বং কীর্ত্ত্যসে সাদৃতশাস্ত্রবিদ্বিঃ
অসংশয়ঞ্চ কিল কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ,
নুলোকে পৃথ্বীপাবনাবতার,

গুরো হুমন্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৮॥

গুরোঃ কৃপাপ্রার্থিনঃ--

উর্দ্ধমন্দিনঃ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭১ পৃষ্ঠার পর)

মায়াশক্তি-বিষয়ে স্বেতাশ্বতরে,—

“ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি ।

অস্মান্মায়ী স্বকৃতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্তো মায়ায়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥”

বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রাঘ্নাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ,—যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করেন, তৎসমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন । সেই বিশ্বে অল্প জীব মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন ।

সার্বভৌম—ব্রহ্মের শক্তি আছে স্বীকার করিলে, অল্প বেদ-প্রমাণে যে তাঁহাকে ‘নির্কিংশেষ’ বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি হয় কিরূপে ?

মহাপ্রভু—নির্কিংশেষ-গুণটীও সেই পরা শক্তিই প্রকাশ করেন, অতএব নিগুণ, নির্কিংশেষ ব্রহ্মও শক্তির পরিচয় দেখা যায় । লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী

ভাণ-মাত্র—মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব। নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত। সর্বিশেষ ও নির্বিশেষ-ব্রহ্ম এইরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছেন—

“য একোইবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-বর্ণনেনেকান্ নিহিতার্থো দধতি।”

“য একো জালবানীশত দৈশনীভিঃ সর্বান্জ্যোতানীশত দৈশনীভিঃ ॥”

পরমেশ্বর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বশক্তিমাত্র-সহায়। এ জগতে যাহা কিছু সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। তিনি নিজ-শক্তিমাত্র-সহায়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মণাদি-বর্ণ বা প্রাকৃত-রূপ-রাহিত হইয়াও নিজ নানা-শক্তি-দ্বারা ব্রহ্মণাদি-বর্ণ ও শুক্লাদিক্রূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন। যিনি অদ্বিতীয় মায়াবাদী, তিনি স্ব শক্তির দ্বারা লোকসকলকে নিহনিত করিয়া থাকেন।

পরম-তত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না; তাহা সর্বদা স্ব-প্রকাশ। সেই স্ব-প্রকাশ-তত্ত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিম্নরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়,—

“স বিশ্বকৃদ্বিশ্বাদিত্যায়োনিজ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ববিদ্যুঃ।

প্রধানক্ষেত্রজপতিগুণেশঃ সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥”

সেই শক্তিমান্ তত্ত্ব—বিশ্বের কর্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কাল-কর্তা, গুণী, সর্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ।

সার্বভৌম—এই সকল শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মের দৈশরাবস্থা বর্ণন করিতেছেন মাত্র, বস্তুতঃ নিঃশক্তিক ব্রহ্মবস্থাই চরমাবস্থা।

মহাপ্রভু—ব্রহ্মবস্থা ও দৈশরাবস্থা-ভেদে লুপ্তশক্তি ও বাস্তবশক্তির পরিচয়-ভেদ মায়াবাদাস্তর্গত মতবাদ-মাত্র; বস্তুতঃ পরমব্রহ্ম সর্বদা সর্বশক্তিমান্। সচ্চিদানন্দময়ত্বই তাঁহার স্বরূপ। শুগবানের এক চিচ্ছক্তিই ‘সৎ’, ‘চিং’ ও ‘আনন্দ’—এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পান। আনন্দাংশে ‘হ্লাদিনী’, সৎশে ‘সন্ধিনী’ এবং চিদংশে ‘সদ্বিং’। সেই সন্নিবিষ্ট কৃষ্ণ-সম্বন্ধি জ্ঞান। দৈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনরূপে প্রকাশ পান—‘অন্তরঙ্গা’ অর্থাৎ চিচ্ছক্তি অর্থাৎ, ‘তটঙ্গা’ অর্থাৎ জীবশক্তি, ‘বহিরঙ্গা’ অর্থাৎ মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তি-প্রভাব-দ্বারা চিজ্জগৎ, কৈবজ্জগৎ ও জড়জ্জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সধ্বিং ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি, তাহার কার্যরূপে চিচ্ছাম, চিদবয়ব, চিদ্রূপকরণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার চিদ্ভৈরব উদ্ভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণ-

লীলা, সমুদায়ই সন্ধিনী-কার্য্য। চিচ্ছক্তি যে সন্নিবৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্ময়-ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তি যে হ্লাদিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময়-সত্ত্ব, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। তাহাতে যে সন্নিবৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনী তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধিস্থ বা কৈবল্যাস্থও তাহার কার্য্যবিশেষ। মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দশ-লোকময় সমস্ত জড় বিশ্ব, বন্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ-শরীর, বন্ধজীবের স্বর্গাদি-লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্মিত হইয়াছে। বন্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয়-কার্য্য, সমুদয়ই তদুদ্ভূত। মায়াতে যে-সন্নিবৃত্তি, তদ্বারা জড় বন্ধজীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচারসমুদয় উদিত হয়। মায়াতে যে আহ্লাদিনী-বৃত্তি, তদ্বারা সুখ-জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত স্বপ্ন-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে। সন্ধিনী, সন্নিবৃত্তি ও হ্লাদিনী-বৃত্তিতত্ত্ব চিচ্ছক্তিতে নিম্নলিখিত ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সক্তি নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রাচুর্য্য অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়া-শক্তিতে বিকৃতভাবে তত্ত্ববৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হয়। জীবশক্তির স্বীয়-বৃত্তিসমুদয় হয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না। তাহা কেবল কৃষ্ণ-রূপা ও কৃষ্ণ-জনের রূপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

সার্বভৌম—শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে ‘নিশক্তি’ ও ‘নির্বিশেষ’ বলা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে আবার একই সময় ‘শক্তিমান’ ও ‘সবিশেষ’ বলিলে কি বিবিধ শ্রুতি-বাক্যের অসঙ্গতি হইল না? অতএব আমরা মনে করি, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নিশক্তি বা নির্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাই মুখ্য শ্রুতি; আর যাহাতে ব্রহ্মকে সবিশেষ ও সশক্তি বলা হইয়াছে, তাহা গৌণী শ্রুতি। মুখ্য ও গৌণীর মধ্যে মুখ্যই প্রবল।

হাশ্রু—শ্রুতি পরমারাধ্য। কোন শ্রুতিই অসম্মানের বিষয় নহে। একটিকে সম্মান প্রদান করিয়া আর একটিকে তাহা অপেক্ষা ন্যূন বা লঘু করিলে বস্তুতঃ বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি ও শ্রুতি-বাক্যের অসম্মানট করা হয়। দুইটী গাভীর মধ্যে যদি পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর কেহই গো-মাতার একটিকে হত্যা করিয়া আর একটিকে

রক্ষা করিতে যান না। গো-মাতার প্রতি অস্বাভাবিক ম্লেচ্ছগণই একটিকে হত্যা করিয়া অপরটিকে রক্ষা করেন। আর বাহারা গো-মাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, তিনি উভয় গাভীকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রুতি-সম্বন্ধও তাহাই। বিবং প্রতীতিবিশিষ্ট পুরুষগণ দবিশেষ-নির্বিশেষ-ভেদ-প্রতিপাদক ও ভেদ-প্রতিপাদক, উভয়বিধ শ্রুতিকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিরোধভঙ্গিকা-নামী একটি অবিচিন্তা শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। সক্রপতা ও অক্রপতা, বিভূতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকপালুতা, অজহ ও জন্মবস্থা, সর্কারাধ্যক্ষ ও গোপক, সর্ষজতা ও নর-ভাবতা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনেক বিরোধি-ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া ফলাদিনীর সেবারূপে নিযুক্ত আছেন। এ বিষয়ে বাহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারস্তের পূর্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তি সহজে সীমা-বিশিষ্ট, অতএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান ব্যক্তি শুদ্ধ-তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নায়-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে আরোহণ করেন। শ্রুতিতে পর-ব্রহ্মের যুগপৎ বিরুদ্ধগুণসমূহ শ্রুত হইয়া থাকে,—

“অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স পুনোতাকর্ণঃ।

স বেতি বেদ্যং ন চ তস্মাস্তি বেত্তা তমাহরাগ্র্যং পুরুষং মহাত্মনং ॥”

ভগবানের প্রাকৃত চক্ষু-পদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সঞ্চালন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত-কর্ণ শূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি-গণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

“তদেজ্জতি তন্নৈজতি তদদূরে তদদন্তিকে।

তদন্তরন্ত সর্ষস্ত তহু দর্ষস্তান্ত বাহতঃ ॥”

সেই আন্তরন্ত সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

“স পর্যাগাচ্ছুকমকাযমব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিহিন্।

কবির্মণীষি পরিভূঃ স্বসুখাখাতখাতোইর্থান্ বাদধাচ্ছাখতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥”

পরমাত্মা সর্বব্যাপী ঊরু, অকায়, অক্ষত, শিরা-রহিত, উপাধিশূন্য, গায়াতীত, কবি, সর্গজ, স্বয়ম্ভু ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নিত্য পদার্থসকলকে তত্ত্ববিশেষ-দ্বারা পৃথগ্ৰূপে বিধান করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়ে 'তলবকার' বলিয়াছেন; যথা,—

“তন্মৈ ত্বং নিদধাবেতদহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দদ্যুম্।
সতত এব নিববৃতে নৈতবশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যজ্জমিতি।”

দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্জিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্জ খর্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নি-প্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী ত্বং স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই ত্বণের সমীপবর্তী হইয়া সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—“এট বৎসে পুরুষকে আমি জ্বালিতে পারিলাম না।” বিভূত্বের মূর্ত্ত্ব কথিত আছে, যথা ছান্দোগ্যে,—

“শ্যামাচ্ছবলং প্রপত্তে শবলাচ্ছ্যামং প্রপত্তে।”

সার্বভৌম—আপনার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবের পারমার্থিক ভেদ বেদান্ত-শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। আমরা বেদান্তের সিদ্ধান্ত বিশেষতঃ আচার্য্য-শঙ্করের স্থায় মহা-মনীষীর বাক্যই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব। বেদান্তের মতই আমাদের মত।

মহাপ্রভু—কিন্তু আপনি বেদান্তের বিরুদ্ধ স্বকোপল-কল্পিত ভাষ্যমতকেই বেদান্তের মত বলিয়া গ্রহণপূর্বক নিগ্রলিপ্সা-দোষের প্রশ্রয় দিতেছেন। পরব্রহ্ম মায়াবীশ, আর জীব মায়াবশ-যোগ্য। এইরূপ জীব ও ব্রহ্মে আপনি কোন্ সাহসে অভেদ বলিতেছেন?

সার্বভৌম—এ সাহস পরম বলীযসী শ্রুতিমাতাই প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য ভগবান্ শঙ্কর চক্ৰানাদে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।

মহাপ্রভু—সূত্রবিরুদ্ধ পারকীয়ভাষ্য পণ্ডিত-সভায় বাচ্য নহে; যেহেতু শ্রুত্যর্থনির্ণায়কসূত্রের অর্থের নিরাকরণে কাহারও সামর্থ্য নাই। ভদবদাদিষ্ট হইয়াই আচার্য্যশঙ্কর বিমুখ-নিমোহনকল্পে ব্রহ্মস্বার্থ-বিরোধি স্বকোপলকল্পিত ভাষ্য প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত সর্বত্র মায়াবীশ জৈশ্বর ও মায়াবশ জীবের নিত্য-ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি

মিত্যলীলাপ্রসিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

আবির্ভাব-তিথিতে দীনহীনের

শ্রদ্ধা-প্রসূনাঞ্জলি

অজ্ঞানতিমিরাক্রম্য জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমঃ ও বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।

তোমার পদযুগলে অসংখ্য প্রণাম ॥

আপনি করুণাময় পতিত-পাবন ।

মোসমপাপী তারিতে শুভ আগমন ॥

অপরাধী বলি মোরে না করিয়া উপেক্ষা ।

এই মায়াজাল হইতে কর যেন রক্ষা ॥

আমি 'মিত্য কৃষ্ণদাস' একথা ভুলিয়া ।

মায়ার দাস হইয়া বেড়াই ঘুরিয়া ॥

দাসের মোহ-বন্ধন করিয়া ছেদন ।

কৃপাকরি দূর কর হৃদয়-অজ্ঞান ॥

তব আবির্ভাব-তিথি মঙ্গল-বাসরে ।

ভক্তসব পূজিছেন শ্রদ্ধা উপচারে ॥

ইচ্ছা জাগে হৃদি মাঝে করিতে সেবন ।

অপরাধপূর্ণ চিত্তে নাই ভক্তিবন ॥

তোমা বিনা শূন্য দেখিতেছি এডুবন ।

আজ আবির্ভাব-দিনে উত্তপ্ত জীবন ॥

ভক্তজন ভাবভরে তব করে দরশন।
 ভক্তি-চক্ষু হীন মোর নহেত দর্শন ॥
 শক্তি-নাহি মোর কিছু করিতে ভজন।
 কৃপাকরি দেহ এ দীনে ভজন-ধন ॥
 এ মায়া-সংসার হতে কৃপাকরি তুলে।
 লহ মোর চিত্তভ্রমর পদ-কমলে ॥
 গুরুদেব ! আশীর্বাদ কর অধমেরে।
 লভি যেন সেবাধিকার জন্ম-জন্মান্তরে ॥

দাসানুদাসাভিলাষী—

শ্রীশেষশায়ী ব্রহ্মচারী

পরমানন্দাত্ম পরমপূজনীয় শ্রী শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীচরণ-কমলে ভক্তিকুসুমাজলি

ভক্তি আমাদের বাসপূজা। বাসপূজা মানেই শ্রীগুরুপূজা, প্রথমেই অরণ্য
 করিয়ে দেয় সেই চিত্তস্থল সপা ধূপ-দীপ-শঙ্খ-ঘণ্টা-সামর-পুষ্প আর গন্ধাজল,
 এদিয়েই তো সব পূজোই হ'য়ে থাকে। এগুলো না হ'লে আবার পূজা
 কখন বাহ্যিক আসারে একথাও সত্য, এটাই যদি সত্যি হলো, তা'হলে
 বৈশিষ্ট্য কোথায়? যিনি আমাদের পারমাখিক কর্ণধার, যিনি নাম-প্রেম-
 প্রদাত্তা, “কাণের তিতর দিঘা মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।”
 এতাদৃশ শক্তিমান যে মহাপুরুষ—বার আজ শুভ আবির্ভাব-তিথি, তাঁর
 পূজাতো একটা নিষ্ঠাভীন অসংলগ্ন লৌকিক আচার নয়; শ্রদ্ধাহীন—
 প্রাণহীন ভাবোচ্ছ্বাসের অস্তিত্ব নয়।

তাই এই পূজার আয়োজনের পূর্বেই ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে সেই নির্ণম
 নিরপেক্ষ প্রশ্ন, কোথায় সে আন্তরিক নিষ্ঠা, কোথায় প্রেমভক্তি ভালবাসা
 যার উপচার দিবে সাজানো হবে আমাদের ভক্তার্ঘ্যের ডালি। কোথায়
 আমাদের সেই গুরুপরিচয় চলার অটকতব চেষ্ঠা; কোথায় সেই শ্রীগুরু-

মুখনিঃসৃত সহস্র সহস্র বাণীর প্রতি সার্থক রূপ দেবার প্রয়াস। কোথায় সেই শ্রীগুরুচরিত্র-মাধুর্য্যাকিরণকণায় নিঃসৃত নিঃসৃত চরিত্র কুমুদিনীকে বিকশিত করার অভিলাষ, আর কোথায় তাঁর অভিলষিত বিষয়ের পূর্ণতায় অগাধের সম্মিলিত সহযোগিতা।

তাই এই পবিত্র দিনে শুভলগ্নে পূজার উপকরণ-অভাবে নিজেকে অত্যন্ত অযোগ্য বলে বোধ করছি। তবে এযোগাত্মক মধ্যেও আমার আশার আলোকবতিকা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত জনসমূহের উপস্থিতিতে তাই বৈকুণ্ঠ থেকে ঝরে পড়েছে পুত মলিনা-মন্দাকিনীর জল-প্রবাহের ভায়ে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিগলিত করুণা ও তাঁর পরিপূর্ণ স্নেহধারা। সেই ধারাতেই সিক্ত হয়েই নিজের অযোগ্যতার ও নিলজ্জতার কথা বিস্মৃত হয়ে পূজোপকরণের দীনতা মাথায় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তাঁর চরণতলে। তাঁহার কৃপাভিক্ষা করে—জানাই আমার প্রণতি।

যশা প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদে যশা প্রসাদাম গতিঃ কুতোহপি।

ধাঃস্তু বৎস্তু যশস্তিসন্ধাং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্।

যাঁহার কৃপায় ভগবানের কৃপা, যাঁহার কৃপা বাতীত এ বদ্ধজীব সমূহের আর কোন সদৃশতির সম্ভাবনা নাই, সেই পবন কাকনিক আশ্রয়-বিগতকে গ্রিসন্ধা বন্দনা করি। সাময়িকভাবে বন্দনপার্কী চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাঁহাকে দেখা যায়। জগন্নাথকে বন্দনান্তে চোখ মেলিলে সর্বত্রই নজরে পড়ে ভগবৎ ভগতকে। আর নথ কেশাগ্রহ দর্শনবিমূঢ় জগতের আছে দর্শনের কথা আজ বিকৃত-মস্তিষ্ক বাতুলের প্রলাপ মাত্র। দর্শ্যপ্রাণ সাধুদের জীবন আজ বিপন্ন। তার উপর আছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক উৎপাত, তারা মনে করে, আমরাই দেশের কর্ণধার। বোকা লোকগুলি হরিভজনপ্রয়াসী। এদের দ্বারা ভগতের কি উপকার সাধিত হইবে?

কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অন্ধ্র ভগবানকে ভজ করিতে পারেন, অন্যায়সে হৃদয় মধ্যে অবরুদ্ধ করিতে পারেন, ভগতে এমন কি বস্তু আছে যাহা তাঁহাদের নিকট হুর্লভ? পরস্তু শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতনাদি গোস্বামিগণ ঐক্য পদ-মর্যাদা রাজমন্ত্রাজ ও ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পদদলিত করিয়া শ্রীশৈতন্যমহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আত্মতত্ত্ব শিক্ষায় ত্রুতী হইয়াছিলেন। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মধ্যে তাদৃশ আচরণই আমাদের সক্ষিতব্য। আরও দেখিতে পাই ভগতে বহুমতবাদ, তথা চিংজড়

সনস্কৃতবাদের প্রবল দৌরাস্ত্য। এসব কদাচারময় বিভীষিকা তাগুবলীলাকে অপসারণ করার জন্তু স্বয়ং ভগবানের অবতারের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই এসেছিলেন কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন নাম-প্রেমের বহুতা, তাহার সেই বহুতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এমন লোক তাত্‌কালে বিরল, শাস্ত্রে পাঠ শাস্ত্রিপুর হাবুডুবু, নদে ভেসে যায়। কিন্তু কালক্রমে সেই প্রেমামৃতের দ্বারা কতকগুলি ভেকধারী অপ-নন্দাদায়ের দ্বারা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পঞ্চমকরণাময় দৈশ্বরের অপার করুণায় তাহার প্রিয়জন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুশ্রম স্বীকার করিয়া সেই দ্বারকে স্রোতস্থিতীতে পরিণত করেছিলেন ও বহু গ্রন্থাদি রচনা করিয়া উন্নতগামী আন্তর জগদ্বাসীকে ভক্তিদর্শনে আগ্রহিত করেন এবং সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহার সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন গৌরাকালের উদিত ভাস্কর সূর্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীকে। এই মহা পুরুষের অতিমর্ত্যতা, অসমর্পিতা ও অপ্রাকৃতত্ব বর্ণন করার কিঞ্চিৎগাত্র প্রয়াস এই অধর্মের পক্ষে ধুষ্টতা মাত্র। তিনি তাহার সমস্ত শক্তি অর্পণ করেছিলেন গৌর-গগনের উজ্জ্বল চন্দ্রস্বরূপ শ্রীবিনোদবিহারী কৃতরত্ন প্রভুকে। দুর্ভাগ্য ধর্মবিমুখ জগতের কাছে যখন আমাদের পরম গুরুদেবের অসংখ্য কল্যাণময়ী নিকপটবাণী লুপ্ত হইতে চলছিল তখন মদীয় শ্রী গুরু-পাদপদ্ম ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তভক্তি-ধারাকে জগতে পুনঃ প্রচার করিলেন। তিনি জগতকে জানা করেন, বেদান্তের তাৎপর্য্য হল ‘ভক্তি’—জ্ঞান-কর্ম্যাদি নহে। তাহার আবির্ভাব-চন্দ্রালোকে মায়াবাদ-তমরাশী বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি ‘মায়াবাদের জীবনী’ গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই কথাগুলি নিচুচ সাহিত্য বা রূপক নহে। নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বাত্রেই জানেন—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রত্যেকটি বাণী তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রত্যেকটি কথাই সত্যের প্রতিষ্ঠা ও বেদান্তের প্রতিধ্বনি। জগতে এই সত্যকথা বলার লোক, সত্যানু-সন্ধানি পাওয়া অতীব বিরল। জগতে বেশীর ভাগ ধর্মপ্রচারকেই অবাস্তব মনরঞ্জন করার জন্তু ব্যস্ত। তাহারা চান না জগতের প্রকৃত কল্যাণ হোক—প্রকৃত মঙ্গল হোক। সত্যের অপলাপ আজ সর্বত্রই—কি ধর্মজগতে, কি ব্যবহারিক জগতে। শাস্ত্রে বলেছেন, ‘সত্যম্ ক্রয়াৎ, প্রিয়ম্ ক্রয়াৎ বা ক্রয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্—এই লৌকিক প্রথা আজ ধর্মজগতেও প্রবেশ করিয়াছে।

কিন্তু মদীয় শ্রীম গুরুপাদপদ্ম বলিতেন যে, সত্য কথা কোনদিন অপ্রিয় হ'তে পারে না। সত্য যাহা, তাহা চিরন্তন সত্য, তাহা নিষ্ঠীকভাবে প্রচার করিয়া যাও, ভগবান্ আছেন, তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে বক্ষা করিবেন।” আমরা দেখেছি, তিনি যখন কোন সম্ভায় বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাঁহার সতীর্থগণ ভয় পেতেন। এই বুদ্ধিগা সত্য পণ্ড হইয়া যায়, এমনিও দেখেছি যে, তাঁহার সতীর্থগণ পিছন থেকে হাত ঘোড় করে—দোহাই আপনার, আস্তে করে বলবেন, কম করে বলবেন, যেন চটে না যায়। আবার এও দেখেছি, তাঁহার সতীর্থগণকে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে, কেননা আজ কিছু নতুন কথা শোনা যাবে। অদ্ভুত তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধি তথা উদ্ভাবনী শক্তি, জলদগন্তীর কাঠোর অথচ সুস্পষ্ট সরল দ্ব্যর্থ-বাঞ্ছিতাশূন্য অর্থপূর্ণ ভাষায় সত্যকথা বলার দৃঢ়তা তদানীন্তনকালে আর কাহারও ছিল না—এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের জন্মার্জিত স্মৃতির বলে আমরা লাভ করিয়াছি সেই সত্যাত্ম-সন্ধ্যানি সত্যনিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে। অজ্ঞানমূলপ্রাণী শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণ জন্ম-শ্রোতে গগণউড়ালিকা-প্রবাহে সত্যবিত্তীন অপসিদ্ধান্তে আত্মবিলুপ্ত ঘটিয়ে পরমার্থ জগত থেকে বিচ্যুত হয়ে আমার রাজ্যে প্রবেশ না করে,—ঈ-বিষয়ে তাঁহার ছিল কি অকুণ্ণ দৃষ্টি। তাই সত্যাত্মী এই মহাপুরুষ দল অপেক্ষা না করে প্রভুপাদের বিচার-দ্বারাকে তথা পারমার্থিক উন্নতির উপর স্তুতীকৃত দৃষ্টি রাখিতেন। তাতে পথ যত কঠোর হোক, বাধা যত তীব্র হোক, বিপদ যত ভয়াবহ হোক, তিনি কোনদিন বিচলিত হননি। তিনি তিনাদ্রি সদৃশ অনড়-অটল থাকিতেন। সত্যাত্মী মহাপুরুষের বিঘ্ন অনেক—একথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না; নিজ-স্বীচরণাশ্রিত জনও সময়ে সময়ে সত্যকথার স্পষ্টবাদিতা সহ্য করিতে না পারিয়া বহু ভাগে অজ্ঞিত আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার অভিশাপ করিলে তিনি তাঁর অচৈতন্য কৃপা-বলে পুনরায় তাঁহাকে স্বীচরণে স্থান দিতেন—ইচ্ছাই তাঁহার মহাপদাশ্রিত।

আমাদের আজ এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, তমিস্র-রজনীতে যিনি আমাদের একটু আলো দেখাবেন, তাঁর আশ্রয় আমরা কদাপিও সাময়িক বুদ্ধির আনুপ্রাণিতঃ বা অযথা অধিক্রিয়কর বৃথা মানাপমান-বোধ জাত অতিমানবশতঃ ভাগ্য করিয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধনে প্রতী হইব না—হইলে আমরা বাহ্য-কার-গৃহে নিমজ্জিত হইব। পরন্তু তাহাতে সেই

মহাপুরুষগণের বিদ্যুৎমাত্রের ক্ষতি হইবে না। আমাদের সকল মনে রাখিতে হইবে যাহারা কদাপিও সাকোপল-কঙ্কিত মতবাদ প্রকাশ করেন না, সত্য চিরন্তন সত্য, নিত্য নবায়মান প্রতিভাত হইলে কালের প্রবাহে কেবল মলিনতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, তাই তখনই প্রয়োজন হয় এ সব মহাপুরুষের আদির্ভাব এবং তখনই ঐ মলিনতা মাথানো সত্যকে স্তম্ভিত করিতে ভারতীয় আৰ্য্য ঋষিগণের নিচাৰ-ধারাকে শুনঃ প্রকাশিত করেন। জগতে এক-একজন আচার্য্য নব-নবায়মান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন মাত্র। আমরা এই সকল বৈশিষ্ট্য মদীয় গুরুপাদগণের মধ্যে বিপুল ভাবে দর্শন করিচ্ছি। 'চক্ষুর দ্বারা ভগবান্ দর্শন হয় না, কান ব্যতীত'—ইহা সেই বৈশিষ্ট্যেরই নিদর্শন।

শ্রীল গুরুপাদের প্রতি তাঁহার যে নিষ্ঠা এবং যেকোন গুরুসেবার আদর্শ তিনি জগতে রাখিয়া গিয়াছেন—নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিগন্ত করে, তাহা পূর্ববর্তী আচাৰ্য্যিকের আদর্শকেও পরাভূত করিয়াছে। তাহা আমরা গুনিয়াছি তাঁহারই সতীর্থগণের শ্রীমুখে এবং দেখিচ্ছি তাঁহার ব্যবহারে আচারে-প্রচারে ও শিক্ষায়। আজ তদীয় শ্রীচরণে এই শিক্ষা, তাঁহার বাদ্য শ্রুতপাদ-নিষ্ঠা, সেই নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ কণা মাত্রও গুরুনিষ্ঠা যেন লাভ করতে পারি। হে শ্রীল গুরু মহারাজ! আপনার আশ্রিত নিজজনগণের শাসন যেন চিরদিন মানিয়া চলতে পারি। শাসন আপাততঃ দৃষ্টিতে চিরকালই কঠোর। কিন্তু শাসিতের মঙ্গল কামনা যেখানে শাসকের অভিপ্রায়, সেই শাসন যত কঠোর, কট বা নির্মম হউক না কেন, তাঁহাকে শুভদৃষ্টিতে গ্রহণ করে আজ্ঞা হওয়ার শাস্ত্রের বিধি। সেই বিধিকে যেন কদাপিও উলঙ্ঘন না করি, ইহাই শ্রীচরণে সাক্ষাত প্রার্থনা।

পারমাখিক জগতের সকল বস্তুই হ্রস্ব আর এজগতে একটী মাত্র বস্তু অমৃত্যু সহজেও স্থূলভ, বিনা পরিশ্রমে অযাচিতভাবে লাভ করা যায়, সেটী হ'ল মায়াদেবীর করুণা। সেই করুণার অরূপ দান গ্রহণ করেন নাই এমন লোকও জগতে বিরল। সেই করুণার হাত হাতে শিক্তি পেতে হ'লে চাই এই মহাপুরুষের রূপ। 'বিনা মহৎ পদরজঃ অভিষেকন্'। তাই আজ এই বাসপুজার প্রধান পূজারীরূপে বর্তমান যিনি মঠাচার্য্য। শ্রীল ভক্তিদেবদাস বামন মহারাজ ও যিনি এই পূজার প্রধান হোতা পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ ও যাহারা এই পূজার যক্ষ্মান অর্থাৎ শ্রীল গুরুপাদগণের আশ্রিত

জনসমূহ সবাই আমাকে কৃপা করুন। ভক্তিহীন আমি, দীনহীন আমি, যাহাতে আগার অর্থা শ্রীল গুরুপাদপদ্মে যথারীতি পৌঁছিতে পারে। বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে গুরুপাদপদ্মের কৃপা তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা অতুল্য।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে এ ৮টি শ্লোক আছে—

তুফা তোয়ে মদনপবনোদ্ধতি মোহোন্নিমালে।

দারাবর্জে তনয় সহজ গ্রাহ সাংখ্যা কুলে চ।

সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতানস্থিধামনু।

পাদাঙ্গোজ বরদ ভবতাং ভক্তি নাবং প্রযচ্ছ ॥

তুফারূপ জলে মদনরূপ হাওয়ার দ্বারা মোহরূপ উদ্ভিত অসংখ্য হাড়র-কুমীররূপ আত্মীয়-স্বজন এমন সংসারাখ্যা সমুদ্রে নিমজ্জিত আনি। হে গৌরসুন্দর, এই মূহুর্তে আমি কিং কর্তব্যবিমূঢ়। অতএব হে প্রাণের ঠাকুর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তিরূপ-নৌকা প্রেরণ কর এবং হে গুরুপাদপদ্ম, তুমি সেই নৌকার কর্ণধাররূপে বিরাজিত হও।

স্বীয় কর্মফলে যদি আমার অধোগতি লাভ হয়, যদি মনুষ্যোত্তর পক্ষী-কীট-কুলে জন্মগ্রহণ করি, যদি শত ক্রিমিকুলেও আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তথাপি, হে কেশব! আমার হৃদয়ে যেন তোমার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি কর্তমান থাকে।

সেই আশ্রয়-কেশব শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বিষয়-কেশব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই উভয় কেশবে আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এই প্রার্থনা জানিয়ে আমি আমার বাসপৃষ্ঠার আরতি সমাপ্ত করছি।

বাঙ্গবল্লভরূপ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ ॥

শ্রীগুরুচরণসেবাভিলাষী—

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রশ্ন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সন্যাসিন্—

শ্রীশ্রীচরণকমলেশু

অসংখ্য দণ্ডবন্দুতিপূরঃসর পাদপদ্মে নিবেদনম্—

মহাত্মন! কলিকৃত জীবের আত্মাত্মিক মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অযাচিত কৃপা যতই কল্যাণ কবিতেছি, ততই আমার ন্যায় সংসার-দুঃখ-জলনিধিময় নানামতগ্রাসব্যাপ্ত নিরাশ্রয় জীবের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে : এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অর্হেতুকী কৃপাপাত্র ভাগাবান্ জনগণের সৌভাগ্যভিষয় যতই নয়ন পথে পতিত হইতেছে ততই চমৎকৃত হইতেছি। প্রভো! শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, যখনই আমার মনে কোন সংশয় উদিত হয়, তখনই শ্রীপত্রিকা (জানিনা কোন্ মহামঙ্গলবলে) আমার মনোভাব অবগত হইয়া সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি নিয়ে কয়েকটি নূতন সংশয় লিপিবদ্ধ করিলাম। আপনারা পরদুঃখদুঃখী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিজজন। আপনাদের চরণে ভিন্ন আর কাহার চরণেই বা মনোদুঃখ নিবেদন করিব? আর কে-ই বা তাহা দূর করিতে সমর্থ? অতএব এ নরাদমকে আপনাদের চরণ-সেবাভিলাষী কিঙ্কর মনে করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক যত সম্ভব সম্ভব প্রশ্ন কয়েকটির সহুত্তরদানে সংশয় ছেদন করতঃ কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীফণিভূষণ বসু

প্রশ্ন—

১। কৃষ্ণভজনেই বিপ্রসাম্যতা, তথাপি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিপ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব বাতীত অন্য কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার কারণ কি? আবার শ্রীল রূপনামদেব ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যখন মাধুকরী ভিন্ন স্কুলভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখনও তাহা বিপ্রগৃহেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। যথা—

“বিপ্রগৃহে স্কুলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।

শুধু রুটী চানাচিবার ভোগ পরিহরি।”

এই লীলাদ্বারা প্রভু জীবকে কি শিক্ষাই বা দান করিলেন ?

২। “কৃষ্ণনামে দীক্ষা-পুরশ্চর্যাদি বিধির অপেক্ষা নাই।” এই বাক্য কেবল তারকব্রহ্ম-নাম সম্বন্ধে না সমস্ত কৃষ্ণনাম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। নামী হইতে অভিন্ন কৃষ্ণনাম সম্ভাবতঃ অসীম শক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং নামাক্রম মন্ত্রের পুনঃ শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুষ্কটচরণের প্রয়োজন কি ? আর শ্রীল সনাতনপ্রভুই বা কৃষ্ণনামের দুই পুরশ্চরণ করাইলেন কেন ? যথা—“কৃষ্ণনাম করাইল দুই পুরশ্চরণ।”

৩। শ্রীরাধিকা সর্বারাধা। সর্বলক্ষ্মীময়ী এবং সর্বকান্তাংশিরোমণি “রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্ললতা। সখীগণ হয় তবে পল্লবপুষ্পপাতা।” শ্রীরাধিকার পাদ-পদ্ম-সেবা তাঁহার কায়বাহুস্বরূপা সর্বসখীগণের মনোহৃতি। সুতরাং শ্রীরাধাপাদপদ্মে তুলসীকে অর্পণ করিতে শ্রীতুলসীর মনোভীতি—পূর্তিরূপ তুলসী-সেবা হয় কি না ?

৪। “ললাটে কেশবঃ ধ্যায়ৎ”—ইত্যাদি তিলক-ধারণ-মন্ত্রে ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি বিষ্ণুর দ্বাদশ মূর্ত্তি ধ্যানের আদেশ দেখা যাইতেছে। আবার “বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং”—বাক্যে কৈশোরবয়সই ধ্যেয় এবং আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ—বাক্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই জীবের একমাত্র আরাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। সুতরাং জিজ্ঞাস্য—(ক) ব্রজেন্দ্রনন্দন বাহার আরাধ্য তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুর অপর দ্বাদশ মূর্ত্তি পৃথক্ ধ্যানের আবশ্যকতা কি ? (খ) একই সাধকের পক্ষে এতগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান কিরূপে বা সম্ভবে ! (গ) বৈকুণ্ঠে স্বীয় ধামে বাহাদের নিত্য অবস্থিতি, সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিগণকে ক্ষুদ্র জীবের ললাটাদি অঙ্গে চিত্রা করিবারই বা তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর

কৃষ্ণভক্তমাত্রের কেন, বিষ্ণুভক্তমাত্রেরও ‘বিপ্র-সাম্যাতা’ বাক্যের দ্বারা বিষ্ণুভক্তকে বিপ্র হইতে নূন বা বাবহারিক বিপ্রের সমান বলিয়া স্থাপন করা হয় নাই। তবে ‘বিপ্র-সাম্য’ শব্দটী এইস্থানে অকল্প্যতী দর্শনল্যাবলম্বনে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিপ্র ও বৈষ্ণবের মধ্যে ‘বিপ্রভট্টী’ সাধারণ ; যেমন পাঁচ ও দশের মধ্যে ‘পাঁচ’—এই সংখ্যাটী পাঁচ ও দশ উভয়েই বর্ত্তমান, তদ্রূপ বৈষ্ণব নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া ‘বিপ্রসাম্য’ শব্দের নির্দেশ, নতুবা শ্রীশ্রীগৌড়ানামী-শাস্ত্রধৃত,—

“ব্রাহ্মণানাং সহশ্রেষ্ঠাঃ সত্রযাজী বিশিষ্ঠ্যতে ।

সত্রযাজিসহশ্রেষ্ঠ্যঃ সৰ্ববেদান্তপারগঃ ॥

সৰ্ববেদান্তবিংকোটা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্ঠ্যতে ॥”

বৈষ্ণবানাং সহশ্রেষ্ঠা একান্তেকো বিশিষ্ঠ্যতে ॥”

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যায়ুত গারুড়বাক্য)

“শ্বপচোহপি মহীশাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ” ॥

(নারদীয় বাক্য)

—প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র-সিদ্ধান্তবাক্যের সহিত সঙ্গতি হয় না। আর যদি, ‘অবৈষ্ণব-বিপ্র’ (?) আর যে কোন কুলে অবতীর্ণ দীক্ষিত বৈষ্ণব সমানই হন, তাহা হইলেও —

“চন্দ্রালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।

হরিভক্তিবিহীনমচ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ।

“দ্বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

পদারবিন্দনিমুখাং শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।

মজ্জে তদপি তমনো বচনে হিতার্থ-

প্রাণং পুণ্যতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥”

(ভাঃ ৭।৯।১০)

“বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাदि-বচনৈয়বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানাংপি বৈষ্ণবানাং শ্রেষ্ঠাং” (দিগদর্শনী)—প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র ও আচার্য্য বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না। তবে ‘বিপ্র’ বা ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দে অপ্রয়োজনীয় কর্মপরতার আদিক ও ‘বৈষ্ণব’ শব্দে প্রয়োজনীয় ভক্তি-মত্তার আদিকা থাকায় অপ্রয়োজনীয় কর্মপরতার স্বল্পতা বৃহদ্রতী-গ্রহত্রত পুরুষন্যায়াবলম্বনে নির্দিষ্ট হইতে পারে। বৈষ্ণব শ্বপচকূলে প্রকটিত হইলেও শ্বপচকূল বৈষ্ণবের কারণ বা জনক নহে; যেমন পূর্বদিকে সূর্য্যের উদয় হয় বলিয়া পূর্বদিক সূর্য্যের কারণ নহে। বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণত্ব ‘স্মৃতিক-ন্যায়ানুসারে নিত্যসিদ্ধ বা পূর্বসিদ্ধ; নতুবা (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

“অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্

যজ্ঞিহ্মাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যাম্

তেপুস্তপস্তু জুহবুঃ সম্মুরাণ

ব্রহ্মানচূর্ম্মাম গৃণতি যে

ভাগবতধৃত এই বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না। ‘ব্রহ্মানুচুঃ’ অর্থাৎ নামকীৰ্ত্তনকারী বৈষ্ণব বহু বহু জন্ম পূর্বেই নিখিল বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন ; এখানে প্রত্যেকটী বিভিন্ন ধাতুর উত্তর লিটের প্রয়োগও তাহা হইলে বার্থ হয়। কারণ পাণিনি বলেন,—(৩২।১।১৫) “পরোক্ষে লিট্।” যদি অবরকুলাবিভূত নামোচ্চারণকারী অব্রাহ্মণই হইলেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপেই বা বহু বহু জন্ম পূর্বেই নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিলেন ? আর যদি যে ভগবন্মায়ের আশ্রয়মাগ্রে মুক্তি হয়, সেই নামের উচ্চারণকারীর কর্মফল-বাধা হইয়া পরবর্তী জন্মে শৌক্রে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ-পূর্বক সাবিত্রা জন্মের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ভাগবতীয় (৩৩৩৬) ও (৩৩৩৭)— এই উভয় শ্লোকের সঙ্গতি কিরূপেই বা হয় ? যে নামোচ্চারণকারী বহু বহু জন্ম পূর্বেই সমস্ত ব্রাহ্মণাদিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নাম-উচ্চারণকারীর পুনরায় ব্রাহ্মণাদিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য শৌক্রে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত পিষ্ট-পেষণ-ন্যায় অর্থোক্তিক এবং শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপক ॥ অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, দীক্ষাপাভের পূর্বে নামশ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্মরণকারী শিষ্টাচারভাব-হেতু সাবিত্রা-জন্ম নাই ; এইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্রাজন্মান্তরাপেক্ষা আছে অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পারমার্থিক বিপ্রের বিপ্রত্বের বিনির্দেশ বা লিঙ্গ, উপনয়ন-সংস্কারাদি শিষ্টাচার সম্মত ; ইহাই শ্রীহরিক্রিবিলাস টীকায়, শ্রীভাগবতমৃত-টীকায়, ব্রহ্মসংহিতায় টীকায়, রসামৃতসিন্ধু-টীকায় শ্রীল সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অতি স্পষ্ট ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ভাগবতীয় শ্লোক-দ্বয়ের (ভাঃ ৩৩৩৬) ও (৩৩৩৭) সঙ্গতি, বাবতীয় সাত্ত্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও গোস্বামি-সিদ্ধান্তের সঙ্গতি, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব সর্ব বিষয়েই সঙ্গতি সাধিত হয়। অতএব ‘বিপ্রসাম্য’ শব্দের দ্বারা ব্যবহারিক বিপ্রত্ব ও বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের ‘পারমার্থিক বিপ্রত্ব’ সম্বন্ধ-বুদ্ধিরূপা অপরাধময়ী সামান্যবুদ্ধি হইতেই দিগ্‌দর্শনকার গোস্বামিবর্গ্য প্রভূপাদ সকলকে রক্ষা করিয়াছেন কারণ তিনি ‘(যে কোন কুলোদ্ভূত)’ নৃমাত্রেয়ই বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে বিপ্রত্ব সাধিক হয়—ইহা যথা কাঞ্চনতাং যাতি’ শ্লোকের ‘বিজত্ব’ টীকায় স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা টীকা—

নৃণাং সর্ববানামেব দ্বিজত্বং ‘বিপ্রত্বা’।

তবে যে শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈধ-সন্ন্যাসীর আচারলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুইটী উদ্দেশ্য আছে।

একটি উদ্দেশ্য বিমুখমোহন আর একটি উদ্দেশ্য—উন্মুখতোষণ। উন্মুখগণ জানেন, শ্রীমদ্রূপাশ্রমের ব্যবহারিক বিপ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—“নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া” (চৈঃ চঃ ম চাঃ ৪৯)। মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনি অবৈষ্ণব মাত্রেয়ই হস্তপাচিত অন্নকে ‘কুক্কর-মাংস-তুলা’ পরিহ্যাজ্য জানিতে বলিয়াছেন, যথা—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৯)

“অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।

অনপিতং তথা বিক্ষৌ স্বমাংশসদৃশং ভবেৎ ॥”

অন্যত্র—বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যাম্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পরিবর্জ্যামেধ্যবৎ ॥”

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

৩

শ্রীগৌরভক্ত্যনু-মহোৎসব

আচার্যভাস্কর নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রবর্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকহৃন্দের উদ্যোগে ও বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় যথারীতি উদযাপিত হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবন-মঙ্গলময়ী স্তোত্রাবির্ভাব তিথিকে আহ্বান জানাইবার জন্ত সমিতির সদস্যবর্গ সপ্তাহব্যাপী নবধাভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার দ্বারা নবধাভক্তি-যাজনের উদ্দেশ্যেই এই মহা-মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

উক্ত মহামহোৎসব বিগত ২৪ গোবিন্দ, ৫ই চৈত্র, ১৯ মার্চ রবিবার হইতে ২৮ গোবিন্দ, ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হয়।

অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা এই বৎসর বহু অস্বাধিক ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার জন্ত নাট্য-মন্দিরে এক সভার আয়োজন এবং পরিক্রমার সম্বল প্রদান করা হয়। সভাপতির আসনে বসে হন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দাস্ত বামন মহারাজ। সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দাস্ত নারায়ণ মহারাজ এই পরিক্রমা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ সুন্দরভাবে বক্তৃতা-মাধ্যমে পরিক্রমা সম্পর্কে জ্ঞাত করান। আহ্বান-সভায় শ্রী শ্রী আচার্য্য মহারাজ পরিক্রমার ইতিবৃত্ত এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়বে বর্ণনা করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দকে এই পরিক্রমায় যোগদানের জন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ পরিক্রমাস্থগী অনুযায়ী ৫ই চৈত্র রবিবার হইতে ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীগৌড়মহীপ (কীর্তনাখ্য), শ্রীমধ্যমহীপ (স্মরণাখ্য), শ্রীকোলমহীপ (পাদসেবনাখ্য), শ্রীখড়মহীপ (অর্চনাখ্য), শ্রীজহ্নুমহীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদক্রমমহীপ (দাস্তাখ্য), শ্রীকুজমহীপ (সখ্যাখ্য), শ্রীসীমন্তমহীপ (শ্রবণাখ্য) এবং অন্তর্মহীপ (আত্ম-নিবেদনাখ্য) প্রভৃতি পরিক্রমা করেন।

উক্ত পরিক্রমাগুলি পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণের সহযোগিতায় সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীধামের বিভিন্নস্থান পরিক্রমাষ্ট্রে প্রতিদिवস সন্ধ্যায় নাট্য-মন্দিরে ধর্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। বিভিন্ন দিনে সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দাস্ত বামন মহারাজ। খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌরবাণী শিনোদ আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দন মহারাজ ও আসামস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাক্ষ-গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দাস্ত পরিব্রাজক মহারাজ।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীল জনার্দন মহারাজ ও শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বিভিন্ন দিনের পরিক্রমাকালে বিভিন্ন স্থানের মহিমা কীর্তন ও ব্যাখ্যা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। তদুপরি অন্যান্য বৈষ্ণবগণও প্রাণবন্ত ভাষণদ্বারা উপস্থিত সজ্জনগুলীর হৃদয় আকর্ষণ করেন।

৯ই চৈত্র (ইং ২২/৩/৭৮) বুধবার পরিক্রমার এক অভিনয় যাত্রা বলিয়া মনে হ'ল। শ্রীগৌর-জন্মশীলারস্থলীর পরিক্রমা-দিবস ছিল এই দিন।

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে যাত্রীগণ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বহির্গত হইয়া বিরাট শোভাযাত্রাসহকারে যখন সুবধূনী-তীরে উপনীত হইয়া স্রোতস্বিনী অতিক্রান্তান্তে অন্তধীপ শ্রীমায়াপুর অভিমুখে এগুতে থাকেন তখন মনে হইতে-ছিল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রবল জন-স্রোতের এক বিরাট প্লাবন। এই প্লাবন দর্শনে মনে হইয়াছিল যে, বিংশশতাব্দির বিপ্লবের যুগে—ইহা ধর্ম-বিপ্লবের অভিনব নিদর্শন।

পরিক্রমা-সভ্য প্রথমে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ ও তৎপর শ্রীগোড়ীয় সঙ্ঘের শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মন্দির এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের (ISKCON) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন। পাশ্চাত্যের প্রচুর ভক্তবৃন্দ আমাদের পরিক্রমা সঙ্ঘের শ্রীবিজয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর তথা ত্রিদণ্ডীপাদগণ ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দকে প্রচুর মালাদ্বারা ভূষিত করিয়া সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করেন। তখন আমাদের পরিক্রমা-সভ্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই যে প্রবেশের দৃশ্য তাহা হৃদয়কে এক উবেলীত আনন্দ দান করিতেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের-মিলন মুহূর্ত্তে উদ্ভূত নৃত্য-কীর্ত্তন মুখরিত করিতেছিল আকাশ-বাতাস। সেই দৃশ্যাবলী আজও স্মৃতিপটে জাগরিত হয় আর মনে করিয়ে দেয় জগদগুরু-লীলাভিনয়কারী পরম কারুণিক প্রেমের ঠাকুর গোরার কথা,—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।”
বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তাধারার যে-প্রেমের বিপ্লব, তাহা রূপায়িত হইয়াছে—হইতেছে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধার শ্রেষ্ঠ-উৎসস্থান এই ভারতভূমি। ভারত বিশ্বের কাছে এই দিগ্‌দর্শনে চির নমস্। কিন্তু আমাদের দুর্দ্দেব—সেই চিন্তাধারার কথা আজ আমরা ভুলতে বসিয়াছি—অন্তের পদলেহী হইতে লজ্জা বোধ করিতেছি না—পরন্তু ভারতীয় চিন্তাধারাকে লাঞ্ছিত করিতে কখন কখন কুণ্ঠাবোধও হইতেছে না। বর্তমান বিপ্লবের যুগে গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণও ধর্মজগতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে শ্রীসারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশ্বের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-দর্শনের যে প্লাবন আনিয়াছে—এমনটী ধর্মবিপ্লব পূর্বে কেহই আনিতে পারেন নাই। আধ্যাত্মিকবাদের চরম উৎকর্ষতাই গোড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য। মহামিলনের পূর্ণক্ষেত্র ভারত তজ্জন্য গর্ভিত।

এস্থান হইতে পরিক্রমাপাটী শ্রীবাস-অদ্বৈত-অঙ্গন হইয়া বৈষ্ণবজগতের যুগান্তর আনয়নকারী চিদ্বিলাস আচার্যভাস্কর জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধিপীঠে উপনীত হন। এখানে তাঁহারই নিজজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণীর প্রতিক বাগ্মী-প্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ উপনীত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ পরম ভূপ্তি লাভ করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবনচরিত ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের অবদান-বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে ভাষণ দান করার জন্য নিবেদন করেন।

তখন শ্রীল বন মহারাজ কৃপাপূর্বক সংক্ষেপত শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বৈশিষ্ট্য, জগদ্বাসীর প্রতি প্রভুপাদের অকুতিম দয়াল নিদর্শন এবং শ্রীগৌড়ীয়ধারায় নিঃসৃত গৌড়ীয়মঠের আগার-প্রচারের বিশেষত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করতঃ শুভবুদ্ধিকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করেন। পরে এস্থান হইতে শ্রীচৈতন্য মঠ, কাজির সমাধি প্রভৃতি পরিক্রমান্তে শ্রীযোগপীঠ প্রত্যাবর্তন করেন। এইস্থানে পরিক্রমা পাটীর মধ্যাহ্নের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় দ্বাদশ সহস্রাধিক লোক প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। এরপর আমাদের পরিক্রমা-সঙ্গ্য শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ অভিমুখে রওনা হন।

১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ শ্রী শ্রীগৌর-জন্মোৎসব দিবস। সমস্ত দিন পাঠ কীর্তন-মাধ্যমে দিন অতিবাহিত হয় এবং সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলা ও শিক্ষা-সহক্রে যে অনুষ্ঠান হয়—তাঁহা যেন ছিল বৈষ্ণবগণের প্রাণবন্ত অভিব্যক্তির নিদর্শন।

পরের দিন ১১ চৈত্র শনিবার সাধারণ মহোৎসবের দিন। সকাল থেকেই সারাদিন ধরে আগত সকল জনগণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবের সেবা-স্মৃতি যদিও এক সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত ছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় প্রায় একাদশদিনব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং এই উৎসবে সর্বমোট লক্ষ্যাধিক মানুষ প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

—কুমারী অর্পণা গুপ্ত

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিঃধোক্ষজে ।



ধর্মঃ স্বভূষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথ্যত্ব যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

অহৈতুকাপ্রতিহতা যযাত্তা সুপ্রদীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরদহ ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০০ বর্ষ

কারণোদশায়ী, ২৪ ত্রিবিক্রম, ৪৯২ গোবিন্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ; ইং ১৫।৬।১৯৭৮

৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্
[লীলাশুক-শ্রীল-বিষ্ণুমঙ্গল-ঠাকুর-বিরচিতম্]

জিহ্বে রসজ্জৈ মধুরপ্রিয়া ত্বং

সতাং হিতং ত্বাং পরমং বদামি ।

আবর্ণয়েথা মধুরাক্ষরানি

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪০॥

হে রসিকে জিহ্বে ! মধুর রসকে তুমি অধিক ভালবাস, সেজন্তু তোমায়
পরম মল্লময়ী সত্য কথা বলিতেছি যে, “হে গোবিন্দ ! হে দামোদর !
হে মাধব !” এই সুমধুর নামসমূহ সম্যাকরূপে কীর্তন কর ॥৪০॥

আত্যাশ্চিকব্যাধিহরং জনানাং

চিকিৎসকং বেদবিদে বদন্তি ।

সংসার তাপত্রয় নাশবীজং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪১॥

“গোবিন্দ—দামোদর—মাধব” এই শ্রীভগবানের নামাবলী মানবের আত্যাশ্চিক ব্যাধিহরণকারী ও সংসারে আধ্যাত্মিক, আর্তিদৈবিক ও আর্তি-ভৌতিক—ত্রিতাপনাশের একমাত্র মূল বীজস্বরূপ ॥৪১॥

তাতাজ্জয়া গচ্ছতি রামচন্দ্রে

সলক্ষ্মণেহরণ্যচয়ে সমীতে ।

চক্রন্দ রামস্তা নিজা জনিত্রী

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪২॥

পিতৃ-অজ্ঞা পালনহেতু ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাদেবীর সহিত শ্রীরাম-চন্দ্র বনগমনে উদ্যত হইলে মাতা কৌশল্যা দেবী “হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥৪২॥

একাকিনী দণ্ডক-কাননাস্থাং

সী নীয়মানা দশকন্ধরেণ ।

সীতা তদাক্রন্দদনন্তনাথ্য

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৩॥

সীতাদেবীকে দণ্ডককাননে একাকিনী দেখিয়া যখন দশানন রাবণ তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জনকদুহিতা অনন্য-শরণা হইয়া “হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !” নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

রামাদ্বিযুক্তা জনকাত্মজা সী

বিচিন্তয়ন্তী হৃদি রামরূপম্ !

রুরোদ সীতা রঘুনাথ পাহি

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৪॥

লঙ্কাতিমুখে গমনকালে শ্রীরাম-বিরহবাথিতা সীতাদেবী হৃদয়মধ্যে রামরূপ ধ্যান করতঃ “হে রঘুনাথ ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !” আমাকে রক্ষা কর বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন ॥৪৪॥

প্রসীদ বিষ্ণো রঘুবংশনাথ

সুরাসুরাণাং সুখদুঃখহেতো ।

রুরোদ সীতা তু সমুদ্রমধ্যে

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৫॥

যখন সমুদ্র মধ্য দিয়া রাবণের সঙ্গে সীতাদেবী অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন “হে বিষ্ণো ! হে রঘুপতে ! হে সুরাসুরের সুখ-দুঃখবিধাতা ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! আমাকে রক্ষা কর !” এই বলিয়া তিনি রোদন করিতেছিলেন ॥৪৫॥

অন্তর্জলে গ্রাহগৃহীতপাদো

বিস্ফুটবিক্রিষ্টসমস্তবন্ধু ।

তদা গজেন্দ্রো নিতরাং জগাদ

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৬॥

যখন জল মধ্যে গ্রাহ (কুস্তীর) কর্তৃক গজেন্দ্রের পাদদ্বয় আক্রান্ত হইল, তখন বন্ধু-বান্ধববিহীন সাতিশয় ক্রিষ্ট করীন্দ্র “হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব ! বলিয়া সর্বক্ষণ সকাতির আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

হংসধ্বজং শঙ্খযুতো দদর্শ

পুত্রং কটাহে প্রতপন্তুমেনম্ ।

পুণ্যানি নামানি হরের্জপন্তুং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৭॥

নৃপতি শঙ্খধ্বজ দেখিতে পাইলেন,—তাহার পুত্র হংসধ্বজ উত্তম তৈল পাत्रে নিপতিত হইয়া “গোবিন্দ—দামোদর—মাধব”—শ্রীহরির এই পবিত্র নাম মন্দ-মন্দ স্বরে জপ করিতেছেন ॥৪৭॥

দুর্ব্বাসসো বাক্যমুপেত্য কৃষ্ণা

স্যা চাত্রবীং কাননবাসিনীশম্ ।

অন্তুঃ প্রবিষ্টং মনসাজুহাব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৮॥

একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণসহ কাননবাসিনী কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদীর কুটিরে পদার্পণ করতঃ আহার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনাঙ্গে

আহার্যা নিঃশেষ হওয়ায় আতিথা সংকাবের নিমিত্ত অস্বর্ধ্যামী বিপদভঞ্জন
মধুসূদনকে “হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !” বলিয়া কাতরস্বরে
আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ধ্যেয়ঃ সদা যোগিভিরপ্রমেষঃ

চিস্তাহরশ্চিস্তিতপারিজাতঃ ।

কন্তুরিকাকল্পিত নীলবর্ণো

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৯॥

যিনি যোগিগণের অপরিজ্ঞেয়, সর্বচিস্তাহরণকারী, কল্পরূক্ষসদৃশ ও যিনি
কন্তুরিকার ন্যায় নীলকান্তিবিশিষ্ট, তাঁহাকে “গোবিন্দ—দামোদর—মাধব”
নামে সর্বদা ধ্যান করা কর্তব্য ॥৪৯॥ (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতি

স্মৃতিশাস্ত্র—বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবেভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে

বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণের বিচার

ধর্ম্মশাস্ত্রের যে-সকল বিধি অবলম্বন করিয়া জীবদ্দশায় ব্যবহারিক কার্য্য
নির্ব্বাহ হয়, সেই বিধি সম্বলিত শাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র বলে। ভক্তভক্ত-ভেদে
স্মৃতিশাস্ত্রও দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ না করিয়া জড়জ্ঞানে সামাজিক
শৃঙ্খলতা রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণ ইতর-স্মৃতি-বিধিগুলিকে বহু-
মাননপূর্ব্বক হরিবিমুখ সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সেই হরিবিমুখ সমাজের
মধ্যে যাহারা ভগবদ্ব্যনুগ, তাহারা কেবলমাত্র অভক্ত স্মার্ত্তের উপদেশ ও
বিধিগুলি পালন করেন না। ভগবদ্ব্যনুগ-বতীস্মৃৎ সমাজ সংখ্যায় প্রচুর
হইলেও ভগবদ্ব্যনুগ সমাজের উপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়
না। ইতর স্মার্ত্তগণ বলেন, ভগবদ্ব্যনুগের আদর না করিয়া শাস্ত্রীয় প্রাণহীন
বিধিগুলিকে পালন করিলেই সংকল্পী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা যাইতে পারে,
কিন্তু পারমার্থিকগণ তাহাদের সত্তিত একমত হইতে পারেন না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ একই শাস্ত্র হইতে ক্রটিক্রমে আচারগত পার্থক্য লক্ষিত
হয়। শ্রীরঘুনন্দনাদি ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণ তাহাদের নিজ-প্রণীত নিবন্ধ-
গুলিতে বৈষ্ণবগণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবার পারমাণ্বিক স্মার্ত্ত শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে অবৈষ্ণবপন্থ-স্মৃতি-বচন 'বৈষ্ণবের পালনীয় নহে'—এরূপ গীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভগবদ্বিমুখতাহেতু অবৈষ্ণব-স্মৃতির প্রাবল্য

ভগবদ্বিমুখতার স্রোত সমাজে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায় বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর অনেকস্থলেই লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব-স্মৃতির সমাদর সর্বত্র না থাকায়, সমাজে উহার উপযোগিতা থাকিতে পারে না—এরূপ বিচার নির্বোধ সমাজেই শোভা পায়। মানব যে-কালে আপনাদিগকে ভগবদ্বিমুখ ও অবৈষ্ণব মনে করেন, সেইকালেই তাঁহার বহিষ্কৃত সমাজে অবস্থানের দৃঢ় প্রতীতি হয়। তিনি মনে করেন, বৈষ্ণবের স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নার হস্ত হইতে তাঁহার রক্ষার আর উপায় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট গৃহীতমন্ত্ৰ হইয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির পদাবলেহন—পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহার কৌলিক পদ্ধতি। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরূপ-বিস্মৃতির ফল মাত্র।

দীক্ষিত বৈষ্ণবের বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুসন্ধান

দীক্ষিত-বৈষ্ণব যখন দেখিবেন যে, অদীক্ষিত হরিবিমুখ-সমাজে আচার-বাবহার তাঁহার পরমার্থবিরোধী এবং পরমার্থের অনুরোধে বাবহারিক জীবনকেও কলুষানুয করা আবশ্যিক, তখন তাঁহার বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুসন্ধান আবশ্য হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত না তিনি পরমার্থে অগ্রসর হন, তৎকালাবধি তাঁহার ইতর-স্মৃতির অনুগমন 'বশ্ব' বলিয়া প্রতিভাত হইবে; কিন্তু আচার্য্যের অনুগমনে বন্ধপরিষ্কর হইলে সমাজের হিতৈষিগণ বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর করিতে শিখিবেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারিগণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের

অনাদর করায় দুঃখ-প্রকাশ

হায়, কি দুঃখের বিষয়, শ্রীমদ্রূপ প্রভুর আদিষ্ট শ্রীমদাতন গোস্থামি-লিপিত স্মৃতিশাস্ত্রের আদর আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারী সমাজে নাই! বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা কুলাজ্ঞাবের কার্য্য করিবার জন্ত বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলন উৎসাদন করিয়াছি। যাহারা বৈষ্ণব-স্মৃতির পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন, তাহাদিগকে শত্রুজ্ঞান করিতেছি!

গোপাল ভট্টের সংক্রিয়ামার-দীপিকার প্রাচীনতা ও

শ্রীঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কর্তৃক উহার প্রচার

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্থামি-নির্ম্মিত বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বনে যে 'সংক্রিয়া-মার-দীপিকা'-গ্রন্থ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শতবর্ষ পূর্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে

সংরক্ষিত ছিল, তাহা এতদিন আচার্যের অভাবে বৈষ্ণবকুলের মধ্যে বন্ধ-মঞ্জুষায় অজ্ঞাত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমদ্বক্তাবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বৈষ্ণবজগতে উহা প্রচার করিয়া শুদ্ধভক্তগণের যে অভাব দূর করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণব-সমাজ নিজ নির্মলতা রক্ষা করিবার জন্ত উহাই নিষ্কির্বাদে প্রচলন করাইয়া লইতে পারেন।

শ্রীগৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণকে শুদ্ধবর্ণাশ্রমে থাকিয়া শ্রীনাম গ্রহণোপদেশ

যে-সময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চ প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চরম দুর্ববস্থার কাল। তিনি পরমার্থ ও চরিনাম প্রবর্তন করাইয়াছিলেন বলিয়া তাৎকালিক হরিনাম-বিরোধী সমাজ তাঁহার প্রতি-কুলাচরণ করিতেও বিরত হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ ও গৌরভক্তের ভক্তগণ বর্তমান কালে বর্ণাশ্রমে সূচুঁভাবে অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন।

স্মার্ত্ত-সমাজের হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইলেই বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলন হইবে

সমাজের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত হরিবৈমুখ্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে অনর্থ জনিত হরিবিমুখ-প্রবৃত্তিক্রমে জীব ভেদে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। যদি সামাজিক প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইয়া হরিসেবন-প্রবৃত্তিমুখে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম বহুলভাবে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর আমরা অচিরেই দর্শন করিয়া প্রোৎসুহিত হইব।

মুখে হরিভক্ত, অন্তরে স্মার্ত্ত হইলে নিক্যালীক বৈষ্ণব হইতে পারা যায় না

মুখে হরিভক্ত আর প্রত্যেক কার্যে হরিবিমুখ ভাব পোষণ ও অন্তরের সহিত ইতর-স্মৃতির আদর করিতে গেলে আমরা নিম্নপটে বৈষ্ণবদাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না। নিক্যালীক না হইলে ভগবানের দয়া পাওয়া যাইবে না এবং শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বর্ণাশ্রমাতীত শুদ্ধ পারমহংস বৈষ্ণবধর্ম, অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-প্রতীতির মধ্যে কখনই সাধিত হইবার নহে—একথা বিজ্ঞকুলের বিবেচ্য বিষয়।

অন্তর ও বাহিরে সম-ব্যবহার

“অন্তর-নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার” এই বাক্যটির অর্থ করিয়া অন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম অন্তরে পোষণ করিতে হইবে, একপন্থ নহে। তাঁহারা নিকপটে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্ত শ্রীহরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপাদ একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

লৌকিকৌ বৈদিকৌ বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে যুনে।

হরিসেবানুকুলৈব সা কার্য্য ভক্তিমিচ্ছতা ॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

ভক্তির অনুকূল জীবন যাত্রা যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা হৈ লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় ক্রিয়াবলী নিজ নিজ হরিসেবার অনুকূলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা যে ব্যবহার লোকে স্থাপন করিবেন, উহা বৈষ্ণবের অন্তরনিষ্ঠার সহিত বিরোধী হওয়া উচিত নহে।

জাতি গোশ্রামী ও তদধীন শিষ্য-সমাজ শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্মের অপ্রতিষ্ঠিত-হেতু বৈষ্ণবনিষ্ঠাহীন

যদি আজ আমরা গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্য ও তদধীন সমাজকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্ত-নামধারীর অন্তর-নিষ্ঠায় গোলযোগ উপস্থিত হইত না। আজ বহির্মুখ সমাজের ব্যবহার দেখিয়া অন্তর-নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগণ পরম দুঃখে বাহ্য লোক-ব্যবহারের দৌরাভ্যের কথা লোক-সমাজে জ্ঞাপন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন। যদি তাহা হইলে লোকব্যবহার ভজনকারী সমাজের অনুকূল হইত —একপন্থ সন্দেহবিশিষ্ট হইতেন না। সুদূরে নিষ্ঠা না থাকিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠার অভাব হইলেই লোক-ব্যবহারের বাহ্য হেয় দর্শন জীবকে ক্রয়নিষ্ঠ হইতে দেয় না।

নামধারী-আচার্য্যগণ-কর্তৃক শাস্ত্রের কদর্থহেতু ভক্তিপথে কণ্টকারোপণ

মহাভারতে দুর্যোধনোক্ত “যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কৰোমি”—এই শ্লোকের দোহাই দিয়া কত না পাপকার্য্যে অভক্ত জীবগণ অগ্রসর হইতেছেন। “অপি চেৎ সুহৃদাচারঃ”—শ্লোকের দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-নামধারী কত শত ব্যক্তি দুরন্ত নরক-পথে দিসাহারা হইতেছেন। “যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ”—শ্লোকের তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া আমাদের ন্যায় নামধারী আচার্য্যগণ ভগবদ্ভক্তির পথে কণ্টকারোপণ করিতেছেন, যেহেতু বাহ্যে সাধারণ লোকের

মধ্যে অসম্ভাবহার প্রচলিত আছে বলিয়া আপনাকে অন্তরনিষ্ঠ বলিয়া কপটতা-সহকারে পরিচয় দিতে গিয়া কতই না পরমার্থের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন !

রাগানুগা ভক্তির নামে বিশৃঙ্খলতা

রাগানুগা ভক্তির নামে বিশৃঙ্খলতাই বাহ্য লোকাচারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাই পালনীয় জানিয়া বাহিচারী সম্প্রদায় নিজ নিজ অন্তরনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন । বৈষ্ণব-সামাজিকগণ এই সকল কথা ধীরভাবে আলোচনা করতঃ বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমনে ভক্তিপথে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের সুবিনয় নিবেদন ।

আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কোন কলাগলাভ ঘটবে না । দেহ ও মনের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহারা আমাদের সুবিনীত বাক্যগুলি পর্যালোচনা করুন ।

— শ্রীল প্রভুপাদ

(২) প্রয়াস

‘প্রয়াস’ কাহাকে বলে এবং তাহা দ্বিবিধ

‘প্রয়াস’ পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না । ‘প্রয়াস’ শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায় । ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই ‘পরমার্থ’ বলা যায় না । ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণদ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না । শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাব-সিদ্ধ নিত্যধর্ম । অতএব ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজ-ধর্ম । সহজ-ধর্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই । তথাপি জীবের বদ্ধদশার ভক্তি-বৃত্তির আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে প্রয়াসের কার্য আছে । সেই সামান্ত প্রয়াস ব্যতীত আর যত-প্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে-সকলই ভক্তির প্রতিকূল । প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান-প্রয়াস ও কর্ম-প্রয়াস । জ্ঞান-প্রয়াসে কেবলান্বৈত-বোধরূপ ফলোদয় হয় । তাহাই আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্মনির্ঝাণ-শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে ।

জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তিবিরোধী

জ্ঞান-প্রয়াস পরমার্থের বিরোধী— ইহা বেদশাস্ত্রে, মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিচারিত হইয়াছে:—

নাশমাস্ত্রা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বণুতে তেন লভ্যন্তশ্চৈষ আস্মা বিরণুতে তনুং স্বাম ॥

(মুণ্ডক-৩।২।৩)

অস্মা—আম্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা । তাহা প্রবচন, মেধা ও অধ্যয়ন-প্রয়াসে পাওয়া যায় না । যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আস্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন ; সুতরাং ভক্তিই ভগবচ্চরণ-লাভের একমাত্র হেতু । ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিলেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্তু নমস্ত এব

জীবন্তি সনুখরিতাং ভবদীয়-বার্তাম ।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-

র্ষে প্রায়শোহজিত জিতোহপাসি তৈস্ত্রিলোক্যাম ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

হে অজিত ! যাহারা জ্ঞান-মার্গে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক সাধু মুখ হইতে আপনার কথা শ্রুতিগত করতঃ কাষ-মনোবাক্যে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন ।

কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াস নিষ্ফল

জ্ঞান-প্রয়াসকে স্পষ্টীকরণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন,—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদয়া তে বিভো

ক্লিশান্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্ণুতে

নান্যদৃ যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো ! ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ-পথ ; তাহা ত্যাগ করতঃ যে-সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈত-বোধ-লাভের জন্ত চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছুই লাভ হয় না । তুষাবঘাতে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াসে কিছুমাত্র পরমার্থ-ফল হয় না ।

সম্বন্ধ-জ্ঞান—পবিত্র, উহা অদ্বৈত জ্ঞান নহে

কেবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয় ; তাহা কেবল আত্মর-বিধান মাত্র । তবে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, সে-জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ ; তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই । ‘চতুঃশ্লোকী’তে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্তা-শূন্য-ভেদ-জ্ঞান । সে-জ্ঞান স্বভাবতঃ জীব-জন্মে

নিহিত আছে। ভগবান্—চিন্ময় স্বৰ্ণ-কল্প; জীব—তাহার কিংশ-পরম-পু-
কল্প। জীব ভগবদানুগতা ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না। সুতরাং
ভগবদানুগতা তাহার স্বৰ্ণ। সেই স্বৰ্ণানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই জীবের
সহজ-স্বৰ্ণ।

ভক্তিসাধন—কৰ্ম-জ্ঞানের জ্ঞান প্রয়াস নহে

যদিও বদ্ধদশায় সেই স্বৰ্ণ সুপ্তপ্রায় এবং সাধনদ্বারা প্রতিবোধিত হয়,
তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কৰ্মকাণ্ডের প্রয়াসের জ্ঞান ভক্তি-সাধনে প্রয়াস নাই।
কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্পকালের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন-প্রতিবন্ধক
দূর হয় এবং স্বৰ্ণ-স্বথ পুনরুদিত হয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রয়াসকে স্থান দিলে
ক্লেশ-ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভক্তি-চেষ্টা হয়।

জ্ঞান-প্রয়াসের গতি

শ্রীগীতার ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো য়ে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরমোপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে হৃৎকরমনির্দেশ্যমব্যাক্তং পৰ্য্যাপাসতে ।

সৰ্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

সংনিয়মোদ্ভিষ্যগ্রামং সৰ্বত্রপমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ॥

অব্যক্তা হি গতির্হুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥ (গী: ১২।২-৫)

কেবল শরণাপত্তি-লক্ষণ। পরা শ্রদ্ধার সহিত বাহারা আমার উপাসনা
করেন, তাহারা যুক্ততম। বাহারা অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সৰ্বত্রগ,
অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক সৰ্বত্র সমবুদ্ধির
সহিত উপাসনা করেন, তাহারা জ্ঞান-প্রয়াসী। সুতরাং যদি তাহাদের
সৰ্বভূতে দয়া থাকে সেই জ্ঞানে অনেক ক্লেশের পর সাধু-ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ
আমাকে পান। সেক্ষেপে ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব। জ্ঞান-প্রয়াসের
ত' এইরূপ গতি !

কৰ্ম-প্রয়াসের ফল

কৰ্ম-প্রয়াসেও কদাচ মঙ্গল হয় না। যথা, ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—

ধৰ্ম্মঃ স্বসৃষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বক্বেদন-কথাস্থ যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভা: ২।৮)

ধর্ম—বর্ণাশ্রমগত কর্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম। সেই স্বধর্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও হরিকথায় রতীলাভ না করিলেন, তবে তাঁহার স্বধর্ম-পালন কেবল প্রয়াস বা শ্রমমাত্র হইল। সুতরাং যেকোন জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তির বিরোধক, কর্ম-প্রয়াসও তদ্রূপ।

ভক্তির অনুকূল কর্ম—প্রয়াস নহে

সিদ্ধান্ত এই যে,—কর্ম ও জ্ঞান-প্রয়াস অতিশয় অহিতকর। কিন্তু জীবন-যাত্রা সুন্দররূপে নির্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে, কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয়। সে-সকল কর্ম আর ‘কর্ম’ বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ-ভক্তগণ কর্ম ও কর্মকলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্যাচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ভ্যাগ করিয়া ভক্তানুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।

ভক্তির অনুকূল জ্ঞান ও যোগ—প্রয়াস নহে

জ্ঞান-প্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য-নির্ব্বাণ-মুক্তির-প্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অক্টাঙ্গ যোগ-প্রয়াস যদি বিভূতি কৈবলাকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক-বিধি এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবের পক্ষে অশাস্ত্র সহজ বলিয়া ‘প্রয়াস-শূন্য’ আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কর্ম, জ্ঞান উপায়স্বরূপে আদৃতমাত্র। উপেষ-স্বরূপে গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয়—ইহা নিয়মাগ্রহ বিচারে দেখাইব।

সাধুসঙ্গ-লালসায় তীর্থযাত্রা, ভক্ত্যঙ্গ ব্রতপালন, বৈষ্ণবসেবা,

অর্চন, কীর্ত্তনাদি প্রয়াস নহে

তীর্থ-যাত্রাদি পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গের ও কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলন-লালসায় কৃষ্ণ-লীলা-স্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তিই বাটে—বৃথা-প্রয়াস নয়। ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা-প্রয়াস নয়—ভক্তি-সাধিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছে বৈষ্ণব-সেবার যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয়; কেননা, স্বযুথ-সঙ্গ-লালসাই জনসঙ্গ-লিপ্সারূপ দোষের বিনাশক। অর্চনাঙ্গ-প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপ সহজ-ধর্ম। সঙ্কীর্ণনাদির প্রয়াস কেবল হৃদয় উদ্ব্যটনপূর্ব্বক প্রচুর নামোচ্চারণ, সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজ-বস্তু।

বৈরাগ্য-প্রয়াস অনাবশ্যক

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই; কেন না, ভক্তির উদয়ে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।

জনয়ত্যাত্ত্ব বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ । (ভাঃ ৩।৩২।২৩)

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তাহা বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রয়াসশূন্য বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদাস্ত-বুদ্ধ্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে । সুতরাং জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আদিয়া ভীতকে অধঃপাতিত করে না ।

ভক্তির প্রয়াস-শূন্যত্ব

অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত “ভক্তিঃ পরেশাত্মভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈব ত্রিক এককালঃ” (ভাঃ ১।১।৪২)—এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধ-ভক্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ’ন, তাহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং অশূন্য বিরক্তির উদয় হয় । দীনভাবে যখন ভক্ত সরলতার দগ্ধিত কৃষ্ণনাম-কীর্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই—‘আমি চিংকণ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু এবং কৃষ্ণচরণে শরণাগতিই আমার নিত্যস্থাবর; এজগৎ আমার পান্থনিবাসমাত্র, ইহার কোন বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য সুখকর নয়’,—এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির উদয় হয় । ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে ।

বিবিধ প্রয়াস-তালিকা, তন্মধ্যে প্রনিষ্ঠা-প্রয়াস

সর্বাপেক্ষা হীন

জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ-সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব । এইসকল প্রয়াস-দ্বারা ভজন নষ্ট হয় । আবার প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস, সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয় । হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে । তাহাও সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । অতএব শ্রীমদাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সর্বত্যাগেহপ্যাহেয়ায়াঃ সর্বানর্থভূবশ্চ তে ।

কুর্য়ুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়াঃ বহুমম্পর্শনে বরম্ ॥

(ভিঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

—এই উপদেশটী অত্যন্ত গভীর । ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে এই একান্তিধর্ম পালন করিবেন ।

গৃহী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

ভক্তির অনুকূল সহজ-বাণীপারের ক্রিয়াদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহপূর্বক ভক্তিসাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ ও কীর্তন করিবেন। এই প্রয়াস-শূন্য ভজন-পদ্ধতির আবার গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে—দুই প্রকার প্রবৃত্তি। গৃহী বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবনযাত্রা অঙ্গীকার করতঃ প্রয়াসশূন্য হইয়া ভক্তি সাধন করিবেন। যাহাতে কুটুম্ব-ভরণাদি অনায়াসে নির্বাহ হয়, সেসকল সঞ্চয় ও উপার্জন করিবেন। হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহাই তিনি সর্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, ভাগরণে-নিদ্রায়—সর্বত্র তাঁহার হরিভজন অচিরে সিদ্ধ হইবে।

ত্যাগী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

আর, গৃহত্যাগী সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন তিষ্ঠাদ্বারা শরীর-যাত্রা নির্বাহ করতঃ ভক্তিসাধন করিবেন। কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, তত কষ্টকুপায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। যথা, ভাগবতে ব্রহ্মবাক্য (ভাঃ ১০।১৪।৮)—

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবান্নকৃতং বিপাকম।

অদ্বাগ্‌বপুভির্বিদগ্নমস্তে জীবত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ দায়ভাক্ হইতে পারে না। কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আনুকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে ‘তোমার অনুকম্পা অংশু হইবে’ এই আশা করতঃ কায়মনোবাক্যে তোমাতে ভক্তিয়োগ করেন।

রূপাদ্বারাই ভগবৎতত্ত্ব লভ্য—জ্ঞানে নহে

জ্ঞানাদি-প্রয়াসদ্বারা কিছুই হয় না; তবে তোমার রূপাতেই তোমাকে জানা যায়। অতএব (ভাঃ ১০।১৪।২৯)—

অথাপি তে দেব পদান্বজ্জয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবদ্‌মহিমো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিহ্ন ॥

দৈন্যভাবে নামাশ্রয় করিলে, ভগবৎ-রূপায় সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগবৎতত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে বিনা-প্রয়াসে উদ্ভিত হয়। চিরকাল স্বতন্ত্র জ্ঞান-প্রত্যয়ে তাহা পাওয়া যায় না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

প্রীতি-সন্দর্ভ-৬৩

শ্রীউদ্ধব ব্রহ্মবাগিগণের নিকট বিদায় লইয়া মথুরাগমনে উদ্যত হইলে নন্দাদি গোপগণ নানাপ্রকার উপহার-হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনুরাগবশতঃ কাদিতে কাদিতে বলিলেন,—আমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তিভাগা দূরেই আছে। তথাপি কৃষ্ণরতি যেন আমাদের অন্তহিত না হয়। অন্য সাধারণ জীবের মত বলিয়াছেন, আমরা স্বকর্মবশতঃ পরমেশ্বরেচ্ছায় যে-কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, যেন আমাদের পরমেশ্বর কৃষ্ণে রতি হয়—কাকুবাদে একথা বলিয়াছেন।

শ্রীব্রজেশ্বরী দিয়াছিলেন পুত্রের জন্ত, শ্রীবলদেব দেবকী ও রোহিণীর জন্ত পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নাঙ্কিত নবনী ও ক্ষীর লড্ডুকাদি। শ্রীব্রজদেবীগণ দিয়াছিলেন প্রাণেশ্বরের জন্ত নিজ শিল্পচিহ্নিত গুঞ্জাহারাদি। শ্রীদামাদি-সখাগণ দিয়াছিলেন প্রিয়সখার জন্ত তাঁহার পরিচিত বস্ত্রপুষ্প ফলমূলাদি। শ্রীব্রজরাজ দিয়াছিলেন পুত্রের জন্ত কন্দরী, গজমুক্তাহারাদি। শ্রীবলদেবের জন্ত ঘৃতপঙ্কাজাদি, উগ্রসেনের জন্ত গোছূয়াদি। আর উদ্ধবকে সকলেই পৃথক-ভাবে বস্ত্রালঙ্কারাদি।

ব্রজরাজ যে বলিয়াছেন—কায়ন্তংপ্রহ্বনাদিহু—দেহ তাহার প্রণামাদিতে রত হউক, এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার গৌরব স্মৃতিত হইয়াছে। বৎসলের এইরূপ উক্তি শুদ্ধ বাৎসল্যের পরিচায়ক হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে ব্রজরাজের সেক্রম অভিপ্রায় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ পিতৃজ্ঞানে প্রণামাদিরূপে যে গৌরব প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে যেন আমি বঞ্চিত না হই। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শরীর, মন ও বাক্যের যথাযোগ্য চেষ্টা তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। আর পরবর্ত্তিপ্লোকে যে কর্ম্মভিত্ত্যামাশ্রয়ানাং ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াছেন সেই ঈশ্বরশব্দ পূর্ব্ববৎ লালনার্থে প্রযুক্ত। সাধারণ লোকমধ্যেও সেইরূপ উক্তি দেখা যায়।

শ্রীব্রজরাজের মনের ভাব—বৎস উদ্ধব লোকে শুভকর্ম্মাদি-দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করে; আমিও শুভকর্ম্মাদি করিয়াছি ইহার দ্বারা আমার ঈশ্বরে রতি প্রার্থনা করা উচিত হইলেও আমি অন্য ঈশ্বরে রতি প্রার্থনা করিতে পারিব না। কৃষ্ণ ছাড়া আমার মনের আবেগ ঘটিবে না। তুমি বলিতেছ আমার পুত্র কৃষ্ণই ঈশ্বর। তাহা হইলে কৃষ্ণরূপ ঈশ্বরেই আমি জন্মে জন্মে রতি প্রার্থনা করিতেছি। ইহা সকাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমপূর্ণ আদর-সূচক। সাধারণ লোকেও যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে তাহার সম্বন্ধে বলিয়া

থাকে আমার ধর্মার্থ যাহা আছে, তাহার ফলে আমি যেন জন্মে জন্মে তাহাকে পাই।

সাত্ত্বিক স্তুতিাদি অষ্টসাত্ত্বিকই বাৎসল্যে প্রকাশিত হয়। মাতার সাত্ত্বিক নববিধ। স্তনের দুগ্ধক্ষরণরূপ অষ্ট এক সাত্ত্বিক ভাব উদ্ভূত হয়। বাৎসল্যের সঞ্চারিতাবসকল শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসিদ্ধ আছে। সে সকল সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃত, লীলাজাত, লীলাশক্তিকৃত এবং ঐশ্বর্য্যময় লীলাগত। “কস্ম্যাম্বুদমদাস্ত্যাম্বু” ইত্যাদি শ্লোকে অর্থ, “সাত্ত্ব দৃশ্যে বিশ্বং” শ্লোকে বিশ্বয় ও শঙ্কা। বাৎসল্য-রসে বাৎসল্য স্থায়ীভাব। সেই ভাব—কৃপাভরে মাতৃযুগলের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। পক্ষ ও অঙ্গরাগে সুন্দরাল বালকদ্বয়কে (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে) কোলে তুলিয়া নিতেন ও স্তন দান করিতেন। তাহারা যখন স্তন পান করিতেন, তখন তাহারা হাস্য ও অল্পবস্তু শোভিত মুখশোভা দর্শন করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিতেন।

নিয়োগ যথা—শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসীরা সাত্ত্বনার তত্ত্ব আসিয়া ব্রজরাজদম্পতির নিকট উপস্থিত হইলে পুত্রশোকাতুর ব্রজরাজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করেন। তিনি পুত্রের চরিত্র স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন। বাৎসে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্রীমন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীযশোদা অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। স্নেহবশতঃ স্তনদ্বয় দুগ্ধ প্লাবিত হইল।

তৎপরে তুষ্টি নামক যোগ—কৃষ্ণ-বলরামে প্ৰীতিনিবন্ধন ও সখার প্ৰীতির জন্য শ্রীমদ্ তিন মাস কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করেন। বসুদেবের অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের পুত্রভাব যাহাতে প্রকটিত হয়, তাহা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনিবার জন্য আগ্রহ না করিয়া শ্রীব্রজরাজ সখার প্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কাহারও নিকট অনাদৃত হন নাই, পংক্ত পূর্য্য সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অন্য যাদবগণও তাহার সঙ্গগুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সম্মান করিয়াছিলেন।

তৎপরে কামিনাসমূহ পূর্ণ হইলে ব্রজ ও বান্ধবগণসহ নন্দ উত্তম আভরণ পটবস্ত্র, নানা অমূল্য পরিচ্ছদের সহিত বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত রাজযোগ্য দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া যাদবগণ কর্তৃক প্রস্থাপিত হইয়াছিলেন। নন্দ, গোপ ও গোপীগণ গোবিন্দচরণকমলে অর্পিত ননকে পুনঃগ্রহণে অসমর্থ হইয়া সেইরূপেই মথুরায় প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরাগমনের অঙ্গীকার করিয়া ব্রজরাজাদিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ; শ্রীবলরামের ব্রজাগমনবর্ণনে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—কমলনয়ন কৃষ্ণে তাঁহাদিগের সমস্ত বিষয় অর্পিত ছিল। টীকায় শ্রীশ্যামিনাদ লিখিয়াছেন—কৃষ্ণে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিমিত্ত তাঁহারা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন ব্যতীত অন্য কামনা ছিল না ; সুতরাং বসুদেবাদি উত্তম আভরণ-দ্বারা যে-রাজ্যযোগ্য উপহার দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রীতিময় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবসুদেব বিপুল মৈন্যপল সঙ্গে দিয়া শ্রীব্রজরাজকে প্রস্থাপিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহাদের যে মথুরায় যাওয়ার কথা—তাহার তাৎপর্য—তাঁহাদের মন ছিল শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ। কোনরূপে দেহমাত্র নিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের তথা ব্রজবাসীর আনন্দ-নিকেতন। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন প্রত্যাশায় তাঁহারা কুরুক্ষেত্রযাত্রার পূর্বকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে গমন-দমনে মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ফিরিতে পারিবেন। তাহা না হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের ফেরৎ বৃন্দাবনে গেলেন না। মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন বলিয়াছেন, যখন আসিবেন তখন তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিব। তখন বৃন্দাবনে গেলে তত্রতা যাবতীয় বস্তু তাঁহার স্মৃতি উদ্বীপ্ত করিয়া কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বহ্নিতে আমাদিগকে ভগ্নাভূত করিবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা মথুরায় রহিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট বর্ণিত না হওয়ায় ব্রজবাসীর বিচ্ছেদবাস্তে মিলনঘটিত তুষ্টির অস্তাব দেখা যায়। সেই জন্য বলিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বারকা প্রজাবাক্যে তাঁহার মথুরা আগমন স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনের পর ব্রজবাসিগণ মথুরায় বাস করিতেছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে ব্রজবাসিগণের সহিত মিলন ঘটিয়াছিল। আর পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে—দত্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ইহা ১৭৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ব্রজে পুনরাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসিদের সহিত আর বিচ্ছেদ ঘটে নাই। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিহার করিতেছেন।

এই পর্য্যন্ত বাৎসল্যরস বর্ণিত হইল।

—পরিব্রাজকচার্য্য শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রীমতী মহারাজ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের

বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্বে প্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৫ পৃষ্ঠার পর)

সার্বভৌম—আপনি সূত্র হইতে প্রদর্শন করুন।

মহাপ্রভু—সূত্রকার “স্থিতাদনাভ্যাক্ষ” এই সূত্রে কর্মকলের অশন এবং অনশনরূপ যুক্তি দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ “শারীরশ্চেত্যেহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে” এই সূত্রে কাণ্ড এবং মাধ্যন্দিন-শাখীয়া সংবাদ অনুসারে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্থাপিত হইয়াছে। “ভেদস্ত্য বাপদেশাচ্চ” “ভেদবাপদেশাচ্চাত্তঃ” এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বাপদিশ্চ হইয়াছে। “বিশেষণ-ভেদবাপদেশাভ্যাক্ষ নেত্রয়ো” এই সূত্রে সর্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ দ্বারা এবং চতুর্মুখাদিরও সৃষ্টিকর্তৃত্বনিবন্ধন, চতুর্মুখ এবং প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। “অনুপপত্তেষু ন শারীরঃ” “নেত্রয়োহনুপপত্তেঃ” এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সাধিত হইয়াছে। “ন প্রতীকে ন হি সঃ” এই সূত্রে প্রতীকসকল হইতে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মের ভেদ বলা হইয়াছে। চান্দোগ্যোপনিষদে নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত ষোড়শ-দেবতা প্রতীক-রূপে প্রসিদ্ধ, যদি তাদৃশ দেবগণের সহিতই ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যাদির সহিত অভেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? “মুক্তোপসৃপ্য বাপদেশাৎ” “অযুপ্তাংক্রান্ত্যোর্ভেদেন” এই সূত্রদ্বয়ে মুক্তজনপ্রাপ্ত এবং সুযুপ্তি ও উৎক্রান্তির নিয়ামকরূপ লক্ষণ-দ্বারা জীবৈশ্বরের ভেদ স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। “পৃথগ্বপদেশাৎ” “সম্প্রজ্ঞাবিহায় যেন শব্দাৎ” এই সূত্রদ্বয়ে ভেদ-নির্দেশ এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রতিপাদনপূর্বক ভেদ ব্যবস্থিত হইয়াছে। “জগদব্যাপারবজ্জাম্” এই সূত্রে জীবের ব্রহ্মত্বলা নিরবধিক ঐশ্বর্য্যের নিষেধ করিয়া বিষ্ণুরই জগৎকর্তৃত্ব সাধিত হইয়াছে। অতএব জগৎকর্তা বিষ্ণু জীব হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন। বেদব্যাঙ্গ বহুসূত্রে এইরূপে ভেদের উচ্চ-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সার্বভৌম—সূত্রকারের এই সকল ভেদোক্তি পারমার্থিক-ভেদনিষ্ঠ নহে, ব্যবহারিক ভেদ-কথনেরই অভ্যাস মাত্র। “ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্যালোকবৎ” এই সূত্রে অভেদসত্ত্বেও ব্যবহারিকভেদের কথন সূত্রকার বলিয়াছেন। যেমন উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও তদ্বিকারীভূত

ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বৃহদ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত প্রভেদ ও মিলন প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয়, যেমন আকাশ অবিচ্ছিন্ন থাকিলেও ঘটাদি উপাধির নিমিত্ত তাহার ব্যবহারিক ভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জীবসম্বন্ধেও জানিতে হইবে।

মহাপ্রভু—“ভোক্তাপত্তেরবিভাগশেৎ স্যাল্লোকবৎ” এই সূত্রে পরব্রহ্মে ও জীবের ঐক্যপ্রাপ্তি-কথনহেতু উভয়ের অভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া “গোষ্ঠে গো-সকল একীভূত হইতেছে” ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের জায় শ্রুতিতে তাদৃশ একীভাবেরই উল্লেখ হইয়াছে, অভেদহেতু নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সূত্রাকার জীবেশ্বরের যে ঐক্যকে পূর্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্তে তাহার নিষেধ করিয়া থাকেন, ভাষ্যকার তাদৃশ ঐক্য সিদ্ধান্তপর বলিয়া মূলবিরোধী ভুক্তরূপেই গণ্য হইয়া থাকেন। “পরেহায়ে সর্কে একীভবন্তি” এই শ্রুতিতে ঐক্যব্যবহার-হেতু মুক্তগণের ব্রহ্মের সহিত অভেদশব্দা বেদব্যাস গো-সকলের ঐক্য-দৃষ্টান্ত-দ্বারা পরিহারপূর্বক মুক্তগণের মধ্যেও পারমাখিক-ভেদই স্বীকার করিতেছেন। সূত্রসমূহের প্রতিপাত্ত যে ভেদ সত্য, তাহা “মুক্তোগম্যপ্যাবদেশাৎ” ইত্যাদি-সূত্রদ্বারাই ত্রিগীকৃত হইয়াছে। “সর্গঃ খল্লিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ঐক্য-বাক্যবলে চেতনাচেতনাত্মক সর্গজগতের ঐক্য লাভ হইলে ভোক্তৃজীব এবং ভোগা-জড়সকলের অভেদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়া মায়াবাদিগণ “স্যাৎ লোকবৎ” এইরূপ সমাধান বলিয়াছেন। সূত্রের আশঙ্কা-তাৎপর্যা যদি বস্তুতঃ এইরূপই হয়, তাহা হইলে সমাধানকালে “স্যাৎ” এই সম্মতি-সূচক পদদ্বারা জড় এবং চেতনের অভেদই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে, পরন্তু জড়মিথ্যাত্ববাদী আপনাদের পক্ষে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধই হয় এবং সূত্র-কারেরও অসম্মতিই হইয়া থাকে।

সার্কভৌম—আচ্ছা, আপনি পুরাণশাস্ত্রকে বেদার্থনির্ণায়ক বলিয়াছেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে ত’ বহুস্থানে জী। ও ব্রহ্মের অভেদই কীৰ্ত্তিত হইয়াছে—

“ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ তিদান্।

সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥” (ভাঃ ৪।৭।৫৪)

ভগবান্ দত্ত প্রজাপতিকে বলিলেন,—“আসি, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিন-জনই একস্বরূপ। সর্বভূতাত্মা আমাদের তিনজনে যিনি ভেদ দর্শন না করেন, সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।” আপনার মতে জীবতত্ত্ব

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মে এবং বিমুক্ত অথবা জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-দর্শনকারী ব্যক্তি—
পাষণ্ডী মনো গণ্য ; কিন্তু আপনি যাহাকে প্রমাণ-শিরোমণি বলেন, সেই
শ্রীমদ্ভাগবতই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, ভেদদর্শনকারীর মোক্ষপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ
নাই। অতএব আপনার বাক্যবলেই আমরা প্রমাণ করিতেছি যে, জীব ও
ব্রহ্মে অভেদ-দিক্কাই বেদ-বেদান্ত ও তাহাদের অর্থনির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবতাদি
পুরাণের মত।

মহাপ্রভু—ঐক্যসূত্রসমূহে ভেদ সাধিত তত্ত্বের শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি
নির্ণেয়-গ্রন্থসকলের মধ্যে কুত্রচিৎ ভেদ-নিষেধ দেখা গেলেও সূত্রানুসারেই
তাদৃশ বচনের অর্থ-বর্ণন কর্তব্য, সুতরাং তাদৃশ ভেদনিষেধ-অর্থে বিরোধ-
নিষেধই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

সার্কভোম—আমরা এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত অর্থ স্বীকার করিব কেন ?

মহাপ্রভু—ইহা স্বকপোল কল্পনা নহে ; তত্বকোবিদগণ ‘ভেদ’শব্দের
এইসকল অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন,—

ভেদ-শব্দো হি বিবৃদ্ধিমিথো ভেদে প্রযুক্ত্যতে ।

ভ্রমে বিরোধে-ধীভেদে নাশেহস্তোহন্যে বিমিশ্রণে ।

অসংযুক্ততযান্যোহহস্থিতিশ্চাপি ভিদোচ্যতে ॥

ভিন্না সেনা মিত্রভেদঃ ক্ষীর-নীর-বিভেদনম্ ।

ভিন্ন-নীরত্ব-বাজ্রাঘে ভিন্নরাস্তত্ত্ববাগপি ॥

বিমিশ্রিতামাহ তস্মাত্তস্মাত্তেদো বিমিশ্রণম্ ।

দ্বৈমধ্য ভেদোপাচ্যশ্চ পৃথকীঃ কেতাদোরিতম্ ।

ভিন্নভিন্নমিতি প্রাজ্ঞর্ন কং ঘটপটাদিকম্ ।

ভ্রমো ভিন্না ভিন্নত্বার্থানন্তরীকুরুতে যতঃ ॥

পণ্ডিতগণ কোন স্থলে পরস্পর ভেদ অর্থে, কোন স্থলে ভ্রম অর্থে, কোন
স্থলে বিরোধ অর্থে, কোন স্থলে বুদ্ধিগত পার্থক্য অর্থে, কোন স্থলে নাশ অর্থে,
কোন স্থলে পরস্পর মিশ্রণ অর্থে এবং কোন স্থলে অসংযুক্তরূপে বস্তুদ্বয়ের
অবস্থান অর্থে “ভেদ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। “সৈন্যগণ ভিন্নরূপে
বর্তমান” এই স্থলে ‘ভিন্ন’শব্দে তাহাদের অসংযুক্তরূপে অবস্থান কথিত হইয়া
থাকে। “চৈত্র ও মৈত্র ভিন্ন” এই স্থলে ভেদশব্দ বিরোধবাচক, “ক্ষীর ও
নীর ভিন্ন” এই স্থলে মিশ্রণ-বাচক, এইরূপ যাবৎকাল—“একত্র স্ফটিক-
তটাংশ-ভিন্ন-নীরা-নীলাশ্মাভ্যুতি ভিন্নরাস্তত্ত্বসৌহপরত্ব” এই শ্লোকে মিশ্রণ

অর্থে “ভিন্ন” এবং “ভিন্ন” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ভেদশব্দ মিশ্রণার্থক। এইরূপ ‘বৈধ’ এবং ‘ভেদোপায়’ এই শব্দদ্বয় বুদ্ধিভেদ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পৃথগ্বুদ্ধি পদভ্রান্তি অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ভিন্নপট, ভিন্নঘট—এই পদদ্বয় বিনাশ অর্থে এবং ভ্রম অর্থ বৈপরীত্যজনকরূপে ভেদশব্দে উক্ত হইয়া থাকে। “ত্রয়ানামেক-ভাবানাম্” ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকের অর্থ স্পষ্টরূপে প্রসীত হয় না, সুতরাং স্পষ্টার্থক শ্লোকান্তরের অর্থানুসারেই ইহার অর্থও বর্ণনীয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে ঋষিগণের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। মুনিগণ ভৃগু বর্ণিতবাক্য শ্রবণ করিয়া সংশয়মুক্ত হইয়া যোক্ষ ও অভয়প্রদায়ক বিষ্ণুকেই সর্বোত্তমরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৮৯ অঃ)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সর্বদেবগণ শাপ এবং অনুগ্রহপ্রদান সমর্থ, তন্মধ্যে শিব এবং ব্রহ্মা অল্প-সেবনেই অনুগ্রহ এবং অল্প অপরাধেই শাপ প্রদান করেন। ভগবান্ স্বল্পসেবায় তুষ্ট কিম্বা স্বল্প অপরাধে ক্রুদ্ধ হন না। “হে বিষ্ণো! প্রদীপ যেক্রপ অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ আপনিও আমার হৃদয়গত অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছেন। অতএব আপনাকেই আমি দেবতাত্রয়ের মধ্যে উত্তম বলিয়া মনে করি। দেব, অসুর এবং মনুষ্যগণ মধ্যে যাহারা শিবের আরাধনা করেন, তাহারা প্রায়ই ধনবন্ত হইয়া থাকেন। যাহারা ব্রহ্মীপতি শ্রীহরির উপাসনা করেন, তাহারা প্রায়ই দরিদ্র।” এবমিধ অনেক ভাগবত বচন দ্বারা বিষ্ণুর সর্বোত্তমত্ব প্রতিপাদনপূর্বক ত্রেদ স্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপ—“যন্মাষ্য গৃহনহ্য” ইত্যাদি ভৃগুবাক্য এবং “বব বরদ! পরাজ্যানাশিয়া” ইত্যাদি রুদ্রবাক্যদ্বারা ভগবানের সর্বোৎকৃষ্টত্ব অবগত হওয়া যায়। “ত্রয়ানাম্” ইত্যাদি বাক্যও “একভাবানাম্” এই পদটি হেতুগর্ভ বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদ দ্বারা উক্ত শ্লোকে দেবতাত্রয়ের বুদ্ধিভেদই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ অবগত হওয়া যায়। মুনিগণ বিচারপূর্বক সর্বলোকে গমন করিয়া অতঃপর যে ভেদের নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক হইতে পারে না। পরন্তু “ত্রয়ানাম্” ইত্যাদি বাক্য দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকালে উগ্র রুদ্রসৈন্যদর্শনে ভীত ভৃগুঋষিকর্তৃক তাহাদের প্রীতির জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় ব্যবহারিকভেদ নিষেধপর হইতে পারে। আপনার মতেও বিশিষ্ট-চেতনগত ঐক্য স্বীকৃত হয় না। অতএব “ত্রয়ানাম্” ইত্যাদি বাক্য আপনাকেই অমুখ্যাবৃত্তিই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং বিবোধরূপ মুখ্য অর্থের সম্ভব হইলে অমুখ্যাবৃত্তি

স্বীকারের আবশ্যকতা কি ? “হে মোহিনি ! আমাদের মধ্যে যাহাতে ভেদ না ঘটে, সেটরূপভাবেই সূক্ষ্ম বস্তু কর । হে ব্রাহ্মণ ! ঋষিগণ কিজন্ত যজ্ঞ-গণকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এক কক্ষই সমস্ত যাদবের অধীশ্বর বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিরূপে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আপনি বর্ণন করুন” এতাদৃশী রীতি অনুসারে ভাগবতে তত্তৎস্থানে বিরোধ অর্থেই ভেদ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে । লোকমধ্যেও সামপ্রভৃতি উপায়চতুষ্টয়ের অঙ্গগত ভেদ-শব্দ বিরোধ অর্থেই প্রযুক্ত হয় । অতএব “ত্রয়ানাম্” ইত্যাদি ভাগবতবাক্যেও ভেদ-শব্দ মুখ্যভাবে বিরোধবাচকই হইয়া থাকে । মুখ্যার্থের সমুদায়স্থলে ‘লক্ষণা’ বিদ্বজ্জন-স্বীকার্য্য নহে । অথবা, এই বাক্য ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বিষ্ণুর একবস্ত্তবিশয়ক মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে । যজ্ঞকালে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছিল, নিষেধও তাহারই হওয়া সম্ভব । শৈব এবং বৈষ্ণবগণের বিরোধই তথায় প্রসঙ্গ হইয়াছিল, মূর্ত্তিকায়ের অভেদ প্রসঙ্গ হইবে নাই ; অতএব ভেদশব্দে শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিরোধই নিষিদ্ধ হইয়াছে । একুপ ব্যাখ্যাই সম্ভব । বৈকুণ্ঠ, সতালোক এবং কৈলাসে নিতা নিবাসশীল বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের রূপভেদ-প্রসঙ্গ সর্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবলমাত্র যজ্ঞকালে তাহার প্রসঙ্গ হইতে পারে না ; সুতরাং অন্যকালে তাহার নিষেধ না হইয়া কেবলমাত্র যজ্ঞকালে তাহার নিষেধ যুক্তিসঙ্গত নহে । পরন্তু যজ্ঞকালে তাঁহাদের মধ্যে প্রেমবশতঃ পূজ্য-পূজক-ভাবও দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে বিরোধই নিষেধ নহে, একপট বলা উচিত । যজ্ঞকালে সম্ভামধ্যে একমুখ, চতুর্মুখ ও পঞ্চমুখ এইরূপ বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট এবং চক্র, অক্ষমালা ও শূলরূপ বিভিন্ন চিহ্ন-বিশিষ্ট বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের মধ্যে স্তোতৃস্বভাবে ও প্রণাম-প্রণেতৃভাবে অবস্থানহেতু ভেদই সিদ্ধ হইয়াছে । ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সমাগত বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া সমস্ত্রমে গাত্রোথানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছিলেন । দেবগণ-বিষ্ণুতেজে হতপ্রভ এবং ভয়ে নির্ঝাক হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সমাক্ না জানিয়াও স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে স্তুতি করিয়াছিলেন । এবম্বিধ পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টবচনদ্বারা অস্পষ্ট বাক্যসকলের অর্থও নির্ণয়যোগ্য হইয়া থাকে । ত্রৈকালিক ভেদজ্ঞ ভৃগুঋষি কেবলমাত্র তৎকালে অভেদ বর্ণন করিতে পারেন না । যদি ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানের মাহাত্ম্য-জ্ঞানলাভেই

অশক্ত, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার সহিত ঐক্যভাবে সমর্থ হইতে পারেন। “যন্মায়য়া গহনয়া” ইত্যাদি ভৃগুবাক্যেও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়িতাব-শ্রবণহেতু স্বরূপগত ঐক্য নিষিদ্ধই হইয়া থাকে। অতএব “ত্রয়াণাম্” ইত্যাদি অস্তিম-বাক্য পূর্ব ও মধ্য-বাক্যের বিরোধি হইতে পারে না। যিনি এক তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট আদি, মধ্য এবং অন্ত্য-শ্লোকের মধ্যে অর্থভেদ দর্শন না করেন, তিনি ভেদাভেদ-কলহ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদি এস্থলে স্বরূপভেদেরই নিষেধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে “কুদ্রুদে যজ্ঞোচ্ছিষ্টে আছতি-প্রদান কর্তব্য” দেবর্ষিগণের এইরূপ আদেশবচন ব্যর্থই হইয়া থাকে এবং প্রথমতঃ কুদ্রের আছতি প্রদান না করায় যে কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারও নিমূলকত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ক্রতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রনির্গত পদার্থসকলের মধ্যে পারমাণ্বিক এবং অপার-মাণ্বিকরূপ বিবিধ ভেদ বক্তব্য নহে, পরন্তু মুখ্যার্থের বাধা হইলেই গোণ অর্থ ব্যক্ত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যকুলতিলক

পরমহংসস্বামী ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের

শুভ প্রকট-বাসরে ভক্ত্যঞ্জলি

“নমঃ ঔ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি-নাম্বিনে ॥”

নমো নমো নমো পরমগুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান,

এসেছো জগতে কুপাধারা লয়ে, তুমি হে মহানু ;

(তব) প্রকট-তিথিতে আমিছে ভক্তগণ দিগ্ হ’তে দিগন্তে

মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথির পুণ্য-বাসরেতে।

আজি তাই প্রাতে এত সুন্দর
প্রথম অরুণোদয়,
পাখীর কুজন কুসুম সুবাস
তাই এত মধুময় ।

রিক্ত আমি সবার চেয়ে ভিক্ষু-নিরুপম,
কি দিয়ে আজি পূজিব তব শ্রীচরণকমল ?
দেবার মত আছে শুধু ভক্তি-অশ্রু-অর্ঘ্য
তা' দিয়ে আজ পুণ্যলগ্নে পূজিব তব শ্রীপাদপদ্ম ।

শুনেছি তোমার মহিমা অপার,
পতিত জনার তুমি তো বন্ধু ।
জীব-উদ্ধারিতে তুমি হে নাথ
অপার কৃপাসিন্ধু ।

এসেছিলে জগতে শিখাতে মানবে
কেমনে ভক্তি লভিতে হয়,
মহাভাবে ভরা, প্রেমময় তনু,
জয়তু শ্রীকেশব জয় ।

গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনে,
গৌরের জয়গানে,
গৌর-ভক্ত বলিয়া বিদিত,
তুমি এ' ধরাধামে ।

গৌরের কথা প্রচারের তরে,
কত সহিয়াছ নিদারুণ ক্লেশ,
মঠ-মন্দিরে কভু দেশে দেশে,
বিচরণ তুমি করেছ অশেষ ।

‘প্রভুপাদ’-নাম কহিতে তোমার
 আঁখি ভেসে যেত জলে,
 যা ছিল তোমার দিয়েছ সঁপিয়া,
 গুরুপদ তলে উজাড় করে ।

তুমি চিরপ্রিয় ভক্তের কাছে,
 প্রেম অমৃতভরা,
 তোমার চরণ-ধূলির স্পর্শেতে
 ধন্য হইয়াছে ধরা ।

বিশ্বমাঝে তব কৃপাসার
 কণামাত্র লভিলে তাহার—
 পঙ্কুও লজ্জয় গিরি, মুক হয় বাচাল,
 অধমারে কর কৃপা, হে ঠাকুর দয়াল !

তুমি যে মোদের আপনজন ;
 অগতির গতিদাতা,
 যুগ যুগ ধরি ভক্ত-মানসে
 রবে চিরদিন গাঁথা ।

দেখিনি তোমারে এ’ দীন জীবনে
 তবু তবলীলা, দোলা দেয় মনে,
 তব নিজজনের লভি কৃপাকণ
 স্বার্থক হউক এ’ হীনজীবন ।

করুণাঘন পতিত-পাবন
 নমো নমো নমো শ্রীকেশব—
 লহ হে প্রভু, ভক্তি-অর্ঘ্য
 করহ কৃপা বরিষণ ।

—কুমারী গৌরী বোস, বি. এ. বি. টি.

দ্বাদশ বৈষ্ণৱ

(৫) কপিল

“দেবহুত্যাং কৰ্দ্দমতঃ প্রাহুর্ভাবমসৌ গতঃ।

প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিক্খিনা ॥”

(শ্রীলঘুঃ ভাঃ)

কপিল—পিতা কৰ্দ্দম, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

“ছায়ায়াঃ কৰ্দ্দমো যজ্ঞে দেবহুত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ॥” (শ্রীভাঃ ৩:২২২৭)।

ব্রহ্মা কৰ্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, তিনি দ্রবশতী-
তীরবর্তী বিজন প্রদেশে গমন করিয়া, স্নানোৎকর্ষকাল উত্তিষ্ঠোৎসবে সৰ্দ্ধসিদ্ধি-
প্রদ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া সময়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। গরুড়-
বাহনে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া, তাঁহার দিব্য-
চক্ষুর গোচর হইলেন। কৃতার্থ কৰ্দ্দম পরমানন্দে তাঁহাদের পাদবন্দনা
এবং পূজা করিয়া কহিলেন,— “প্রভো, আমি সকাম; পিতার প্রজা-
সৃষ্টির আদেশ পালনে সুযোগলাভ-কামনা করিয়াই তোমার শরণ লইয়াছি।
সকাম উপাসনা নিষ্ফল হইলেও, আমি তোমারই সৰ্দ্ধমঙ্গলময় শ্রীপাদ-
পদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। আমি জানি, সকাম বা নিকাম যে-কোনও ভাবে
তোমার চরণ আশ্রয় করিলেই, তুমি আশ্রিত জনের সকল গ্লানি দূর
করিয়া তাহাকে শ্রীপাদ-সেবাই দাও।”

শ্রীহরি কৰ্দ্দমের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্নিতমুখে কহিলেন,— “বৎস,—
আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না আমি আপনাই আমার প্রাণ-
ধিক ভক্তগণের যোগ-ক্ষেম বহন করি। তোমারও যাহা আবশ্যিক, তাহা
আমি পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। প্রজাপতি-প্রধান মনু ও তৎপত্নী
শতরূপা শীঘ্রই তাঁহাদের পরমা সুন্দরী কন্যা দেবহুতি সহ তোমার আশ্রমে
উপস্থিত হইবেন। ঐ সৰ্দ্ধসুলক্ষণা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে।
তাহা হইতেই তুমি পিতৃ-বাকা পালন করিয়া পূর্ণকাম হইতে পারিবে।
আর, আমার এক বিশেষাংশ তোমাকে অবলম্বন করিয়া ঐ দেবহুতি-
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন
করিবেন। তুমি আদেশ পালন করিয়া, আমাতে সৰ্দ্ধকর্মফল সমর্পণ
কর। তাহা হইলেই কলুষমুক্ত হইয়া, সময়ে আমাকেই পাইবে।” শ্রীহরি
লক্ষ্মীসহ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর, মনু ও শতরূপা, কন্যা দেবহুতি সহ উপস্থিত হইয়া, সর্বগুণা-
 হিত সুপাত্র কর্দ্ধম-ঋষিকে কন্যা সম্ভাদান করিলেন। কর্দ্ধম-ঋষি সেই
 দিব্যরূপা পত্নীগণ মিলিত হইয়া, কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। সাধবী
 দেবহুতি অনেকগুলি কন্যা এবং একটি পুত্রের জননী হইলেন। পুত্রটি
 জন্মগ্রহণ করিলে, অলক্ষ্যে অমরবৃন্দের দিব্যবাগ্মবুনি ও গন্ধর্বগণের গীত
 শ্রুতি-গোচর হইল। মরীচি-আদি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রজা তথায়
 আগমন করিলেন। তিনি সানন্দে স্বীয় পুত্র কর্দ্ধমকে কহিলেন,—“বৎস,
 তুমি আমার আদেশ পালন করিয়া আমার সম্যক্ পূজা ও সম্মান রক্ষা
 করিয়াছ। পিতার প্রতি পুত্রের ইহাই কর্তব্য। তোমার সুন্দরী কন্যাগণ
 যোগ্য পতি লাভ করিয়া পতিব্রতা হইবে। আর তোমার এই পুত্রটি
 ভগবদংশে অবতীর্ণ। জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন।
 ইহার নাম হইবে কপিল।” তারপর তিনি দেবহুতিকে কহিলেন—“মা,
 তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; তুমি কৈটভহারি হরির জননী হইয়াছ।
 এই পুত্র হইতেই তুমি কৃতার্থা হইবে।”

ব্রজাস্বজন সহ প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতি কর্দ্ধম যথাসময়ে কন্যা-
 দিগকে সুপাত্রে সমর্পণ করিয়া, সংসার-কর্তব্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া,
 আবার পূর্ববৎ বিজন বন-বাসে গিয়া হরিসাধনায় জীবন সফল করিতে
 কৃত-সংকল্প হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পতিব্রতা দেবহুতি কর-
 ঘোড়ে সকাতরে কহিলেন,—“ব্রহ্মন্, আপনি ত হরিসাধনায় চলিলেন।
 কিন্তু, আমার গতি কি হইবে?”

কর্দ্ধম কহিলেন,—“রাজতনয়ে, তুমি কেন দুঃখিতা হইতেছ? স্বয়ং
 গতি-পতি তোমাকে ‘মা’ বলিয়া গৃহে আঁসিয়াছেন; তোমার আর দুঃখ
 কি? তুমি ভক্তিভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় কর। তিনি তোমাকে
 তত্ত্বোপদেশ দিয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্ত করিবেন।”

মহাত্মাগ কর্দ্ধম, মহাসত্ত্ব কপিল-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই
 স্বতঃসিদ্ধ পুরুষবরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কহিলেন,—“ভগবন্, বহুজন্ম
 ভক্তিব্যোগে তোমার আরাধনা করিয়া ভক্তগণ তোমার পরম স্বরূপ প্রত্যক্ষ
 করেন। তুমি স্বীয় ভক্তগণেরই সদা শ্রীবুদ্ধি সাধন কর। সেই ভক্তগণের
 সম্যক্ সমৃদ্ধি সাধন জন্তই তোমার শুভাগমন। তুমি ভক্তদের মান বুদ্ধি
 কর; তাই নিজ বাক্য রক্ষা করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তত্ত্ব-

জ্ঞান বিতরণ করাই তোমার আগমনের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমি তোমার সর্বসম্পন্নায় শ্রীপদে শরণ লইলাম, তুমি আমার হিতার্থ কিঞ্চিৎ উপদেশ দাও। গৃহমেধীয় ধর্মে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।”

তখন ভগবান্ কপিল কহিলেন,—“লোকে আমার বাক্যই সত্য এবং সকলে তাহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে; তাই আমি আমার অঙ্গীকার মত তোমার গৃহে আসিয়াছি। আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্তই আমার আগমন। বিমুক্ত আত্মজ্ঞানের যে অতি গুঢ় মহাপথ, কাল-প্রভাবে আসুর ভাবের আবর্জনায় রুদ্ধপ্রায় হয়, তাহাই পুনঃ প্রবর্তিত করিতে আমি এইরূপে আগমন করি। যেখানেই থাক, সতত আমার (অর্থাৎ শ্রীহরির) ভজনা কর। তাহা হইতেই জীব, কালের অধিকার অতিক্রম করিয়া, নিত্যানন্দের অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। অন্তরে হৃৎপ্রকাশ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অশোক অভয়পদ প্রাপ্ত হয়। আমি মাতা দেবহুতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, কালভয়-নিবারণ অমোঘ ঔষধ-স্বরূপ পরা-বিদ্যা, কাল-কবলিত জীবগণকে বিতরণ করিব। তাহাতেই আমার জননীও অ-কাল-বিপ্লুত অভয়-পদ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন।”

কর্দম-ঋষি পুত্র-রূপী শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, তাঁহারই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া অরণ্য-যাত্রা করিলেন। পুত্র কপিলসহ দেবহুতি সেই বিন্দুসরোবর তীরস্থ আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা দেবহুতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্র-সকাশে গিয়া কহিলেন,—“হে প্রভো, আমার বিষমাসক্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ যোগাইয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি; তথাপি আমার বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই। তাহাই আমাকে তুঃখের ঘোর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। ত্রাণ পাইতে, পরম সৌভাগ্য তোমাকেই এখন অংলঘন-রূপে পাইয়াছি। এবার যে রক্ষা পাইব, তাহাতে আমি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি। তুমি আত্ম ভগবান্, সকলের দৈবর; তুমি অজ্ঞান-অন্ধকার-মগ্ন লোকসমূহের চক্ষুঃস্বরূপ স্বর্ঘ্যের স্থায় উদ্ভিত হইয়াছ। আমি তোমারি মায়ায় আবহারা হইয়া, মোহকূপে মজিতেছি। তুমি রক্ষা কর আমাকে; আত্মজ্ঞান দিয়া মোহ দূর কর আমার। আমি তোমার চরণে প্রণত, শরণাগত।”

মাতার অদোষ—অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কপিলদেব অফুল্লমুখে পরম সুখে কহিতে লাগিলেন,—“মাতঃ, চিত্তই জীবের বন্ধন

ও মোচনের হেতু। চিত্ত বিষয়ে মগ্ন হইলেই জীব বদ্ধ হয়; তাহার গতি-পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আর সেই চিত্ত শ্রীভগবানে রত হইলেই, জীব মোহমুক্ত হইয়া পরম-পদে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়। গুণময়ী প্রকৃতিই জীবকে নানারঙ্গে নাচায়; বিষয়ে লইয়া যায়। ভক্তিব্যোগে—সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ক্রমে শ্রীহরির সেবা হইতেই জীবের সকল ভুভ্যোগ উপস্থিত হয়; প্রবল প্রকৃতিও হীনবল হয়। স্বয়ং শ্রীভগবানে এই অনন্ত ভক্তিব্যোগ বাতীত জীবের পরম-মঙ্গল-জনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।

“হরিপরায়ণ সাধুদের মহিমা অসীম। যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি অপরের অক্ষয়-পাশ-স্বরূপ, সেই প্রসঙ্গই হরিজনে নিযুক্ত হইলে পরা-গতি লাভের কারণ হয়। সাধুগণ আমার স্বখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া সকল কার্য্য করেন। আমার সেবার প্রতিকূল হইলে, তাঁহার তুস্তাজ্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকেও পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহার আমার প্রসঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যে কাল হরণ করেন। আমার নাম, আমার কথা আলোচনা করিয়াই পরমানন্দে থাকেন। দ্রিত্যপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এইরূপ সাধু-সঙ্গই অসাধু-জনের যাবতীয় কুসঙ্গ-দোষ নষ্ট করিয়া, তাহাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কারণ, সাধুসমাগমে সতত হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথাই হয়; শ্রীহরির মহিমাই সহস্র প্রকারে অভিযুক্ত হয়; তাহাতে চিত্ত, বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাতেই রত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত হইলেই, অচিরে অতি বহির্মুখ চিত্ত ও ভক্তি-রস-সিক্ত হইয়া মলমুক্ত ও পবিত্র হয়। তখন এই অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি ভক্তি-প্রবাহিনী ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে। সেই প্রবল বেগেই সদায়ুক্ত জীব আমাকে তাহার এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়।”

দেবহুতি বলিলেন,— “আমি শ্রীজাতি; আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নহে। আমি যাহাতে বেশ বুঝিতে পারি, আয়ত্ত করিতে পারি এমন সরলভাবে আমাকে এই ভক্তিব্যোগ বল। আমার কর্তব্য কি, তাহাও উপদেশ দাও।” (ক্রমশঃ)

“সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন”

(পূর্ব প্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৩ পৃষ্ঠার পর)

আজ ইং ১২/৮/৭৭ বুধস্পতিবার ভোর হইতেই ভূবর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর দর্শন-মানসে প্রস্তুতি-পূর্ব্ব শেষ করিয়া সকাল ৮.৩০ মিঃ কাশ্মীর সরকারের পরিবহন বিভাগের বাসযোগে সংরক্ষিত আসনে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করিলাম। গত ৭ দিন যাবৎ পহেলগাঁও এবং অমরনাথের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীঅমরনাথ-জীউকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক পহেলগাঁওর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে বিদায় দিয়া আমরা নূতন অজ্ঞানার পথে পাড়ি দিলাম।

বাস দ্রুতগতিতে তাহার গন্তব্যস্থানে ধাবমান। সে সহজপথে ৬৫ কি.মি. পথ অতিক্রম করিতে বাস্তু। আর আমিও এই কঁাকে চলার পথের দুধারে পাহাড়ী নদীর তীব্র জল-স্রোত, ধানের ক্ষেত, আপেল ফলের বাগান, ছোট ছোট কুঠীর, টিনের বাড়ী ও মাঝেমাঝে পাকাবাড়ী দর্শন করিলাম। ইতিহাস বিখ্যাত ঝিলাম নদীর তঁাকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের বাস বেলা প্রায় ১২.১০ টায় সহর শ্রীনগরের বাস ডিপোতে প্রবেশ করিল। আমরা সকলে বাস হইতে নামিয়া কুলির সাহায্যে মালপত্র একত্র করিতে বাস্তু। ছুপুরের রৌদ্রতাপে আমরা অনেকে বড় রাস্তার ধারে বৃক্ষের নীচে ছায়ায় আশ্রয় নিলাম। এই অবসরে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন। অবশেষে আমরা কুলি ও ঠেলাগাড়ীর সহযোগিতায় সহরের কেন্দ্রমণিতে অবস্থিত সনাতন ধর্ম্ম প্রতাপ সজ্জের ধর্ম্মশালাতে পৌঁছিলাম। ধর্ম্মশালাতে একতালা বা দোতালাতে আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে আমরা তিনতলাতে আশ্রয় লইলাম। আমরা সকলে ঘর পরিষ্কার করিয়া জায়গা করিয়া লইলাম। আমাদের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ৬৭পাতা বড় বড় দোকানের দালালরা আসিয়া দোকানের কার্ড দিল এবং বৈকালবেলা আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিবে বলিয়া বিদায় নিল। শ্রীনগরের উচ্চতা ৫২০০ ফুট, পহেলগাঁও হইতে উচ্চতায় ২০০০ ফুট কম। এখানে বেশ গরম অনুভব হইতেছে। কাশ্মীর-হাউস দোকানের দালাল রহমৎ বৈকাল ৪টার সময় আসিয়া হাজির ধর্ম্মশালাতে। আমরা সকলে রহমতের অহরোধে টেম্পোযোগে রওনা হইলাম বৈকাল ৫টার এবং সুবিশাল গণেশ মন্দির দর্শন করিয়া পুরাতন শ্রীনগর শহরের তঁাকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া টেম্পোতে চলিলাম। টেম্পো হইতে নামিয়া রহমতের

অনুসরণে কিছু অলিগলি পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে পৌড়িঙ্গাম বিধান নদীর ধারে রঘুনাথ মন্দিরে। শ্রীরামদীতা ও লক্ষ্মণের শ্রীবিগ্রহ দর্শন শেষ করিবার পরে—দোকানের দালাল রহমত রঘুনাথজীউর মন্দিরের নিকটেই একটি বড় শাল-কারখানাতে প্রবেশ করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইল। কারণ মহরে আর কোন দর্শনীয় মন্দির নাই বলিলেই চলে। এখানকার লক্ষণীয় ব্যাপার, দালালের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বড় বড় শালের দোকানে প্রবেশ। 'কিছু কিনুন বা না কিনুন একবার দোকানে পদার্পণ করুন' ইত্যাদি বলিয়া দোকানে টানিয়া লইয়া যাওয়ার মত। অবশেষে আমরা সকলে রহমতের অনুরোধে তাহারই পূর্বনির্দ্ধারিত দোকানে প্রবেশ করিলাম। উপর নীচে দোকান ও কারখানা, অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম শাল কাশ্মীরে তৈয়ারী হয় না, অমৃতসর ও নিমটবত্ৰী অন্যান্য স্থান হইতে শাল কাশ্মীরে আসে এবং এখানকার কারখানাতে শালের উপর বিভিন্ন প্রকারের পাড়ের কাজ করা হয়, ইহাই কাশ্মীরের অধিকাংশ শালের কারখানার বৈশিষ্ট্য।

যাত্রীদের মনের কোণে যে ক্ষীণ বাসনা ছিল, তাহা তাঁহারা চরিতার্থ করিলেন দোকানে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরী-শাল, কাশ্মীরী শাড়ী ক্রয় করিয়া। আমার স্ত্রীও চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধাণ গোড়ীয় মঠের বিগ্রহ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জন্য ২ খানা শাল ক্রয় করিল এবং নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের সেবিত বিগ্রহগণের মধ্যে শ্রীরাধারানীর জন্য মীল রং-এর একখানা শাল ক্রয় করিল, সেই সঙ্গে নিডেরও কিছু ক্রয় করিল। অন্যান্য যাত্রীরাও তাহাদের সাধ্যমত একই দোকান হইতে শাল ও শাড়ী ক্রয় করিলেন, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভুও শ্রীল গুরুমহারাজ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অর্চনা-বিগ্রহের জন্ত দুইখানি দামী শাল ক্রয় করিলেন। অর্থাৎ ঐ দোকান হইতে যাত্রীগণ সর্বমোট প্রায় ৬৭ হাজার টাকার জিনিষপত্র ক্রয় করিলেন। কাশ্মীরের দোকানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দোকানে প্রবেশ করিয়া শূন্য হাতে কেহ ফেরেন না। কম দরে বা বেশী দরে হউক কিছু না কিছু ক্রয় করিয়া তবেই ফিরিয়া থাকেন। আজ আর কোন দর্শন হইল না, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দর্শন হইতে কেনাকাটার দর্শনই ছিল বেশী আকর্ষণীয়, অবশেষে রাত্র প্রায় ৯।০ টায় আমরা ধর্মশালাতে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভু তাঁহার রান্না কার্য্য লইয়া বাস্ত হইয়া পড়িলেন
শ্রীপাদ রামানন্দ প্রভুর সাহায্যে এবং অত্যাশ্রয় যাত্রীরাও সেই অবসরে
কেনাকাটার আনন্দে ও সমালোচনায় বাস্ত। প্রসাদ সেবান্তে আমরা
সকলে নিকিঘ্নে শয়ন করিলাম। পরের দিন সকাল সকাল প্রসাদ সেবান্তে
আমরা টেম্পোযোগে শ্রীনগর সহর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী ডাললেকের
ধার দিয়া সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত
স্থানগুলি দর্শন করিলাম,—

চশমাশাহী—শ্রীনগর সহর হইতে ৫ মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড়ের
পাদদেশে একটি বিরাট বাগান অবস্থিত। মূল রাস্তা হইতে প্রায়
১ মাইল দূরে পায়ে হাঁটিয়া মোঘল সম্রাট শাহজাহানের নিম্নিত প্রাসাদ
দর্শকেরা দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। বাগানে বহু রং-বেরং-এর সাজান
ফুলের বাগান ও নানাবিধ গাছপালা সুসজ্জিতভাবে অবস্থান করিতেছে।
দেখিতে বেশ মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। ছোট ছোট জলপ্রপাতের স্থায়
জলধারাও দৃষ্টিগোচর হইল। এখানকার আবহাওয়াও হৃদয়গ্রাহী। প্রকৃতির
নিয়মে ও মানুষের চেষ্টা ও যত্নে বেশ অপূর্ব বাগান তৈয়ারী হইয়াছে,
এই বাগানের সন্নিকটে রাজ্যপালের ভবন বিদ্যমান। সাধারণ দর্শকেরা
এই চশমাশাহী বাগানকে ‘প্রেমের উদ্যান’ বলিয়া অভিহিত করিয়া
থাকেন। বহু দর্শনার্থী এখানে আসিয়া ভীড় করেন। অর্থাৎ যাহারা
কাশ্মীর আসেন তাহারা এই বাগান দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

নিশাতবাগ—চশমাশাহী হইতে ২০ মাইল দূরে ডাললেকের ধারে
নিশাতবাগ। এখানেও দর্শকদের আকর্ষণের জন্য নানাবিধ রং বেরং এর
ফুলের বাগান, ছোট ছোট বিবিধ প্রকারের গাছপালা, ফলের গাছ, বড়
বড় চিনারবৃক্ষ সুন্দরভাবে সাজান আছে, বাগানের মধ্যপথে একটি জলের
খাল আছে, যাহা বাগানটিকে আরো আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শালিমার উদ্যান—এই উদ্যানটিও বেশ বড়, ইহা জাহাঙ্গীর ও
নূরজাহানের প্রেমের নিদর্শন। শ্রীনগর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত
এই উদ্যান, বহু জলপ্রপাত ও ফুল ও ফলের গাছে ভরপুর—সৌন্দর্য্যে কোন
অংশে কম নয়।

ডাললেক—এই লেকের আকর্ষণেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে
দর্শনার্থীরা আসিয়া ভীড় করেন। কাশ্মীরের বিখ্যাত ও অতি মনোরম

ডাললেক। লেকটি দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল এবং প্রস্থে ২০ মাইল। এই লেকের ভিতর বিখ্যাত ও মনোরম নেহেরু পার্ক অবস্থিত, লেকের ভিতরে সুউচ্চ-ভূমিতে এই পার্কটি নিম্নিত হইয়াছে, এই লেকের ভিতরে আছে চারিটি বড় চিনার বৃক্ষ, ইহাকে চারমিনার বলে। এই লেকের অন্যান্য দর্শন ও লেক ভ্রমণ আগামীকলা রবিবার-এর বাসনায় আমরা আমাদের ধর্মশালাতে সন্ধ্যা ৮টাতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। যাত্রীরা কিছু কিছু জিনিষপত্র ক্রয় করিলেন ধর্মশালার সন্নিহিতে দোকান হইতে।

শ্রীনগরে বাজারের জিনিষপত্রের দর অন্যান্য স্থান হইতে তুলনামূলক ভাবে কোন বিশেষ হেরফের নাই। শ্রীনগরের নামী ও দামী চাউন সংগ্রহ করিয়া প্রভুগণ আমাদেরকে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিতেন। এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করিতেন। প্রসাদ বিতরণের ব্যাপারে প্রভুদের কোনরূপ কার্পণ্যতা ছিল না। বৈকালবেলা দুগ্ধ সরবরাহ ও তৎসহ আপেল এবং অন্যান্য ফলফলাদিও দিতেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

গ্রন্থ-বার্তা

কবিভূষণ শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল মহাশয়ের রচিত শ্রীগৌর-গুণগাথা—

“কথা-মালা”

গীতিকাব্য-রূপে প্রকাশ লাভ করায় ভক্তগণের আদরের সম্পদ হইয়াছে এবং রচয়িতার সার্থক কবিত্বের এক অনবদ্য প্রকাশভঙ্গীর রূপায়ন ঘটিয়াছে। ভক্তি-কাব্যমোদিগণ ইহা সংগ্রহ করিলে প্রচুর তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বহুল প্রচার-বৈশিষ্ট্যই গ্রন্থখানির অবদান-সার্থকতা আনয়ন করিয়াছে।

সাধারণ বাঁধাই—৪.৫০

*

উত্তম বাঁধাই—৭.৫০

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

গ্রাম—বড় বহরকুলি

পোঃ—সিঙ্গেরকোণ (বর্ধমান)।

শ্রীগৌড়ীয়গ্রন্থ-প্রকাশনী

দেয়াড়াপাড়া রোড, মণিপুর

পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ-রঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরন আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥”

তীর্থদর্শন, ৬৪ প্রকার ভক্তাসক্তির অন্ততম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—“যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ” ।

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-মজ্জা নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল লাভ হয় না ।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

- ১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রম দির যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রমুখে সর্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমন্তাগবতাদি পাঠ, কীর্তন ও শ্রবণ ।
- ২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ ।
- ৩। চলন্ত ট্রেনেও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের পূজার্চন ও ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি দর্শনের সৌভাগ্য ।
- ৪। প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৫। সঙ্কীর্্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা ।
- ৬। রিজার্ভড্ গাড়ীতে স্বচ্ছন্দ রেলভ্রমণ ।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নিয়মানুসারে ধর্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে এই পারমার্থিক সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি ।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন ।

দর্শনীয়-স্থানসমূহ :-

- ১। মথুরা—ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি, গোপবর্নেশ্বর, দীর্ঘবিষ্ণু, ক্রুবঘাট, বিশ্রামাদি ২৪ ঘাট, অম্বরীষটীলা, রক্তেশ্বর মহাদেব, কংস-বধস্থলী, হারকাধীশ, শ্বেতবরাহ প্রভৃতি।
- ২। মধুবন, তালবন, বহলাবন।
- ৩। গোবর্দ্ধন—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, মানসগঙ্গা, হরিদেব, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কুসুম-সরোবরাদি।
- ৪। কাম্যবন—বিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, বোমাস্বর-গুহা, পিছল-পাহাড়ী, ডীং প্রভৃতি।
- ৫। নন্দগাঁও—পাবন-সরোবর, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব-কেসারী, টের-কদম্ব : বর্ষাণা, সঙ্কত, যাবটাদি।
- ৬। শ্রীবৃন্দাবন—পঞ্চকোশী-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, কেশীঘাট, কালীয়দহ প্রভৃতি দর্শন।
- ৭। বেলবন, প্রেম-সরোবর।
- ৮। মহাবন গোকুল—ব্রজাশ্রমঘাট, চৌরানীখাড়া, উত্তম্বে বন্ধনস্থলী, দাউজী ইত্যাদি।
- ৯। গম্বা, কানী (বেনারস), প্রয়াগ (এলাহাবাদ) এবং আগ্রা প্রভৃতি দর্শনেরও ব্যবস্থা থাকিবে।

—ঃ নিয়মাবলী :—

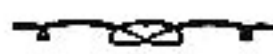
আগামী ৩রা কার্তিক (ইং ২১/১০/৭৮) শনিবার দিবা ৮ ঘটিকায় হাওড়া স্টেশনের ৭নং প্ল্যাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রীগণ ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক এক মাস সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও ভূইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৬০৫.০০ (ছয়শত পাঁচ) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক-দিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৪৫৫.০০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ১৩ই আশ্বিন

(ইং ৩০।৯ ৭৮) মধ্যে অগ্রিম ৩০৫.০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্বেই অর্থাৎ ২৪শে আশ্বিন (ইং ১১।১০।৭৮) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রীগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১৫ কিলোর অধিক না হয়; বড় স্টুটকেশ ও ট্রাঙ্ক সঙ্গে লইবেন না। সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদ্যায়ের খরচ যাত্রীগণ বহন করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় অর্থাৎ জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫।

শুদ্ধভক্ত-কুপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— অনিবার্য কারণ ও দৈব-দুর্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয়-স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজে বায়ে যানবাহন করিবেন।



শিলিগুড়ি শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে
নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও

মহা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৫ (ইং ১০।৫।৭৮) বুধবার অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সহরস্থ অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে নবনির্মিত মন্দিরে পরমহংসকুল চূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিন্ত ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর শ্রীমূর্তি অর্চাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হয়। সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমন্তকিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে সমিতির সেবকগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই উৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরিব্রাজকচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকিভূদেব শ্রোতী মহারাজ। পূর্বে প্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী ২৫শে বৈশাখ (ইং ২০১৭) মঙ্গলবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে নগরকীর্ত্তন ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়। ইহার পুরোভাগে ছিলেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাধক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। এই দিন শক্তিগড় ও জাতীয় সড়ক পরিক্রমাস্তে শীঘ্রই শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। উক্ত দিবস শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা বর্ণের বিবিধ পত্র-পুষ্প-মাল্য-কদলীরক্ষ রোপণ, তোরণ রচনা, রঞ্জিত পতাকাদি সুসজ্জিত এবং শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান হয়। বিবিধ মাসুলিক উপচ'রে সুসজ্জিত শ্রীমন্দির ও অঙ্গনাদি নবসাজে উদ্ভাসিত হইয়া অনির্বচনীয় শ্রী-ধারণ করে। সকাল ৯টা হইতে মধ্যাহ্ন-কাল পর্য্যন্ত মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে ভোগ-আরতি সমাপ্তান্তে আমন্ত্রিত, আহত, রবাহত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তকিভূদেব শ্রোতী মহারাজের সভাপতিত্বে এক মহতি সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতির নির্দেশে সভার মুখবন্ধন-ভাষণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ এই মঠের মূল ভিত্তির প্রাক্ ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং সমিতির সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরমাধ্যাতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্বের অর্হেতুকী কৃপাশীর্ষাদে ভগবদিচ্ছাক্রমে আজ এই সুন্দর অবস্থায় এসে পৌঁছিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করেন। তজ্জন্য তাঁহার সতীর্থগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার অনুগৃহীত মঠসেবকগণের প্রতি উৎসাহ-ব্যঞ্জক নির্দেশনা এবং এই কার্য্যে যাহারা শারীরিক, আর্থিক, মানসিক প্রভৃতি সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। তদুপরি শিলিগুড়িবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহানুভূতির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রচুর প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানান। তদনন্তর অধিবা-সতিধির তাৎপর্য্য এবং আগামী-কলা শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের সূচী বর্ণনা করিয়া যথাযথ ভাবে তাহাতে

সকলকে যোগদানের জন্য নিবেদন জ্ঞাপন করতঃ তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন। সভাপতির ভাষণে পূজাপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজ শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণের পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবক-প্রাণ প্রভৃতির কথা উল্লেখপূর্বক ভূয়সী প্রশংসা করতঃ সভার কার্য সমাপ্ত করিতে নির্দেশ দান করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ সুললিত বর্ণে কীর্তনধ্বনি সহযোগে সভার সমাপ্তি-কীর্তন করেন।

২৬শে বৈশাখ, বুধবার ত্রাস্ময়ুর্জ্জ্বে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অমুগৃহীতজন পূজাপাদ শ্রীমতাবিগ্রহ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীগুরুষ্টক, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ শ্রীকেশবাষ্টক, তদুপরি বিভিন্ন জনে শ্রীল প্রভুপাদ-দশকম্, গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, শঙ্করত্ব তথা বহুপ্রকার আতিশ্রুচক দস্তাভূক প্রার্থনা গীতি-কীর্তন মঠকে মুখরিত করিয়া তোলে। এরপর পূজাপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচবিতামৃত পাঠমুখে অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

তদনন্তর পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। একদিকে উচ্চ শ্রীহরি নাম-কীর্তন অন্যদিকে মাতুলিক দ্রব্যাদির সমারোহ। যজ্ঞের নিয়মানুযায়ী প্রস্থানত্রয় পাঠ করিয়াছেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ ন্যায়প্রস্থান (বেদান্ত); ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ক্রতিপ্রস্থান (উপনিষৎ); শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী স্মৃতিপ্রস্থান (যথাক্রমে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত) পাঠ করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে গৌরহিত্য করেন শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহভাজন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবদেব শ্রোতী মহারাজ, যজ্ঞকর্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, হোতা শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং উদ্যাতা শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ ও আরও অনেক বৈষ্ণবগণ। মুহূর্ভঃ উলুধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টার নিনাদ ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের উচ্চধ্বনি পরিবেশকে ভাবগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে পুরুষমূর্ত্ত-মন্তোচ্চারণ ও শ্রীগুরু-গৌরাদেব জয়ধ্বনি তথা যজ্ঞের ধূম দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত হইতেছিল। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা সমাপ্তান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীল শ্রোতী মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিলে উপস্থিত সহস্র সহস্র দর্শনার্থীগণ উৎফুল্লিত

হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-রাধা-বিনোদবিহারী-জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউর জয়ধ্বনি এবং রমণীগণের উলুধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করায় ভক্তগণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। তদনন্তর মধ্যাহ্নে ভোগারতি করেন শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভু ও পূজাপাদ শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজের মূল গায়কত্বে সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসে আরতি-কীর্তন। কীর্তনান্তে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীগুরুবর্গ তথা-বিষয়-বিগ্রহ ও পার্শ্বদগণের জয়ধ্বনি করেন।

তদনন্তর উপস্থিত আমন্ত্রিত, আহৃত, ববাহৃত সহস্র সহস্র জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এমনকি আগন্তুক যাত্রাই আকর্ষণ মহাপ্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। বৈকাল ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত অব্যাহত দ্বারে এই ভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐদিন গোপুলীলগে সন্ধ্যারতি অন্তে মহাজন গীতি-কীর্তন হইলে পর এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এইদিন সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদ্য বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার পুরোভাগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদ্য হরিজন মহারাজ বিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে এক সাবলীল গতিতে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নাম যেমন উভয়েই অভিন্ন এবং অপ্রাকৃততত্ত্ব তদ্রূপ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-বিচার সহীয়া উহার তত্ত্ব কখনই অবগত বা অনুভূতি-মধ্যে আনা সম্ভব নহে। “উহা একমাত্র জীবের ঐকান্তিক সাধনা লব্ধ ও ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ”, বলিয়া ব্যক্ত করেন।

পূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে “প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দন”—কথার সার্থকতা প্রতিপাদনপূর্বক শ্রীবিগ্রহ যে সাধারণ প্রতিমা নহেন তাহার নিগূঢ়ত্ব দ্বারা প্রকাশ করেন। এর পরেও শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ পদ্মনাভ মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় সভাপতি মহারাজ সংক্ষেপত শ্রীবিগ্রহ ও প্রতিমার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত রাখেন। পরে পূজাপাদ সত্যবিগ্রহ প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে “গায় গোরা মধুর স্বরে....” কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

২৭শে বৈশাখ ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে মঙ্গলারতি অন্তে সংক্ষেপত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে সকাল ৭টায়া বিরাট এক জনসমাবেশে সমিতির মূলবেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় গঠ হইতে আগত শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয় বিগ্রহ চতুর্চক্রযানে সুসজ্জিত

করিয়া কীর্তনসহযোগে নগর পরিক্রমার আয়োজন হয়। উক্ত শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে শোভমান বিজয় বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী তথা সজ্জনগণ মিলিত হইয়া উচ্চশব্দকারী যন্ত্র-সাহায্যে গগণ-বিষোষিত করতঃ শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্তন করিতে করিতে নগর পরিক্রমার ব্যবস্থা হয়। এই অভূতপূর্ব ধর্মীয় শোভাযাত্রা দর্শনে শ্রদ্ধালু জনগণ তাঁহাদের ভক্তার্ঘ্য তথা সামর্থ্যানুযায়ী অনেকে বিবিধ-প্রকার উপকরণ এবং উপঢৌকনাদি অর্পণ করেন। এইভাবে পদব্রজে ভক্তগণ যখন শ্রীমন্মহা-প্রভুকে অগ্রভাগে রাপিয়া নৃত্য-কীর্তন করিতে করিতে নগর-পরিক্রমা করিতেছিলেন, তাহারই সন্ধিক্ষণে ভক্তগণের ক্রেশ লাখব করার জন্যই যেন বৈশাখের প্রখর রবির তেজও স্থান হইয়া শীতলরূপ ধারণ করে। তাই সুদীর্ঘ ৫৬ ঘণ্টা পথ-পরিক্রমা করিলেও বিশেষ কষ্টদায়ক হয় নাই, পরন্তু বৈষ্ণবগণ সজ্জনগণের প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছিলেন। সহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমাশ্রেণী মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

তদনন্তর মধ্যাহ্ন আরতি সমাপ্ত হইলে চর্কা, চুষা, লেছা, পেয় উপকরণাদি নিবেদিত প্রসাদ আগত ভক্তগণকে বিতরণ করা হয়।

অপরাত্নে কীর্তনধ্বনি ভক্তজন-হৃদয়ে পুনঃ আনন্দের বন্ধ্যা এনে দেয়। সন্ধ্যার আগমনকালে যথারীতি আরতির ঘণ্টা বেজে উঠে। শ্রীপাদ জগন্নাথ-দাস ব্রহ্মচারী প্রভু এই দিন আরতির উপায়ন নিবেদন করেন। আরতি অশ্রেণী শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি সমাপ্ত হইলে এই দিনেও সমিতির আচার্য্যপাদের সভাপতিত্বে ধর্মসভার আয়োজন হয়। এই দিনেও শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব, ভগবদ্‌তত্ত্ব, ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ-তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভাষণ দান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভাবগন্তীর দ্বারায় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যক্ত করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

২৮শে বৈশাখ প্রত্যুষে যথারীতি মঙ্গল আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরুষ্টক, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীপঞ্চ-তত্ত্ব এবং দন্ড-বিজ্ঞপ্তি আতিথ্যসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্তন কীর্তিত হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ছোট বিপ্র, বড় বিপ্রের উপাখ্যান শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ পাঠ করেন। তদনন্তর পূর্বদিনের ন্যায় এই দিনেও শোভাযাত্রা সহযোগে নগর-কীর্তনের ব্যবস্থা হয়। উক্ত দিবসে

পূর্বদিনের অপেক্ষা আরও অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। মধ্যাহ্নেব সন্ধিক্ষণে শোভাযাত্রা প্রত্যাবর্তন করিয়া মঠে উপনীত হইলে শ্রীপাদ কানাই-লাল ব্রহ্মচারী প্রভুর “নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে ……” কীর্তনখানি মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে থাকে। তৎপর মধ্যাহ্ন-ভোগারতি সমাপ্তান্তে সহস্র সহস্র আগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসেও অপরাহ্নে কীর্তন-নিবাদ মঠকে মুখরিত করে। এই দিন সন্ধ্যায় আরাতি করেন উক্ত মঠের অতীতম প্রাণ-সঞ্চারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ এবং আরাতি-কীর্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ। তদনন্তর শ্রীমন্নির-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে এই দিনেও এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজ-জীবনে মঠ-মন্দিরের আবশ্যিকতা বিষয় লইয়া বৈষ্ণবগণ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ রমাপতি ভক্তসুহৃদ প্রভু, শ্রীভুভানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাদের বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে পূজাপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ সভাপতির ভাষণে সুসমাজ-জীবনে মঠ-মন্দিরের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা বিভিন্ন যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর কীর্তনান্তে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

পূর্বপ্রচারিত অনুষ্ঠান-স্বর্গী অমুঘাঘী অজ্ঞ হইতে এখানকার উৎসব-পঞ্জী সমাপ্ত হেতু রাত্রেও আগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বলা বাহুল্য এই উৎসবে প্রত্যাহ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই এই অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এই উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পাদনায় ষাণ্মারা ষাণ্মারা সহায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি সমিতির সেবকবৃন্দ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

—শ্রীবৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

স বৈ পুংসং পুরো ধর্মো যতো ভক্তিৰধোকজে ।

ধর্মঃ সঙ্কল্পিতঃ পুংসং বিশ্বক্বেসম কথাস্থ যঃ ।



নোৎপাদয়েদ্যদি রুতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না হুপ্রদীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে সেই জন ।
হরি-কথায় রুতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩০শ বর্ষ	{	সঙ্করগ, ২৭ বামন, ৪৯২ গৌরাক	{	৫ম সংখ্যা
		সোমবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮৫ : ইং ১৭।৭।১৯৭৮		

সান্ন্যাসাদঃ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর-বিরচিতম্]

সংসাররূপে পতিতোহতাগাধে

মোহাক্ষপূর্ণে বিষয়াভিতপ্তে ।

করাবলম্বং মম দেহি বিষ্ণো

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫০ ॥

আমি মোহাক্ষকার-পরিব্যাপ্ত, অতিশয় তপ্ত বিষয়রূপ বিষে পরিপূর্ণ,
গভীর সংসাররূপে নিপতিত হইয়াছি । হে বিষ্ণো ! হে গোবিন্দ ! হে
দামোদর ! হে মাধব ! আপনার শ্রীকর-কমলাবলছনদানে আমায়
ত্যাগ করুন ॥ ৫০ ॥

স্বামের যাচে মম দেহি জিহ্বে

সমাগতে দণ্ডধরে কৃতান্তে ।

বক্তব্যমেবং মধুরং সুভক্ত্যা

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫১ ॥

হে-জিহ্বে ! তোমার নিকটে এই যাক্রা করিতেছি যে, দেহাবসানে
যে সময় দণ্ডপানি যম সমাগত হইবে, তখন তুমি “হে গোবিন্দ ! হে
দামোদর ! হে মাধব !”—এই সুমধুর নামসকল প্রেমভরে গান করিতে
থাকিবে ॥ ৫১ ॥

ভক্তস্য মন্ত্রং ভব বন্ধমুক্ত্যে

জিহ্বে রসজ্ঞে সুলভং মনোজ্ঞম্ ।

বৈপায়নাতৈর্মুনিভিঃ প্রজপ্তং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫২ ॥

হে রসাস্বাদনকারিণি জিহ্বে ! তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ
করিবার জন্য ব্যাসপ্রমুখ মুনিবৃন্দগীত “গোবিন্দ, দামোদর, মাধব”—এই
সকল সহজলভ্য, মনোমুগ্ধকারী নামরূপ মন্ত্র জপ কর ॥ ৫২ ॥

গোপাল বংশীধর রূপসিন্ধো

লোকেশ নারায়ণ দীনবন্ধো ।

উচ্চস্বরৈস্ত্বং বদ সর্বদৈব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৩ ॥

হে জিহ্বে ! তুমি সর্বদা “গোপাল, মুরলীধর, রূপসিন্ধু, লোকেশ,
নারায়ণ, দীনবন্ধু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” এই নামসমূহ উচ্চৈঃস্বরে
বলিতে থাক ॥ ৫৩ ॥

জিহ্বে সর্বদৈব ভক্ত সুন্দরাণি

নামানি কৃষ্ণস্য মনোহরাণি ।

সমস্তভক্তাঙ্কিবিনাশনানি

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৪ ॥

হে জিহ্বে ! তুমি ভক্তবৃন্দের ক্লেশবিনাশক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর, মনোহর
“গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” নাম সর্বদা ভজন করিতে থাক ॥ ৫৪ ॥

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে,

গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ ।

গোবিন্দ গোবিন্দ রথাজপাণে,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৫ ॥

হে জিহ্নে! তুমি “হরি, মুরারি, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” এই কৃষ্ণের নাম সকল সর্বদা গান কর ॥ ৫৫ ॥

সুখাবসানে হৃদমেব সারং

দুঃখাবসানে হৃদমেব গেয়ম্ ।

দেহাবসানে হৃদমেব জাপ্যং

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৬ ॥

‘গোবিন্দ, দামোদর, মাধব’—এই নামসকল সুখের অস্ত্রে একমাত্র সার, দুঃখের শেষে ইহাই গান করা কর্তব্য এবং দেহত্যাগকালে ইহাই জপ্য ॥ ৫৬ ॥

দুর্ব্বারবাক্যং পরিগৃহং কৃষ্ণা

মৃগীৱ ভীতা তু কথং কথঞ্চিং ।

সভাং প্রবিষ্টামনসাজুহাব,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৭ ॥

ক্রৌপদী (কৃষ্ণা) দুঃশাসনের অনিবারণীয় দুর্ব্বাক্য শ্রবণে কোনও প্রকারে ভীতা হরিণীর ন্যায় সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ‘গোবিন্দ, দামোদর, মাধব’ বলিয়া মনে মনে বিপদহারী মধুসূদনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধাবর গোকুলেশ

গোপাল গোবর্দ্ধননাথ বিষ্ণো ।

জিহ্নে পিবত্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৮ ॥

হে জিহ্নে! তুমি “শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধানাথ, গোকুলপতি, গোবর্দ্ধন-গিরিধারী, বিষ্ণু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব”—এই নামামৃত পান কর ॥ ৫৮ ॥

শ্রীনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে

শ্রীদেবকীনন্দন দৈত্যশত্রো ।

জিহ্নে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৯ ॥

হে জিহ্নে! তুমি “শ্রীনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, শ্রীদেবকীনন্দন, দৈত্যনাশন, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব”— এই সকল নাম-সুধা পান কর ॥ ৫৯ ॥

গোপীপতে কংসরিপো মুকুন্দ,

লক্ষ্মীপতে কেশব বাসুদেব ।

জিহ্নে পিবস্বামৃতমেতদেব,

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬০ ॥

হে জিহ্নে! তুমি “গোপীপতি, কংসারি, মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতি, কেশব, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব”— এই সকল নাম-পীযুষ পান করিতে থাক ॥ ৬০ ॥

(ক্রমশঃ)

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের

আবির্ভাব-তিথি

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা

অতঃ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অস্বাভিলাষী ছিলেন না, তিনি কণ্ঠবীর ছিলেন না এবং তিনি নির্ভেদ ব্রহ্মাণ্ড-সন্ধিংসু ছিলেন না। ঠাকুর মহাশয় ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন, ভগবানে সতত ভক্তিয়োগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ভগবদ্ভজনে অস্থিত ছিলেন।

ভক্তি, ভক্তিয়োগ ও ভক্তনীর জ্ঞান—অন্যভিলাষী, বন্দী ও জ্ঞানীর নশ্বর ফলু চেষ্টার জায় অকিঞ্চিৎকর মাত্র নহে। কালের দ্বারা উৎপত্তিশীল স্থিতিবান্ ও লয়ধর্ম্মাধীনে যে-সকল নশ্বর ভাবের উদয় হয়, ভগবানে নিত্য ভক্তি সে-জাতীয় প্রাকৃত আধার মাত্র নয়। ভক্তি আত্মার নিত্যবৃত্তি; এই নিত্যবৃত্তি যে-কালে প্রাকৃত অখণ্ডজ্ঞান-ধারণায় আবৃত হয়, সে-কালে জীব মায়াবাদী বা প্রকৃতিবাদী হইয়া পড়েন।

ঠাকুরের ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ ত্যাগ

ঠাকুর মহাশয় কোনদিন প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীর অযোগ্য-মতকে নিত্য-সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি অনান্দ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মার সহিত ভ্রান্তিময় দর্শনে এক বস্তু বলিয়া ধারণা করিবার উপদেশ দেন নাই। মায়াবাদীর হ্রায় কোনদিন উপাস্ত ও উপাসকের সমন্বয় আকাজক্ষা করেন নাই। মায়াবাদীর হ্রায় মুক্তিকালে চেতনরহিত ত্রিগুণ সাম্যাবস্থাকেই জীবের পরাবস্থা বলিয়া ভ্রমমত প্রচার করেন নাই। প্রচ্ছন্ন মায়াবাদীর হ্রায় মুক্তিকালে নির্বিশিষ্ট চিন্মাত্র-বাদের সহিত অচিন্মাত্র-বাদের সমন্বয়তা স্বীকার করেন নাই।

ঠাকুর অধোক্ষজ-সেবার নিত্য প্রচারক

তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত অধোক্ষজ সেবার নিত্য প্রচারক ছিলেন, আছেন ও নিত্যকাল থাকিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভাষা-জ্ঞানের সাহায্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। বাঁহারা স্বয়ং ভাগবত না হইয়া, ভক্তিরযোগে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অনিত্য ভাব-সংগ্রহের দাস্যে গ্রন্থের পাঠকমাত্র অভিমানে অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া ভাগবত পড়িতে যান, স্তম্ভিতে সময় নষ্ট করেন, এবং নিজ খণ্ড বাহুজ্ঞানকে সম্বল করিয়া শ্রীব্যাসের সমাধিলব্ধ ভক্তিরযোগকে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-বিশেষ বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা ভক্তির হরুপকে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সোপান-বিশেষ মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া বা মিছা-ভক্ত-শ্রেণীতে আপনাদিগকে গণনা করেন মাত্র। ঠাকুর মহাশয় এরূপ প্রাকৃত সহজিয়া কর্ম্মগীরের কোন আদর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মাটিয়া বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লভ্য নহে

তিনি অনেক সময় বলিতেন,—বাঁহারা নিত্যসেবাবৃত্তি-বঞ্চিত হইয়া আত্মধারণায় প্রতিষ্ঠিত মনে করেন, সেই “মাটিয়া চিন্তারত” জীবগুলি অপ্রাকৃত বস্তু-বৈচিত্র্যে প্রবেশলাভ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়াছে। ভগবৎ-সেবারিখুগণ কৃষ্ণোত্তর বস্তুর ভোজ্য কল্পনা করিয়া প্রতাক্ষ-অনুমানাদি নানা-প্রকার বৃত্তিবশে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চালনাপূর্বক নিত্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন মাত্র। এইরূপ অনান্দ চেটাধারা ভগবানের ভক্তির ও হরিপ্রেমার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

প্রকৃতিবাদী, মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী, হঠযোগী, রাজযোগী

প্রভৃতি দুঃসঙ্গ বিধায় ত্যাজ্য

জড়পদার্থ-ভোগোন্মত্ত হইয়া বহুজীব আপনাদিগকে প্রকৃতিবাদী, মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী, হঠ বা রাজযোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি বিভিন্ন বেশে সজ্জীভূত করিয়া কৃতার্থ মনে করে, কিন্তু অধোক্ষজ-সেবাপন্ন ভক্তগণ ইহাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়ে ইন্দ্রিয়তৎপর জানিয়া তাহাদিগের দুঃসঙ্গ করেন না।

গৌরহরির তাঁহার নিজজন শ্রীল ঠাকুরকে

নিজাভীষ্ট প্রচারে প্রেরণ

আত্মবিৎ ভক্তের অমল পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ বাতীত জীবের নিত্য-গতিলাভের আর অণু উপায় নাই। অনায়-প্রতীতি দ্বারা জীব জড়-ভোগ্য বস্তুকে ব্রহ্ম, মায়া, আত্মা, চৈতন্য প্রভৃতি কল্পিত সংজ্ঞাসমূহ প্রদান করিয়া সত্যভ্রষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-নিহিত সত্য শ্রীমদ্ব্যাক্তিবিদ্যে এবং তাঁহার পার্শ্বদ-ভক্তগণ প্রচার করিয়াছেন। কালে তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইলে শ্রীভগবান্ গৌরহরির নিজেচ্ছাক্রমে তাঁহার নিজজন শ্রীমদ্ব্যাক্তিবিদ্যে ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীগৌরান্দের প্রকটকালীণ সেবা-প্রবৃত্তি ইহভগতে জীব-জন্মদে পুনরুন্মেষিত করিতে প্রেরণ করেন। ভক্তরাজ, শ্রীগৌরহরির নিজাভীষ্ট কীর্তন-প্রচার-প্রণালী আপনাদের সকল জীবের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য নানাবিধ সেবাপথে সত্যের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। আসুন, আমরা সেইগুলির কি পরিমাণ গ্রহণ করিতে সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছি। একবার দেখিবার সুযোগ পাই।

উপাস্ত-সম্বন্ধে ঠাকুরের শিক্ষা

উপাস্ত-বিষয়ে আমরা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম বাঁহার অঙ্গকাঙ্ক্ষি, পরমাত্মা ভূমা বাঁহার আংশিক প্রকাশ-বিশেষ, সেই অদ্বয় ভগবদ্বস্তই জীবের নিত্য সেবা বস্তু।

ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, জাতার-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে সেবার্ত্তি-রহিত, সান্নিধ্য-রহিত দূরস্থিত আংশিক অনুভূতি মাত্রের উপলব্ধি কিছু পুরুষার্থ শব্দবাচ্য হইতে পারে না।

পরমাত্মার উপাসনায় সান্নিধ্য থাকিলেও নিত্য-সেবা-ধর্মরূপা রতির অনুদয়ে-জ্ঞেয় বস্তু-বিজ্ঞানে আংশিক যোগসিদ্ধ হইলেও তাহা ভগবন্তের খণ্ড প্রতীতি মাত্র।

ভগবতুপাসনা অথও অপ্রাকৃত ; ব্রহ্মজ্ঞানে ও পরমাত্ম- সান্নিধ্যে মাটিয়া বিচার প্রবল

অথও অদ্বয়জ্ঞান ভগবৎপ্রতীতির অভাবে যে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্ম-সান্নিধ্য, তাহা জড়াতীত হইলেও তাহাতে “মাটিয়া বিচার” প্রবল থাকে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়যুক্ত, জ্ঞাতার অধিষ্ঠানের ক্ষণভঙ্গুরতা জ্ঞেয়ের চিরাদিষ্ঠানের বাধাতকারণী। একমাত্র ভগবতুপাসনা প্রকৃতির অতীত চিন্ময় রাজ্যস্থিত স্বয়ীকের দ্বারা নিত্য স্বয়ীকেশের সেবার সম্ভাবনা বর্তমান। ব্রহ্মজ্ঞান বা অনাত্ম বিদ্যোগরাহিত্যাত্মক-যোগ সাহিত্য-সেবার অনম্যকৃ দর্শন বা খণ্ড সান্নিধ্য বলিয়া অচিদবিমিশ্র কেবল চিন্ময় আত্মার সেবা বস্তু নহেন।

ঠাকুরের গ্রন্থরাশি নিত্য মঙ্গলের নিদান

ঠাকুর মহাশয়, সর্বকাল জীবের মঙ্গলের জন্ত কয়েকখানি গ্রন্থে নিত্যোপাসকের উপাস্য, উপাসনা ও প্রয়োজন বিষয়ে প্রাকৃত বিচার বিদূরিত করিয়া জীবের সহজ নির্মল নিত্য কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান দিয়াছেন এবং শ্রীগৌরহরির অপার-বদান্তে আমরা তাঁহার ভক্তের মুখেই প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নিত্য-বর্তমান সত্যের সকল কথা শুনিবার অবসর পাইতে পারি, কিন্তু আমাদের ভাগ্যের দোষে যদি ভক্তিপথকে একমাত্র আত্মার অবিচ্ছিন্ন বৃত্তি বলিয়া জামিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের আর তুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না।

ভক্তের আবির্ভাব-তিথি-পূজা

কোণী কোণী জন্ম নশ্বর স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের সেবার কাটাইয়া পরমার্থ-বঞ্চিত হইলাম এবং বঞ্চিত হইবার জন্ত কতই না চেষ্টা করিলাম, এখনও যদি পুনরায় তাহাই করিয়া বসি, তাহা হইলে আর ভক্তের আবির্ভাব-তিথির পূজা করিতে পারিলাম না। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের হরিবিমুখ অনিত্য কার্যে মনোযোগ দিবার সময় আছে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের সর্বোপেক্ষা সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটু সামান্য সময় মাত্র দিবার অবকাশেরই অভাব। ইহাকেই বলে ভাগ্য।

সুকৃতিশালী জীবের পক্ষেই ভক্ত-সান্নিধ্য ঘটে

সুকৃতি-প্রভাবেই জীবের ভগবন্তের সান্নিধ্য লাভ ঘটে, ভক্তের প্রসাদ লাভ ঘটে। যাহাদের সুকৃতির অভাব তাহাদের অনেকেই মিছাভক্তকে,

প্রাকৃত সহজিয়াকে, নিসর্গপিচ্ছিল প্রেমাভাসকে সত্যবস্তুজ্ঞানে কতই না স্মৃতি মনে করিয়া, ভগবানের সেবা হইতে সূদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া অহঙ্কার-পর্বতের শিরোভাগে পদবিক্ষেপপূর্বক, মুখে তৃণাদপি সুনীচ-সজ্জায় কপটতার ভাণকেই ভক্তির স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। সেই কপট প্রাকৃত সহজিয়াগণের অসৎ চিত্তবৃত্তিতে প্রকৃত ভক্তি দেখিতে পাইলে ভগবদ্ভক্তগণের কতই না গরসা বাড়িয়া যায়।

ঠাকুরের সেনকের সঙ্গ করিলে ঠাকুরকে জানা যায়

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাবদান্ত কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কত প্রিয় বস্তু তাহা জানিবার বৃত্তিসমূহ ইন্দ্রিয়তর্পণে যাহাদের আবৃত রহিয়াছে, তাহারা তাঁহার অনুগত সেনকের সঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই নিকটে ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে তাহাদের আবৃত্তি উন্মোচিত হইবে। জগতের নানা অভাবের পেষণে ত্রিবিধ দুঃখে সর্বক্ষণ নিম্পেষিত হইতে হইবে না। আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভের আর অন্য উপায় নাই।

নিজের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান ভক্তির বাধক

শ্রীগুরু সেবাতেই ভক্তি লাভ

প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া যাহারা অনুমান ও আপ্তবাক্যের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহারা কোনদিনই ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন না। উহা ভক্তিরাজ্যে যাইবার পথ নহে। ভক্তিরাজ্যে যাইবার পথ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে লাভ্য। নিজের প্রত্যক্ষ, অনুমান, ত্রুটিহ প্রভৃতিকে সহল করিয়া কখনই ভক্তির বা ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐগুলি ইন্দ্রিয়-তর্পণ মাত্র; ভক্তির পরম বিরোধী বস্তু।

যাঁহার চরিত্রের অত্যেক ক্রিয়ায় ভক্তি স্মৃষ্টভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃপালুগবর শ্রীঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথি পাঠকবর্গের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করুক দেখিয়া আমরা সুখী হই।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্তিত

অনুষ্ঠানে শাস্ত্রাঃ—

ক) প্রচার-কার্য্যে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-মত ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সভা পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের

অভিপ্রায়-মত তিনি **শ্রীনাম-হট্টের পুনরুদ্ধার** করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছামত তিনি **শ্রীনবদ্বীপধাম উজ্জল** করিবার অভিপ্রায়ে **শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা** সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-মত তিনি **শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ** বিস্তৃতভাবে পুনর্গঠনের জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাহার অনুগত বলিয়া আলমুখর উজ্জয়-কারিদল ভক্তির কোন অনুষ্ঠানেই কার্যমণ্ড্যবাক্যে যত্ন করিতেছেন না।

খ) **কীর্ত্তনমুখে** শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে তিনি নানাবিধ ভক্তজন-সঙ্ঘে, হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় ও বহু দেবালয়ে হরিকথা বলিবার প্রথা স্থাপিত করেন। তাহারই অনুকরণে তাহার অনুসরণ পরিহার করিয়া পুনরায় আবার ভাড়াটিয়া বক্তার দল স্বীয় উদর-ভরণ ও স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনোপযোগী জীবিকাতে তাহা পর্য্যবসিত করিয়া হরিকথা প্রচারে নিকার উপস্থিত করিয়াছেন। শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার প্রথার অনুকরণে একদল ভূতকাজীবী তাহার অনুসরণ করিতে গিয়া উপার্জন-দ্বারা আচার্য্যের কাষে বিষয়ঙ্গ উৎপন্ন করিয়াছেন।

গ) **শাস্ত্র-প্রচারে** তাহার অতুলনীয় বিদ্যোৎসাহিতার অনুকরণে তাহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থপ্রচার চলনায় উদরভরণ ও স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনাদিতে বাস্তব থাকায় অনেক ব্যবসাদার প্রচার-কার্য্যে জঞ্জাল উপস্থিত করিয়া স্ব-স্ব চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছেন।

ঘ) **ভক্তিপথে সহায়কার্য্যে** তাহার দীক্ষা-শিক্ষাদিকে নিজ ও স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণের যত্ন-বিশেষে পরিণত করিয়া ভক্তিপথকে কটকাকীর্ণ করিতেছেন।

ঙ) **বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃস্থাপনে** ঠাকুর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় পথকে কটকিত করিয়া বৈষ্ণব-সমাজকে নানাপ্রকারে কলঙ্কিত করা কখনই ভক্তিমান অনুগত মণ্ডলীর কার্য্য নহে। তাহার প্রদর্শিত পথে শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ পুনর্গঠন না করিলে এবং তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিলে হরিকথা জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে—একথা যাহারা ভাবেন না, তাহারা অচিরেই হরিবিমুখতার পরাকাষ্ঠার মরণের পথে ধ্বংস হইয়া যাইবেন।

চ) **বৈষ্ণব-স্মৃতি-প্রচারে** ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ পরিহার করিয়া নাস্তিক বা পক্ষোপাসক সমাজের আনুগত্যে আচার্য্যানুগমন পরিত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প, বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় নহে।

ছ) সাময়িক পত্র প্রচারের দ্বারা দূর্বস্থিত ভক্তিমান জনগণ ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ করিবার কতই না সুযোগ পাইয়াছিলেন। আবার তাঁহার অমুদ্রণে তাঁহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া উদর-চেঁচায় ও প্রতিষ্ঠাশায় জর্জরিত হইয়া যে-সকল মৎসর জীব হরি-কথার চলনা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা কালের করাল কবলে পতিত হইয়া প্রচার-কাৰ্য্য হইতে বিরাম লাভ করিয়া নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সুযোগ করায় ধ্বংসের পথের পথিক হইয়া গিয়াছে।

জ) কাল-প্রচারকার্য্যে ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণে সে-সকল ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা নানাপ্রকার মৎসরতা-জালে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ সংখ্যায় একবৎসর বাড়াইয়া শ্রীষ্টানি পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যে যে মাস-নামানিতে শ্রীনামাশ্রয় কার্য্যের সাহায্য হইত, তাহার মধ্যে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার অভাবে সেগুলির আর আদর নাই।

ঝ) বিজ্ঞোৎসাহিতার উন্নতিকল্পে জগতের কল্যাণের জন্য শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অনুমোদিত হরিশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রদান কার্য্য প্রাপ্ত পণ্ডিত-প্রতিভায় বিকৃতিলাভ করিতে চলিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ পরিহার করিয়া মৎসরতা-বশে ভক্তিবিরোধ-মানসে জাগতিক সমৃদ্ধি আদরের বিষয় নহে।

ঞ) মঠ-মন্দির ও ভক্তিস্থানাদির সংরক্ষণে ঠাকুর মহাশয়ের যত্ন পরিহার করিয়া তাহার যে-সকল শিল্পকর নিজ নিজ কার্য্যে বাস্ত, তাহারা শ্রীগুরুদেহ-বাতীত অন্য কোন ভজনের অনুষ্ঠান না করায় জগতে অসাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে চলিল। শ্রীগৌড়সুন্দরের নিজাভীষ্ট প্রচারের বিকল্প আচরণ করিয়া কখনই ভক্তকরগণের কোন সুবিধা হইবে না।

ভজনে আলস্য থাকিলে কখনই শ্রীগুরুদেহের সেবা হইবে না। ভজন কিছু নাস্তিকের, পথোপাসকের বা অত্যাভিলাষীর জীয়াবিশেষ নহে। শ্রীগুরু-গোরাচন্দ্রের বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সেবার জন্য যে নিরুপট ভক্তগণ কায়মনোবাক্য সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র আশার স্থল। পূর্ব্বোল্লিখিত ঠাকুর মহাশয়ের অনুষ্ঠানাবলীর উদ্দেশ্যে সেবা না করিয়া নিজ নিজ কল্পিত আলস্য কখনই জীবে দয়ার পরিচয় নয়। যদি হরিভজনে অনুরাগ থাকে, বা মায়ার বন্ধন মুক্ত হইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে—

“তাতে কৃষ্ণে ভজে করে গুরু সেবন ।

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”—পুনঃ পুনঃ আলোচনা

করিলে অবশ্যই সুফল লাভ ঘটিত । *

(৩) প্রজ্ঞা

‘প্রজ্ঞা’ কাহাকে বলে, এবং তাহা ভক্তিবিরোধী

পরস্পর কথোপকথনের নাম জ্ঞান বা ‘প্রজ্ঞা’ । জগতে সম্প্রতি বহির্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত জ্ঞান করিতে গেলেই প্রায় বহির্মুখ-জ্ঞান হইয়া পড়ে । সুতরাং ভক্তিসাধকের পক্ষে জ্ঞান শ্রেয়স্কর নয় ।

ভক্তির অনুশীলনে অনেক প্রকার জ্ঞান হইতে পারে । সে-সমুদয় ভক্তদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক । শ্রীরূপ স্বয়ং স্বীয় ‘কার্পণ্য-পঞ্জিকা’-স্তোত্রে লিখিয়াছেন—

তথাপ্যামিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নাম-জ্ঞানি ।

অবজ্ঞানদনিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম ॥ (কাঃ পঃ ১৬)

এই তাৎপর্য্যে বৈষ্ণবগণ এই পদ্যটি পাঠ করিয়া থাকেন—

তথাপি এ দীন-জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,

নামাভাস করিল জীবনে ।

সর্বদোষ-নিবারণ,

হুই-নাম-সংজ্ঞান

প্রসাদে প্রসীদ হুই জনে ॥

কীর্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচারণ—এ সমস্তই জ্ঞান ; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবের সহিত অহং-অভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে-সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে ।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত প্রজ্ঞাই ভক্তিবিরোধী । সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজ্ঞা পরিত্যাগ করিবেন ।

মহাজনানুগত প্রজ্ঞা আদরণীয়

মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই । মহাজনগণ যে-সমস্ত প্রজ্ঞা আদর-পূর্ব্বক করিয়াছেন, তাহাই কেবল আগাদের কর্তব্য । কোন কোন অতিভক্ত

* জগদগুরু শ্রীল নৃসিংহদেব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-বাসরে চিদ্বিলাস পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রদত্ত ভাষণ ।

পুরুষ সর্বপ্রকার প্রজন্ম পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু আমরা শ্রীকৃষ্ণভগ্ন, কপের অনুগত হইয়া তদাদিষ্ট সাধুগণের পথানুগমনে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকিব। যথা—

স মুগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবজ্জিতঃ।

অনবাপ্তশ্রমং পূর্বে যেন সন্তুঃ প্রতস্থিরে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত স্থান্দ-৭৮ন)

যে-পথে পূর্বে সাধুগণ অনায়াসে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্তাপবজ্জিত শ্রেয়ঃসাধক পন্থা সর্বদা আমাদের অব্বেষণীয়।

বাস, জুত, প্রহ্লাদে, সী শ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্শ্বদবর্গ যে-পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সে-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিশুকদিগের উপদেশ ক্রান্তিতে বাধা নই। সমস্ত মহাজন-গণ হরিভক্তি-সাধক প্রজন্মকে আদর করিয়াছেন। তাহা আমরা স্থলবিশেষে বিচার করিব।

প্রজন্মের প্রকার-ভেদ ও তন্মধ্যে (১) বৃথাগল্প

বহির্মুখ প্রজন্মই ভক্তি-বান্ধক। তাহা বহুবিধ। (১) বৃথাগল্প, (২) বিতর্ক, (৩) পরচর্চা, (৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষাহসঙ্গান, (৬) মিথ্যা-জল্পনা, (৭) সাধু-নিন্দা, (৮) গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই ‘প্রজন্ম’।

(১) বৃথা-গল্প অতীব অতিক্রম। ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জনে হরিনামাদি স্মরণ করিবেন। গীতা বলিয়াছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি যত্র ভজন্তে মাং বৃথা ভাবসমহিতাঃ ॥

মচ্ছিত্রা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুচ্ছান্তি চ রমন্তি চ ॥ (গীঃ ১০।৮-৯)

অনুব্রতঃ—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দূতব্রতাঃ।

নমস্তন্তশ্চ মাং শুক্লা নিতামুक्ता উপাসতে ॥ (গীঃ ৯।১৪)

এইরূপভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্ত-ভক্তির অনুরোধ করিবেন। যদি বহির্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে ‘সর্বদা আমার নাম কীর্তন করিবে’—এই উপদেশ পালন করা হয় না।

সংবাদপত্রে অনেক বৃথা-গল্প থাকে। ভক্তি-সাধকগণের পক্ষে সংবাদ-পত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য। তবে কোন বিদ্বৎপুঙ্ক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়। গ্রাম্য-লোকেরা আহা-বাহা-করিয়া প্রায়ই ধূমপান করিতে করিতে অল্প বহির্নুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে রূপানুগ চণ্ডা বড়ই কষ্টিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জানোপাখ্যানের স্থায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

(২) বিতর্ক প্রজ্ঞার অন্তর্গত

(২) বিতর্ক একটা ভক্তিবাদক প্রজ্ঞা। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তাত্ত্বিক-গণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্নুখ বিবাদ মাত্র। চিন্তের বলক্ষয় ও চাঞ্চল্য-বৃদ্ধি বাতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদ (কঠ—১২৯) বলিয়াছেন যে—“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেয়া”। জীবের স্মৃতি সহজ-বুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎ-পাদপদ্মে-স্বভাবতঃ চালিত হয়; কিন্তু দিক্, দেশ, ব্রহ্ম, প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কর্কশ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বাভাবিক শুদ্ধমতি থাকে না। বেদে যে দশমূল উপদিষ্ট আছে, তাহা স্বীকার করতঃ তদনুগত তর্ক করিলে মতি দুষ্ক হয় না। কি ভাল, কি মন্দ—এইরূপ বিতর্ক বেদানুগত হইলে তাহা আর প্রজ্ঞা হয় না। এইজন্য শ্রীমদ্মহাপ্রভু এরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—“অতএব ভাগবত করহ বিচার” (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)।

সম্বন্ধজ্ঞান-নিকরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজ্ঞা নয়। বৃথা-তর্ক করিয়া ইংহা-সভা জয় করিয়া থাকেন, তাহাদের নিজের কোন সিদ্ধান্ত হয় না; সুতরাং তাত্ত্বিকের দল গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম স্বয়ং এই কাথাটী স্বীকার করিয়াছেন—

তাত্ত্বিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।

সেই যুখে এবে সদ্য কহি ‘কৃষ্ণ’, ‘হরি’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮০)

বাহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাহারা যেন বারানসীর সম্মাদী ঠাকুরের এই কথাটী স্মরণ করেন—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।

কাঁহা মুণ্ডি পা’ব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২)

বৃথা-তর্কসমূহ হয় দীর্ঘা, নয় দম্ভ ; হয় দোষ, নয় বিষয়ানুরাগ ; হয় মুঢ়তা, নয় আবুপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা-তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক হইয়া না পড়ে—এ-বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকিবেন।

(৩) পরচর্চা—প্রজন্মের অগ্র্যতম

(৩) অকারণ পরচর্চা অতীব ভক্তি-বিরোধী। অনেকেই আবু প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অশ্রের প্রতি বিদ্রোহপূর্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চা করেন। এইসকল বিষয়ে ষাঁহার বাস্তব হন, তাঁহাদের চিত্ত কক্ষ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চা সর্কতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে ; তাহা পরচর্চা হইলেও দোষের হয় না। সম্পূর্ণরূপে পরচর্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে বন-বাসই প্রয়োজন। ভক্তি-সাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির কোনমাত্র বিষয়োন্মাদ না থাকায় তিনি পরচর্চা সর্কতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্ব-ভরণ-সম্বন্ধে পরচর্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কক্ষ-সংসারে স্থিতিই একমাত্র মতুপায়। বিষয়-কার্য্যসমস্ত কক্ষ-সম্বন্ধী হইলে, তাঁহার অনিবার্য পরচর্চাও নিস্পাপ এবং কক্ষ-সম্বন্ধে ভক্তিসাধক হয়। পণের যাতাতে ক্ষতি হয়, এইরূপ পরচর্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কক্ষ-সংসারে যেটুকু পরচর্চা আবশ্যিক হয়, তাহাটী তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্ত উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চা না করিলে উপদেশ স্মৃত হয় না। পূর্ব মহাজনগণ যখন যেকোন পরচর্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই।

যথা শ্রীশুকদেব-বচন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবাহেয়ং চ বা বয়ঃ ।

দিবা চার্ধেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

দেহাপত্য-কলত্রাদিহান্নসৈন্যেন্দ্রসংস্থপি ।

তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ (ভাঃ ২।১।৩-৪)

হে রাজন্! বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্ৰিক্ষেপ করে অথবা
 শ্রীসঙ্গে রাত্ৰিকাল যাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থ-চেষ্টায় বা কুটুস্থ-
 ভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র—ইহাদের সকলকেই নিজ-
 জ্ঞান জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ নৃষ্টি করিয়াও তাহাবিগকে অনিতা
 জ্ঞান করে না। গুরুদেব শিষ্যোপদেশ জ্ঞাত এইরূপ বিষয়ীদিগের চৰ্চা
 করিয়াও প্রজ্ঞানী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ
 করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জ্ঞাত স্বীয় শিষ্যদিগকে
 অসদ্বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—“বৈরাগী করে ‘প্রকৃতি’-সম্ভাবন।

দেখিতে না পারেন। আমি তাহার বদন ॥

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগা করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাগ্রা বুলে প্রকৃতি সম্ভাবিহা ॥”

প্রভু কহে,—“মোর বশ নহে মোর মন।

‘প্রকৃতি’-সম্ভাবী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥”

(চঃ চঃ অঃ ২।১১৭, ১২০, ১২৪)

উপদেশ-স্থলে এবং বিবচ-সিদ্ধান্ত সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে
 জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এইরূপ
 আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধ-
 আচরণে আমাদের কিরূপ মঙ্গল হইবে? কোন সম্প্রদায় বা সাধারণে
 প্রচলিত অসদ্ব্যবহার এইরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তি-
 বিরোধী প্রজ্ঞান বলিয়া যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের
 কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না। ভাগবত-প্রধান মৈত্রেয়
 বেণরাজা-সদ্বাদে এইরূপ বলিলেন—

ইথং বিপর্যায়মতিঃ পাপীয়াহুংপথং গতঃ।

অনুনায়ামানস্তদ্যাক্ষাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥ (ভাঃ ৪।১৪।২৯)

বিপর্যায়-মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের
 যাক্ষা পরিপূরণ করিল না, যেহেতু সে ভ্রষ্টমঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয়
 ঋষির এইরূপ পরচর্চার আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব উপদেশ-বাক্যের
 সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ কহিয়াছিলেন; ইহাতে প্রজ্ঞান হয় না। ভক্তি-
 সাধকদিগের ভক্ত-মণ্ডলীকে প্রাচীন ইতিহাস-সকল সংক্ষেপে আলোচিত হয়।

তাহাতে অসাধুদিগের চরিত্র-আলোচনা স্থানে-স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহা সর্বদাই মঙ্গলজনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, ঘেব, দন্ত অথবা প্রতিষ্ঠাদি ভক্তি-বোধক প্রবৃত্তি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তি-দেবীর নিকট অপরাধী।

(৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষানুসন্ধান, (৬) মিথ্যা-জল্পনা,

(৮) গ্রাম্যকথা—প্রজন্মের মধ্যে পরিগণিত

(৪) বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা নিতান্ত হয়। (৫) পরদোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে। তাহা সর্বতোভাবে তাজা। (৬) মিথ্যা-জল্পনা কেবল বৃথা-গল্পের রূপান্তর। (৭) গ্রাম্যকথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্তানুকূলরূপে বিয়ংপরিমাণে স্বীকৃত। পুরাবৃত্ত, পশু-বিবরণ-ভোজ্য ও ভূগোল ইত্যাদি বহির্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য। শ্রীশুকদেব বলিষাছেন—

মুখা গিরন্তা হসতীরসং-কথা, ন কথ্যতে বদন্তগবানধোক্ষজঃ।

তদেব সত্যং তদুৎসবং মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্ভগোদয়ম্।

তদেব রমাং রুচিরং নবং নবং, তদেব শঙ্খননসো মহোৎসবম্।

তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, বহুভুতমল্লোক-যশোহুগীঃতে।

(ভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০)

হে রাজন্! যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা উদয় না হয়, সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। যাহাতে ভগবদ্-ভগোদয় হয়, সেই কথাই সত্য; তাহাই মঙ্গল-স্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে-কথায় উত্তমল্লোক ভগবানের যশঃ অহুগীত হয়, তাহাই রমা, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণব-শোষণ-স্বরূপ।

সাপুনিন্দা—অমঙ্গলজনক প্রজন্ম

(৭) সাপুনিন্দা-রূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে,— “আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না।” তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরম-পাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটয়াছিল। যথা, দশমে—

আয়ুঃ শ্রিঃ হশো ধর্ম্যং লোকমাশিব এব এ।

হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ (ভাঃ ১০।৪।৪৬)

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্যাদ-বাক্য বলিলে মানবের
অযুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম, পরকাল-গতি শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ই বিনষ্ট হয়।

প্রবন্ধের নির্যাস বা উপদেশ-সার

এই প্রবন্ধের নির্যাস এই যে,—ভক্তির অন্তকূল নচে, এইরূপ সমস্ত
প্রজন্মই ভক্তি-সাধক বৈষ্ণবগণ বহুযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। এই উপদেশ-
গুলির মধ্যে প্রথম স্লোকে যে ‘বাচো বেগং’ অর্থাৎ বাক্যের বেগ সহিবার
উপদেশ আছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক বেগমাত্র। প্রজন্ম-পরিত্যাগ-দ্বারা
বাক্য নিত্যরূপে নিষিদ্ধ হয়। নিষ্পাপ জীবন-নির্ভর্যাহে যতটুকু প্রয়োজন
হয়, তদ্ব্যতীত কোন প্রকার বাক্য-বাণ করাই ভাল নয়। আপনার এবং
অন্য জীবের যাতাতে মজল হয় সেই সমস্ত কথ আলোচনা করাই প্রয়োজন।
পরের বিষয় লইয়া চর্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব
শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন—

পরম্ভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।

স আশু ভ্রশতে দ্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥ (ভাঃ ১১২৮২)

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি
অসদ্ বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে দ্রুতই ভ্রষ্ট হন।

— শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ—৬৪)

অতঃপর সখ্যরস বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে আলম্বন (বিষয়) মিত্র-
রূপে স্ফুটি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণই মৈত্রীর বিষয় হন। আর তাহার লীলান্তঃপতী
মিত্রবর্গ তাহার আশ্রয়। তাহার শ্রীকৃষ্ণের দজাতীয়-ভাববিশিষ্ট এবং
সেই ভাব উৎকৃষ্ট সখ্যভাবে কোন কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে
আবির্ভূত হইলেও শ্রীমদ্রায়াকার বলিয়াই প্রতীত হন। শ্রীমদ্ভগদগীতায়
১১শ অধ্যায়ে বিষ্ণুরূপদর্শনের পর অর্জুন প্রার্থনা করিলেন,—তেনৈবরূপেণ
চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে,—হে বিশ্বমূর্তে! হে সহস্রবাহো!
তুমি সেই চতুর্ভুজরূপ হও। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে প্রাক্তভূত হইলে
অর্জুন বলিলেন,—দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌমাং জনার্দন। ইদানী-

মঙ্গলংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ অর্থাৎ, হে জনার্দন! অধুনা তোমার সুন্দর মানুষ্যরূপ দেখিয়া আমার চিত্ত প্রশস্ত হইল, আমি সুস্থ হইলাম। অতএব বিশ্বরূপ ও তজ্জনিত ভবাদি-ভাব শ্রীঅর্জুনের কিঙ্কিন্ময়ও অর্জুই নহে।

সুস্থ ও সখ্যভেদে মিত্র দ্বিবিধ। পরস্পর নিকরপাশি উপকার ও রসিকতাময়ী শ্রীতি যাহাদের থাকে, তাহারা সখা। শ্রীভীমসেন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সুস্থ, আর সখা শ্রীঅর্জুন, সুদামা নিপ্র প্রভৃতি। শ্রীগোকুলে শ্রীদামাদি গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সখা। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাদের প্রসিদ্ধি আছে। আগমে বসুদাম, কিঙ্কিনী প্রভৃতি সখার কথা প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যপুরাণে উত্তর পণ্ডে অন্তালীলায় সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, বজ্রেন্দ্রভট প্রভৃতি সখা বলিয়া উক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র গোপবালক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহাদের তুল্য। “সখান গুণ, স্বভাব, বয়স, বিলাসবেশবিশিষ্ট গোপগণসহ” ইত্যাদি আগমবাক্যে সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমতা বিচার উক্ত আছে। গোপজাতি প্রতিচ্ছন্নৌ দেবা গোপালরূপিণঃ। ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ (ভাঃ ১০।১৮।১১)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নৃপ! নট যেমন নটকে স্তব করে, তজ্জপ গোপজাতিতে অভিব্যক্ত দেবগণও গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন। এস্থলে দেবশব্দে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ অভিহিত। দেব পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের মাহাত্ম্য-দাম্য, গোপালরূপী-পদের দ্বারা প্রকৃতি বৈশালীলাসাম্য আর নট দৃষ্টান্ত-দ্বারা গুণসাম্য প্রদর্শিত।

শ্রীকৃষ্ণসখা গোপবালকগণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট তন্ন প্রার্থনা-কালে বসিয়াছেন,—

দীক্ষার্যঃ পশুসংস্থার্যঃ সৌত্রামণ্যশ্চ সত্তমাঃ।

অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমগ্নং হি তুয্যতি ॥ (ভাঃ ১০।২৩।৮)

হে সত্তমগণ! দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সৌত্রামণী পশুসংস্থারের পূর্বে দীক্ষিতান্ন গ্রহণে দোষ আছে; তদ্বিহীন স্থানে এবং সৌত্রামণী ভিন্ন অত্যাগে দীক্ষিতব্যক্তির অন্নভোজনে দোষ নাই।

এই বাক্যে গোপবালকগণের শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় ও সেই সখাগণ তিন প্রকার,—সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নন্দসখা। ভাববৈশিষ্ট্য দ্বারা ইহাদের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীদামাদি শুদ্ধপরম মাধুর্য্যাময়-প্রচুর প্রণয়পূর্ণ বিহার-লালিত্য দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ।

ঈশং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন্য সাকং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

(ভাঃ ১০।১২।১১)

জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে, ভক্তগণের নিকট পরম দেবতাস্বরূপে মায়াশ্রিতগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণ সহ গোপ-বালকগণ বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই তদীয় প্রসাদের হেতুভূত প্রচুর পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণযোঃ কর্ণিকারং

নিভ্রবাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীক্ষ মালাম্।

বজ্রান্ বেণোরধরজ্জয়া পূরয়ন্ গোপবন্দৈ-

বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদঙ্গীতকীর্তিঃ ॥ (ভাঃ ১০।২।১৫)

শ্রীকৃষ্ণ নটবরবপু ধারণ করিয়া স্বীয় চরণচিহ্নে অঙ্কিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছমুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধানে স্বর্ণের মত কপিশবর্ণ বস্ত্র এবং গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা। তিনি অধরজ্জয়া বেণুরক্ত পূরণ করিতেছেন এবং গোপগণ চতুর্দিকে তাঁহার কীর্তি গান করিতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব বর্ণিত।

উদ্দীপন সকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ—অভিযাক্ত মিত্রভাব, সরলতা, কৃতজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দক্ষতা, শৌর্য্য, বল, ক্ষমা, কারুণ্য ইত্যাদি এবং অবয়ব ও বয়সের সৌন্দর্য্য সর্ব্বসম্মুখস্থ প্রভৃতি।

সৌন্দর্য্যময় মৈত্রীতে সাংলতা প্রভৃতির প্রাধান্য, আর সখ্যময় মৈত্রীতে বৈদগ্ধ্য সৌন্দর্য্যাদিমিশ্র সরলতাদির প্রাধান্য। উভয়াংশ মিশ্রিত মৈত্রীতে গুণাংশদ্বয়ের (সরলতা ও সৌন্দর্য্যাদি মিশ্রসরলতার) যথাযোগ্য মিশ্রণ জানিতে হইবে।

শ্রীগোপগণ সম্বন্ধে সেই সব গুণের অভিযাক্তির কথা বনভোজন পীলায় কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সম্ভ্রান্তান্ উচে কক্ষোহস্ম ভীভয়ম্।

মিত্রাণ্যাশান্নাবিরমতেহানেন্তে বৎসকানহম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৩।১৩)

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ সহ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে ব্রজা বৎসসকল হরণ করিয়া লুপাইয়া রাখেন। বৎস সকলের তৃণভোজন স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে না পাঠিয়া সখাগণ অস্তান্ত ভীত হইলেন। তাহাদিগকে ভয়সম্ভ্রান্ত দেখিয়া সকলের অভয়দাতা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,— হে মিত্রগণ! তোমরা ভোজন হইতে বিরত হইও না। নিশ্চিন্ত মনে ভোজন কর। আমি

সকলের বৎস আনিয়া দিব। এই বলিয়া খাচু হস্তে তিনি পর্বত, কন্দর, কুঞ্জর ও গহ্বর প্রভৃতি সর্বত্র বৎসকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পূর্বে ব্রহ্মা আকাশে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর মোক্ষলীলা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অতুলীলা দর্শনের অভিলାষে তিনি প্রথমে গোবৎসসকল, পরে (শ্রীকৃষ্ণের বৎস অনুসন্ধানকালে) সখাগণকেও অপহরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে না পাইয়া পুলিন-ভোজনস্থলে আগমনপূর্বক সখাগণকেও দেখিতে না পাইয়া বৎস ও বয়সুগণকে সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কালীষ হৃদের জলপানে মৃত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেন। ইহাতে মৈত্রেয় উদ্বীপককাণ্ডা অভিভূত হইয়াছিল। যথা—

অন্নমংসত তদ রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম।

গীতা বিষং পরেতন্ত পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥ (ভাঃ ১০।১৫.৫২)

গোপবালকগণ কালকূটপানে মৃত নিজেদের পুনর্জীবন লাভে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দৃষ্টিকেই কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অতঃ দৃষ্টান্ত—

অহোহতিরমাং পুলিনং বহুসূঃ স্বকেষিসম্পন্নতুল্যচ্ছবালুকম্।

স্মৃতংসংযোগকৃততালিগত্রিকধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্রুমাকুলম্ ॥

(ভাঃ ১০।১৩।৫)

বনভোজনলীলায় পুলিনভোজনস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিয়াছিলেন.—হে বয়সুগণ! এই পুলিন অতি রমণীয়। এখানে আমাদের খেলার সম্পৎসকল বিজ্ঞমান—বালুকাসকল কোমল অথচ নির্মূল, আর সরোবরে প্রচুর পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়ায় তদগন্ধে ভ্রমর ও সখিগণ আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিসহ যে-সকল তরু বিভাজিত শুদ্ধারা এই পুলিন ব্যাপ্ত। সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি—

কচিং পল্লবহল্লোষু নিযুক্তশ্রমকথিতঃ।

বৃক্ষমূলশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ (ভাঃ ১০।১৫।১৬)

কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত ক্রীড়া-প্রসঙ্গে বাহ্যযুক্তে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে পল্লবশয্যায় সখাগণের কোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্তকিছুদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রী শ্রী ব্যাসপূজা-বাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

কৃপালু তুমি 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' জগতে অবতরী ।
বাসের কার্য্য করিয়াছ, শুদ্ধ ভক্তি প্রচারী ॥
অপরাধ-ভঞ্জন-পাটের স্থানে করিয়াছ আশ্রম ।
দয়ালু তুমি দর্শন দানে ঘুচাইলে জীবের ভ্রম ॥
তুমি 'গুরুরূপে' করিয়াছ বদ্ধজীবের তমো-নাশ ।
কতশত দাসে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছ ভক্তির পাশ ॥
জীবন্ত ফুলে করিয়াছ সেবা বদ্ধ জীবের তরে ।
ফুলের সৌরভ ছড়াইয়াছে আজও জগৎ মাঝারে ॥
ইহ জগতে প্রকটকালে তোমায় বুঝে নাই যারা ।
ফুলের গন্ধে চেতনা পেয়ে অনুতাপ করিতেছে তারা ॥
দয়ার সাগর, রাধার প্রেষ্ঠ, ভক্ত কূল-চুড়ামণি ।
শরণাগত-পালক, বেদান্তী-শ্রেষ্ঠ, সর্বগুণের গুণী ॥
ভক্তি অতি অমূল্যরতন ভক্তগণে জানাইয়াছ ।
ধর্ম্মধ্বজী পাষাণীর কাছে তাহা গুপ্ত রাখিয়াছ ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে ভুলি মায়ার কবলে ভুগিতেছিল সংসারে ।
সে-সকল জীবে প্রেমের বন্ধনে আনিলে প্রভুর দ্বারে ॥
উদ্ধার হইবে শ্রীগৌর ভক্তিলে সকলেরে ভরসা দিলে ।
ত্রিতাপ যাইবে ভক্তি লভিবে শরণাগত হইলে ॥
'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, গৌর-নিজঙ্জন' বলিয়া গুরুকে সেবিবে ।
ভক্তি-রাজ্যে তবে প্রবেশ অধিকার শীঘ্রই লভিবে ॥
শিক্ষা দিলে তুমি বদ্ধজীবেরে ভক্তিই মাত্র সার ।
দূঢ় করি লও গুরুর শরণ হইবে ভবপার ॥
আচার্য্যকেশরী, হুঙ্কারী স্থাপিলা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, মোক্ষকামী সকলই (ক্ষুদ্র) ভ্রষ্ট ॥

‘বেদান্ত সমিতি’-খনিতে করিয়াছ ত্রিরত্ন প্রকাশ ।

প্রভুর বাণী প্রচারিছে যঁারা পৃথিবীর সর্বদেশে ॥

পাপী, পাষণ্ডী, কুকর্ম্মীর করিতেছে মোহনাশ ।

শ্রদ্ধালু জনে খুঁজিয়া খুঁজিয়া আনিছে ভক্তির পাশ ॥

অজ্ঞান মূঢ় জীবেরে উদ্ধারি, দিয়াছ কৃষ্ণধন ।

এ অধম দাসে, দয়া করি দেহ তব কুপার এক কণ ॥

মুণ্ডিঃ পা পীঠাধমচাহি আজ তব ভক্ত-পদধূলি ।

তব ভক্তাশ্রয়ে থাকি, গাতি, তব একবিন্দু গুণাবলী ॥

—শ্রীপ্রোমানন্দদাস ব্রজচারী

—

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্বে প্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

সার্বভৌম—“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ সাদীশাদপেতম্ বিপর্য্যয়োহ-
স্মৃতিঃ । তন্মাযয়াতো বধ আভ্যন্তং তং ভক্ত্যাকর্ষণং গুরু-দেবতান্না ॥”
“দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলে জীবের ভয় উপস্থিত হয় এবং বিপরীত
স্মৃতি উদ্ভূত হয় : অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে গুরু, ঈশ্বর অর্থাৎ
ব্রহ্ম হইতে অভেদজ্ঞানে সাধন করিবেন”—ভাগবতের এই উক্তি অবৈত-
জ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া জীব ও ব্রহ্মে অভেদত্বই অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন ।

মহাপ্রভু—“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ”—এই ভাগবত-বচনে “দ্বিতীয়”-
পদ দ্বারা স্বকীয় দেহ-গেহাদিই উক্ত হইয়াছে । দেহ-গেহাদি-বিষয়ক
আগ্রহ হইতে নরক-ভয় হইয়া থাকে, অতএব ভগবানেরই শরণ গ্রহণ
কর্ত্তব্য—এইরূপই শ্লোকার্থ বক্তব্য, অন্যথা পূর্বোক্তের বিরোধ ঘটিয়া থাকে ।
যদি আত্মব্যতিরিক্ত সর্ব পদার্থই “দ্বিতীয়” পদ-বাচ্য বলিয়া ততদ্বস্ত-
বিষয়ক আগ্রহ হইতে ‘ভয়’ জন্মিয়া থাকে, এইরূপ অর্থ বলা হয়, তাহা
হইলে “ভয়েৎ” এই পদ-দ্বারা ভক্তরূপ দ্বিতীয় পদার্থের বিধানও অসঙ্গত
হইয়া থাকে ।

সার্বভৌম — “গুরুদেবতাত্মা” পদের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। গুরুদেবতাস্বরূপ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভাবনা করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন—ইহাট ‘গুরুদেবতাত্মা’-শব্দে স্পষ্টীভূত হওয়ায় আপনার কথিত ব্যাখ্যা বাধিত হইতেছে।

মহাপ্রভু — “গুরুদেবতাত্মা” এই পদেও গুরুদেবতার স্বরূপ—এইরূপ অর্থ নহে, পরন্তু ‘আত্মা’ শব্দ মনোবাচক বলিয়া উক্তপদে গুরুদেবতাগত চিত্ত—এইরূপ অর্থ দ্বারা সেবকের গুণান্তরই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতীত স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপের ভজনাতি-ক্রিয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকে গুরুদেবতাত্মক বৃদ্ধজনকে উদ্দেশ্য করিয়া ভজনের বিধান করা হইয়াছে; সুতরাং গুরুদেবতাত্মকত্বরূপ বিশেষণ অপেক্ষা “লিঙ্” প্রত্যয়ের অর্থভূত বিধিক্রম-ভজনই প্রবল। অতএব শাস্ত্ররীতিঃ পুরুষের পক্ষে আপাত-প্রতীয়মান অর্থগ্রহণ কর্তব্য নহে।

সার্বভৌম—এখানে নিগূর্ণ ব্রহ্মকেই অদ্বিতীয় এবং তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থকেই দ্বিতীয় বা মিথ্যা উপাধিক্রমে বর্ণন করিয়া মিথ্যা বস্তুতে অভিনিবেশ পরিত্যাগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। আর আপনার মতানুসারে যদি “ভজৎ” এই ক্রিয়ার প্রাধান্যই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ঐরূপ ভজন দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সত্ত্ব ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হওয়ায় ঐরূপ ভজনক্রিয়ারও ব্যবহারিকতাই সিদ্ধ হইল। অতএব ব্রহ্ম ও জীবে অভেদই সিদ্ধান্ত; জীব ও জগৎ মিথ্যা উপাদি মাত্র।

মহাপ্রভু—যদি দ্বিতীয়াভিনিবেশ ভয়ের কারণ হয়, তাহা হইলে উহা মুমুক্শুগণের পরিত্যাগ—এইরূপ অর্থই হইতে পারে, পরন্তু দ্বিতীয় বস্তুর মিথ্যাত্ব কোনরূপে সিদ্ধ হয় না। বৈরাগাণীল পুরুষ সম্ভ্রাম-অবলম্বনপূর্বক গৃহ পরিত্যাগ করিলে সেজন্ত যেকোন গৃহ দক্ষ হইয়া যায় না, সেইরূপ মুমুক্শুগণ দ্বিতীয় পদার্থ-বিষয়ক অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিলেই তদ্বারা দ্বিতীয় পদার্থের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। দ্বিতীয় বস্তু সর্বভৌমভাবে অবিদ্যমান হইলে শশ-শৃঙ্গ সদৃশই হইয়া থাকে। যদি দেহ-গেহাদি দ্বিতীয় বস্তুকে আপনার মতে পারমার্থিকরূপে অবিদ্যমান বলা হয়, তাহা হইলে আমরাও উহাদিগকে স্বরূপতঃ অবিদ্যমান (অর্থাৎ আগন্তুক) বলিতে পারি। সর্বেশ্বর সর্বনিয়ন্তা বিষ্ণুকে পরিত্যাগপূর্বক দ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বিষয়ে অভিনিবেশশীল পুরুষের ভয় এবং বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে।

দশজ্ঞিক মায়াবীশ পরব্রহ্মের অপেক্ষায় নিঃশক্তি নিবিশেষ ব্রহ্মই দ্বিতীয় হইয়া থাকে। “স বাপকতয়ান্ম” ইত্যাদি শ্লোকে হংসযুগলের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব, ভিন্নভাব, পরস্পর আশ্রয়ভাব, বোধ্য-বোধকভাব এবং নিত্যজ্ঞান জ্ঞান্যজ্ঞানভাব বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাকে পরব্রহ্মের আশ্রিত এবং পরব্রহ্মকে আত্মার নিয়ামকরূপে অবগত হইয়া তদীয় জ্ঞান পরিত্যাগ না করিয়া এই সংসার ভ্রান্তি হইতে নিবৃত্তি হইয়া ছিলেন। ধূম, অগ্নিকণা এবং জ্বলার লোকমধ্যে অগ্নিরূপে প্রসিক্তি হইলেও বস্তুতঃ অগ্নি যেক্রপ এইসকল পদার্থ হইতে পৃথক-স্বরূপ, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়গণ, অন্তঃকরণ, প্রকৃতি এবং জীব হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন। শ্রুতিসমূহে— “অয়মগ্নঃ” “ইমৌ দৌ” “ভিন্নাবিমৌ” ইত্যাদি পদসকলের স্বরূপভেদ বাতীত অগ্নি অর্থ আদরনীয় নহে। ভেদ-শ্রুতি-সকল জীবের বহুত্ব, অপূর্ণত্ব কর্মফলভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম এবং ব্রহ্মে নিত্যমুক্তত্ব, পূর্ণত্ব, কর্মফলভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম কীর্তন দ্বারা ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন। নিত্য পদার্থ সমূহের মধ্যে অতিনিত্য এবং চেতনসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট চেতনস্বরূপ এক ভগবান্ বহু জীবের কাম্য বিষয়রূপে জড় পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হাঁহারা তাঁহাকে গ্রাস্তমধ্যে অন্তর্গামিরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের শাস্ত্রত স্নখলাভ হইয়া থাকে। হাঁহারা উক্তরূপে দর্শন করিতে সমর্থ নহেন কিম্বা বিরুদ্ধভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা শাস্ত্রত স্নখভাগী হইতে পারেন না। “নিত্যো নিহান্যঃ” এই শ্রুতি কর্তৃক এবিধ অর্থসকল কথিত হইতেছে। “নিত্যানাম্” ইত্যাদি পদে নির্দ্ধারণার্থক ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রয়োগহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং নিত্যদেহও সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুণ-সকলের বারম্বার কীর্তনরূপ অভ্যাস-দ্বারা ঐ সকলের শ্রুতি তাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অনেক জীবমধ্যে অবস্থিত ভগবানের একত্ব-কীর্তন দ্বারা অনন্ত অবতাররূপ সকলেরও অভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। একত্ব দশায়ণও ভগবানের অনন্তত্ব-ঘটক শক্তি-বিশেষ সিদ্ধ বলিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি-বর্ণিত পুচ্ছের সহিত পুচ্ছবিশিষ্ট আনন্দময়ের অভেদ কৈমুত্যা ন্যায়-বলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবদ্গত নিখিল-গুণের অভেদ-কীর্তন-হেতু গুণ-সমূহের চিন্ময়ত্ব এবং ধোয়ত্ব-কথন-হেতু ভগবানের অভীষ্ট-দেবত্ব, সৌন্দর্য্য ও সুপ্রসন্নতা প্রভৃতি গুণ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রুতি বলে জীবের অন্তঃস্থিত ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব, শক্তি, স্বতন্ত্রতা, অষ্টত্ব, কামদাতৃত্ব, মুক্তিপ্রদত্ব,

সর্বৈশ্বরত্ব, পূর্ণত্ব এবং নিত্যত্ব প্রভৃতি গুণ সাধিত হইয়াছে। “চেতনানাং” এই বহুবচনান্ত প্রয়োগ হেতু মুক্তগণের বহুত্ব, ব্রহ্মের মুক্তগণ-স্বামিত্ব এবং মুক্তগণের মধ্যেও আত্মগত ভগবৎজ্ঞানের স্থিতি কথিত হইয়াছে। জীব-সকলের মধ্যে কেহ কেহ আত্মত্ব ভগবানকে অবগত হইয়া থাকেন, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ এবং কেহ কেহ বা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট। এইরূপে জীবগত ত্রৈবিধা-কথন-হেতু তাহাদের পরস্পর ভেদ এবং অভিষ্ঠিত্যয়ক ভগবান্ হইতে পার্থক্য সাধিত হইয়া থাকে। অতএব উপপত্তি-সহকারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্থাপিত হইল। মোক্ষোপ-যোগিত্বনিবন্ধন উক্তভেদ অত্যাশ্চর্য্য সত্য। কাম্য বিষয়ের বহুত্ব কর্তৃক-হেতু জড়দগ্ধ-সমূহের পরস্পর ভেদ এবং ঈশ্বর কর্তৃক-কথন-দ্বারা ঈশ্বরের সহিত তাহাদের ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। জগতের সৃষ্টিকথন-হেতু তাহার সত্যত্ব এবং “সৎ” প্রত্যয় প্রয়োগবলে নিত্যকাল বৃদ্ধি নির্ণীত হইয়াছে। জীবের ভোগের জন্য জড়স্বষ্টি কথন-হেতু জীব ও জড়গত ভেদ সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রুতিপদ-দ্বারা এক জীববাদ, জীবগত অভেদবাদ, জীব ও ঈশ্বরগত অভেদবাদ, জীবগণের চিদ্রূপত্ব, ব্রহ্মের অকর্তৃত্ব, নির্বিশেষ জ্ঞানের মোক্ষণ-সাধনত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব এবং এককালীন সর্ব-বিমুক্তি দৃষিত হইয়াছে। সর্ব-জীবোত্তম চতুর্নুষ্ঠেয়ও ভগবানের সহিত ঐক্য শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি তাঁহারই ঐক্য সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র জীবগণের ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদ্ব্যতীত নামক অসুর বেদ অপহরণ করিলে চতুর্নুষ্ঠ উহার উদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছিলেন, পরন্তু শ্রীহরি মংজ্ঞানি-অবতার গ্রহণপূর্ব্বক বেদসকলের উদ্ধার করিয়াছেন, শ্রুতিতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। শ্রীহরি নিজগুণ পরিত্যাগ দিচ্চা অনেকে উক্ত-গুণ প্রদান করেন না। তপস্তাদ্বারা তাঁহারা আরাধনা করিলেও তিনি কিছুমাত্র কর্তৃত্বাদি-গুণই প্রদান করিয়া থাকেন। পৌণ্ড্রক রাজা নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়াছিলেন এবং শিশুগাল নিজেকে লক্ষ্মীপতি বলিয়া অভিমান করায় তাহাকেও সংহার করিয়াছিলেন; সুতরাং অপর যে কেহ তাঁহার সামাবদ্ধি করিলেই তিনি তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না। পৌণ্ড্রক বাহুদেবের “আমিই কৃষ্ণ” এইরূপ অভিমান ব্যতীত অন্য কোন অপরাধই ছিল না; সুতরাং মোহহং ভাবই যদি শাস্ত্রতত্ত্ব হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কি জন্য পৌণ্ড্রককে বধ

করিয়াছিলেন? মধুসংগ্রহশীল ভ্রমরগণের মধ্যে স্থূল ও ক্ষুদ্র-ভেদে দ্বিবিধ জাতিভেদ করিয়াছে। তন্মধ্যে স্থূল ভ্রমর ক্ষুদ্র ভ্রমরকে ভক্ষণ করিবার জন্ত নিজ বাসস্থানে আময়নপূর্বক তথায় স্থাপন করিলে ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরই সর্বদা নিজের ভবিষ্যৎ সংহারকর্ত্তা স্থূলভ্রমরের রূপ চিন্তা করিতে করিতে ময়ং ও কালাস্তরে তাদৃশ স্থূল ভ্রমররূপেই পরিণত হয়, এইরূপ জীবও “অহংব্রহ্ম” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ময়ং ব্রহ্মরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহা মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—ক্ষুদ্র ভ্রমর স্থূল ভ্রমরকে ধ্যান করিয়া পুরোক্ত স্থূল ভ্রমর হইতে পৃথক্ অন্য স্থূল ভ্রমররূপেই পরিণত হয়, পূর্ব স্থূল ভ্রমরের ঐক্য প্রাপ্ত হয় না; বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ভ্রমর স্থূল ভ্রমরকে নিজের সংহারকর্ত্তা রূপেই চিন্তা করিয়া থাকে, নিজকে তদভিন্নরূপে চিন্তা করে না। মায়াবাদিগণ ক্ষীর এবং নীর দৃষ্টান্ত-অনুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রাপ্তি বলিয়া থাকেন, পরন্তু ক্ষীর নীরেরও মিশ্রভাবই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঐক্য লাভ হয় না। যদি ঐক্য প্রাপ্তিই হইত তাহা হইলে অগ্নি সস্থাপে জলের নাশ এবং কেবলমাত্র ক্ষীরের পিণ্ডাকারে অবস্থান সম্ভব হইত না, ক্ষীর এবং জলের তাদৃশ একীভাবস্থলেও অনুরস-সংযোগে পুনরায় পৃথক্ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরন্তু বস্তুতঃ ঐক্যস্থলে তাদৃশ পৃথক্ভাব সম্ভবপর নহে; সুতরাং কর্কফলের ভোজ্য এবং অভোজ্যরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম-নিবন্ধন জীব এবং ঈশ্বরের ঐক্য হইতে পারে না। জীব—মায়াবশ, ঈশ্বর—মায়াধীশ। অতএব জীব ও ঈশ্বরে মিত্য ভেদ।

ছাদশ বৈবরণ

(৫) কপিল

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৪ম সংখ্যা, ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

কপিল-দেবের হৃদয় স্নেহ-রসে অভিষিক্ত হইল। মাতার অভিপ্রায় মত তিনি আবার বলিতে লাগিলেন;—“মাতঃ! আমন্দ-মুণ্ডি সর্বাকর্ষক শ্রীভগবানেই শুদ্ধ-জীবাত্ম-স্বরূপের লৌল্য স্বভাব-সিদ্ধ। বিস্তৃত তাঁহারই গুণময়ী মায়া শক্তি তাঁহাকে অন্তরাল করিয়া, সমুদ্রে প্রাকৃত রূপ-রসাদি

ধরিয়া, জীবকে ঐ প্রাকৃত বিষয়েই বন্ধ করিতেছে। সাধুসঙ্গে, ইন্দ্রিয়বর্গের ঐ স্বতঃসিদ্ধ-বৃত্তি বিষয় হইতে আবার তাহাতেই উদ্ভূত হয়। ইহাই অভিসন্ধি-শূন্য গুণা ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তি, মুক্তি হইতেও মহীয়সী। আমার অকিঞ্চন ভক্তগণ মুক্তিবাহু কখনও করেন না। তাহারা সর্বদা ও সর্বথা আমার সেবাতেই অনুরক্ত। আমার আনন্দচিন্ময় মদনমোহন-রূপেই তাহারা একান্ত আসক্ত। ইহাতেই, তাহারা ঐ মুক্তির প্রতি ফিরিয়া না চাহিলেও, ঐ ভক্তিকিঙ্করী মুক্তি, দাসীরূপে তাহাদের সেবা করে। তাহারা মুক্তলোক বা সিদ্ধ-লোক অতিক্রম করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। মুমুকুর সদাব্যঞ্জিত ঐ সাযুজ্য-মুক্তি বা মোক্ষপদও কাল-বিপ্লবিত। কিন্তু, আমার অমল ভক্তিপথের প্রিয়তম ভক্ত-গণ আমার নিত্যধামে প্রবেশ লাভ করিয়া, কালের সম্পূর্ণ অতীত অভয় পদ অধিকার করেন। আমার অনিমিষ-কাল-চক্র কদাচ তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অতএব, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবানে সুদৃঢ় ও স্থনির্মল ভক্তিযোগই জীবের পরম মঙ্গলের দ্বিতীয় মহাপথ। মাতঃ, তুমিও সর্বপ্রযত্নে এই পথ আশ্রয় কর।”

“শ্রীহরিই সর্ব কারণ কারণ। কেহ স্থূলবুদ্ধি-বশে জড়া প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলে; কিন্তু, তাহা ভুল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র,—পুরুষই মূল কারণ। তাহারই বীৰ্যা ধারণ করিয়া প্রকৃতি সত্ত্ববতী হয় এবং প্রসবাদি কার্য্য করে। তাহা হইতে প্রথম এই অখিল জগতের অদ্বৈত-স্বরূপ মহত্ত্ব উদ্ভূত হয়। পরে তাহা হইতে এই জগতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চমহাভূত; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগ,—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ঐ প্রকৃতি—এই চতুर्वিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন প্রকৃতির গুণ,—একত্রে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব ভেদে পুরুষ দ্বিবিধ। প্রকৃতি সত্ত্ব; পরম পুরুষ ঈশ্বর নিগুণ; তিনি পরমাত্ম-স্বরূপে অচিন্ত্যশক্তি-বলে প্রকৃতি জাত জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। জলশয়-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের মত নিলিপ্ত থাকেন। তাহাকেই পরমাত্মা—পরম-পুরুষ বলে। তাহারই অণু-রূপ একাদ্র বা সঙ্গাভাস, প্রকৃতির গুণে

অহঙ্কার-যুক্ত হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই জীব নিগুণ হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান করিয়া সুখ-দুঃখাদি দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত হন। আবার সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া নিগুণত্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। আমাতে তাঁর ভক্তিয়োগ হইতেই বহুবীচ গুণাতীত অবস্থায় আমার নিত্য-সেবায় স্বরূপে অবস্থান করে।”

“মাতঃ, অতঃপর, এই গুণ-বন্ধন বা মায়াপাশ হইতে সম্যক মুক্তি পাইবার জন্ত কিরূপে আমার ভজনা করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি, শুন। ভক্তিয়োগীরা ধ্যান-যোগে অহরে পরমাত্মার সচ্চক্রগদাপদুমের শ্যামল-সুন্দর শ্রীমূর্তি চিত্রা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হন। শুদ্ধ ভক্তিয়োগে ভক্তগণ যে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবানকে দর্শন করেন, তাহা অন্ততম অতি সুন্দর নবকিশোর মূর্তি। সেই চরণ হইতে উদ্ভূতা গজাকে মস্তকে ধরিয়াই শিবও ‘শিব’ নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।”

দেবহুতি কহিলেন,—“হে ভগবন, ভক্তিয়োগ-কথা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি বল। তোমাকে ভুলিয়া সংসার ঘোর মোহ-নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে; তুমি তাহাকে জাগরিত করিবার জন্ত পরম যোগ-প্রকাশ স্বরূপে উদিত হইয়াছ।”

মাতার এই সুচাষিত সুন্দর বাক্যে আনন্দিত হইয়া কপিলদেব আবার কহিতে লাগিলেন :—“মাতঃ, ভক্তি দুই প্রকার; সগুণ ও নিগুণ; ফল-কামিদের ভক্তি সগুণ; আর, সকলের হৃদয়-বিহারী শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণমাত্রই, হাঁহাদের মনোগতি সাগরগামিনী গজাজল-ধারার মত অন্য-লক্ষ্যহীনা হইয়া অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সেই পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীহরি-পাদ-পদেই ধাবিতা হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে অট্টহতুকা, অপ্রতিহতা, নিরবচ্ছিন্না ও নির্মলা আত্মার স্বাভাবিকী রুচি তাহাই নিগুণ ভক্তি। নিগুণ ভক্তগণ, যুক্তিকে ‘শিশ্যী’ নামে অভিহিতা এবং ভক্তিরই প্রকার-ভেদমাত্র জ্ঞান করিয়া তাগ করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিরন্তর সেবা ভিন্ন অণু কিছুই চাহেন না। এই অর্কতর ভক্তিয়োগকেই ‘আত্মাত্মিক’ বা শুদ্ধ ভক্তিয়োগ বলা হয়। আমার এই ভক্তগণ, আমার নাম-সঙ্কীর্্তন, সাধুসেবা, সরলতাচরণ, শ্রীবিগ্রহের অর্চন, ইন্দ্রিয়-দমন, হরিকথা-শ্রবণ, মহতের সম্মান, ভগবন্তের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি ভক্তির অমূল্য আচরণ দ্বারা অন্যায়সে আমাকে প্রাপ্ত হন।”

“যাহারা দেব-হিংসাদির বশে ঈশ্বরতোষণ জন্য জীবগণের প্রতি নির্দয় আচরণ করে, অথচ আমার অর্চনার চলনা করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ অর্চনা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই যতদিন পর্যন্ত না দ্বীয় হৃদয়ে ও সর্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উত্তমাদিকার লাভ হয়, তাৎকাল সাধুপথে শ্রীঅর্চনাতে আমার পূজা-বিধান কর্তব্য।”

“হে অনবে, এই জগতে অনন্ত কোটি জীব আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সকলের মধ্যে চতুর্বর্ণীয়ক ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ-জন শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতেও, যিনি নরক কর্মকল অর্পণ করিয়া, সর্বথা হরি-সাধনায় রত, তিনি শ্রেষ্ঠ। হরি-পরায়ণ ভাগবৎজন হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। সকলের উপর হরিভক্তের অক্ষয় আসন।

“হরিভক্তিহীন হৃদয় নানা দুঃখ, অভাব ও অশান্তির আলয়। তাহা কদাচিৎ কোন অনিত্য সুখের আশ্রয় হইলেও, পরিণামে দুঃসহ সন্তাপে দগ্ধ হয়। হরিবিমুখ বিষয়ীরা, মায়া-কবলে ত্রিতাপময় সংসারে, আর যমদণ্ডে যরণাময় নরকেই পুনঃ পুনঃ বাতায়ত করে। গর্ভবাস-কালে তাহার আপন দুঃখ-ভুগতির কথা মনে হয়; তখন সে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া কত কাঁদে; বলে,—“হরি হে, আমার দুঃখ দূর কর; আমাকে রক্ষা কর; আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয়-সেবা করিব না। আমাকে এবার ক্ষমা কর।” কিন্তু, ভূমিষ্ঠ হইয়াই, সে আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়; আবার সেই বিষয়-রূপেই মগ্ন হয়; হরিভজন করে না; হরিভক্তের নিকট যায় না; পরন্তু, তাহার (ঐ হরিভক্তের) ঘেঁষ করে। স্ততরাং তাহাকে (সেই হরিবিমুখ হরিভক্তদেষী জীবকে) আবার সেই ভীষণ নরকেই ঘাইতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-পথেই যথা বাতায়ত করিয়া কল্প-কল্প-কাল কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোনও পথে অনিত্য-দর্শাদি উন্নত পদবী লাভ করিলেও, পুণ্যক্ষেয়ে আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে, আবার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাই, চতুর ব্যক্তি, সাধুসঙ্গে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, অসংসঙ্গ তাগ করেন, এবং সাধুসেবায় শুদ্ধ হইয়া পরম ভক্তিযোগে হরিভজনায় রত হন। হরিভক্তই সকলকে অতিক্রম করিয়া, আমার নিত্যানন্দপুরে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।”

ভগবান্ কপিলদেব নীরব হইলেন। ভাগ্যবতী দেহহুতি তাঁহার শ্রীমুখে এই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মোহপাশ-মুক্ত হইলেন। তিনি পুত্রকে দাক্ষাৎ নারায়ণরূপে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন।

দেবহুতি বলিলেন,—“হে ভগবন্, হস্ত, তোমার ভক্তগণ হস্ত! চণ্ডালও তোমার শরণ গ্রহণ করিয়া, তোমার একটীবার নাম গান যাহার রসনায় সদা বর্তমান, তাঁহার কথা আর কি বলিব? হস্তি নীচকূলে আবিস্কৃত হইলেও তিনি সর্বপ্রকারে সর্বোত্তম। হে কপিলরূপধারী হরি, আমি তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করি।”

কপিলদেব কহিলেন;—“না, আমি তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই উপদেশ-মত তুমি এইবার সাধনা কর। এইরূপ সাধনা অর্থাৎ অকৈতব-ভক্তিয়োগে শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেই জীব আপন নিত্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, কৃতকৃত্য হয়।”

এই বলিয়া কপিলদেব জননীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি উত্তর মুখে গিয়া প্রাকৃত লোকলোচনের অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইলেন। যিনি এই কপিল চরিত্র শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তাঁহার ক্রমেঃ মতি দৃঢ় হয়।

সিদ্ধভক্তিয়োগের বা অকৈতব ভাগবত-ধর্মের উপদেশদাতা কপিলদেব, শ্রীবিষ্ণুর আবেশ অবতার। ইহার উক্তির প্রত্যেক বাক্য ভগবদ্ভাব-ভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিরীশ্বর-সাংখ্য-শাস্ত্রওঁটা কপিল ইহাতে ভিন্ন। নিরীশ্বর সাংখ্য প্রণেতা কপিল অল্প একজন মহর্ষি। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—“কপিলঃ পরমযিঞ্চং যং প্রাহ্ম্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ-প্রবর্তকঃ।” (বনঃ পর্বঃ ২২০-২১)। অত্র নীলকণ্ঠ টীকায়াম্,—“অতএব কপিলঃ সাংখ্যঃ নিরীশ্বরশাস্ত্রং তদ্রূপো যোগস্তস্য প্রবর্তকঃ।” অনেকে ভগবদেব এই নিরীশ্বর জীবতত্ত্ব কপিলের সহিত আমাদেগ আলোচ্য ভগবদবতার কপিলের নামের ঐক্য দর্শন করিয়া গোলযোগ করেন। “তথাচ নামমাত্রেন ন ভ্রমিতব্যমিতি।”

শ্রীভগবানের “আবেশ” দ্বিবিধ—

- (১) “ভগবদাবেশ”,—যথা, কপিল ও ঋষভদেব।
- (২) “লজ্যাবেশ”,—যথা, নারদ, বাস, পৃথু, ব্রহ্মা, সনকাদি।

যাঁহাতে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানে কোনও এক শক্তির বিশেষ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাকেই “শক্ত্যাবেশ” বলে। যেমন, নারদে ভক্তি-শক্তি; পৃথুতে পালনী-শক্তি; চতুঃসনে জ্ঞান-শক্তি; ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি, ইত্যাদি। তাঁহাদের আপনাদিগকে ‘ভগবদ্ভাস’ বলিয়া অভিমান হয়। মহত্তম জীব মাത്രেই শক্ত্যাবেশ ও অভিমান এইরূপ হইয়া থাকে।

ভগবদাবিষ্ট জীবে এই শক্তি অধিকতর ভাবে প্রকট হয়। তাই তিনি আপনাকে ‘শ্রীভগবান্’ বলিয়াই অভিমান করেন। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে ‘ভগবান্’ বলিয়াই অভিমান করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের মত ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের মত ভিন্ন। শ্রীভাগবত পাঠে জানা যায় যে, দেবহুতি-নন্দন কপিলের বাক্য যিনি শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাঁহার গুরুভক্ত ভগবান্ গ্রীহরিতে মতি দৃঢ় হয় এবং তিনি ভগবৎপাদপদ্ম সেবা লাভ করেন। কিন্তু নিরীশ্বর কপিলের মতে,—‘ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ’ (সাংখ্যদর্শন ১।৯২), অর্থাৎ কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে ‘মুক্ত’ বলিবে, নয় ‘বদ্ধ’ বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই (সাংখ্যদর্শন ১.৯৩)। যদি পূর্বপক্ষ হয়, ‘তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক স্রষ্টার কি গতি হইবে?’ তত্তত্তর আশঙ্কা করিয়া সাংখ্যকার বলিতেছেন,—ঈশ্বর-বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তান্ধাদিগের প্রশংসাস্বতক অথবা অণিমাদিসিদ্ধযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির উপাদানপর। ইহা বাস্তবিক নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিলমতের অনেক বিরোধী মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের মতে—জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ; কিন্তু ভাগবতোক্ত শেখর কপিল দেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্ত পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের কথা উল্লেখ আছে যথা—

কপিলো বাসুদেবাংশ সাংখ্যঃ তত্ত্বং জগাদ হ।

ব্রহ্মাদিভাশচ দেবেভ্যো ভূত্বাদিভাস্তথৈব চ ॥

তথৈবাস্থরয়ে সর্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।

সর্বদেববিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহন্যো জগাদ হ ॥

সাংখ্যমাস্থরয়েহন্যস্মৈ কুতর্ক-পরিবৃংহিতম্ ॥

সুতরাং কপিল দুইজন,—একজন দৈশবাবতার, আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল ভগবদাবেশাতার কার্দ্দমি ও বাসুদেবাংশ; তিনি ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও ‘আত্মরী’ নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব-বেদার্থ-সম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী ‘আত্মরী’ নামক অপর ব্রাহ্মণকে সর্ব-দেববিরুদ্ধ কুতর্ক-পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। কার্দ্দমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। অগ্নিবংশজ নাস্তিকাবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। দেবহুতি-নন্দন কপিলই দেবের সাংখ্যদর্শনের আদিকর্তা, তিনি যদিও ‘সাংখ্যদর্শন’ নামে কোনও বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তৎপ্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবাদিত গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তি যোগেরই কথা পাওয়া যায়। এমন কি, সালোক্যাদি-যুক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি বিশেষরূপে গর্হণ করিয়াছেন (ভাঃ ৩:১১-১৪)। নিরীশ্বর কপিল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী; ভগবদাবেশবতার কার্দ্দমি কপিল ষড়্-বিংশতি-তত্ত্ববাদী। ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলই ভগবদাবেশবতার কার্দ্দমি-কপিলোক্ত সাংখ্যমত-গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়া ‘সাংখ্যদর্শন’ নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনখানি সত্যযুগের কার্দ্দমি কপিলের ষড়্-বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্য-মতেরই সার-সঙ্কলন হইলেও উহাতে মত-পার্থক্য আছে। ঐ সকল মতই ঐতিহাসিক নাস্তিক্যমত। পরাশর পুরাণে লিখিত আছে,—

“অক্ষপাদ-প্রণীত ন্যায়দর্শন, কনাদপ্রণীত বৈশেষিক দর্শন, কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলি-কৃত যোগ-দর্শনের শ্রুতি-বিরুদ্ধ অংশসকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্তা” বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—
‘কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে; অনুরাগের মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুবিগণ উহাদের হেয়্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশই গ্রহণ করিবেন।”

শ্রীমদ্ভাগবত-সার

[দশম স্কন্ধের অধ্যায় বিবরণ]

প্রথম অধ্যায়—কৃষ্ণাবতার-চরিতামৃতশ্রবণাতৃপ্ত মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণদমীপে পুনঃপ্রশ্ন এবং দেবকী-স্বত হইতে কংস দ্বীয় মৃত্যুর সম্ভাবনা শ্রবণপূর্বক ভীতচিহ্ন হইয়া দেবকীর যটশিশু-বিনাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—কংস-বিনাশার্থ দেবকী-গর্ভে শ্রীহরির প্রবেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণের দেবকীগর্ভগত শ্রীহরির স্তব ও দেবকীকে সান্ত্বনাপ্রদান।

তৃতীয় অধ্যায়—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির স্বয়মুপস্থিতি আবির্ভাব, মাতাপিতার পুত্রকে ভগবজ্জ্ঞানে স্তুতি এবং কংসভয়ভীত পিতার পুত্রকে গোকুলে আনয়ন।

চতুর্থ অধ্যায়—চণ্ডিকাাকাশ্রবণে অতিভয়াকুল কংসের দুর্ভিক্ষগণ-প্রদত্ত বালাদিহিংসন-রূপ অহিত পরামর্শকে ‘হিত’ বলিয়া জ্ঞান।

পঞ্চম অধ্যায়—শ্রীনন্দমহারাজের পুত্রের জাতকর্মাদি সম্পাদন-পূর্বক মথুরায় গমন ও তথায় বসুদেব-মহা মিলনোৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সখা-বসুদেব বাক্যানুসারে শ্রীনন্দের গোকুল-প্রত্যাগমন-কালীন পশ্চিমধো মূর্তি-রাক্ষসীদর্শন এবং তন্মূরগবৃত্তান্তশ্রবণে বিস্ময়।

সপ্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাশ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের উৎসাহ ও প্রশংসা; শিশুকল্পী শ্রীকৃষ্ণের শকটোৎক্ষেপ, তৃণাবর্ত-বধ এবং মুখ-গহ্বরে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন।

অষ্টম অধ্যায়—গর্গকর্তৃক দেবকীপুত্র ও রোহিণীপুত্রের নামকরণ এবং নন্দসদীপে কৃষ্ণকৃত-কথন; শ্রীকৃষ্ণের রিঙ্গ (জাহ্নুচংক্রমণ), পদদ্বারা বিচরণ, গব্যামোষণ (গব্যাপহরণ), গব্যভাণ্ডভজনাदि বাল্যক্রীড়া তথা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তকণ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন এবং পরীক্ষিত-প্রমোদরে শ্রীকৃষ্ণের দ্রোণ ও ধরাদেবীর প্রসঙ্গ-বর্ণনাদি।

নবম অধ্যায়—মাতা-যশোদার দধিমহনকালে কৃষ্ণের স্তন্যপানেচ্ছা, মাতা কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে ভূমিতলে অবতারণ করিয়া চুল্লীস্থ উৎসিচ্যমান দুগ্ধরক্ষার্থ গমন করিলে কৃষ্ণের ক্রোধ ও দধিভাণ্ডভজনাदि-লীলা, কৃষ্ণকৃত ভাণ্ডভজাদি-দর্শনে যশোদার কৃষ্ণকে বন্ধনোদ্‌যোগ, সমস্ত বন্ধনরজ্জুর দ্বাঙ্গুলাপুত্তি এবং মাতার শ্রান্তি-দর্শনে কৃষ্ণের বন্ধন-স্বীকার।

দশম অধ্যায়—দামোদর শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন-ভঞ্জন-লীলা-বহস্য ও কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শ-হেতু শাপাবসানে যমলার্জুন-বৃক্ষ হইতে নির্গত কুবেরাত্মজ দ্বয়ের দিবাদেহধারণ-পূর্বক কৃষ্ণস্তুতি ।

একাদশ অধ্যায়—শ্রীমদকর্তৃক কৃষ্ণের দাম-বন্ধন-মোচন, শ্রীকৃষ্ণের ফলক্রয়াদিচ্ছলে ফল-বিক্রেত্রীর প্রতি কৃপা-প্রদর্শন, শ্রীমদাদি গোপবৃন্দের সংগোষ্ঠী গোকুল হইতে বৃন্দাবনযাত্রা এবং কৃষ্ণের বৎস ও বকাসুর-বধলীলা ।

দ্বাদশ অধ্যায়—কৃষ্ণের গোপবালকগণসহ বনবিহার এবং অঘাসুর-বধলীলা ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ব্রহ্মার গোবৎস ও বৎসপাল-হরণ, শ্রীকৃষ্ণের সর্বাশ্রয়ামিরূপে যোগমায়া-প্রভাবে সহস্রসরাবধি তত্ত্বস্বরূপে লীলাবিস্তার-পূর্বক ব্রহ্মবিমোহন এবং অবশেষে ব্রহ্মার মোহনাশ ।

চতুর্দশ অধ্যায়—শ্রীভগবানের অচিন্ত্যাত্মত লীলাবিলাস-দর্শনে বিস্মিত—পূর্বাগন্তকনিশ্চয়-করণে অসমর্থ ব্রহ্মকর্তৃক কৃষ্ণস্তব ।

পঞ্চদশ অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের ব্রজবালকগণ-সহ ধেষ্ঠ-পালন করিতে করিতে তালবনে প্রবেশ, শ্রীবলরাম-কর্তৃক সানুচর-ধেনুকাসুর বধ এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কালিয়বিষ হইতে গোপ-সহ গোপবালকগণকে রক্ষণ ।

ষোড়শ অধ্যায়—যমুনা-তটে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনলীলা, কালিয়পত্নীগণ-কর্তৃক কৃষ্ণস্তব, কালিয়-প্রতি কৃষ্ণানুগ্রহ এবং কৃষ্ণদেশে কালিয়ের পূর্ব-বসতি রমণকদ্বীপে গমন ।

সপ্তদশ অধ্যায়—কালিয়ের নাগালয়-রমণকদ্বীপ-পরিত্যাগপূর্বক যমুনা-প্রবেশকারণ-কথন, গরুড়ের প্রতি শৌভরি-শাপবাক্য, কালিয়হৃদ হইতে উদ্ধিত কৃষ্ণদর্শনে গোপবালকগণের আনন্দ এবং কৃষ্ণকর্তৃক দাবানল হইতে সুপ্ত-ব্রজবাসিগণের পরিত্রাণ ।

অষ্টাদশ অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রীষ্মে বন-বিহার-লীলা, ভগবদ্-বিহার-স্থল শ্রীবৃন্দাবনে গ্রীষ্মেও বসন্ত-ঋতু-লক্ষণ প্রকাশ এবং শ্রীবলরাম-কর্তৃক প্রলম্বাসুর-বধ ।

উনবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মুঞ্জারণ্য-প্রবিষ্ট গোপ ও গোধনগণকে দাবাগ্নি হইতে সংরক্ষণ-পূর্বক ভাণ্ডীরবনানয়ন ।

বিংশ অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের গোপগণসহ বর্ষায় বন-বিহার এবং উপমান-সংযোগে বর্ষা ও শরৎঋতুর শোভা-বর্ণন-মুখে বিবিধ উপদেশ ।

একবিংশ অধ্যায়—শরদাগমে শ্রীকৃষ্ণের রম্যবৃন্দাবন-প্রবেশ এবং কৃষ্ণ-বংশীধ্বনি-শ্রবণে ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণগুণ-গান।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-জ্ঞাত গোপকন্যাগণের কাহ্যায়নী অর্চন, কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও বরদানাদি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—ক্ষুধার্ত গোপবালকগণের রামকৃষ্ণ সমীপে ক্ষুধাপ্রশমন-প্রার্থনা ও তদান্যে যজ্ঞশালায় যাজ্ঞিক বিপ্রগণ-সমীপে অন্ন-যজ্ঞা, বিপ্রগণের তদ্যানে অনঙ্গীকারহেতু পুনঃ কৃষ্ণাদেশে তৎপত্নীগণ-সমীপে অন্নভিক্ষা, বিপ্রপত্নীগণের অন্নদান ও কৃষ্ণানুগ্রহ প্রাপ্তি এবং বিপ্রগণের তদান্যাকরণ-হেতু পশ্চাত্তাপ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়—ইন্দ্রগর্ভ-চূর্ণীকরণ মানসে কৃষ্ণের ইন্দ্র-যাগ-নিবারণ-পূর্বক গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-প্রবর্তন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—যজ্ঞভঙ্গহেতু ক্রোধপরবশ ইন্দ্রের ব্রতনাশার্থ অতিরিক্ত বারিবর্ষণ, তন্নিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ এবং গোকুল-রক্ষণ-লীলা।

ষড়্বিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কন্মদর্শনে বিস্মিত গোপগণসমীপে শ্রীমন্দের গর্গোক্তি অনুবাদপূর্বক কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বর্ণন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতপ্রভাব-দর্শনে ইন্দ্র ও সুরভি-কর্তৃক কৃষ্ণাভিষেক ও শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' নামকরণ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের বক্রণালয় হইতে নন্দানয়ন এবং গোপগণকে বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন।

একোনত্রিংশ অধ্যায়—রাসলীলাবিলাসার্থ শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণ-সহ উজ্জ্বল-প্রভাক্তি এবং রাসারম্ভে তাঁহার অঙ্কদ্বানরূপ কোতুক।

ত্রিংশ অধ্যায়—বিরহসম্প্রদা গোপীগণের উন্মত্তবৎ বনে বনে ভ্রমণ-পূর্বক কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে প্রিয়বিরহবিধুরা শ্রীকৃষ্ণভানু-নন্দিনীর সাক্ষাৎপ্রাপ্তি, তৎসহ গোপীগণের পুনরায় যমুনাপুলিনে প্রত্যাবর্তন এবং কৃষ্ণাগমন-প্রতীক্ষা।

একত্রিংশ অধ্যায়—যমুনাপুলিনাগতা কৃষ্ণাদর্শনবিহ্বলা গোপীগণের কৃষ্ণগীতি-সহকারে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণদর্শন-প্রার্থনা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—কৃষ্ণদর্শনলালসান্বিতা গোপীগণমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁহাদিগকে সাত্ত্বনাপ্রদান তথা গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দোচ্ছাস।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়—যমুনোপবনে গোপীমণ্ডলমধ্যগত কৃষ্ণের বহুমূর্তি প্রকটপূর্বক রাস-ক্রীড়া ও তদনন্তর যমুনা-বিহার, শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষাংসংশয়-নিরাকরণ-ব্যগদেশে রাস-লীলা সম্বন্ধে বদ্ধভীষের প্রাকৃত-ধারণা-নিরসন।

চতুত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অধিকাবনে সর্পগ্রস্ত নন্দের এবং অঙ্গিরোগোত্রজ-ঋষিশাপে সর্পযোনিপ্রাপ্ত 'সুদর্শন' নামক বিদ্যাধরের মোচন তথা শঙ্খচূড়-বধ-লীলা।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ গোচারণার্থ বনগমন করিলে গোপীগণের কৃষ্ণ-বিরহসূচক গীতি-অবলম্বনে দিবস-যাপন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অরিষ্টাসুর-বধ, নারদ-বাক্যে রাম-কৃষ্ণেরে বহুদেবায়ুজ-জ্ঞানে কংসের তদুভয়ের বিনাশ-চিন্তা, বৃন্দাবনে 'কেশি'-প্রেরণ এবং রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়নার্থ অক্রুরের প্রতি আদেশ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কেশীদৈত্য-বধ, শ্রীকৃষ্ণের ভাবিকর্ষসমূহ কীর্তন-দ্বারা নারদের কৃষ্ণস্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের বোমাসুর-বধ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়—মহামতি অক্রুরের ব্রজগমন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রজরাজ-কর্তৃক তাঁহার সংকার।

একোচত্বারিংশ অধ্যায়—অক্রুরসমীপে কংসাপ্তপ্রায় শ্রবণপূর্বক সোপায়ন গোপগণসহ শ্রীরাম-কৃষ্ণের রথারোহণে মথুরাযাত্রাকালে গোপীগণের বিলাপোক্তি, শ্রীকৃষ্ণের দূতদ্বারা গোপীগণকে আশ্বাসন, অক্রুরের রথচালন এবং গমন-পথে কালিন্দীজলমধ্যে বিফুলোক-দর্শন।

চত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীঅক্রুরের ভগবৎস্তব।

একচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের মথুরাপুরী-প্রবেশ, পৌণ্ড্রীগণের কৃষ্ণদর্শন-জন্ম উল্লাস, শ্রীকৃষ্ণের রক্তক-বধ এবং সুদামা মাণাকার ও বায়ককে বরদান।

বিচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কুজার উন্নমন, ধনুর্ভঙ্গ, কংসরক্ষি-গণের বিনাশ এবং কংসের দুর্নিমিত্ত-দর্শন ও রছোৎসবাদি।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের রক্তদ্বারে 'কুবলয়াপীড়' নামক মত্তহস্তীকে বিনাশপূর্বক রক্ত-প্রবেশ ও চানুর-সহ আলাপন।

চতুশচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবকর্তৃক যথাক্রমে চানুরাদি ও মুষ্টিকাদি মল্ল-বধাঙ্গে কংস ও তাহার কঙ্কাদি অষ্টভ্রাতার বিনাশ-সাধন, শ্রীকৃষ্ণের কংসপত্নীগমাশ্বাসন ও ঘোর জনক-জননীর বন্ধন-মোচন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—সাগ্রশ্রীকৃষ্ণের জনক-জননীকে সান্ত্বনা দান, মাতাসহ উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক, সত্ত্বর ব্রজগমনাঙ্গীকারে নন্দাদি ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনাপ্রদান, দ্বিজাতিসংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতগ্রহণ-পূর্ব্বক গুরু-কুলবাস ও বিদ্যাধায়ন-লীলা, 'পঞ্চজন'নামক অসুর-বধ ও 'পাক্‌জন্ম' শঙ্খ-লাভ, যমালয় হইতে গুরুপুত্রপ্রত্যানয়ন-দ্বারা গুরুদক্ষিণা দান এবং গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভবকে ব্রজে প্রেরণ-পূর্ব্বক নন্দ-যশোদার শোকাপনোদন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণদেশে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশ-প্রদান-দ্বারা সান্ত্বনাপূর্ব্বক উদ্ধবের মধুপুরী-প্রত্যাগমন এবং ব্রজবাসিগণের প্রেমাতিশযা-জ্ঞাপন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের কুজার মনোভিলাষপুরণার্থ কুজা-গৃহে গমন ও কুজা-সহ বিহার, অক্রুর-গৃহে গমনপূর্ব্বক অক্রুরের স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসন ও পাণ্ডবগণের সংবাদ-গ্রহণার্থ তাঁহাকে হস্তিনায় প্রেরণ, অতঃপর উদ্ধবসহ যুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন।

একোদশাশতম অধ্যায়—অক্রুরের কৃষ্ণদেশে হস্তিনাপুর-গমন, বিদুর ও কুন্তীদেবীর নিকট পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বৈষমা-বাবহারের কথা শ্রবণ, কুন্তীদেবীর শিরামক্কপাদপদ্মে শরণাগতি-জ্ঞাপন, অক্রুরের ধৃতরাষ্ট্র-প্রতি হিতোপদেশ, ধৃতরাষ্ট্র-মনোভিপ্রাষ জ্ঞাত হইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন ও কৃষ্ণদম্ভীপে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন।

পঞ্চাশতম অধ্যায়—জরাসন্ধের জামাতা-কংস-নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে মথুরা অবরোধ, রামকৃষ্ণ-কর্তৃক জরাসন্ধের সপ্তদশবার পরাজয়, জরাসন্ধের অষ্টাদশ-বার যুদ্ধোচ্ছোগ-কালে নারদপ্রেরিত কালযবন নামক জনৈক বীরের আব্রুতুল্য যোদ্ধা অবস্থেণে মথুরাগমন ও যদুপুরী অবরোধ, অবিলম্বে জরাসন্ধাগমন-সম্ভাবনায় উভয়তঃ যাদবগণের সমূহ বিপদাশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণকে রক্ষণার্থ সমুদ্রমধ্যে দুর্গনির্মাণপূর্ব্বক তথায় যোগবলে যাদব-গণকে আনয়ন এবং আত্মীয়গণকে সুরক্ষিত-দর্শনে বলদেবের অন্তমতি লইয়া নিরস্ত্র পুরদ্বার হইতে বহির্গমন।

একপঞ্চাশতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মুচুকুন্দের প্রথর দৃষ্টিদ্বারা কালযবন সংহার, মুচুকুন্দের কৃষ্ণস্তুতি ও কৃষ্ণকৃপা-লাভ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—মুচুকুন্দের কৃষ্ণাবাদনা, শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় মথুরাক্রমণকারী যবনসৈন্তের বিনাশ-সাধনপূর্বক ধনরত্নাদি লইয়া দ্বারকা-গমনকালে বহুসৈন্তসহ জয়সন্ধের পুনরায় মথুরাবরোধ, রামকৃষ্ণের ভীতবৎ পলায়নলীলা এবং শ্রবণপর্বতারোহণ, জয়সন্ধের পর্বতে অগ্নিপ্রদান, রামকৃষ্ণের জয়সন্ধাদির অলঙ্কিতে পর্বতশিখর হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকায় প্রবেশ, জয়সন্ধের সঙ্কল্পসিদ্ধি-বিবেচনায় সসৈন্যে হৃদৈশ-প্রস্থান, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবস্থানকালে বিদর্ভরাজনন্দিনী কাক্ষিণীর শ্রীকৃষ্ণকে পতিক্রমে বরণ এবং ব্রাহ্মণ-দ্বারা কৃষ্ণসমীপে পত্র-প্রেরণ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—কাক্ষিণী-পত্নীভূতাবে শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ-নগরে গমন এবং জয়সন্ধ-প্রমুখ শত্রুবল-সমক্ষে কাক্ষিণী-হরণ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিপক্ষরাজগণের পরাভব, কাক্ষিণী-ভ্রাতা কাক্ষীকে বিক্রম করিয়া কৃষ্ণের পুত্রী প্রত্যাগমন ও কাক্ষিণীর পাণিগ্রহণ এবং কাক্ষীর 'ভোজকট'-নামক নগর নির্মাণ-পূর্বক ত্রুক্ষুটিতে তথায় বাস।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রহ্লাদের জন্ম, শম্বরাসুর-কর্তৃক প্রহ্লাদ-হরণ, শম্বরকে বধ করিয়া পত্নী রতিদেবী-সহ প্রহ্লাদের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন এবং পুরবাসীর আনন্দবর্দ্ধন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়—রাজা সত্রাজিতির স্বর্ঘ্যসকাশে সামন্তকমণিলাভ, ঐ মণিহরণ-ব্যাপারে সত্রাজিতির কৃষ্ণপ্রতি যিথ্যা সন্দেহ, স্বকলঙ্কানোদন-মানসে শ্রীকৃষ্ণের মণি-আচরণ, জাহ্নবান ও সত্রাজিতির কট্যাহয়-প্রাপ্তি তথা সত্রাজিতকর্তৃক উপদ্রোহ-স্বরূপে প্রদত্ত মণির অগ্রহণ এবং সমস্তক-হরণাদি-দ্বারা অর্থের অনর্থতা-কথন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের ছতুগৃহ-দাহ-সংবাদ-ভ্রমণে হস্তিনা-পুরে-গমন, অক্রুর ও কৃতবর্মা'র প্ররোচনায় শতংহ্মার মণিলোভে সত্রাজিৎ-বধ, রামকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন, শতংহ্মার অক্রুর-সমীপে মণি রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন, মণিহরণে প্রযোজক অক্রুর ও কৃতবর্মা'র পলায়ন, মিথিলোপবনে কৃষ্ণকর্তৃক শতংহ্মা-বধে মণির অপ্রাপ্তি, শ্রীবলরামের জনক-ভবনে এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন, শ্রীকৃষ্ণের অক্রুরকর্তৃক আনীত মণি-দ্বারা স্বীয় অপযশ-মার্জ্জন এবং অক্রুরকে সেই মণির পুনঃপ্রতারণা।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডব-গণকে দর্শনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থ-গমন, শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দ্যাদি পঞ্চকন্ঠার পাণিগ্রহণ,

অগ্নির খাণ্ডবদাহন ও অর্জুনকে গান্ধীবাদি প্রদান, ময়দানবের সভা-নির্মাণ ও দুর্যোধনের বিবর্ত্ত ।

একোদশষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রানুরোধে মুরাদি অনুচরসহ পৃথ্বীপুত্র নরকাসুর বধ, পৃথিবী কর্তৃক কুম্ভস্তব ও নরকাস্ত্রত দ্রব্যাদি কুম্ভকে প্রতাপর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের নরকপুত্রকে অভয়দান, নরকাস্ত্রত ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণি-গ্রহণ, স্বর্গ হইতে পারিজাত-হরণ এবং তাহাতে ইন্দ্রাদির দুর্ভিক্ষ ।

ষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে কল্মিষীর কোপোৎপাদন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম-কলহ ।

একষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের পুল্ল-পৌত্রাদি সন্ততি-কথন, অনিরুদ্ধ-বিবাহে বলরাম-কর্তৃক রুক্মীবধ ও কলিঙ্গরাজের দন্তোৎপাটন এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদির বিবাহ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়—‘উষা-হরণ’ প্রসঙ্গারম্ভ ; অনিরুদ্ধের বাণাসুর-কন্যা উষা-সহ বিহার, বাণাসুরের অনিরুদ্ধ-সহ সংগ্রাম এবং অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়—বাণ-বাদবসমরে শিববল-পরাজয়, বৈষ্ণবজ্বর-কর্তৃক রৌদ্রজ্বর-পীড়ন, রৌদ্র-জ্বরের কুম্ভস্ততি, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বাণের বাহুচ্ছেদ ও সহস্রভুজ-মধ্যে ভুজচতুষ্টয়মাত্র সংরক্ষণপূর্বক তৎপ্রাপ্তি রূপা প্রদর্শন এবং উষা-সহ অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন ।

চতুষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ইক্ষ্বাকু-জনয় নৃগোত্রের শাপবিমোচন, ব্রহ্মসাপহরণ-দ্রোণোক্তি-দ্বারা রাজগণকে শিক্ষাদান এবং নৃগোত্র-প্রসঙ্গে বিভূতি-ভাগ্য-ভোগাদি মদমত্ত বাদবগণের অমুশাসন ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীবলদেবের সুহৃদর্শনাভিলাষে গোকুলে গমন, মধু ও মাধব মাসে যমুনোপবনে স্বীয় গোপীগণসঙ্গে রাসরসোৎসব এবং যমুনাকর্ষণ-লীলা ।

ষট্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের কাশীগমন-পূর্বক পৌণ্ড্রক তনুিত কাশীরাজ এবং সুদক্ষিণাদি বধ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়—বৈবতকপর্বতে ললনামুখ-সহ ক্রীড়ারত শ্রীবলদেব কর্তৃক নরকমিত্র মৈন্দবানরের ভ্রাতা অতিথল দ্বিবিদবানরের বিনাশ-সাধন ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়—দুর্যোধনকন্যা লক্ষ্মণা-হরণ-ব্যাপারে জাহ্নবতী-নন্দন সাম্ব কোরবগণসহ যুদ্ধে নিরুদ্ধ হইলে তদ্বিমোক্ষার্থ বলদেবের হস্তিনাগমন

ও বন্ধুভাবে শাস্তিস্থাপনে অনিচ্ছুক কোরবগণের ঔদ্ধত্য-দর্শনে বলদেবের হস্তিনাকর্ষণ, দুর্ঘোষনাদির বলদেব-স্তুতি এবং শ্রীবলদেবের লক্ষ্মণাসহ সাস্থকে লইয়া হারকা-প্রত্যাবর্তন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ ষোড়শসহস্র-মহিষী-গৃহে গাইস্থালীলা-দর্শনে শ্রীনারদের বিষ্ময় ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং নারদপ্রতি কৃষ্ণাঙ্গগ্রহ।

দ্বাদশসপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের আফিক-কর্ম, সুধর্মা-সভায় জরাসন্ধকর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ-প্রেরিত দূতের আগমন ও কৃষ্ণসমীপে প্রতিবিধান-কামনা, নারদাগমন, কৃষ্ণের পাণ্ডব-সংবাদ-পৃচ্ছা, নারদের পাণ্ডবগণেপ্সিত রাজস্বয়-যজ্ঞানুষ্ঠান-বার্তা-জ্ঞাপন ও তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের অনুমোদন-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণের রাজস্বয়যজ্ঞে গমন ও জরাসন্ধ-বিজয়ের কোন্টী অগ্রে কর্তব্য, তদ্বিষয়ে উদ্ধবের বিচারাপেক্ষা।

একসপ্ততিতম অধ্যায়—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে রাজস্বয়াদি-ব্যাপার তাঁহারই অচিন্ত্য ইচ্ছায় সংঘটিত ও জরাসন্ধ-বধাদি-ব্যাপার তদন্তভুক্ত জ্ঞানাইলে মহিষীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থগমনোচ্চোগ, দূতপ্রমুখাৎ রাজগণকে সান্ত্বনা-দান এবং শ্রীকৃষ্ণাগমনে পাণ্ডবগণের আনন্দোৎসব।

বিসপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়-যজ্ঞানুষ্ঠান প্রস্তাবের অনুমোদন, ভীমসেনকর্তৃক দুর্জয় জরাসন্ধের নিধন, জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষেক ও কারাকুদ্ধ রাজগণের মুক্তিদান।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের রাজগণকে মোচনপূর্বক জরাসন্ধপুত্র সহদেব-দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজযোগা ভোগাদি-প্রদান ও কৃপাপূর্বক নিজরূপ প্রদর্শন, সহদেবকর্তৃক পূজিত হইয়া ভীমার্জুনসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রেমবিহ্বলতা।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়—রাজস্বয়রাজ্যে যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণস্তুতি, হোতৃবরণ, অগ্রপূজা-প্রসঙ্গে সহদেবের কৃষ্ণপূজারহঁ শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপন, চেদিরাজের অসহিষ্ণুতা ও কৃষ্ণকাকর্ষনিন্দা, শ্রীকৃষ্ণের চক্র-দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন, শিশুপালের সাক্ষ্যমুক্তিলাভ, রাজস্বয়-সমাপনান্তে মহিষীগণসহ কৃষ্ণের হারকা-প্রস্থান, দুর্ঘোষনের পরসুখাসহিষ্ণুতা ও কলি-আবাহন। (ক্রমশঃ)

— শ্রীমুরেরন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ, (অনার্স)

[প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়]

“সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন”

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠার পর)

আজ শনিবার (ইং ১৪।৮।৭৬)। যাত্রীরা সুউচ্চ শ্রীশঙ্করাচার্যের মন্দির দর্শনের কুছত। আর স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। শ্রীঅমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকলেই শ্রান্তক্লান্ত। একটু কষ্ট আর সহ্য করিতে ইচ্ছা করেন না। আমার বাসনা শ্রীশঙ্করাচার্যের মন্দির দর্শন করিব। ইহা কাশ্মীরের সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত মন্দির। ধর্মশালা হইতে প্রধান সড়কে ৭ মাইল দূরত্ব। তবে সোজা পথে দূরত্ব কম হইবে। শ্রীপাদ রাধামাধব প্রভু আমার সাথী হইলেন। ট্যাক্সি ১০ টাকার কমে যাইবে না, সেই হেতু সকলে পিছপা হইলেন। যাহা হউক অন্যান্য যাত্রীরা প্রভুদের আশ্রুগতো ডাললেকে বিভিন্ন স্থান দেখিতে গেলেন। আমি ও রাধামাধব প্রভু বৈকাল ৫টা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সোজা রাস্তা ধরিয়া সুউচ্চ ১০০০ হাজার ফুট পাহাড়ের গায়ে যে সড়ক রাস্তা আছে যাহা বিপদসঙ্কুল তাকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইলাম। এই পথের যাত্রী কেহ নাই। আকাশে মেঘ আনাগোনা করিতেছে। সূর্যের তাপ তখনও কমে নাই। সন্ধ্যার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। সেই হেতু আমরা দুজনে দ্রুতগতিতে চলিয়া অবশেষে শ্রীশঙ্করাচার্যের সুউচ্চ মন্দিরে পৌঁছলাম ৬।৩০ মিনিটে। এই পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের সন্নিকটে দূর-দর্শন কেন্দ্র (Television Centre) আছে। আমরা উহার ধার দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলাম। পাহাড়ের উপরে শ্রীশিব-লিঙ্গ ও শ্রীশঙ্করাচার্যের মন্দির দর্শন করিলাম। শহরের সুউচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করিয়া বেশ আনন্দ পাইলাম। নীতল আবহাওয়ায় বেশ অ'রাম অনুভব হইল, চারিদিকে অবলোকন করিয়া কাশ্মীর সহরের দৃশ্য দর্শন করিলাম। সহরের চারিদিকের রাস্তা বড় বড় বাড়ী, হোটেল, বিলাম নদীর তীরকাঁধাকা জলস্রোত যেন শ্রীনগরকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, ডাললেক, নেহেরুপার্ক এবং অন্যান্য দর্শনীয় দৃশ্য দর্শন করিলাম। শ্রীশঙ্করাচার্যের মন্দিরে উঠিলে শহরের চিত্রটি সুন্দরভাবে দর্শন হয়। আমরা মন্দির হইতে বাহির হইয়া নীচের রাস্তা ধরিয়া নীচে মূলরাস্তা ধরিলাম। ট্যাক্সি পাইয়া ডাললেকের ধারে আসিলাম। কিছু সময় ডাললেকের ধারে ঘোরাফেরা করিতে করিতে আমাদের সহযাত্রীদের দর্শন পাইলাম। তাহারা পূর্বেই একবার নৌকা ভ্রমণ করিয়াছেন। পুনরায়

আমাদের ভ্রমণকে নৌকায় তুলিয়া নিলেন। মনের আনন্দে নৌকাতে ভ্রমণ করিলাম। ডাললেকে দুভাগে ভাগ করা হইয়াছে। একটি বড়লেক আর একটি ছোট লেক। বড় লেকের ধারেই আছে মোঘল উদ্যানগুলি, চার-চিনার, নেহেরু পার্ক, ছোট লেক হজরত বাল মসজিদের দিকে গিয়াছে। ডাললেকের জল গ্রীষ্মে ঈষৎ ঠাণ্ডা এবং নীতে ঈষৎ গরম অনুভব হয়, আমরা ছোটলেকের কিছুদূর অতিক্রম করিয়া বড়লেকের ধারে আসিলাম। অবশেষে সকলের ইচ্ছাতে নেহেরু পার্কে অবতরণ করিলাম, নেহেরু পার্কে রেফ্রিজেট আছে, বিভিন্ন রং-এর ফুলের বাগান; লোকজনে পরিপূর্ণ। রাত্রের দৃশ্য বড়ই মনোরম, রাত্রিকালীন আলোর ঝলমলে পার্কের সৌন্দর্য্য বহুভাবে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ডাললেকে বড় বড় হাউস বোট (House-Boat) আছে। সমর্থবান ব্যক্তি হোটেলে উঠিয়া হাউস-বোটে থাকিয়া প্রমোদ ভ্রমণ করেন। বহু পুরাণ নৌকাও দেখিলাম ডাললেকে। ছোট বড় বহু নৌকা যাত্রী বহনের জন্য ব্যস্ত। ডাললেকের ধারেই দোকান পাটের বাহার। Govt. Art Emporium দর্শন পেলাম ডাললেকের ধারেই। বাহিরের লোকদের আকর্ষণ করিবার জন্য শাল, শাড়ী ও বিভিন্ন কারুকার্যের দোকান-পাট সুন্দর পরিবেশে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ডাললেকের ও আসেপাশের দর্শন শেষ করিয়া আমরা রাত্রি ১০টায় ধর্ম্মশালাতে পৌঁছিলাম।

শ্রীনগর সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিশেষ করিয়া নূতন সহর। ঝিলাম নদী সহরকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বড় বড় হোটেলের আকর্ষণীয় প্রাসাদ বিভিন্ন প্রকার মন্দের দোকান সহরের চারিদিকে ছড়িয়াছে মত্ৰপায়ীদের আকর্ষণের জন্য। মিলিটারী হেড কোয়ার্টার্স, বড় বড় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ছোট বড় মাংসের দোকান, যানবাহনের বন্দোবস্ত সব কিছু মিলিয়া ভোগের একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা আছে এখানে, এই ভোগের ব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য বড় বড় সহরেও আছে। তবে কাশ্মীর উপত্যকার আকর্ষণ অল্প রকম, প্রমোদ ভ্রমণের একটি বিশেষ স্থান হল কাশ্মীর-শ্রীনগর।

আজ ১৫ই আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতার ২৯তম দিবস। স্বাধীনতা-উৎসবের বিশেষ কোন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান নজরে পড়িল না। আমরা বাসযোগে সকাল ৮টায় রওনা হইয়া ৯-৩০ মিঃ-এ ক্ষীরভবানী মন্দিরে

পৌঁছিলাম। এখানে হিন্দুদের মহারঙ্গিনী মূর্তি দর্শন করিলাম, শ্রীনগর হইতে দূরত্ব প্রায় ১৫।১৬ মাইল। এখানে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে ভক্তগণ নিজেদের পূজা অর্থাৎ নিবেদন করেন এবং কুণ্ড হইতে নির্মালা গ্রহণ করেন। আমরা দর্শন শেষ করিয়া ১১-৩০ মিঃ ধর্মশালাতে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং প্রসাদ সেবাস্তে বিশ্রাম করিলাম।

কাশ্মীর উপত্যকায় আরো দর্শনীয় স্থান আছে যেমন শোনমার্গ শ্রীনগর হইতে ৮৩ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। প্রতিদিন বাস যায় না, সপ্তাহে তিন দিন বাস যায় যদি যাত্রী থাকে। টাঙ্গমার্গ ও গুলমার্গ শ্রীনগর হইতে ৪৫ কিঃ মিঃ দূরত্ব এবং ৫১ কিঃ মিঃ খিলেনমার্গ। দৈনিক একথানা বাস যায় যদি যাত্রীপূর্ণ হয়, শুধু পাষ্টন বৃক্ষ দেখা ছাড়া আর কিছুই আকর্ষণীয় নাই, শ্রীঅমরনাথ যাহারা একবার দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে এই সমস্ত আকর্ষণীয় আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহারা অমরনাথের পথে যান নাই, তাহারা এই সমস্ত দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, উলার হ্রদ শ্রীনগর হইতে ১৬০ কিঃ মিঃ দূরত্ব। সপ্তাহে তিনবার বাসের ব্যবস্থা থাকে। যাতায়াতের অসুবিধায় এখানে যাইবার আশা পরিত্যাগ করি।

প্রমোদব্রমণে যাহারা বাহির হন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তীর্থযাত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি আকাশপাতাল পার্থক্য। অতএব কর্ণজড় ভোগীকুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনের প্রতি যত আকর্ষণ, ভক্তদের সেরূপ আকর্ষণ নাই। আমরা শ্রীঅমরনাথ দর্শনের আকর্ষণেই বাহির হইয়াছিলাম শ্রীগৌড়ীয় তন্ত্রের আনুগত্যে। শ্রীঅমরনাথ কীউর শ্রীলিঙ্গ দর্শনের পর প্রত্যাবর্তনই বিধেয়। তবুও এতদূরে অর্থাৎ প্রায় ২২০০ কিঃ মিঃ দূরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যখন আসা হইয়াছে, তখন পহেলগাঁ হইতে ৬৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত ভূম্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকার ভৌগোলিক দর্শনীয় স্থান দর্শনের উপেক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন ঠিক হবে না মনে করি। যাত্রা-পথে কাশ্মীরের উপরিলিখিত স্থানগুলি দর্শনের ব্যবস্থা ছিল। আমরাও কৌতুহল ও দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় স্থানগুলি দর্শন করিলাম। মহাজন গাহিয়াছেন—

“জনম সফল তার

কৃষ্ণ দরশন যার

ভাগ্যে হইয়াছে একবার।

বিকশিয় হনুয়ন

করি কৃষ্ণ দরশন

ছাড়ে জীব চিন্তের বিকার ॥”

যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত এবং সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে সদা সর্বদা কৃষ্ণের রূপগুণ-লীলা-পরিবরণের কথা নিত্যশ্রবণ করেন, তাঁহাদের বাহ্যিক আকর্ষণ কতদূর বিস্তার করিতে পারে? তবুও কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাতে আকর্ষণ কম বলিয়াই—চিন্তের বিকার হেতু এই সকল দর্শনে আমরা স্বল্প ও কোমল মতি ব্যক্তি মাতিয়া উঠি দর্শনের লালসায়। এই কর্ণফল-বশতঃ জ্ঞানের ভূমিকায় আসিয়া পড়ি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে মাতোয়ারা হইয়া যাই সাধারণ কন্মীর মত।

(ক্রমশঃ)

— শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রী জগন্নাথ-প্রকাশ

দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-নগরে ।
 দ্বারকার রাজা হ'য়ে রাজ-কার্য্য করে ॥
 বিশ্বকর্মা নিরমিল সুরম্য প্রাসাদ ।
 নানা দিব্য মণিরত্ন সেথা' সুশোভিত ॥
 কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর তরে ।
 ষোড়শ সহস্র মন্দির রাজে অন্তঃপুরে ॥
 কৃষ্ণের মহিষী-মধ্যে বিদর্ভ-নন্দিনী ।
 সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা নাম সে' রুস্বিনী ॥
 রুস্বিনী-মন্দিরে কৃষ্ণ করিয়া শয়ন ।
 রাত্রে ঘুম-ঘোরে কহে প্রলাপ বচন ॥
 'নন্দরাজ, নন্দরাণী—আছ কত দূরে ।'
 কহি' হেন কৃষ্ণচন্দ্র কাঁদে ঘুম-ঘোরে ॥
 'রাধা' 'রাধা' বলি' কভু করয়ে ক্রন্দন ।
 'ললিতা, বিশাখা' বলি' ডাকয়ে কখন ॥
 এ হেন ব্যাপার দেখি' রুস্বিনী বিস্মিত ।
 পুছিল কৃষ্ণচন্দ্রে,—'এ কেমন প্রলাপ ॥
 মোরা জানি, মোরা শুধু তোমার প্রেয়সী ।
 মোরা ধন্য, তব পদ সেবি' দিবানিশি ॥

রাধা নামে ডাক যারে, কে সেই প্রেয়সী ?
 কোথা' শ্রীদাম, লজিতা আর দাস-দাসী ॥
 নন্দরাজ, নন্দরাণী কহিছ যা'দেরে ।
 কোথায় তা'দের ঘর কহ তা' মোদেরে ॥
 হেথা থাকি' ভাবিতেছ যাহাদের কথা ।
 তা'দেরই প্রেম-ডোরে তুমি সদা বাঁধা ॥
 আমাদের প্রেম বুঝি লাগে নাই ভালো ।
 তাই তাহাদের প্রেম যাচিছ কেবল ॥
 মোদের সেবা চেয়ে, তাদের সেবা শ্রেয়ঃ ।
 তারাই ধন্যাতি ধন্য, মোরা অতি হেয় ॥
 তাদের প্রীতির কথা কহ গো মোদেরে ।
 শুনি' তাহা, মোরা ধন্য হইব অন্তরে ॥
 কহিল শ্রীকৃষ্ণ তবে,—‘শুন গো রুক্মিণী ।
 সুধদ্বা সভাতে আমি যেতেছি এখনি ॥
 তথা হ'তে ফিরি' তোমা' কহিব সকল ।
 তদবধি ধৈর্য্য ধরি' রহ কিছুকাল ॥
 কৃষ্ণের বচনে রুক্মিণী কহে স্নান মুখে ।
 ‘এখনই তা' শুনিলারে সাধ জাগে চিতে ।’
 রুক্মিণীর অনুরোধে কহিল কেশব ।
 ‘রোহিণী মাতার কাছে জেনে লহ সব ॥
 —এত কহি' কৃষ্ণচন্দ্র লইল বিদায় ।
 রুক্মিণীও হাসিমুখে মা'র কাছে ধায় ॥
 অন্য পটুরাণীগণে রুক্মিণী-সহিত ।
 রোহিণী মাতার কাছে ধাইল ত্বরিত ॥
 পুছিল,—‘কহ গো মাতঃ ! ব্রজ-কথামৃত ।
 যাহা স্মরি' স্বামী নিদ্রাকালে ব্যাকুলিত ॥
 কহিলা রোহিণী মাতা,—‘সে' কথা মধুর ।
 শুনিলেই মহাভাবে হ'বে ভরপুর ॥

প্রকাশ্যে সে' কথা কভু বলা নাহি যায় ।
 নিভৃত গৃহের মাঝে কহি আজি তাই ॥
 দ্বারী হ'য়ে রহ কেহ ভবনের দ্বারে ।
 কৃষ্ণ-বলাই যেন পশিতে না পারে ॥
 ব্রজপুর-লীলা-কথা করিলে কীর্তন ।
 কৃষ্ণ ও বলরাম আসিবে তৎক্ষণ ॥
 তা'দিগে সকল কথা বলা অনুচিত ॥
 তাই কহি, কেহ রহ দ্বারে উপস্থিত ॥
 অষ্ট-মহিষী তবে করিয়া যুকতি ।
 অহুনয় করি' কহে সুভদ্রার প্রতি ॥
 'দিদি তুমি কৃপা করি' রহ গৃহ-দ্বারে ।
 তোমা' ঠেলি' তারা কভু আসিবে না ধরে ॥
 রাণীদের অনুরোধে সুভদ্রা তখন ।
 প্রীত হ'য়ে গৃহ-দ্বারে করে অবস্থান ॥
 মাতা তবে ব্রজলীলা কহিতে লাগিল ।
 শুনি' তা' আনন্দ-রসে শ্রোতারা মজিল ॥
 'মাধুর্য্যামণ্ডিত সেই ব্রজপুর-শোভা ।
 দ্বারকার শোভা চেয়ে বড় মনলোভা ॥
 দ্বারকার পথে পথে সৈন্ত ও সিপাহী ।
 ব্রজ-পথে দেখা যায় গোয়ালার গাভী ॥
 মণিময় অট্টালিকা দ্বারকা নগরে ।
 তথাপি মৌন্দর্য্য ভায় ব্রজপুরে ॥
 জন-কোলাহলে মত্ত দ্বারকা নগর ।
 শুক-সারী-গানে মাতে সারা ব্রজপুর ॥
 দ্বারকার মাঠে খেলে মল্ল-যোদ্ধা-বৃন্দ ।
 ব্রজ-মাঠে গোষ্ঠ-লীলা করে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ (ক্রমশঃ)
 — ক্রীড়িতরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য

পরমহংসস্বামী ঙ্গ বিষ্ণুপাদ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;

জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ।

শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

অন্যাত্ম বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উছোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে । এই উপলক্ষে আগামী ২০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ (ইং ১৫৭১৯৭৮) বুধবার হইতে ৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ (ইং ১৫৭১৭৮) শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাট্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্তাঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন । এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী শুকুতি অর্জিত হইবে । পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল । ইতি—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ; ইং ১৫৬১৯৭৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

—ঃ সেবা-পঞ্জী :—

- ১। ২০শে আষাঢ় (ইং ৫।৭।৭৮), বুধবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ২১শে আষাঢ় (ইং ৬।৭।৭৮), বৃহস্পতিবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ২২শে আষাঢ় (ইং ৭।৭।৭৮), শুক্রবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা; অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথাক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে অপরাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ২৩শে আষাঢ়, ৮ জুলাই শনিবার হইতে ২৫শে আষাঢ়, ১০ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গে পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ২৬শে আষাঢ় (ইং ১১।৭।৭৮), মঙ্গলবার—হেরাপঞ্চমী-দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ২৭শে আষাঢ়, ১২ জুলাই, বুধবার হইতে ২৯শে আষাঢ়, ১৪ জুলাই, শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ পূর্বাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাটিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৫।৭।৭৮), শনিবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

স বৈ পুংনাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিধোক্ষজে ।



অঠৈতুকাপ্রতিহতা যযাত্তা তুপ্রনীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পনন ।
অধোক্ষজে অঠৈতুকা ভক্তি বিরহন ।

অন্য ধর্ম কৃষ্ণরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ } কারনোদশায়ী, ২৮ শ্রীধর, ৪২২ গোরাঙ্গ ১১ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
বৃহস্পতিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।৮।১৯৭৮

সান্ন্যাসাদঃ

শ্রী শ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিষ্ণুমঙ্গল-ঠাকুর-বিরচিতম্]

গোপীজনাহ্লাদকর ব্রজেশ

গোচারণারণ্যকৃতপ্রবেশ ।

জিহ্বে পিরম্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬১ ॥

যিনি ব্রজগোপীবৃন্দের চিত্তবিনোদনকারী, যিনি ব্রজের ঈশ্বর, যিনি গোচারণার্থ বনে বিচরণশীল ; হে জিহ্বে ! তুমি সেই ঈশ্বরের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—নামামৃত সর্বদা পান কর ॥ ৬১ ॥

প্রাণেশ বিশ্বন্তর কৈটভারে

বৈকুণ্ঠ নারায়ণ চক্রপাণে ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬২ ॥

হে জিহ্বে ! তুমি “প্রাণেশ্বর, বিশ্বন্তর, কৈটভারি, বৈকুণ্ঠ, নারায়ণ, চক্রপানি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব”—এই শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত পান কর ॥ ৬২ ॥

হরে মুরারে মধুসূদনাত্ত

শ্রীরাম সীতাবর রাবণারে ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৩ ॥

হে জিহ্বে ! তুমি “হরি, মুরারি, মধুসূদন, আদি পুরাণপুরুষ, রাবণারি, সীতাপতি, শ্রীরাম, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব”—এই নামামৃত পান করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

শ্রীষাদবেন্দ্রাদ্রিধরাসুজাঙ্ক

গোগোপগোপীসুখদানদক্ষ ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৪ ॥

হে জিহ্বে ! তুমি “যদুপতি, গিরিধারী, কমললোচন, গো-গোপ-গোপীজনসুখদাতা-শিরোমণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” এই নাম সুধা নিরন্তর পান কর ॥ ৬৪ ॥

ধরাভরোত্তারণগোপবেষ

বিহারলীলাকৃতবন্ধুশেষ ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৫ ॥

যিনি ধরণীর ভার অপনোদন করিবার জন্য গোপবেষ ধারণ করিয়াছিলেন এবং লীলাবিহারের নিমিত্ত শেষশায়ী অনন্তদেবকে সহায় করিয়াছিলেন :

হে জিহ্বে ! সেই শ্রীকৃষ্ণের “গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” নামামৃত সর্বদা পান কর ॥ ৬৫ ॥

বকীবকাঘাসুরধেনুকারে

কেশীতৃণাবর্তবিঘাতদক্ষ ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৬ ॥

যিনি পুতনা, বকাসুর, অঘাসুর ও ধেনুকাসুরগণের বিনাশকারী এবং কেশীদৈত্য ও তৃণাবর্ত অসুরকে বধ করিতে যিনি বিশেষ পটু ছিলেন ; হে জিহ্বে ! সেই শ্রীকৃষ্ণের “গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” নামরস নিরন্তর পান কর ॥ ৬৬ ॥

শ্রীজানকীজীবন রামচন্দ্র

নিশাচরারে ভরতাগ্রজেশ ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৭ ॥

যিনি জানকীর জীবনধরুপরাম, রাক্ষসহন্তা, ভরতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন ; হে জিহ্বে ! সেই কৃষ্ণচন্দ্রের “গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” নামামৃত সর্বদা পান কর ॥ ৬৭ ॥

নারায়ণানন্ত হরে নৃসিংহ

প্রহ্লাদ বাধাহর হে কুপালো ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৮ ॥

যিনি নারায়ণ, অনন্ত, হরি ও প্রহ্লাদের সর্ববিঘ্ননাশন, করুণাময় শ্রীনৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ; হে জিহ্বে ! সেই শ্রীহরির “গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” নামামৃত পান কর ॥ ৬৮ ॥

লীলামনুশ্রীকৃতিরামরূপ

প্রতাপদাসীকৃতসর্বভূপ ।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৯ ॥

যিনি লীলাবিলাসচ্ছলে মনুষ্যাকার ধারণ করতঃ রামরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং যিনি অসীম প্রতাপে সমস্ত নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন : হে জিহ্নে ! সেই নন্দনন্দনের “গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” নামামৃত সর্বদা পানরত হও ॥ ৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে

হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব ।

জিহ্নে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৭০ ॥

হে জিহ্নে ! তুমি “শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, মুরারি, নাথ, নারায়ণ, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব”—এই নামামৃতরস নিরন্তর পান কর ॥ ৭০ ॥

বক্তুং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চি-

দহো জনানাং ব্যসনাভিমুখাম্ ।

জিহ্নে পিবস্বামৃতমেতদেব

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৭১ ॥

ইতি—শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল-ঠাকুর-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ-

দামোদর-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

কলিহত জীবের বিষয়পিপাসা কীদৃশী ! অহো ! সহজলভ্য স্নগ্ধুর শ্রীহরিনাম মুখে কীর্তন করিতে সমর্থ হইলেও বিষয়াসক্ত মানবের মধ্যে কেহই ঔগবল্লম গ্রহণ করে না । ইহা হইতে আর ত্রুণের বিষয় কি হইতে পারে ? কিন্তু হে আমার জিহ্নে ! তুমি “গোবিন্দ, দামোদর, মাধব” এই নামামৃত অনুক্ষণ পান করিতে থাক—ইহাই আমার একান্ত অহরোধ ॥ ৭১ ॥

শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-

স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

দিবাসূরি বা আল্‌বর্গের জীবনী

(২) দিব্যসূরি বা আল্‌বর্গ

আল্‌বর্গ-শব্দের অর্থ

আল্‌বর্গ বা আল্‌বর্—ইহা একটি দ্রাবিড়ীয় শব্দ, তামিল ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ—দিব্যসূরি বা দিব্যযোগী বা নিত্যযোগী। বিশিষ্টাষ্ট্রেত বিশ্বাসমতে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধপার্ষদ-মহাদ্বাগণ এইরূপ সংজ্ঞায় কথিত হইতেন।

আল্‌বর্গের সংখ্যা ও তাঁহাদের জীবনী-গ্রন্থ

আল্‌বর্গের সংখ্যা কাহারও মতে দশ এবং অচ্যুতমতে দ্বাদশ। বৈকুণ্ঠ হইতে এইসকল নারায়ণ-পার্ষদগণ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'দিবাসূরি-চরিতম্' ও 'প্রপন্নামৃতম্'-গ্রন্থে এবং তামিল ও সংস্কৃত-মিশ্র মণিপ্রবাল-ভাষায় লিখিত গুরুপরম্পরা-প্রভাবে—'প্রবন্ধসার', 'উপদেশ-রত্নমালা' এবং দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত 'পট্টনড়ি', 'বিলক্কম'-নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয়ে উল্লিখিত আছে।

আল্‌বর্গ-সম্বন্ধে "প্রপন্নামৃতম্"

প্রপন্নামৃতের ৭৪ অধ্যায় ১৫।১৬ শ্লোকে লিখিত আছে যে—

কাহারভূতমহদাহ্বয়ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছটারিকুলশেখরবিষ্ণুচিন্তাঃ।

ভক্তাজিযুরেণুমুনিবাহশ্চতুষ্কবীজাঃ তে দিব্যসূরয় ইতি প্রতিথা দশোক্তাং ॥

গোদায়তীন্দ্রমিশ্রাভাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্ধ্বুধাঃ। বিস্বজা গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম। কেচিন্দ্वादশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ।

সংস্কৃত ও দ্রাবিড়-ভাষায় দিব্যসূরি বা আল্‌বর্গের নাম

- ১। কাহার নুন, বা সরোযোগী (দ্রাবিড় ভাষায়—পয়গই আল্‌বর্)
- ২। ভূত যোগী (দ্রাবিড়—পুদত্ত আল্‌বর্)
- ৩। ভ্রান্ত যোগী বা মহদ (দ্রাবিড়—পে-আল্‌বর্)
- ৪। ভক্তিসার (দ্রাবিড়—তিরুমটিসাইল্লিরাণ আল্‌বর্)
- ৫। শঠারি, শঠকোপ, পরাহুশ, বকুলান্তরণ (দ্রাবিড়—নন্মাল্‌বর্)
- ৬। কুলশেখর (দ্রাবিড়—কুলশেখর আল্‌বর্)
- ৭। বিষ্ণুচিন্ত (দ্রাবিড়—পেরি-ই-আল্‌বর্)
- ৮। ভক্তাজিযুরেণু (দ্রাবিড়—তোত্তরডিগ্গডি আল্‌বর্)
- ৯। মুনিবাহ, যোগীবাহ, প্রাণনাথ (দ্রাবিড়—তিরুম্মাণি)

১০। চতুষ্কবি, পরকাল (দ্রাবিড়—তিরুমঙ্গল আল্‌বর্)

এই দশজন সর্ববাদীসম্মত দিবাসুরি ব্যতীত অন্য কেহ

১১। গোদা (দ্রাবিড়—আণ্ডাল)

১২। রামানুজ (দ্রাবিড়—যংবাকুমানার, উদইয়াবার বা ইলাই আল্‌বর্)

দ্বাদশটিকে আল্‌বর্ বা দিবাসুরি বলিয়া থাকেন। অপর গোদাদেবীকে বাদ দিয়া মধুর কবিকে দিবাসুরির তালিকা-অন্তর্গত করেন।

১৩। মধুর কবি (দ্রাবিড়—মধুরকবিগল আল্‌বর্)

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে এবং শ্রীপেরুম্বৈতুরে এই দিবাসুরিগণের মূর্তি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়।

(২) শ্রীগোদাদেশ্বরী

আবির্ভাব-স্থান—শ্রীভিল্লিপুতুর

শ্রীভিল্লিপুতুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্র নামক জনৈক আল্‌বরের সহস্র-কর্ষিত তুলসী-কাননে শ্রীগোদাদেশ্বরী আবির্ভূতা হন। জনকরাজ-সদৃশ বিষ্ণুচিত্র স্বীয় কন্যাজ্ঞানে গোদাকে লালন-পালন করিতেন।

আবির্ভাব-কাল ও পূর্ব মূল-পরিচয়

৯৭ কলিগতাকে মঙ্গলবারে বৈশাখমাসে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে গোদাদেশ্বরী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। স্থলমাহাত্ম্য-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গুরুত্ব বিষ্ণুচিত্র-রূপে অনুগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের নিকট বিষ্ণুচিত্রের তনয়রূপে পৃথিবীতে প্রকট হইবার প্রার্থনা করেন। নারায়ণ সেই প্রার্থনায় সন্মত হইয়া তাঁহার গোদা মূর্তি পৃথিবীতে সকল নারায়ণ-মন্দিরে অর্চিত হইবেন আশ্বাস করেন। লক্ষ্মীর গোদা নাম্নী অর্চার উপাসনাবলে শ্রীবৈষ্ণব-গণ মোক্ষলাভ করিবেন। শ্রীনারায়ণের বিবিধ শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অগ্রতম। ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা গীলা-নাম্নী শক্তিত্রয় মূর্ত্যাকারে মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। লীলা বা ভূর্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা। তাঁহার অংশে গোদা ধরায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

দ্বাদশ আলোয়ার মধ্যে গোদাদেশ্বরী

গোদা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মতে একজন আল্‌বর্। নারীমূর্তি ধারণ করিয়া তিনিই একমাত্র আল্‌বর্ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আল্‌বর্ বলিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা দশটি আল্‌বর্ স্বীকার করেন।

শ্রীবিষ্ণুচিত্তের ভগবৎসেবা ; তাঁহার কন্যা গোদাদেবীর বাল-
চাপল্যে অযথা কুঠে, পরে লক্ষ্মীর অবতার-জ্ঞানে পূজা।

বিষ্ণুচিত্ত অচনিশ পুষ্প-তুলসী-কানন রচনা করিয়া কাননস্থ পুষ্পতুলসী সংগ্রহপূর্বক তাহার মালা গাঁথিয়া বটশায়ী ভগবানকে সমর্পণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত গোদা ক্রমশঃ বালোচিত চাপল্যে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচিত্ত যে-সকল পুষ্পতুলসী ও মালাদি ভগবান্ বটশায়ীর জন্য পবিত্র-ভাবে সংরক্ষণ করিতেন, বাল্যস্বভাবক্রমে গোদা সেইগুলি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিজের ভোগাজ্ঞানে ব্যবহার করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। একাদিন সেইরূপ ব্যবহার বিষ্ণুচিত্তের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি কন্যা গোদাকে হারপন্নাই তিরস্কার করিলেন—“ভগবানের জন্ত পুষ্প-তুলসী তাঁহাকে দিবার অথো তুমি ঐগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে ভোগ কর, ইহাতে মহা-সেবাপরায় হইয়া। ভগবৎ নির্মালাই জীবের গ্রাহ্য। জীবের ভুকাব শেষ হইয়া আমি ভগবানকে জ্ঞানসারে দিতে পারিব না।” বিষ্ণুচিত্ত সেইদিবস রিক্তহস্তে বটশায়ীর মন্দির গেলেন ও নিজকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিদ্রাবশে দেখিতেছেন যেন বটশায়ী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পুষ্পতুলসী না লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিষ্ণুচিত্ত কারণ নিবেদন করিলে বটশায়ী বলিলেন—“গোদা মালাদি ধারণ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না, বরং আমার অধিক প্রীতির বিষয় জানিবে। তোমার কন্যা মালাদি ব্যবহার করিয়া আশা দিলে আমার অধিকতর প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে।” বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রা হইতে উদ্ধুদ্ধ হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ কক্ষার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্বিবসাবধি তিনি তাঁহার কন্যাকে ‘লক্ষ্মীর অবতার’-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন এবং তদীয় বাবস্থিত পুষ্পতুলসীাদি শ্রীবটশায়ীকে প্রতাহ দান করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না।

বয়োমত্তির সহিত ভগবৎপ্রেম-লাভ-চেষ্টার বিকাশ

গোদার বয়োমত্তির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্তের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মর্ত্য পুরুষের পাণিগ্রহণ হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-ললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া ভগবৎপ্রেম-লাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ হইল।

মর্ত্যজীবের সহিত বিবাহ-প্রস্তাবে গোদার ক্রোধহেতু বিষুচিত্তের ক্ষমা প্রার্থনা

বিষুচিত্ত গোদার ভাবাদি দল্লর্শনে তাঁহার হৃদয়ভাষ্য প্রায় সংগ্রহ-মানসে উদ্ধাচের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। গোদা মর্ত্য-মানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হুঃখিতা ও ক্রোদ্ধা হইলেন। 'মর্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে'—একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বিষুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার বিবাহ-সংযোগ

নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্তির কমনীয়ভাবে তাঁহার কথা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তরশত মূর্তির উল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতুহল-সহকারে সকল অর্চনার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অমুকম্পায় সর্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন প্রকাশ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার কিরূপে বিবাহ হইবে, তদ্বাবসায় বিষুচিত্তের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইল। অবশেষে চিন্তামগ্ন হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথ দ্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কথা গোদার করগ্রহণ প্রস্তাব করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে সেবকগণের উপায়নসহ বিপ্লিপুতুরে আগমন

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেও প্রধান সেবক, ভগবদাদেশে তত্রস্ত সেবকমণ্ডলী, ভূত আড়ানি প্রভৃতি শ্রীবিপ্লিপুতুরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীগোদা-দেবীকে রাজকীয় সন্ময় ও সমাদরের সহিত আনিবার জন্য অঙ্কমতি করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে প্রেরিত সম্প্রদায় যথাকালে বিপ্লিপুতুরে গমন করিয়া বিষুচিত্তকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। বিষুচিত্তও ঘটনায়ী নিকট সকল কথা জানাইলেন এবং তাঁহার সন্মতিও প্রাপ্ত হইলেন। গোদার জ্ঞান মণিময় সিংহাসন প্রস্তুত হইল। তাহার চতুর্দিকে আবরণ। শ্রীগোদা আর মর্ত্য-মানবের পরিদর্শনের যোগ্য বস্তু নাই। শ্রীভগবানের অস্তঃপুরচারিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৪) নিয়মাগ্রহ

‘নিয়মাগ্রহ’ দুই প্রকার—‘বিধি’ ও ‘নিষেধ’

নিয়ম দুই প্রকার অর্থাৎ ‘বিধি’-লক্ষণ ও ‘নিষেধ’-লক্ষণ। যাহা যাহা করা কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সেই সকলই বিধি-লক্ষণ-নিয়ম। যাহা যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সেই সকলই নিষেধ-লক্ষণ-নিয়ম। উভয় লক্ষণ-নিয়মই জীবের মঙ্গলজনক।

জীবের উপাদেয়তা-লাভের প্রত্যেক ক্রম-সোপানেরই
বিধি এবং নিষেধ বর্তমান

বহুজীব অত্যন্ত ছোট অবস্থা হইতে অত্যন্ত উপাদেয় অবস্থা-প্রাপ্তির যোগ্য। তদুভয় অবস্থার মধ্যে অনেক অবস্থা আছে। প্রত্যেক অবস্থাই একটি ‘ক্রম’-সোপান। প্রত্যেক ‘ক্রম’-সোপানেই জীবের এক একটি বিশ্রাম-স্থল। প্রত্যেক ক্রম-সোপানেই পৃথক্ পৃথক্ বিধি-নিষেধরূপ কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত আছে; জীব যখন যে সোপানে পদ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, তখন সেই সোপানের নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ-পালনে তিনি বাধ্য। সেই নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালন করিতে করিতে তাঁহার অব্যবহিত পর-সোপান-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ঐ যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিলে তিনি পদচ্যুত হইয়া নিম্নস্থ সোপানে নামিয়া পড়েন। ইহার নাম ভ্রগতি। উচ্চ সোপান-প্রাপ্তির নাম সঙ্গতি।

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই ‘গুণ’ ও তাহা ত্যাগের নাম ‘দোষ’

স্বীয় সংপ্রাপ্ত সোপান-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম ‘স্বধর্ম’ বা স্বাধিকার-নিষ্ঠা। স্বাধিকার-নিষ্ঠাই ‘গুণ’ এবং স্বাধিকার-নিষ্ঠা-ত্যাগের নাম ‘দোষ’। গুণ-দোষ বলিয়া আর কিছু নাই। অতএব শ্রীভগবান্ উক্তবকে এই উপদেশ বলিয়াছেন,—

স্বৈ স্বধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরকীর্তিতঃ।

বিপর্যায়স্ত দোষঃ শ্রাদুভয়োঃ নৈশ্চয়ঃ॥

দেশকালাদিভাবানাং বস্তুনাং মম সত্তম।

গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কৰ্ম্মণাম্॥

(ভাঃ ১১।২১।২, ৭)

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং তদ্বিপর্যয়ই 'দোষ'—ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। দেশ, কাল ও বস্তুসকলে জীবের কর্তব্য-নিয়মের ভিন্ন গুণ ও দোষের বিধান হইয়াছে।

নিত্য ও নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধের মধ্যে 'নিত্য', যথা :-

এই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আবার বিচার করিতে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ হয়। জীব বিস্তৃত চিদ্রূপ।

ঐহার নিত্য-স্বভাবে অবস্থিতি-কালে যে বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, তাহা নিত্য নিয়ম। তিনি সংসার প্রাপ্ত হইয়া মায়া-দন্তোপাধি-দ্বারা স্বীয় সিদ্ধ অবস্থা হইতে যে পৃথক্ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা ঔপাধিক। সেই ঔপাধিক অবস্থাই বহুবিধ; নিত্য অবস্থা অদ্বয় ও এক।

নিত্য-অবস্থায় জীবের প্রেমই—বিধি ও মংসরতাই—নিষেধ। সেই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম জীবের নিত্য-স্বভাবের অনুগত। মংসরতাশূন্য প্রেমময় জীব নিত্য-রসের আশ্রয়। রস পঞ্চবিধ হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্ব। সে-অবস্থার নিয়ম আমাদের এতুলে বিচার্য্য নয়। কেবল এইমাত্র জ্ঞান আবশ্যক যে, সেই অবস্থায় জীবের নিত্য-স্থিতি।

নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধ, যথা :-

নৈমিত্তিক অবস্থায় নিয়মসকল বহুবিধ হইলেও স্থূল-লক্ষণ বিচারপূর্ব্ব সমস্ত সোপানগুলিকে তিনটি সীমাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ গীতা, স্মৃতিসকলের মতেই কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটি স্থূল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি বিধি ও কতকগুলি নিষেধ নিদ্ধিষ্ট আছে। কৰ্ম্ম-বিভাগে বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম এবং তদনুগত দশবিধ সংস্কার ও আত্মিক কৰ্ম্মগুলি—বিধি। পাতক, উপ-পাতকাদি—নিষেধ। দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ জ্ঞান-বিভাগে সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, চিদচিদ-আলোচনা—বিধি। কাম্যকৰ্ম্ম, নিষিদ্ধকৰ্ম্ম ও বিষয়াসক্তি—নিষেধ। ভক্তি-বিভাগে ঐদাসীত্ব ও ভক্তির অনুকূলতার সহিত কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-বিভাগের বিধি-নিষেধ-পালন এবং তদ্বারা দেহযাত্রা-নির্ব্বাহপূর্ব্বক ভগবদনুশীলনই—বিধি। ভগবদ্বিহীনুখ সমস্ত কৰ্ম্ম-জ্ঞান ত্যাগ, বিষয়াসক্তি ও অজ্ঞান ভক্তি-প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া পরিত্যাগই—এ পর্ব্বের নিষেধ।

বদ্ধজীবের প্রথম সোপান—কৰ্মকাণ্ড

বদ্ধজীব অর্বেচ-জীবন অর্থাৎ অস্ত্যাজ-চরিত্র ছাড়িয়া যে-সময়ে উন্নত হন, তখন প্রথমে তিনি কৰ্মকাণ্ড-রূপ সোপানে অবস্থিত হয়। সেই সোপানস্থ জীব জ্ঞান-বিভাগের উচ্চ সোপানকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্যে থাকিবেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। যে-পর্যন্ত চিদচিদ-আলোচনা ও অহঙ্কার-তত্ত্বের বিবেক-ক্রমে জড়নয় ক্রমে তাঁহার নির্বেদ না হয়, সে-পর্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্যনিষ্ঠা ত্যাগ করিলে প্রতাবায়ী হইয়া পড়েন। আবার যখন তদ্রূপ নির্বেদ উৎপত্তি হয়, তখন উচ্চাধিকার আসিয়া তাঁহার কৰ্ম-নিষ্ঠাকে দূর করে। সে-সময়ে কর্ম্মাধিকারগত নিয়ম-সকলে আগ্রহ করিলে তাঁহার আর উন্নতি সাধন হয় না।

দ্বিতীয় সোপান—জ্ঞান-বিভাগীয় কাণ্ড

সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগীয় সোপানাক্রম পুরুষের পক্ষে জ্ঞান-নিষ্ঠাই নিয়ম। যে-পর্যন্ত ভক্তি-সোপানে রুচি না হয়, সে-পর্যন্ত তিনি জ্ঞান-নিয়মে অবস্থিত থাকিবেন। ভক্তিতে অধিকার জন্মিলেই জ্ঞান-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইবে; নতুবা তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া উন্নতি-লাভ করিতে পারিবেন না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্স্বীত ন নির্বিচ্ছিন্নত যাবত।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ম জায়তে ॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-কাল পর্য্যন্ত বিবেক-জাত বৈরাগ্য না হয়, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল করিবে। সেই নির্বেদ ততদিন কার্য্যকর হইবে, যতদিন কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধার উদয় না হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকার-তত্ত্ব। যথা—

তস্মান্ভক্তিয়ুক্তস্ত যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ (ভাঃ ১১।২০।১১)

আমার ভক্তিয়ুক্ত যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়োজনক হয় না। অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নিষ্ঠা হৃদয় হইতে দূর হয়, তখনই ভক্তির ক্রিয়া ভালরূপ হইতে থাকে।

কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপান ত্যাগ করিয়া ভক্তির

সোপানে নিষ্ঠাই কর্তব্য

কৃষ্ণ-প্রেমের মন্দির, শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে চৌদ্দ-লোকসয় প্রাকৃত কর্ম্ম-কাণ্ডীয় জগৎ-রূপ

সোপান অতিক্রম করতঃ বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞান-কাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।

তৃতীয় সোপান—ভক্তি, এবং তাহার ক্রমোন্নতিতে—‘প্রেম’

ভক্তি-সোপানে দমাকচ পুরুষের শ্রদ্ধাই—নিয়ম। সেই শ্রদ্ধা সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে ভজনবলে বিগত-অনর্থ হইলে ভক্তি—নিষ্ঠা-রূপে প্রকাশ পায়। যত যত অনর্থ বিগত হয়, তত তত উন্নতি-সোপানের অতিক্রম হইতে হইতে নিষ্ঠা রুচি-রূপে এবং রুচি আসক্তি-রূপে এবং আসক্তি ভাব-রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব রতি-রূপে সামগ্রী-যোগে রস হয়। যথা, একাদশে—

যথা বথান্না পরিমুখ্যতেহসৌ মংপুণাগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।

তথা তথা পশ্যতি বস্ত স্মৃক্ষং চক্ষুযথৈবাজ্ঞন-সম্প্রযুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৬)

আমার পুণাগাথা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনদ্বারা জীবান্না ক্রমশঃ যত যত পরিস্কৃত হন, তত তত তিনি স্মৃক্ষ বস্তু দেখিতে পান। অজ্ঞান-সংযুক্ত চক্ষু যেক্রপ সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ দেখে, তদ্রূপ।

শ্রীল রূপগোষায়ী ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’-গ্রন্থে এই ক্রমটী স্পষ্ট করিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্নাততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়কতি।

সাধকানাময়ং প্রেমাঃ প্রাভূর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থাভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটী সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্বর্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রবর্তী সোপানের নিয়মগুলিতে আদর করিতে হয়। যাহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদ্বর্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন, তাহাদিগকে ঐশঙ্কল নিয়ম, শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব সোপানেই আবদ্ধ রাখে; অগ্রবর্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গের ক্রম-সোপানের যাবতীয় বিধি-নিষেধই

একটি প্রধান নিয়মের অন্তর্গত

ভক্তিমার্গে যে-সোপানে যে-নিয়ম স্থিরীকৃত আছে সে-সমুদায়ই একটি প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। সাধারণ নিয়ম, যথা—

স্মৃতিঃ সততং বিমুখবিস্মৃতিবো ন জাতুচিৎ।

সর্বো বিধিনিষেধাঃ সুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৪২শ অধ্যায়)

‘কৃষ্ণ-স্মরণ নিরন্তর কর্তব্য’—এই মূল-বিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদয় হইয়াছে। ‘কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনই কর্তব্য নয়’—এই মূল-নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতি-কালে পূর্ববিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর-পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া উর্দ্ধগতি-লাভে অশক্তি হইবেন। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ-বিষয়টি সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য। ‘শ্রীহরিভক্তিবিলাসে’ এবিষয়ের বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—

কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।

লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যত কৃত্য লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্তই প্রায় গৃহী ধনী সাধুদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ত্যক্ত-পরিগ্রহ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম লিখিত হয় নাই।

অবশ্যং তানি সর্বাণি তেষাং তাদৃক্-সিদ্ধয়ে।

প্রাগপেক্ষ্যানি ভক্তিহি সদাচারৈকসাধনা॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

যদিও ত্যক্ত-পরিগ্রহ পুরুষদিগের জন্য নিয়মসকল এই গ্রন্থে অপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি সাধকদিগের ত্যক্তপরিগ্রহ-অবস্থা-সিদ্ধির জন্য সেইসকল অপেক্ষিত নিয়ম পালন করা কর্তব্য। ত্যক্তপরিগ্রহ সাধুদিগের কৃত আচারই সে-সম্বন্ধে সদাচার। তাহাই যাত্র তাহাদের পালনীয়।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে শরণাগতি দ্বিবিধ

প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষের প্রথম লক্ষণই শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি। তাহা গৃহস্থ-গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বি-প্রকার। সেই অবস্থার নিয়মগুলি যতদূর গৃহী-দিগের পালনীয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শিব-চতুর্দশী প্রভৃতি ব্রত-সকল ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি গৃহত্যাগীর উপযোগী, তাহা গৃহত্যাগী শরণাগত পুরুষের পালনীয়।

অনন্ত-শরণাগতের লক্ষণ

গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েই সাধনোন্নতি লাভ করিতে করিতে অনন্ত-শরণাগত হন। তখন তাঁহাদের নিম্ন কিছু পৃথক্ হইয়া পড়ে। সে-অবস্থায় সাধনোন্নতি-ক্রমে একান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগতি উপস্থিত হয়। যথা, একাদশে—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্বক্তো বানপেক্ষকঃ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

একান্তিতাং গতানাস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণাক্ষয়োঃ।

ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্তেত তদ্বিন্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিলাস)

ন মযোকাস্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।

সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমপেচুযাম্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩৬)

আমার ভক্ত জ্ঞান-নিষ্ঠই হউন, বিরক্তই হউন বা নিরপেক্ষই হউন—তিনি আশ্রমসকলকে তত্তদাশ্রমের লিঙ্গের সহিত পরিত্যাগ করতঃ অবিধি-গোচর হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যাহারা একান্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভক্তি তাঁহাদের হৃদয় স্বয়ং প্রবর্তমান অর্থাৎ ব্রত-নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না। ব্রত-নিয়মাদি তাঁহাদের পক্ষে বিমুজনক হয়। আমার একান্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণ-সকল স্থান পায় না, কেন না, তাঁহারা সমচিত্ত সাধু এবং বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং অরণং প্রভোঃ।

কুর্ক্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃতামহম্ন বোচতে ॥

বিহিতেদেব নিতোষু প্রবর্তন্তে স্বয়ং হি তে।

ইত্যাত্তেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিলাস উপসংহার-শ্লোক)

একান্ত শরণাগত ভক্তদিগের প্রায়ই কৃষ্ণ-কীর্তন ও কৃষ্ণ-স্মরণ পরম-প্রীতির সহিত সাধিত হয়; সুতরাং নিম্নাধিকারীদিগের জন্য আর সে-সকল কৃতা নিদ্রিষ্ট আছে, তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না। সময়ে সময়ে তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্বক নিত্য-বিধিসকলে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের নিয়ম-বন্ধন বা নিয়মাগ্রহ থাকে না। এই 'উপদেশামৃতের' অষ্টম স্কন্ধে ইহা দর্শিত হইয়াছে। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য অর্থাৎ অন্যান্য কৃত্যের অসাধনে তাঁহাদের কোন প্রকার লাঘব হয় না।

ভক্ত জ্ঞানীর নিয়ম, জ্ঞানী কৰ্ম্মীর নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন

করেন—ইহা বাধ্যতামূলক নহে

তাৎপর্য্য এই যে,—উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছাবিলস মাত্র। জ্ঞানাদিকারী কৰ্ম্মাধিকারের বর্ণাক্রম-ধর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে পালন করেন, বিধি বাধ্যতার সহিত পালন করেন না। ভক্তাধিকারীও তদ্রূপ কৰ্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাদিকারের নিয়ম-সকল কোন কোন কারণবশতঃ স্বেচ্ছাচারের সহিত পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই বিধি-নিষেধের বাধা না হইলেও স্বেচ্ছাপূর্বক পালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরমোচ্চ-ভক্তাধিকারী একান্ত ভক্তও কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও সাধারণ-সাধনভক্তির নিয়ম-সকল পালন করিয়াও নিয়মাগ্রহী হন না; স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের একান্ত ভজনে প্রবৃত্ত হন। সাধন-ভক্ত্যগ্রহই নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মাদি পালন করেন, তাহাই তাঁহার মঙ্গলজনক।

নিয়মাগ্রহ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ

উপদেশ এই যে,—দ্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম-ফলেই সাধকের উচ্চ সোপান লাভ হয়। তখন পূর্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না। সাধক এই উপদেশ সর্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও কীর্তন-লক্ষণ ভজনের প্রতি লক্ষ্য করত ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী, ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ-৬৫)

শ্রীকৃষ্ণের জাতিরূপ উদ্দীপন বিবিধ—গোপন ও ক্ষত্রিয়ত্ব। ক্ষত্রিয়ত্বে মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য, আর গোপনত্বে সখাময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য।

ক্রিয়াক্রূপ উদ্দীপন—সৌহৃদ্যময় প্রীতিরসে যে-সকল ক্রিয়ায় বিক্রমাদির প্রাধান্য থাকে, সে-সকল ক্রিয়া এবং সখাময় প্রীতিরসে নন্দ গান, নানা-ভাষাবিজ্ঞতা, গবাহ্বান, বেণুবাছাদি কলানৈপুণ্য, বাল্যোপযোগী-কৌড়া প্রভৃতি। তন্মধ্যে নন্দ (পরিহাস) যথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনার চতুর্দিকে উপবিষ্ট সখাগণের মধ্যে বসিয়া পরিহাস বাক্যে তাঁহাদিগকে হাস্ত করাইতেছিলেন।

সখাময় প্রীতিরসের নন্দ ছাড়া অন্যান্য ক্রিয়াক্রূপ উদ্দীপনের দৃষ্টান্ত—শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকারে শ্রীবলদেবের সহিত পরিহাস করিতে করিতে শোভাময় বৃন্দাবনের প্রতি প্রীত হইয়া অল্পগত বয়স্যাদির সহিত সন্তুষ্টচিত্তে গোবর্দ্ধন সন্নিহিত মানসগঙ্গাদি নদীতটে গোচারণসহকারে কৌড়া করিতে লাগিলেন। অনুচরণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করিতেছিলেন; পশ্চিমধ্যে কোন স্থলে মদ্যক অলিকুল গান করিতেছে দেখিয়া বলরামের সহিত তিনিও গান করিতে লাগিলেন। কোন স্থলে শুক অপেক্ষা স্তম্ভুর কলবাক্যদ্বারা শব্দায়মান শুকপক্ষীর অন্তরঙ্গ করিতে লাগিলেন।

কোনস্থলে গো ও গোপবালকগণের মনোহর মেঘগম্ভীর স্বরে দূরগামী পশুগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কোনস্থলে চকোর, বক, চক্রবাক, ভারদ্বাজ (ভারুই), ময়ূর প্রভৃতি পাখীর অল্পরূপ ধ্বনি করিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন, কোনও সময়ে প্রানি-গণের মধ্যে গিয়া গোজাতীয় প্রানী সিংহ, বাঘ হইতে ভয় পাইলে যেরূপ শব্দ করে, তদ্রূপ শব্দ করিতে লাগিলেন।

বিহারবিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—
হে বয়স্যগণ! আমরা বয়স ও বলের অল্পরূপ দুইদলে বিভক্ত হইয়া কৌড়া করিব।

শিখিপিচ্ছ, পুষ্প, গৈরিকাদি-দ্বারা বিচিত্র শরীর শ্রীকৃষ্ণ বংশী, পত্রয়চিত্র বংশী ও শৃঙ্গাদির অতুল শব্দ এবং নৃত্যগীত কৌড়াদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। সে-সময় অনুচর গোপবালকগণ তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি গান করিতেছিলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে বয়সগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, তাঁহার দর্শন শ্রীযশোদা প্রভৃতির নয়নের আনন্দস্বরূপ।

সখীগণের উক্তি—গোপগণের সহিত বনে বনে বিচরণকারী এবং দোহনসময়ে চঞ্চল-স্বভাব গাভীগণের বন্ধনরজ্জু-বাবা শোভিত রাম-কৃষ্ণ সুমধুর পদসঙ্ঘলিত শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরব-দ্বারা যে গতিমানদিগের জাড়া এবং বৃক্ষগণের পুলকোদগম করাইতেছেন, তাহা বড়ই বিচিত্র।

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ শুভ বনে গমন করিল শ্রীভৃজদেবীগণ মিলিত হইয়া বিরহাভিবশতঃ তাঁহার চরিত্র গান করিতে করিতে বলিতেছেন,—হে সখি! ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিক এবং তরুণলব্ধদ্বারা মুকুলমল্লের ন্যায় বন্ধ পরিকর হইয়া বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকলকে আহ্বান করেন, এসকল বেশ-দ্বারা সেই সেই লীলা বিশেষ শোভা পায়।

সখারূপ উদ্দীপন—বসন, ভূষণ, শঙ্খ, চক্র, শৃঙ্গ, বেণু, বষ্টি, শ্রেষ্ঠজন প্রভৃতি। কালরূপ উদ্দীপন—সেই সেই ক্রীড়ার (গোচারণ, বনভোজন, মল্লক্রীড়াদির) উপযুক্ত কাল। সে-সকল কাল—শ্রীভৃজদেব বৃন্দাবনের বর্ষা-ঋতু প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

এবং বনং তদ্বিষ্টিং পঞ্চখর্জুরজঙ্গমং।

গো-গোপালৈর্বৃত্তৌ রন্তঃ সবলঃ প্রাবিশঙ্করিঃ॥ (ভাঃ ১০।২০।২৫)

হে রাজন্, এই প্রকার বর্ষার সময় ক্রীড়ার নিমিত্ত গো ও গোপগণে পরিবৃত্ত হইয়া শ্রীবলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চখর্জুর ও জঙ্গুবিষ্টি এক বনে প্রবেশ করিলেন। স্তনভরে মন্দগামিনী ধেনুসকল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আহূত হইয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল, প্রীতিবশে তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল।

সেই বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—পুলিন্দ্যাদি বনবাসিগণ, গুহুল বনরাজি মধুকরণশীল, পর্কত হইতে জলধারা প্রবাহিত, জলের পতনশব্দে গুহাসকলও শব্দায়মান। বনমধ্যে বৃষ্টিপাতসময়ে শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃক্ষ-কোটরে, কখনও বা গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্দমূলফলাদি ভোজন করিয়া বিহার করেন।

নিজ গৃহস্থিত কোনজন বান্ধবগণের আনীত দধি, অন্নবাজন ও জল সন্নিহিত শিলার উপর বসিয়া শ্রীবলরাম ও গোপগণ সহ ভোজন করিলেন। তখন তৃণসকলের উপর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ বৃষ বৎসন্তর ও স্তনভারাক্রান্ত গাভীসকল রোমন্থন করিতেছিল।

সেই বর্ষামৌল্যকে সর্বকালস্থাবহ নিজ-শক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমাদর করিলেন।

অতঃপর মৈত্রেয় প্রীতির অনুভাব প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে উদ্ভাস্বর, সৌন্দর্যময়ী প্রীতিতে নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের হিতানুসন্ধান, সঙ্গত কি অসঙ্গত কি, তাহা বলা; সহস্র আলাপ প্রভৃতি। আর সখ্যময়ী প্রীতিতে অসঙ্খচিত প্রীতিময় চেষ্টা। যথা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র নানা খেলা, সঙ্গীতাদি কলাভ্যাস, ভোজন, উপবেশন, শয়ন প্রভৃতি এবং পরিহাস, বহোলীলাশ্রবণ-কথনাদি, ইথাং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদি শ্লোকে যে-সকল ক্রীড়ার প্রশংসা করা হইয়াছে, সে-সকল সখ্যময়ী মৈত্রীর উদ্ভাস্বর, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন,—হে রাজন্! বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি গোপগণ নবপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, প্তবক (পুষ্পপুচ্ছ) মালা ও গৈরিক ধাতু-দ্বারা ভূষিত হইয়া নৃত্য-গীত ও বাহ্যমুদ্র করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকালে কেহ কেহ গান করেন, কোন গোপবালক বংশী, করতাল ও শৃঙ্গবাঁজা করেন, কেহ কেহ বা প্রশংসা করেন। নট যেমন নটকে স্তব করে তদ্রূপ গোপজাতিক্রমে ছদ্মবেশী দেবতাগণ গোপালকৃপী রামকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন।

কাকপক্ষধর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া ভ্রামণ, উল্লঙ্ঘন, আফোটন ও আকর্ষণ করিয়া বাহুবল করিতেন। যখন অন্য গোপবালক নৃত্য করেন, তখন দ্বয়ঃ কৃষ্ণ-বলরাম গায়ক ও বাদক হন এবং সাধু সাধু বলিয়া নৃত্যের প্রশংসা করেন, কখনও বিল্বফল বা কুম্ভফল-দ্বারা ক্রীড়া করেন।

বনভোজনলীলায় ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সকলদিকে বহু পংক্তি রচনা করিয়া উপবেশন করিলেন। সকলেরই নখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবন্ধ ছিল। সকলে একসঙ্গে উপবেশন করায় পদোৎপত্ত দেখাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার কর্ণিকার স্বরূপ আর সখ্যগণ দল স্বরূপ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ পুষ্পদ্বারা, কেহ পত্রদ্বারা, কেহ অঙ্কুর, কেহ ফল, কেহ বৃক্ষত্বক, কেহ শিকা, কেহ বা প্রস্তর-দ্বারা পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজনরত ছিলেন। ভোজনকালে সকলেই নিজ নিজ খাটের বিশেষ আহার শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া হাস্য-পরিহাস সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন।

একত্রে বিহার সখ্যের ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র গোপ-
বালক অসংখ্য গোবৎস অগ্রে করিয়া পরমানন্দে বাহির হইলেন।
সকলেরই সঙ্গে শিকা, বেত্র, বেণু ও শৃঙ্গ ছিল। কাহারও মনের আবেশ
শ্রীকৃষ্ণ বাতীত অন্যের প্রতি ছিল না। সকলেরই মনের ভাব—আমি
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই যাইতেছি। ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিরূপ
ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতেই গোপগণের সহিত বিহারশালী প্রণয়ের
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সহ বনভোজনলীলায় ব্রহ্মা, গো-বৎস ও সখাগণকে
অপহরণপূর্বক প্রায় একবৎসর মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ
যখন পুনর্বার পুলিনে তাহাদিগকে আনয়ন করেন, তখন সখাগণ বলিলেন,
কৃষ্ণ তুমি অতি মত্তর আসিচ্ছ, আমরা একগ্রাসও ভোজন করি নাই। এস
নিশ্চিন্তমনে ভোজন কর।

লীলাশক্তির প্রভাবে উক সমস্ত ক্ষণকাল মাত্র মনে হইয়াছিল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্ত্ত্রিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রকাশ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৪ম সংখ্যা, ২০৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্রজ-মাঠে ধেনুগণ হাস্য হাস্য করে।

তা' দেখিয়া হরষিত গোপীরা অন্তরে ॥

দ্বারকা নগরে রাজে ঐশ্বর্য্য প্রচুর।

মণি-মুক্তা ঝলমল করে চারিধার ॥

পরমার্থে ব্রজের এক বালুকার কণ।

দ্বারকার শতরত্ন চেয়েও মূল্যবান ॥

মহাসৌভাগ্য লভি' ব্রজবাসীগণে।

সর্ব্বত্যাগ করি' কৃষ্ণে ভজয়ে যতনে ॥

বশুদেবাত্মজ কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা।

সম্মুখে তাহারে সবে করে থাকে সেবা ॥

কৃষ্ণে আত্ম-সম-জ্ঞান করে ব্রজজন ।
 সঙ্কোচ, সম্ভ্রম সেথা রহে না কখনো ॥
 ব্রজপুরে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দের নন্দন
 'গোপাল' বলিয়া তারে ডাকে ব্রজজন ॥
 ব্রজরাজ-স্মৃত বলি' করে না খাতির ।
 সবে জানে কৃষ্ণ তাদের বড় আপনার ॥
 মাতা যশোমতী তারে করি' পুত্রজ্ঞান ।
 কভু বাঞ্ছে, কভু করে তাড়ন-ভৎসন ॥
 ঘাঁ'র ভয়ে মৃত্যুও পলায় ভীত হয়ে ।
 সেই কৃষ্ণ ব্রজ-লীলায় কান্দে মাতৃ-ভয়ে ॥
 শুদ্ধ সখাভাবে যত ব্রজ-সখাগণ ।
 কভু বা কৃষ্ণের স্বেচ্ছা করে আরোহণ ॥
 শ্রীরাধা-অনুগা হয়ে ব্রজ-গোপীগণ ।
 কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে কৃষ্ণের সেবন ॥
 রস-মধো মধুর রস হয় চমৎকার ।
 গোপী-প্রেম সেই হেতু সর্ব রস-সার ॥
 দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ গদা-চক্রধারী ।
 কিন্তু ব্রজে কৃষ্ণ-করে বিরাজে বাঁশরী ॥
 পঞ্চ মুখ্য ভক্তি-রসে ব্রজবাসীগণ ।
 আত্মসম জ্ঞানে কৈল কৃষ্ণের সেবন ॥
 ব্রজবাসীদের প্রেম এতই মধুর ।
 নিদ্রাতেও তাঁদেরে চিন্তে শ্যামসুন্দর ॥
 ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম রহে ব্রজপুরে ।
 ব্রজের মাধুর্য্য তাই ভক্ত-চিন্ত হরে ॥
 মাতা যবে ব্রজ কথা কহিছে এমতে ।
 গৃহ-দ্বারে কৃষ্ণ-বলাই আসিল চকিতে ॥

সর্ব যজ্ঞের সার প্রভাস-যজ্ঞ-কথা ।
 কহিতে লাগিল এবে স্নেহময়ী-মাতা ॥
 “প্রভাস-যজ্ঞ যবে করিল কেশব ।
 নারদ ভবে দ্বারকায় হ'ল উপনীত ॥
 কহিল দেবকী দেবী নারদে ডাকিয়া ।
 নিমন্ত্ৰণ করে এসো সর্বপুরে গিয়া ॥
 শ্রীনারদ সর্বস্থানে গিয়া ঘরে ঘরে ।
 প্রভাস-যজ্ঞে আসিবারে নিমন্ত্ৰণ করে ॥
 ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ।
 ব্রজপুরে প্রবেশিলা স্নান সমাপিয়া ॥
 ব্রজ-রাজ-গৃহে তিনি পশিলা যখন ।
 রাণী যশোমতী তাঁরে বন্দে সেইক্ষণ ॥
 তাঁর পদ ধৌত করি' বসাইয়া আসনে ।
 ছানা-ক্ষীরাদি তাঁরে খাওয়া'লো যতনে ॥
 নারদ ঋষি প্রীত হয়ে কহে যশোদারে— ।
 'দ্বারকায় কেহ এত যত্ন নাহি করে ॥'
 দ্বারকা হইতে ঋষি আসিছে শুনিয়া ।
 পুছে মাতা যশোমতী কঁাদিয়া কঁাদিয়া ॥
 কহ ঋষি,—‘মোর কানু আছেয়ে কেমন !
 দ্বারকার রাজা আজ মোর বাছাধন ॥
 নির্মম অকুর আসি' মোর মুরারিরে ।
 ব্রজ হ'তে নিয়ে গেল মথুরা নগরে ॥
 মথুরা হইতে সে যে ফিরিল না আর ।
 ততবধি মোরা সবে করি হাহাকার ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

অশোভন ভক্ত

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

কিছু স্বপচকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবের প্রদত্ত যাবতীয় বস্তু গ্রহণ এবং তাঁহার সহিতই ষড়্বিধ-সঙ্গ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজকে মহাপ্রভুর সমীপে 'নীচ জাতি', 'নীচ সঙ্গী' সূতরাং 'অস্পৃশ্য' প্রভৃতি জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু স্বমুখে এই শাস্ত্রীয় বাক্যটি উচ্চারণপূর্বক বলিয়াছিলেন,—“ন মেহভক্তশ্চতুর্কেদী মন্তুঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হুহুম্ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ দ্বত ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্‌বাক্য)

চতুর্কেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ যদি অভক্ত হয়, তবে আমার প্রিয় নহে, আর স্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, সেইরূপ ব্যক্তিকেই যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তাঁহা হইতেই যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ আমি যেরূপ পূজা, তিনিও সেইরূপ পূজা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেট উপদেশামৃত হইতে জানিতে পারি,—“দদাতি প্রতিগৃহাতি গৃহমাখ্যাতি পূচ্ছতি।

ভুঙ্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥”

বৈষ্ণবের সহিতই দান-প্রতিগ্রহ, গৃহকথা বলা ও শ্রবণ করা, বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তু ভোজন ও তাঁহাকে ভোজন করান প্রভৃতি প্রীতিলক্ষণ সাধন করিতে হইবে। উপরি-উক্ত মহাপ্রভু-বাক্য ও গোস্বামি-বাক্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিলে কি ভক্তের নিকট হইতে বাচিয়া বাচিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে? অর্থাৎ ভক্তের স্পৃষ্ট, ভক্তের দত্ত তুল বা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা চলিবে না, কেবল তাঁহার নিকট হইতে অপর তণ্ডুল ও কদলীমাত্র গৃহীত হইবে? কই, শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর মতাবলম্বী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু তো’ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এরূপ ব্যবস্থা দেন নাই বা মহাপ্রভুও তো’ “তস্মৈ দেয়ং” বা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও তো’ “ভুঙ্তে ভোজয়তে” পদের টীকায় ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে অপর তণ্ডুল বা কদলী মাত্র গ্রহণের কথা লেখেন নাই। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী-প্রভু ৯ম বিলাসে বলিয়াছেন—

“নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্বক্ষণে বিজ্ঞাঃ ॥”

--হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য, অন্নপানাদি যে কিছু দ্রবাই হউক না কেন, তাহাতে তক্ষাভক্ষ্য বিচার নাই।

পূর্বপক্ষীয়গণ বলেন, একপ বিচার কেবল 'মহাপ্রসাদ' সম্বন্ধে করিতে হইবে, আর সেই 'মহাপ্রসাদ' কেবল আমাদের মাপকাঠির অন্তর্গত পুরীধামেই সম্ভব হইতে পারে, অতএব 'মহাপ্রসাদ' হয় না—একপ যুক্তি নিতান্ত প্রাকৃত; কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

“কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টে হয় মহাপ্রসাদ নাম।”

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মাত্রেই শ্রীমহাপ্রসাদ। জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্চা-বতাবরূপে বা তত্ত্বগণের হৃদয়মন্দিরে জগতের সর্বত্রই বিরাজিত; সুতরাং সর্বত্রই 'মহাপ্রসাদ' হয়।

আর যদি স্থানমাহাত্ম্য হেতুই পুরীধামে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ (?) বিচার করা না হয়, তাহা হইলে শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি পরম মাহাত্ম্যযুক্ত ধামসমূহে কেনই বা মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করা হইবে? তাহা হইলে কি শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ বা বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কম? শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি চরিক্ষেত্র সমূহ কি অভিন্ন নহে? আর যদি পূর্বপক্ষীয়গণের বিচারাবলম্বনে ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য হেতুই শ্রীমহাপ্রসাদে 'বিশ্বাস' (?) স্থাপন করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণোচ্ছিষ্টের শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অপ্রাকৃতত্ব হেতু মহাপ্রসাদে বিশ্বাস স্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে অর্ধ-কুক্কটন্যাবলম্বনে বিষ্ণুধাম-মাহাত্ম্য স্বীকার (?) করিলে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ-মাহাত্ম্য স্বীকার করিলে না। বিষ্ণু-ধাম ও বিষ্ণু-প্রসাদ অভিন্ন বস্তু, উভয়েরই মাহাত্ম্য সমান, উভয়েরই অপ্রাকৃত। অতএব পূর্ব-পক্ষীয়গণের যাবতীর প্রজ্ঞগুণি গুণানুপুঞ্জরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে কেবলমাত্র কপটতা ও বিশ্রলিপ্সা ছাড়া আর কিছু নাই। পুরীতে যে মহাপ্রসাদে 'বিশ্বাস' (?) স্থাপন করা হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিশ্বাস' নহে; পরন্তু তনুধো ও অদৈব-স্মার্ত্ত-সমাজের দাসত্ব-ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্ব ও স্মার্ত্ত সমাজের আইন কানুনে কেবলমাত্র সে-স্থানে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ (?) বিচার নাই বলিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান কর্ণ-জড়-পদাবলিগণের ঐ সকল কপট ও দুর্বল যুক্তির অবতারণা; কিন্তু উহা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের স্তুতীক বিচারে ধরা পড়িয়া যায়।

স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ এত কথাতেও নিরপ্ত না হইয়া বলিয়া থাকেন, একপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য-দ্বারা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু

মহাপ্রভুর আচরণ-দ্বারা তেঁা সমর্থিত হয় না, একরূপ পূর্বপক্ষও বস্তুনযোগ্য। কারণ মথুরায় সানোড়িয়ার ঘরে—যে সানোড়িয়াগণের স্পৃষ্ট জল সং-শূদ্ৰাদি ভাতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী তেঁা গ্রহণ করেনই না, সেইরূপ সানোড়িয়া-কুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের হস্তপাণিত অন্নও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে অনেক সময়েই তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে আসিয়া ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, মহাপ্রভু তখন দ্বিজিহ্ব কপট ব্যক্তির স্থায় কপট ব্যবহারিকতা দেখাটবার জন্য ঠাকুর হরিদাসের সহিত সমপংক্তিতে ভোজনার্থ আহ্বান প্রচার করেন নাই। অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি, তিনি শান্তিপুত্র শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহে বর্ণাশ্রমীর আদর্শ গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভিনয়কারী আচার্য্য-বর্ণা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে স্বয়ং যবনকূলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাস ও ব্রাহ্মণেতরকূলে প্রকটিত শ্রীমুকুন্দের সহিত একত্র ভোজন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা—

“মুকুন্দ হরিদাস লৈয়া করহ ভোজন ॥

তবে ত’ আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।

করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ৩।১০৬-১০৭)

যদি বল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখা যায় তিনি একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইলেই তাঁহার গৃহে অন্নাদি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণব + ব্রাহ্মণ একত্র সমষ্টিতে বড়! প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচার অত্যন্ত প্রাকৃত। বৈষ্ণবে বিপ্রতার অভাব নাই—ইহা তাঁহারা প্রাকৃত অস্মিতা ছাড়িতে পারেন না বলিয়াই বুঝিতে পারেন না। যদি বৈষ্ণব + ব্রাহ্মণ, শৌক্যব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত-বৈষ্ণব অপেক্ষা বড়ই হইবে, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাস বা রায় রামানন্দ অপেক্ষা প্রত্যয় মিশ্রকে মহাপ্রভু অধিক বড় বৈষ্ণব বলিতেন। বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম্ম, উহার উচ্চাচর্য্যবিষয়ে প্রাকৃত কুলাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদি তাহা না হইবে, তবে কেনই বা যবনকুলোদ্ভূত—

“হরিদাসের পাদোদক শিখে শুকগণ ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ১১৬৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত-সার

[দশম স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ]

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চসপ্ততম অধ্যায়—যজ্ঞসমাপনান্তে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গণসহ দীক্ষান্ত-স্নানাদি উৎসব এবং তাঁহার ময়দানব-নিম্নিতসভায় দৃষ্টিভ্রমহেতু মাৎসর্য-পীড়াক্রান্ত রাজা-দূর্যোধনের মানভঙ্গ ।

ষট্‌সপ্ততম অধ্যায়—রুক্মিণীহরণকালে পরাজিত রাজগণের অন্ততম শাল্যের পৃথীকে যাদবশূন্য করিবার প্রতিজ্ঞানুসারে শিবারাধনা ও শিব-বরে ময়দানব-রচিত ইচ্ছানুরূপ গতিশীল 'সৌভ' নামক যানপ্রাপ্তি, বৃষ্ণিবীরগণ-সহ শাল্য-পক্ষীয়গণের মহাযুদ্ধ, বীরগণ প্রত্যয়ের দিব্যাস্ত্র-দ্বারা শাল্য-রচিত মায়া-বিনাশ, শাল্যানুচর দুঃমানের গদাহত প্রত্যয়কে দারুকপুত্র প্রত্যয়-সারথী-কর্তৃক রণস্থল হইতে অপসারণ, সংজ্ঞালাভাস্তর প্রত্যয়ের তজ্জন্ম বীরোচিত ক্ষোভপ্রকাশ এবং তচ্ছরণে সাবধীর নিজধর্ম্য-কথন ।

সপ্তসপ্ততম অধ্যায়—প্রত্যয়ে পুনরায় শাল্যসহ যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন-পূর্বক রণক্ষেত্রে গমন এবং কাপট্যপরায়ণ শাল্যের বিনাশ-সাধন ও 'সৌভ'যান-ভঞ্জন ।

অষ্টসপ্ততম অধ্যায়—শাল্যমিত্র দত্তবক্র ও তদ্ভ্রাতা বিদূরথকে বিনাশ-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নিজপুরীতে বিহার, দত্তবক্রের সাক্ষ্যমুক্তি-লাভ, কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধোপক্রম-শ্রবণে শ্রীবলদেবের তীর্থ-স্নানচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান ও নানাতীর্থ-ভ্রমণ, নৈমিষারণ্যে রোমহর্ষণ সূতের প্রাণবিনাশ ও তৎপুত্র উগ্রশ্রবা সূতকে ভাগবতবক্তৃত্বরূপে বিনিয়োগ ।

একোনাশীতম অধ্যায়—নৈমিষারণ্যবাসী দ্বিজগণের তুষ্ঠার্থ লোক-শিক্ষাকল্পে সূতহত্যাজনিত অপরাধ-মোচন-ব্যপদেশে শ্রীবলদেবের 'বল্লল'-নামক-অসুরের বিনাশসাধনপূর্বক নানাতীর্থে অবগাহন, কুরুক্ষেত্রে ভীম-দূর্যোধনযুদ্ধ-দর্শনে তাহা দৈবকৃত-জ্ঞানে দ্বারকায় প্রত্যাগমন, পুনরায় নৈমিষে গমন, ঋষিগণকে অপ্রাকৃত স্বরূপজ্ঞান-প্রদান এবং অবভূথ-স্নানান্তে শ্রীরেবতীদেবীসহ মিলন ।

অশীতম অধ্যায়—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিজগৃহাগত অর্থেঙ্গু সখা শ্রীদামবিপ্রকে অর্চনপূর্বক উভয়ের একত্রে গুরুকূলে বাসকালীন লীলা-সমূহের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীকুরুপাদপদ্ম-সেবার মাহাত্ম্য-কীর্তন ।

একাদশীতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের সখা-শ্রীদামা-সহ প্রেমালাপ স্তম্ভজ্ঞাত চপিটকতগুল ভঞ্জন এবং সখার আশ্রমে ইন্দ্রজর্জর শ্রীনির্মাণ শ্রীদামার

গৃহে প্রত্যাগমন, ঐশ্বর্য্যদর্শনে বিস্ময় ও শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের প্রশংসা এবং অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিতে করিতে যথাকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

দ্বাদশীতিতম অধ্যায়—স্বর্গাশ্রয়গোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমাগত বাদবগণ ও অন্যান্য নৃপতিগণের পরস্পর কৃষ্ণকথা-আলাপন এবং নন্দাদি-সুহৃদগণের আনন্দবিধানকারী শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে আগমন ও সুদীর্ঘবিরহসমুপ্ত ব্রজবাসীগণ-সহ মিলন।

ত্রাদশীতিতম অধ্যায়—(কুরুক্ষেত্রে) শ্রীগণ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণপত্নীগণকর্তৃক দ্রোপদীর নিকট স্ব-স্ব পাণিগ্রহণ-ব্যাপার বর্ণন।

চতুর্দশীতিতম অধ্যায়—(কুরুক্ষেত্রে) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনার্থ মুনি সমাগম, শ্রীকৃষ্ণের সাধুসাহায্য ও মুনিগণের কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্তন, শ্রীবৃন্দেবের জীব-মঙ্গলোপায়-প্রশ্নোত্তরে মুনিগণের যজ্ঞদ্বারা সর্বযজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনার উপদেশ; বৃন্দেবের যজ্ঞোৎসাহ এবং যজ্ঞক্ষে মুনিগণের স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান।

পঞ্চাদশীতিতম অধ্যায়—মাতা-পিতাকর্তৃক সম্প্রাপ্তি রাম-কৃষ্ণের পিতাকে তত্ত্বজ্ঞান, মাতাকে মৃতপুত্র-প্রদান ও কৃষ্ণকুপায় দেবকী-পুত্রগণের মুক্তিলাভ।

ষড়দশীতিতম অধ্যায়—অর্জুনের দত্ত-সহকারে সুভদ্রা-হরণ এবং ‘ভক্ত-ভক্তিমান’ শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা গমনপূর্ব্বক তদীয় ভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুত-দেব-গৃহে অবস্থান এবং তাঁহাদিগকে সন্মার্গের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন।

সপ্তাদশীতিতম অধ্যায়—শ্রীনারায়ণ-নারদ-সংবাদে ‘বেদসমূহকর্তৃক নারায়ণের সত্ত্ব-নিগুণ-স্তুতি’-বর্ণন।

অষ্টাদশীতিতম অধ্যায়—গুণাতীত বিষ্ণুপাসকগণের মায়িকগুণ-নির্ম্মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপদবী লাভ এবং গুণময় অন্যদেবোপাসকগণের জড়ীয় বিভূতিলভাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবপ্রতি প্রকৃত অমুগ্রহের লক্ষণ তথা শিব-বরদৃপ্ত রকাসুর-নিধনবার্তা-কীর্তনমুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুরই মহত্ব-কথন।

একোনব্বতিতম অধ্যায়—‘কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ’—এতদ্বিষয়ে সংশয়চিহ্ন মুনিগণের নিকট ভৃগু-কর্তৃক (পরীক্ষা-দ্বারা) বিষ্ণুর উৎকর্ষ-বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনের মহাকালপুর-গমন ও দ্বারকাবাসি-বিপ্রপুত্রোদ্ধার-প্রসঙ্গে অর্জুনের কৃষ্ণ-প্রভাবদর্শনে বিস্ময়।

নব্বতিতম অধ্যায়—“মধুরেণ সমাপয়েৎ”—এই আয়াতুসারে পুনর্বার সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং যত্ববংশের স্কারণ আনন্ত্য-বর্ণন।

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়—কৃষ্ণেচ্ছায় মোক্ষলোপপত্তিহলে যদুবংশ ধ্বংশের সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—নিমি-জায়ন্তের-সংবাদের উল্লেখপূর্বক জিজ্ঞাসু বসুদেবের নিকট নারদের ভাগবত-ধর্মোপদেশ; আত্মাত্মিক ক্ষেম ও বৈষম্যবধর্মের স্বরূপ বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়—বহিরঙ্গা মায়ার স্বরূপ, তন্নিবৃত্তির উপায় ও কর্ম্মনৈকর্ম্মের বিষয় বর্ণন। চতুর্থ অধ্যায়—ভগবদবতারগণের লীলাদি বর্ণন।

পঞ্চম অধ্যায়—ভক্তিহীনজনগণের স্থিতি ও প্রতियুগের পূজাবিধি বর্ণন এবং নিমি-জায়ন্তের সংবাদের সমাপ্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্তৃক স্তবসহকারে স্বধাম-গমন বিষয়ে প্রার্থিত শ্রীভগবানের নিকট শ্রীউদ্ধবের তদ্ধামগমন-বিষয়ক প্রার্থনা।

সপ্তম অধ্যায়—শ্রীউদ্ধবের আত্মজ্ঞানসিদ্ধির জন্য শ্রীহরি-কর্তৃক ইতিহাসোক্ত অবধূত-বিষয়ক চতুবিংশ গুরুর মধ্যে অষ্টগুরুর শিক্ষা বর্ণন।

অষ্টম অধ্যায়—অঙ্গুর প্রভৃতি নবসংখ্যক গুরুর নিকট হইতে শিক্ষিত বিষয়ের কথন। নবম অধ্যায়—কুরুর প্রভৃতির নিকট হইতে লব্ধ-শিক্ষা।

দশম অধ্যায়—স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহসম্বন্ধবশতঃই আত্মার সংসার-দশা লাভ হয়, স্বরূপতঃ নহে—মতান্তর-নিরাসপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত বর্ণন।

একাদশ অধ্যায়—বদ্ধ, মুক্ত, সাধু ও ভক্তির লক্ষণ-কথন।

দ্বাদশ অধ্যায়—সাধুসঙ্ঘের মহিমা ও ব্রজবাসিগণের প্রেমের সর্ব-মহোৎকর্ষ বর্ণন। ত্রয়োদশ অধ্যায়—সত্ত্বগুণের উদ্বেকহেতু বিজ্ঞার উদয়ক্রমে এবং হংস-দেবের ইতিহাস হইতে চিত্তের গুণবিশ্লেষ-বর্ণন।

চতুর্দশ অধ্যায়—ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাধন সহিত ধ্যানযোগ-বর্ণন।

পঞ্চদশ অধ্যায়—ধারণাগত সিদ্ধিকথন।

ষোড়শ অধ্যায়—হরির আবির্ভাবযুক্ত-বিভূতি-বর্ণন।

সপ্তদশ অধ্যায়—ভক্তিরূপ স্বধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণের সম্বন্ধে হংসোক্ত ধর্ম্ম-বর্ণন।

অষ্টাদশ অধ্যায়—বানপ্রস্থ যতিগণের ধর্ম্ম এবং অধিকারীভেদে তদুগত-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন। একোবিংশ অধ্যায়—জ্ঞানাদির ত্যাগ কথন।

বিংশ অধ্যায়—অধিকারীভেদে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ-নির্দেশ।

একবিংশ অধ্যায়—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ অনধিকারী কামিগণের স দ্রব্য ও দেশাদি বিষয়ক গুণদোষ-নিরূপণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—তত্ত্বসংখ্যার অবিরোধপ্রণালী এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক ও জন্মমৃত্যুর প্রকার বর্ণন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—ভিক্ষুগীতোক্ত-প্রণালীক্রমে বুদ্ধির সাহায্যে মনঃসংযম দ্বারা দুর্জয়কৃত তিরস্কারের সহনোপায়-বর্ণন।

- চতুর্বিংশ অধ্যায়—সাংখ্যযোগ-দ্বারা মহামহো নিবারণ বর্ণন।
 পঞ্চবিংশ অধ্যায়—জ্ঞানবৃত্তি নিরূপণ। ষড়বিংশ অধ্যায়—দুষ্টসমুদয়শতঃ
 যোগনিষ্ঠার বিঘাত ও সংসঙ্গবশতঃ তদ্বিষয়ক উৎকর্ষ-নিরূপণ।
 সপ্তবিংশ অধ্যায়—সংক্ষেপে অঙ্গসম্বন্ধিত ভগবদাব্যাসনা-রূপ ক্রিয়াযোগ-বর্ণন।
 অষ্টবিংশ অধ্যায়—পূর্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত জ্ঞান-যোগের পুনঃ
 সংক্ষেপে কথন। একোত্রিংশ অধ্যায়—পূর্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ভক্তি-
 যোগের পুনঃ সংক্ষেপে কথন।
 ত্রিংশ অধ্যায়—নিজধামগমনেচ্ছু ভগবৎকর্তৃক নিজ-কুল-সংহার।
 একত্রিংশ অধ্যায়—ভগবানের স্বধামবিজয় ও সুদেবাদির তদনুগমন।

দ্বাদশ অধ্যায়

- প্রথম অধ্যায়—কলিপ্রভাবে সাক্ষর্যদোষে মলিনতা-প্রাপ্ত মাগধবংশীয়
 প্রভৃতি ভাবী রাজগণের সংক্ষেপে-ক্রম-বর্ণন।
 দ্বিতীয় অধ্যায়—কলির দোষসমূহের বৃদ্ধিতে ভগবানের কলি অবতার
 তৎফলে অধর্মনিষ্ঠগণের বিনাশে পুনরায় সত্যযুগারম্ভ।
 তৃতীয় অধ্যায়—পৃথিবী কর্তৃক পৃথিবী-জয়ে ব্যগ্র নৃপতিগণের নিবৃদ্ধিতা
 প্রদর্শন এবং কলির বহুদোষ-সত্ত্বেও কলিযুগে সর্বদোষাপহারক শ্রীহরি-
 সঙ্কীর্ণন-মাহাত্ম্য বর্ণন।
 চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্বিধ লয়ের বিবরণ ও হরিসঙ্কীর্ণনে সংসার-নিষ্ঠারোক্তি।
 পঞ্চম অধ্যায়—সংক্ষেপে পরব্রহ্মের উপদেশদ্বারা রাঙ্গা পরীক্ষিতের তক্ষক-
 দংশন-ক্রমিত মৃত্যুভয় নিবারণ।
 ষষ্ঠ অধ্যায়—পরীক্ষিতের মোক্ষপ্রাপ্তি, তৎপুত্র জনোজয় কর্তৃক সর্প-
 বিনাশার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান; বেদোৎপত্তি ও বেদব্যাস কর্তৃক বেদ-বিভাগ।
 সপ্তম অধ্যায়—অথর্ববেদ-বিস্তার, পুরাণ-বিভাগ, পুরাণ-লক্ষণ ও
 ভাগবত-প্রবণের ফল।
 অষ্টম অধ্যায়—মার্কণ্ডেয় ঋষির তপশ্চর্যা, তাহার প্রভাবে সানুচর কাম-
 দেবের পরাভব ও তৎকর্তৃক নর-নারায়ণ-রূপী ভগবান শ্রীহরির স্তব।
 নবম অধ্যায়—মার্কণ্ডেয় ঋষির ভগবদ্ভ্যাসপ্রভাবদর্শন।
 দশম অধ্যায়—শ্রীশঙ্কর হইতে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বরপ্রাপ্তি।
 একাদশ অধ্যায়—অর্চনার্থ মহাপুরুষ ও প্রতিমাসের বিবিধ-কথন।
 দ্বাদশ অধ্যায়—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিষয়সমূহের সংক্ষেপ-বর্ণন।
 ত্রয়োদশ অধ্যায়—পুরাণসংহিতা-সমূহের সংখ্যা-সমষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবতের
 বিষয়, প্রয়োজন এবং দান ও পাঠাদি-মাহাত্ম্য।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ, (অনার্স)

[প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়]

শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের জায় এই বৎসরেও শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ তথা তৎশাখা অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে।

এই উৎসব সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবরূপে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুষ্টিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ এই উৎসব উপলক্ষে একটি প্রচার পার্টি লইয়া কিছুদিন পূর্ব হইতেই উক্ত মঠে উপস্থিত হন এবং প্রস্তুতিপর্বের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। এই পিছলদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাইবার কালে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র-পুতস্থান বৈষ্ণব-গণের স্মৃতির এক পুণ্যপীঠ। তাই শ্রীমঠের সন্নিহিতে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিয়ামক-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমন্তুষ্টিপ্রভুজন কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। স্নানযাত্রা-উপলক্ষেই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া সেই স্মৃতি অবলম্বনপূর্বক প্রতিবৎসরেই এই সময়ে বিরাটভাবে মহোৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তাই ৪ঠা আষাঢ় (ইং ১৯৬৭৮) সোমবার হইতে শ্রীমঠ তথা প্রাঙ্গণাদি নানা পত্র-পুষ্প-মালা প্রভৃতি-দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুষ্টিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য সহজ সরলভাষায় ব্যক্ত করেন এবং তৎপরে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে ইহা সমাপ্ত হইলে ভোগ-আরতি ও কীর্ত্তনমুখে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি চর্ব্বা, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় উপকরণাদি নিবেদন করেন। ভোগান্তে আরতি হইলে সমাগত ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ দয়ালহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃপাসিকু ব্রহ্মচারী প্রভৃদ্বয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

--শ্রীগৌরানন্দপদ ব্রহ্মচারী

শ্রী রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষে সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে রথযাত্রা-সমারোহ বিপুলভাবে হয়। কাঁসিতলা-ঘাটনিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পূজা-মণ্ডপ শ্রী গুণ্ডিচা-মন্দিরের স্থানরূপে কয়েক বৎসর হইতেই নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। তাই রথযাত্রার প্রাক্কল্লিবেশে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন উপলক্ষে ২১শে আষাঢ় (৬।৭।৭৮) বৃহস্পতিবার কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্বাঙ্কে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া উক্ত গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ উদ্ধৃতপূর্বক পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর ভক্তগণ শ্রীমন্দির-মার্জ্জনা দি করিলে কীৰ্ত্তন মুখেই প্রত্যাবর্তন করেন।

২২শে আষাঢ় (ইং ৭।৭।৭৮) শুক্রবার ভাস্ক-মুহূর্ত্তে যথাক্রীতি মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ শ্রী শ্রী জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউর প্রকাশের ইতিবৃত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণের প্রচুর আনন্দ বিধান করেন।

শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের রথখানি নবসাজে সুসজ্জিত হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে নানাবিধ উপকরণাদি নিবেদিত হইলে সঃস্র সহস্র আগন্তুককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে অপরাহ্নে শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবকে রথাক্রুত করিয়া মন্তর গতিতে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল শ্রেণীর মানুষেই রথাকর্ষণ করিতে থাকেন। শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের রথখানি মন্তর গতিতে নবদ্বীপ সহরের মুখা মুখা পথ অতিক্রম করা-কালে অগণিত ভক্তগণের 'জয় জগন্নাথ'-ধ্বনিতে জনগণ উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। পরে সন্ধ্যালগ্নে গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব শুভবিজয় করেন।

শ্রী জগন্নাথজীউ গুণ্ডিচা-মন্দিরে অষ্টম দিবস অবস্থান করিয়া নবম দিবসে প্রত্যাবর্তন করেন (ভক্তগণ মানসপটে গুণ্ডিচা-মন্দিরকে সুন্দরানল ও জগন্নাথ-স্থলীকে নীলাচল সদৃশ ভাবনা করেন)। প্রত্যাবর্তনের দিনই পুনর্যাত্রা। ঠাণ্ডা এবৎসর ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৫।৭।৭৮) বোমবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কয়েক দিবস গুণ্ডিচা বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীৰ্ত্তন ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-লীলাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ গুণ্ডিচা বাড়ীর পরিচালনার দায়িত্ব বহন করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। পুনর্যাত্রা দিবসেও শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে সহস্র সহস্র আগন্তুককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও সংবাদ এই যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও যথারীতি শ্রীরথযাত্রায় যথাকর্ষণ ও মহোৎসব-অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্থানাভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইতেছে যে, ঐ দুই মঠেও যথারীতি উক্ত অনুষ্ঠান বিপুলভাবে উদযাপিত হইয়াছে। উক্ত দুই মঠের পরিচালনায় যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ থাকায় দুই স্থানেরই শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবাদি সুকৃভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। স্থানাভাবে উহার বিশদ বিবরণ এস্থলে দিতে নাপারায় দুঃখিত।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ ভারত-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারা অবলম্বন-পূর্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তস্থিত এমনকি বহির্ভারতেও বিভিন্ন তীর্থাদি পরিভ্রমণ ও দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া ধর্মপিপাসু পারমার্থিক কল্যাণকামী জনগণকে বিভিন্ন সময়ে তীর্থদর্শনের সুযোগ দান করিয়া আসিতেছেন। তাই বিগত ২১শে কা্তিক* (ইং ৭।১১।৭৭) সোমবার হাওড়া-মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেস ট্রেনে রিজার্ভ টুরিষ্ট কোচে দক্ষিণ ভারত-পরিভ্রমণ উদ্দেশ্যে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের নেতৃত্বাধীনে হাওড়া স্টেশন হইতে রাত্রি ১০-৪০ মিনিটের সময় বিজয় বিগ্রহ শ্রীগৌরানন্দকে অগ্রগামী রাখিয়া শ্রীগুরু-গৌরাজের নাম-স্মরণ করতঃ সর্বাপ্রে-ভক্ত-বিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপাভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে মঙ্গলগিরি অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করা হয়। ইং ৯।১১।৭৭ তারিখে সকাল সাতটায় বিজয়ওয়াড়া স্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের রিজার্ভ গাড়ী সেখানে অবস্থান করে। পরে আমরা সেখান হইতে মঙ্গলগিরি যাত্রা করি এবং তথায় প্রথমতঃ সঙ্গদুগুরু শ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের স্থাপিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া শ্রীজীওড়নুসিংহ দর্শন করি। এখানে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভু তথাকার ইতিবৃত্ত ও মহিমা প্রাজ্ঞল ভাষায় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পরে প্রসাদ পাইয়া পুনঃ বিজয়ওয়াড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্তন করি। বিজয়ওয়াড়ায় রাত্রে প্রসাদ পাইলে আমাদের রিজার্ভ কোচ তিরুমালাই এক্সপ্রেসে সংযোজিত হয়। আমরা গাড়ীতে আরামে নিজ নিজ বিছানায় শুইয়া পরি। রাত প্রায় ভোর হইতে চলিয়াছে। শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু ও শ্রীপাদ মুরলী প্রভু গুরুর হইতে সোজা মাদ্রাজ চলিয়া যান। কারণ ঐ সময় তামিলনাড়ুর সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তিতে প্রায় প্রলয়ঙ্করী সমুদ্রোচ্ছাস ও বর্ষণে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুবরণ ও গৃহহারা হইয়া পরিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের যাত্রাপথের কি ব্যবস্থা হইবে তাহারই খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য তাঁহারা দুইজন মাদ্রাজ যাত্রা করেন। তখন সকাল প্রায় ৭টা, আমরা রেগিগুটা ষ্টেশনে পৌঁছি এবং আমাদের কোচ সেখানেই অবস্থান করে।

এখান হইতে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও বর্ত্তমানে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী শ্রীতিরুপতি মন্দির দর্শনের জন্য তিরুপতি ইষ্ট (পূর্ব) যাত্রা করি। তিরুমালাই পর্ব্বতোপরি ইহা অবস্থিত। এখানে ভগবান্ শ্রীবালাজী (নারায়ণ) ও লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। এখানকার ঐশ্বর্য দেখিলে মনে হয় লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য যেন ঢেলে দিয়াছেন। দর্শনার্থীর ভিড় দেখিলে অবাক হইতে হয়। সহস্র সহস্র দর্শনার্থীগণ বিরাট আঁকা-বাঁকা লাইনে শারিবদ্ধ হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশের জন্য উদ্গ্রীব ও অপেক্ষমান। এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য দেখিলে সত্যিই প্রাণকে আন্দোলিত করে। এই আধুনিক যুগে ও যুবক-যুবতীগণ এমন কি সধবা-জলনাগণও সন্তুষ্ট হইয়া মস্তক মুগুন করতঃ শ্রীবৈষ্ণবদেবকে বিনম্র নিবেদন করেন। স্বামী-পুষ্করণীতে স্নান ও কেশ-চ্ছেদন এখানকার মাহাত্ম্যকে আরও আকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। মুগুন-সংস্কার স্থানকে কলাগকট বলে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী

ন বৈ পুংনাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিধোক্ষজে ।



অতৈতুক্যপ্রতিষ্ঠতা যয়াক্সা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পনর ।
অধোক্ষজে অতৈতুকী ভক্তি বিদ্রশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ }

বাসুদেব, ১ পদুনাভ, ৪২২ গোঁরাঙ্গ
রবিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।৯।১৯৭৮

{ ৭ম সংখ্যা

সানুনাং পাণ্ডুনাং কৃতম্ শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

পাণ্ডুরবচ—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরশর-পুণ্ডরীক-

ব্যাসাশ্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দালভ্যান্ ।

রুক্মাঙ্গদাজুর্ন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন

পুণ্যানিমান্ পরম-ভাগবতান্ স্মরামি ॥১॥

পাণ্ডু বলিলেন,—প্রহ্লাদ, নারদ, পরশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অশ্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দালভা, রুক্মাঙ্গদ, অর্জুন, বশিষ্ঠ, বিভীষণ প্রমুখ পবিত্র পরম ভাগবতগণকে আমি স্মরণ করি ॥১॥

লোমহর্ষণ-উবাচ—

ধর্মো বিবর্ধতি যুধিষ্ঠির-কীর্তনে

পাপং প্রণশ্যতি বৃকোদর-কীর্তনে ।

শত্রুর্বিনশ্যতি ধনঞ্জয়-কীর্তনেন

মাদ্রীসুতো কথয়তাং ন ভবন্তি রোগাঃ ॥২॥

লোমহর্ষণ বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের নামকীর্তনের দ্বারা ধর্ম বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়, ভীমসেনের নাম কীর্তন করিলে পাপ প্রণষ্ট হয়, অর্জুনের নাম-কীর্তন-দ্বারা শত্রু বিনষ্ট হয় এবং মাদ্রীসুত নকুল-সহদেবের নাম-কীর্তন করিলে রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না ॥২॥

ব্রহ্মোবাচ—

যে মানবা বিগত-রাগপরাবরজ্জা

নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি ।

ধ্যানেন তেন হত-কিঞ্চিৎ-বেদনান্তে

মাতুঃ পয়োধর-রসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে-সকল মানব পরাবরবস্তুরাজ্ঞানী আসক্তিহীন হইয়া দেবগুরু নারায়ণের নাম সতত স্মরণ বা ধ্যান করেন, তাঁহারা পাপযন্ত্রণা হইতে নিম্মুক্ত হন এবং তাঁহাদের পুত্ররায় মাতৃসুতা পান করিতে হয় না অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম হয় না ॥৩॥

ইন্দ্র-উবাচ—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং,

প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্ ।

অনেক-জন্মার্জিত-পাপসঞ্চয়ং,

হরত্যশেষং স্মরতাং সदैব ॥৪॥

ইন্দ্র বলিলেন,—পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের মধ্যে নারায়ণ-নাম প্রসিদ্ধ চৌর বলিয়া কথিত হন; কারণ যাহারা সর্বদাই নারায়ণের নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের অনেক জন্মার্জিত অশেষ পাপরাশি নারায়ণ দ্বয়ং হরণ করেন ॥৪॥

যুধিষ্ঠির-উবাচ—

মেঘশ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসং,

শ্রীবৎসাক্ষং কোস্তভোদ্ভাসিতাক্ষম্ ।

পুণ্যোপেতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং,

বিষ্ণুং বন্দে সর্বলোকৈকনাথম্ ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট, পীত-কৌষেয় বস্ত্র-পরিধানকারী, শ্রীবৎস ও কোমলশোভিতাঙ্গ, পুণ্যযুক্ত, পুণ্ডরীকলোচন, সর্বলোকেশ্বর বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি ॥৫॥

ভীমসেন-উবাচ—

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা,
বিষাণ-কোট্যখিল-বিশ্বমূর্তিনা ।
সমুদ্ধতা যেন বরাহরূপিণা,

স মে স্বয়ত্ত্বভগবান্ প্রসীদতু ॥৬॥

ভীমসেন বলিলেন,—যিনি কোটি-অখিলবিশ্বমূর্তিবিশিষ্ট বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তদ্বারা জলমগ্না সচরাচরা পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই স্বয়ত্ত্ব ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৬॥

অৰ্জুন-উবাচ—

অচিন্ত্যমবাক্তমনন্তমচূতং
বিভুং প্রভুং কারণভূতভাবনম্ ।
ত্রৈলোক্য-নিস্তার-বিভাব-ভাবিতং
হরিং প্রপন্নোহস্মি গতিং মহাত্মনাম্ ॥৭॥

অৰ্জুন বলিলেন,—যিনি অচিন্ত্য, অবাক্ত, অনন্ত, অচূত, বিভু, প্রভু ও সমস্ত প্রাণীর পালনের একমাত্র কারণ, এবং যিনি ত্রৈলোক্যের উদ্ধারবিষয়ে বিশেষ ভাবনায়ুক্ত ও মহাত্মগণের গতিস্বরূপ, সেই হরিতেই আমি শরণাগত হইতেছি ॥৭॥

নকুল-উবাচ—

যদি গমনমধস্তাত্ কৰ্ম্মপাশানুবদ্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে ।
কুমিশ্রতমপি গতা জায়তে চান্তরাভা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥৮॥

নকুল বলিলেন,—যদি কৰ্ম্মপাশবদ্ধতাহেতু অধোগতি হয়, কুলবিহীন পক্ষী বা কীটজন্মও হয় এবং শত শত কুমিরূপে জন্ম হইলেও যেন হৃদয়স্থিত কেশবে আমার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে ॥৮॥

সহদেব-উবাচ—

তস্মা যজ্ঞবরাহস্য বিষ্ণোরতুল-তেজসঃ ।

প্রণামং যে প্রকুর্বন্তি তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥৯॥

সহদেব বলিলেন,—যাঁহারা সেই অতুলতেজা যজ্ঞবরাহ বিষ্ণুকে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগকেও আমি বারবার প্রণাম জানাই ॥৯॥

কুন্তীবাচ—

সকর্ম-ফল-নির্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজান্যহম্ ।

তস্মাং তস্মাং হৃষ কেশ ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্ত মে ॥১০॥

কুন্তীদেবী বলিলেন,—নিজ কর্মফলানুগারে যে যে যোনিতে জন্ম হউক না কেন, হে হৃষীকেশ ! সেই সেই জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার দৃঢ়া ভক্তি থাকে ॥১০॥

মাদ্রী-উবাচ—

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি,

রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুখিতা য়ে ।

তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং,

হবির্যথা মন্ত্রহতং হুতানম্ ॥১১॥

মাদ্রীদেবী বলিলেন,—যাঁহারা কৃষ্ণেরত এবং রাত্রিকালে নিদ্রোখিত হইয়াও সর্বক্ষণ কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তাঁহারা মন্ত্রপূত ঘৃতের অগ্নিপ্রবেশের ন্যায় মৃত্যুসময়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সামীপ্য-মুক্তি লাভ করিবেন ॥১১॥

দ্রুপদ-উবাচ—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু

রক্ষঃ-পিশাচ-মনুষ্যপি যত্র যত্র ।

জাতস্য মে কেশব ! তে প্রসাদাত্

ত্বয়োব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী ॥১২॥

দ্রুপদরাজা বলিলেন,—হে কেশব ! কীট, পক্ষী, মৃগ, সর্প, রক্ষঃ, পিশাচ, মনুষ্য প্রভৃতি যে কোন যোনিতে জন্ম হউক না কেন, তোমার প্রসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহে তোমাতে যেন আমার অব্যভিচারিণী, অচলা ভক্তি থাকে ॥১২॥

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৬ পৃষ্ঠার পর)

গোদাদেবী শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে নীতা হইলে শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা ও লোকলোচনের বহিষ্কৃত্য

মহাকোলাহলে গীতবাহুভাণ্ডাদি দ্বারা দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করিয়া গোদাদেবী শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। বিষ্ণুচিত্তের শিষ্যকল্প মথুরাবাসী রাজা বল্লভদেব তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। দেবীমণিময় শিবিকা হইতে অবতরণপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষঃশয্যারোহণপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচর হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অত্যাশ্চর্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

বিষ্ণুচিত্তের প্রতি দৈববাণী

তখন দৈববাণী হইল—‘বিষ্ণুচিত্ত! তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সন্মান প্রদান করি।’ পঞ্চরাত্নোক্ত বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্রুরে গিয়া জীবনাবশিষ্টকাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। ইহাই গোদা-চরিত্র।

গোদার কাল-সম্বন্ধে মতভেদ ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ-পরিচয়

আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা পাঠে জানা যায় যে, গোদাদেবী শকাব্দের দশমশতাব্দিতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গোদার ছায় কুল-শেখরের কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনার্য্যের দুই শতাব্দী পূর্বে ইহাদের অভ্যাসকাল হওয়া উচিত।

গোদাদেবী-রচিত তামিলভাষায় ‘তিরুপ্পাভই’ নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল-গ্রন্থের নাম ‘নাচিয়ার তিরুমডি’।

(৩) শ্রীনিম্মুচিত্ত

জন্ম, পিতামাতা ও বাল্য-পরিচয়

ভট্টনাথ (নামাস্তুর) তামিল পেরি-আল্‌বর। বিষ্ণুচিত্ত আল্‌বর, দশজন প্রাচীন দিব্যসূরির মধ্যে অগ্রতম। তিনি গুরুডের অবতার বলিয়া খ্যাত।

ইনি দক্ষিণ-মথুরা নিকটে শ্রীবিষ্ণুপুত্রুরে ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ৪৬ কলিগতাব্দ বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে মাতী নক্ষত্রে ইহার জন্ম প্রসিদ্ধি । এই মহাত্মার ৫১ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোদাদেবীকে কন্যাক্রমে পালনাধিকার প্রাপ্ত হন । ইনি বেয়ার জাতীয় পবিত্র “বংশ”-বংশসম্মত । আলবরের পিতার নাম মুকুন্দ এবং মাতার নাম পদ্মাদেবী । বালাকাল হইতেই তাঁহার নারায়ণে স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবৃত্তি ছিল । সেবা-প্রবৃত্তিক্রমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যহ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিতেন । শ্রীবিষ্ণুপুত্রুর গ্রামে ষটশায়ী ভগবানের পুষ্প-সেবা-ব্রত গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করিতেন ।

পাণ্ডুরাজ বল্লভদেবের সহিত জনৈক

অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ

এই সময়ে দক্ষিণ মথুরা প্রদেশে কড়াল ভূমিতে পাণ্ডুরাজ-বংশোদ্ভব বল্লভদেব নামক এক নরপতি ছিলেন । একদা রাত্রিকালে তিনি অপরিচিত-বেশে মথুরা নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণ-তনয়কে পশ্চিমদোহে নিদ্রিত-অবস্থায় দেখিতে পাঠিয়া তাহাকে জাগরণ করাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন—“আমি উত্তর দেশ হইতে গজাস্ত্রান করিয়া দেশে যাইতেছি ।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি যদি কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে তদ্বিষয় মতপদেশ প্রদান করুন ।”

অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের উপদেশ

ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী তদুত্তরে রাজাকে কহিলেন,—

“বর্ষার্থমকৌ প্রযতেত মাসান্ নিশার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত ।

“বার্দ্ধকাহোতোর্ব্যয়সা নবেন পরব্রহ্মতোরিহ জনুনা চ ॥”

গৃহে চারিমাস সুখে থাকিবার তরে ।

পরিশ্রম করি আমি একমাস ধরে ॥

রজনী সুখেতে আমি বঞ্চিবার লাগি ।

অর্দ্ধকাল দিবাভাগ পরিশ্রমভাগী ।

বৃদ্ধকালে বিনাশ্রমে সুখবাস আশে ।

যুবা কালে করি শ্রম বিবিধ প্রয়াসে ॥

এই সব হ’তে ভাই লহ এই সার ।

পরম কল্যাণ-তরে জীবন তোমার ॥

উপদেশ গ্রহণে রাজার চিন্তা ও মন্ত্রীর

পরামর্শ-সভা আহ্বান

এই হৃদয়স্পর্শী বাক্যাবলী শুনিয়া অধি বল্লভদেব চিন্তামগ্ন হইয়া শিদ্ধেশ্বরী নামক মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণে অচিরেই বৈদান্তিক সাধু-কোবিদগণের সম্মিলনে প্রয়াসী হইলেন। সমস্ত রাজ্য হইতে পণ্ডিতসমূহ আহৃত হইলেন।

বটপত্রশায়ী ভগবানের আদেশে

বিষ্ণুচিত্তের সভায় গমন

বিষ্ণুচিত্ত দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, তিনি সেবাপর ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং পণ্ডিত-কুলরাজ। বটপত্রশায়ী ভগবান তাঁহাকে বল্লভদেবের সভায় যাইবার জন্য বাস্তব করিয়া তুলিলেন; দিব্যসূরি মহাশয় নিজের কৃতিত্বের সমাক অভাব সন্দর্শনে রাজাহৃত পণ্ডিত-সভায় গমনে পরাজুখ হইলেন। বটপত্রশায়ী তাহাতে অভিমতি না দিয়া পাণ্ডিত্যের সকল ভার নিজেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভক্ত সাধুর অবশ্যই যাচিতে হইবে। আদেশ-লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুচিত্ত রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন।

সসন্মানে সভায় প্রবেশ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশ দান

উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার স্থায় শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ, অবৈদান্তিক মালা-কারের পণ্ডিতযোগ্য সম্মান দেখিয়া দীর্ঘান্বিত হইলেন। রাজা ও মন্ত্রী মহাশয় গৃহদ্বার হইতে সাধুকে প্রণত্যাগি আহ্বান-সহকারে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। ভগবান্ ভক্তের সহায় হইয়া আশ্চর্য উপদেশ-কথা তাঁহার মুখে প্রকাশ করাইলেন। পরিষদগণ বাক্য শুনিয়া বিস্মিত। শ্রোতৃবর্গ, রাজা প্রভৃতি সকলেই সাধুর ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিষ্ণুচিত্তের সভা-জয় ও উপাধিলাভ

পুরস্কারার্থ তাঁহার বিষ্ণুচিত্তকে স্তুভূষিত গজোপরি চড়াইয়া পণ্ডিতগণের সম্মিলনে নগরে বাহির হইলেন। রাজা তাঁহাকে “ব্রাহ্মণ-পুঞ্জব” বা “ভট্টর পিরাগ” উপাধি-মণ্ডিত করিলেন। বিষ্ণুচিত্ত ‘তিরুপ্পল্লাভু’ নামক স্তবপাঠে জনসাধারণকে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যাগ্ন সকলে বিষ্ণুচিত্তের সর্বজ্ঞতা ও বেদরহস্যজ্ঞতার উল্লেখ গুরুকণ্ঠে প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন।

রাজপ্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য ভগবানে সমর্পণ

বিষ্ণুচিত্ত রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি-সহ বহু-সম্মানিত হইয়া বিল্লিপুত্রে প্রত্যাগত হইলেন। উপায়নপুঞ্জ বটশায়ী ভগবানের সমক্ষে সংরক্ষণপূর্বক সমস্তই তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পূর্বের ন্যায় মালিকা-সেবাধারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐহিক গৌরব ও পার্থিব অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না।

বিষ্ণুচিত্তের সিদ্ধসেবা ও তাঁহার তামিল-গ্রন্থ

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সিদ্ধপরিচয়ে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ লাভ করিয়া জীবনাবধি অহরহঃ কৃষ্ণ-সেবানন্দে বাপন করিতে লাগিলেন। গোদা-কণ্ঠার চরিত্রে ইঁহার নিজাংশ সেই (২) গোদাদেবী-প্রবন্ধে পাঠ্য। অনুকার বা মানস সিদ্ধ-পরিচয়ে গোপসখা হইয়া কৃষ্ণলীলা-প্রবিষ্টজনের ন্যায় ব্যবহারসমূহ তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। তিনি 'তিরুমটি'-নামক কৃষ্ণলীলার তামিল কবিতামালা রচনা করেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৫) জন-সঙ্গ

ভক্ত নিস্পাপ, সর্বজ্ঞ ও কন্নি-জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

'জন'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত মানবকে বুঝায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগোষামী শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে" অর্থাৎ সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন। ভক্তি-সাধকগণ সত্যবতঃ কন্নি-জ্ঞানী অপেক্ষা সর্বোংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

যেষাং তত্ত্বগতং পাপং জনানাং পুণ্য-কর্মণাম্।

তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভ্রতাঃ ॥ (গীঃ ৭।২৮)

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পাপ-পুণ্যরূপ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যে খোহ—তাঁহা হইতে বিমুক্ত হ'ন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্র-কর্ম্ম। তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কন্নি ও জ্ঞানীদিগের ন্যায় তাঁহারা অল্পজ্ঞ ন'ন, কেননা, তাঁহারা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা-ফলে সাধুসঙ্গ ; এবং সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য

বহু জনের স্মৃতি-ফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় ; অতএব তাঁহারা যে পবিত্র-কর্ম্মা—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? শ্রদ্ধা হইলে স্বভাবতঃ সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে সকল লাভই হয়। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য এইরূপ,—

যে মে ভক্ত-জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।

মন্তুকানাঞ্চ যে ভক্তাস্তু মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

(ছাদিপুরণ)

আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না, আমার ভক্তগণের ভক্ত-সকলই ভক্ততম।

সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

ভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা-কথনে উক্ত হইয়াছে—

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ ।

ভক্তাঃ পুনস্তু কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুরুষম্ ॥

কৃষ্ণ-ভক্তের ক্ষণমাত্র দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাস—সাক্ষাৎ পুরুষকেও পবিত্র করে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদ্ব্যক্রমাভিঃ স্পৃশতানর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদ-রঞ্জেইভিষেকং নিক্ষিপনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যে-পর্যন্ত নিক্ষিপন ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের পদধূলি পরমার্থ বলিয়া না বরণ করে, সে-পর্যন্ত ইহাদের সমস্ত অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ স্পর্শ করিবার আশা নাই।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না—ইহা শাস্ত্রে অনেকস্থলে কথিত হইয়াছে। সাধকগণের ভক্তজন-সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব ‘জনসঙ্গ’-শব্দে এস্থলে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে।

অসাধু-সঙ্গ-ত্যাগের আবশ্যিকতা

এইজগৎই শ্রীরূপপাদ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বহিঃস্থ-সঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—

সঙ্গ-ত্যাগো বিদুরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ । (ভঃ ৩ঃ সিঃ ১।২।৪৩)

কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য যিনি আশা করেন, তিনি বহু যত্নে বহিঃস্থ-সঙ্গ

ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকে* লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ক্রিয়াসকল তাহাদের সহিত কোনক্রমে করিবেন না। কার্য-ব্যবহারে যে বাক্যাদি করা যায়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলা যায় না। প্রীতির সহিত সেই সেই কার্য-ব্যবহার সহিত করা যায়, তাহার সহিত সঙ্গ করা হইল--বলিতে হইবে।

বহির্মুখ বা অসাধু সঙ্গ লাভ (৭) প্রকার

ভগবদ্বহির্মুখ জন কত-প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্তব্য। এতদ্বিবন্ধন আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেইসকল লোকের সংখ্যা লিখিতেছি। ভগবদ্বহির্মুখজ সপ্ত প্রকার, যথা—

(১) মায়াবাদী বা নাস্তিক, (২) বিষয়ী, (৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি, (৪) যোষিৎ, (৫) যোষিৎ-সঙ্গী, (৬) ধর্মধ্বজী এবং (৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ।

(১) মায়াবাদী ও নাস্তিক

মায়াবাদিগণ পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও শক্তি স্বীকার করেন না। জীব-সত্তাকে মায়া-গঠিত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাহাদের মতে জীবের নিতা-সত্তা নাই। ভক্তি-তত্ত্বকে তাহারা নিত্যধর্ম বলিয়া মনে করেন না, বরং জ্ঞান-সাধনের একটি অনিত্য উপায় মনে করেন। মায়াবাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের বিরোধী। অতএব মায়াবাদীর সঙ্গক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হন। শ্রীস্বরূপ গোদামীর উপদেশ—

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।

মায়াবাদ শুনিবারে উপধিল রঙ্গে ॥

বৈষ্ণব হঞা যেনা 'শারীরক-ভাষ্য' শুনে।

সেবা-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।৯৪-৯৫)

যাহারা বেদোক্ত পরমেশ্বর-তত্ত্ব স্বীকার করে না, তাহারা নাস্তিক। কুতর্কের দ্বারা তাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিহানি হয়।

(২) বিষয়ী

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ। যে-সকল লোক বিষয়-সঙ্গে সর্বদা ব্যস্ত,

* দদাতি প্রতিগৃহাতি গৃহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।

ভুঙ্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

[অর্থাৎ দান, প্রতিগ্রহ, গৃহকথা বলা ও শুনা, ভোজন করা ও করান।]

তাহারা পরনিন্দা ও ঘৃণা-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসংবাদ ও বিষয়-পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের পিপাসা বৃদ্ধি হয়। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে অবসর পায় না। পুণ্যকর্মই করুক বা পাপকর্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্বদাই দূরে থাকে। অতএব শ্রীদাস-গোস্বামী বলিয়াছেন—

বিষয়ীর অন্ত্র খাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মন হইলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২।৭৮)

যে-সকল লোক বাহ্যে বিষয়-কর্ম করেন এবং জীবন-যাত্রার নিমিত্ত বিষয়-স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তঃকরণে সর্বদা আত্মতত্ত্ব এবং কৃষ্ণ-বিষয়ে যত্ববান, তাহারা কর্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত নন।

(৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি

বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও ভগবদ্বিষ্মুখ। বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী; যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয়-ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা স্বয়ং তত বিষয়ী নন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন। তাহাদের সঙ্গও সর্বদা পরিহার্য। কেন-না তাহারা শীঘ্র বিষয়ী হইয়া দুঃসঙ্গী হইবেন। বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গ দুই প্রকার অর্থাৎ নিতান্ত-বিষয়ী ও ভগবদ্বিষ্মুখ-বিষয়ী। নিতান্ত বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাজ্য। ভগবদ্বিষ্মুখ বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ যাহারা ভগবানকে স্থায়ী বিষয়াঙ্গ করিয়াছেন এবং যাহারা ভগবদর্থে সমস্ত বিষয়কার্য করেন। প্রথম-প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষ-প্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাহাদের পুণ্যময় বিষয়-সঙ্গ, তাহারা পাপ-যুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও, যে-পর্য্যন্ত তাহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হন, সে-পর্য্যন্ত সাধক ভক্তের সঙ্গযোগ্য ন'ন। বৈরাগ্য-বেশাদি ধারণ করিলেই যে-বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়—একরূপ নয়; কেন-না, অনেক-স্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ি-প্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া ভক্তি-সাধক ব্যক্তি বিষয়ি-সঙ্গ ও বিষয়ি-সঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ-৬৬)

এক্ষণে উজ্জলরসের কথা বর্ণিত হইতেছে। ইহাতে আলম্বন কান্তরূপে স্ফুর্তিমান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, আর সজাতীয়ভাবে তদীয় পরমকান্তাগণ আশ্রয়ালম্বন। তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ক্রিয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে—

শ্রদ্ধা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃংখলাং তে

নিবিশ্য কর্ণ-বিবরৈর্হরতোহঙ্গতাপম্।

রূপং দৃশ্যং দৃশিমতামখিলার্থলাভং

দ্বযাচাতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)

শ্রীকৃষ্ণিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণ-সমাপে এক ব্রাক্ষণকে দিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই—হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! তোমার যে-সকল গুণ শ্রবণ-কারীর কর্ণবিবর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করত অঙ্গতাপহরণ করে, সে-সকল গুণের কথা এবং তোমার যে রূপ চক্ষুস্বান্ প্রানিমাত্রের নয়নের অখিলার্থ লাভস্বরূপ, তাদৃশ রূপের কথা শ্রবণে আমার চিত্ত লজ্জাবিরহিত হইয়া তোমাতে আবিষ্ট হইয়াছে।

বাসবজনীতে শ্রীকৃষ্ণ একস্মাৎ অন্তর্দ্বান করিলে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন পীতবসনধারী বনমালায় বিভূষিত সাক্ষাৎ মন্থথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণ সম্মিত বদনে তাঁহাদের নিকট আবিভূত হইয়াছিলেন, সাক্ষাৎ মন্থথমন্মথ—অর্থে স্বয়ং কামদেবদেবের মন্মথ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যে চিত্তোন্মাদকারী। স্বর্গস্থ দেবতাবিশেষ যে কামদেব তিনি স্বরূপে জীবতত্ব। আর চতুর্বাহাগুর্গত সাক্ষাৎ কামদেবের শক্তাংশাবেশ। প্রাকৃত কামদেব জগতের সকল স্ত্রীপুরুষের চিত্তকোভকারী। শ্রীকৃষ্ণ সেই সাক্ষাৎ মন্থথেরও ক্ষোভকারী। অতএব সৌন্দর্য্যের পরাবধি।

সৈরিক্রী কুজা কেবল অঙ্গরাগ-অর্পণরূপ ভজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ বিস্ময়ের কথা। তিনি সেই ভজনপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সহিত বাসকরার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছিলেন। যিনি কৈবল্যনাথ, কেবল—শুদ্ধ প্রেমবান্ তাঁহার ভাবকৈবলা, কৈবলাই তিনি নাথ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াও ঐরূপ যাক্রুর তাৎপর্য্য কুজার নিজস্ব-তাৎপর্য্যমাত্র। শ্রীব্রজদেবীগণের মত প্রেমবতী নহেন।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে ঐক্কিনী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—যাঁহারা পতিবুদ্ধিতে পাদসেবাদি দ্বারা জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণের সমাক্ষেপ পরিচর্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের তপস্যার কথা কি বলিব ?

ইতং রম্যপতিস্বপা পতিং স্ত্রিয়ন্তা

ব্রহ্মদযোইপি ন বিভুঃ পদবীং যদীয়াম্ ।

ভেজুমূর্দাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-

হাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্ ॥

প্রভূদগমাসনবরাহ্নপাদশৌচ-

তাস্মূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ ।

কেশপ্রসারণয়নম্পনোপহার্যৈ-

দাসীশতৈঃ অপি বিভো বিদধুঃ স্নাদ্যম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬।১৫-৬)

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার মহিমা অবগত নহেন, সেই রম্যপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ষোড়শ সহস্র মহিষী নিরন্তর বর্দ্ধনশীল অনুরাগ, হাস্য, নব-সঙ্গমলালসা প্রভৃতি বহুবিধ ভজন করিতে থাকিলেন । শত পত দাসী বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীমহিষীগণ প্রভূদগমন, আসনপ্রদান, পুষ্পাঞ্জলি ও রত্নাঞ্জলি নিক্ষেপ, পাদপ্রক্ষালন, তাস্মূল প্রদান, বিশ্রামার্থ বাজন, গন্ধ ও মাল্যপ্রদান, কেশ-সংস্কার, শয্যা, স্নান, উপহারাদি-দ্বারা বিভূ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন ।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজন করিয়াছেন, পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকে উক্তরূপে প্রশংসা করিয়াছেন ।

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যায়া ।

কামাত্মানোহপবর্গেশং মোহিতা মম মায়ায়া ॥ (ভাঃ ১০।৬।১৫২)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণীদেবীকে বলিয়াছেন,—যাঁহারা দাম্পত্যসুখোপভোগ-নিমিত্ত তপস্যা ও ব্রতচর্যা-দ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমাকে ভজন করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মোহিত । এই বাক্যে দাম্পত্যসুখ উপভোগের জন্য যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে, তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিরূপে ভজন করা সম্বন্ধেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহাকে পতিভাবে ভজন করার প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণীদেবীকে বলিয়াছেন—

দিষ্টা গৃহেশ্বর্যসকলুয়ি তুষা কৃতানুবৃত্তিভবমোচনৌ খলৈঃ ।

সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুঃশিষো হৃদন্তরায়া নিকৃতিং জুষঃ স্ত্রিয়াঃ ॥

(ভাঃ ১০।৬০।৫৪)

হে গৃহেশ্বর! তুমি নিষ্কাম হইয়া যে আমার নিরন্তর সেবা করিতেছ, তাহা অতি মঙ্গলের বিষয়। উহা কপট ব্যক্তির পক্ষে অতি দুষ্কর। দুঃশিষ্য বিশিষ্ট, স্বীয় প্রাণের প্রতিস্নেহশীলা ও প্রবঞ্চনাপরা স্ত্রীগণের পক্ষেও ইহা অতি দুষ্কর।

শ্রীভাগবতের অন্ত্রও শ্রীভগবান্ বাতীত অন্যকে পতিরূপে ভজন করার নিন্দা দেখা যায়। কেতুমাল বর্ষে শ্রীকামদেবদ্বরূপ ভগবদ্বাহস্ততিতে শ্রীলক্ষ্মীবাক্য—

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো

হারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেহন্যম্ ।

তাসাং ন তে বৈ পরিপাত্যপত্যং

প্রিয়ং ধনায়ুংষি যতোহম্বতস্ত্রাঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১৯)

আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয় সকলের পতি, অগতে যে সকল স্ত্রী বিবিধ ব্রত দ্বারা আপনার আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে, তাহাদের পতিগণ প্রিয় সন্তানসন্ততি, ধন কিম্বা পরমায়ু রক্ষা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা অম্বতস্ত্রী।

—পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বক্তৃভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রকাশ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৯ পৃষ্ঠার পর)

মথুরায় কংসে নাশি' সে' স্থান ত্যজিয়া ।

রাজ্য স্থাপিল পুনঃ দ্বারকায় গিয়া ॥

দ্বারকার রাজা আজ আমার নন্দন ।

না জানি এখন তারে দেখিতে কেমন ??

আমার অদৃষ্টে আরো কি আছে লিখন !

আর কতকাল দুঃখ সহিব এমন !!'

নারদ কহিল তবে,—‘শুনিহু এখন ।
 দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ, তোমার নন্দন ॥
 প্রভাসে যজ্ঞ লাগি’ কৃষ্ণ করে আয়োজন ।
 সেই হেতু নিমন্ত্রিত হৈল ত্রিভুবন ॥
 কিন্তু ব্রজে নিমন্ত্রণ হইল না হয় ।
 এ কেমন রীতি তাহা বল গো আমায় ॥’
 নন্দ-যশোদারে ত্যজি’ কৃষ্ণ যজ্ঞ করে ।
 একথা শুনিয়া রাণী কঁাদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 রাণীর ক্রন্দন শুনি’ নন্দ মহারাজ ।
 ছুটিয়া আসিল ত্বরান্বিত রাণীর সকাশ ॥
 শুনি’ সব বিবরণ রাজা কহে ধীরে ।
 ‘দুঃখিত হ’য়ো না রাণী এ হেন খবরে ॥
 পুত্র তব দ্বারকাধীশ,—এ’ মহা গৌরব ।
 তার যজ্ঞ আয়োজনে কর আশীর্ব্বাদ ॥
 বিচারিয়া দেখ রাণী আপন অন্তরে ।
 পুত্র কি পিতা-মাতারে নিমন্ত্রণ করে ??
 তুমি মাতা, আমি পিতা,—মোরা যাবো সেথা ।
 নিরখিব রাজ্যসনে কানু-রূপ-শোভা !!
 ছানা-ক্ষীর-দধি-আদি কানু ভালবাসে ।
 বহুকাল খায়নি সে মোর ঘরে এসে ॥
 সুস্বাদু ক্ষীরাদি লয়ে চল তা’র স্থানে ।
 সেথা গিয়া মোরা তারে খাওয়াবো যতনে ॥’
 রাজার বচনে রাণী হইয়া আশ্বস্ত ।
 দ্বারকা যা’বার তরে হ’ল বড় ব্যস্ত ॥
 রাজা ও রাণীয়ে ঋষি করি নমস্কার ।
 দ্বারকাভিমুখে তবে ধাইলা সত্বর ॥

দ্বারকার যজ্ঞস্থলে হেরি' ঋষিবরে ।
 দেশকীর শ্বশ্রুমান্তা পুছিল। তাঁহারে ॥
 'যজ্ঞারম্ভের সময় হইল আসন্ন ।
 সর্বস্থানে নিমন্ত্রণ হ'ল কি সম্পন্ন ?'
 নারদ কহিল,—'দেবি, গিয়া সর্বপুরে ।
 নিমন্ত্রণ জানায়েছি সবার গোচরে ॥
 আদিষ্ট না হ'য়েও গিয়া ব্রজধামে ।
 কহেছি ব্রজবাসীদের আসিতে এস্থানে ॥
 ব্রজবাসীরা এ'যজ্ঞে নিমন্ত্রিত শুনে ।
 উত্তেজিত হ'য়ে পদ্মা কহিল। তৎক্ষণে ॥
 'ওগো ঋষিবর, তুমি ভাল কর নাই ।
 কে বলিল নিমন্ত্রিতে নন্দ-যশোদায় ??
 দৈবক্রমে কৃষ্ণ মোদের গেছিল তথায় ।
 তাই বুঝি তারা কৃষ্ণে শাস্তি দিল হয় !!
 কোথায় কা'র ঘরে কৃষ্ণ ননী চুরি করে ।
 তাহা শুনি' যশোদা বান্ধিল কৃষ্ণেরে ॥
 গোপী যশোমতী শুধু জানে গো-দহন ।
 রাজপুত্র বলি' কৃষ্ণ করেনি সন্মান ॥
 যশোদা কৃষ্ণেরে ধেহু চড়াইতে পাঠায় ।
 রাখালের সাথে কৃষ্ণ ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
 রাজার তনয় সেথা' হইল রাখাল ।
 সহ্য করিল কত রৌদ্র-ঝড়-জল !!
 যশোদা ভৎসনা কত করিল কৃষ্ণেরে ।
 বড় কষ্টে ছিল কৃষ্ণ তাহাদের ঘরে ॥
 তাই তারা যজ্ঞ যা'তে দেখিতে না পারে ।
 সে'হেতু রহিব নিজে যজ্ঞালয়-দ্বারে ॥'

এত কহি' পদ্মাবতী রহে পাহাড়ায় ।
 ব্রজবাসীরাও তবে পৌঁছিল তথায় ॥
 ক্ষীর-ছানা-দধি-ননী ধরি' শিরোপরে ।
 গাহে তারা কৃষ্ণ-লীলা মহাপ্রেমভরে ॥
 ব্রজবাসীদের হেন কৃষ্ণ-প্রীতি হেরি' ।
 পদ্মাবতী ভাবে—এ'রা আসে ছল করি' ॥
 যশোদারে কহে পদ্মা অতি ক্রোধ ভরে ।
 'স্নেহ, দয়া নাহি কভু তোমাদের অন্তরে ॥
 কৃষ্ণ, রাজার পুত্র, তোমরা গোপজাতি ।
 তোমাদের ঘরে কৃষ্ণ পাইল দুর্গতি ॥
 রাখালের সাথে কৃষ্ণ মাঠে মাঠে ঘোরে ।
 কত কষ্ট পাইল সে রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে ॥
 তাড়ন-ভৎসন কত করিলে তাহারে ।
 কেঁদে কেঁদে ফিরিল সে তোমাদের ঘরে ॥
 যে-মুখে ভৎসিলে তুমি মোদের কৃষ্ণেরে ।
 কেমনে সে মুখ পুনঃ দেখাবে তাহারে ??
 শুনি' তাহা যশোমতী দুঃখিত হইয়া ।
 সজল নয়নে রহে নীরবে চাহিয়া ॥
 স্বশ্রমাতার এ' কটুক্তি শুনিয়া দেবকী ।
 কহে,—‘মাতা, এরা আজ মোদের অতিথি ॥
 অতিথি তুষ্ট না হইলে ঘটে অমঙ্গল ।
 এদেরে উদ্বেগ দিয়া কিবা হ'বে ফল ??
 কৃষ্ণেরে ডাকিয়া হেথা' পুছিব তাহারে ।
 কেমনে মীমাংসা হ'বে এ' সব ব্যাপারে ॥
 এত কহি' দেবকীদেবী পুছিলা নারদে ।
 'দ্বরায় কৃষ্ণেরে ডাক যজ্ঞস্থল হ'তে ॥'

উত্তরিল। ঋষি,—‘এবে হৈল যজ্ঞারম্ভ ।

দেব, মুনি-ঋষিগণে সেথা উপবিষ্ট ॥

এবে সেথা ‘স্বাহা’ ধ্বনি গুঠে সর্ববক্ষণ ।

তাই কৃষ্ণেরে ডাকা মাতারই শোভন ॥

তোমার আহ্বানে কৃষ্ণ আসিবে এখন ।

কোন দোষ নাহি রহে মা ডাকে যখন ॥’

নারদের কথা শুনি’ দেবকী তখন ।

‘কৃষ্ণ’ বলি’ উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ঘন ঘন ॥

শুনিয়াও কৃষ্ণ তাহা শুনিল না কানে ।

আসিল না তবু হায় মাতা-সন্নিধানে ॥

কৃষ্ণের এ হেন লীলা নেহারি’ নারদ ।

কহে,—‘মাগো, তব-ডাকে এল না কেশব ॥

তব মাতৃ-স্নেহ তারে বান্ধিতে নারিল ।

যজ্ঞস্থানে থাকি’ সে যে তোমা’ উপেক্ষিল ॥

অনুমতি দাও এবে যশোদামাতারে ।

তিনি যেন কৃষ্ণচন্দ্রে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥’

দেবকী ভাবিল মনে হয়ে নিরুপায় ।

মোর ডাকে পুত্র কভু ফিরে নাহি চায় ॥

এত ভাবি’ দেবকীদেবী কহে যশোদারে ।

‘ডাক দিদি কৃষ্ণেরে বারেক উচ্চৈঃস্বরে ।’

দেবকী দেবীর কাছে পেয়ে অনুমতি ।

‘কানাই’ ‘কানাই’ বলি’ ডাকে যশোমতী ॥

যশোদা মাতার ডাক শুনিয়া শ্রবণে ।

যজ্ঞস্থল হ’তে কৃষ্ণ উঠিল তৎক্ষণে ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

প্রশ্নোত্তর ভিত্ত

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

কর্মজডম্মার্ত্তানুগ প্রাকৃত সহজিয়াগণ এখানে বলিতে পারেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীরাঘ রামানন্দের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কানীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব মহাপ্রভু বৈষ্ণবতার আদর করিলেও ব্যবহারিক পানভোজনাদি বিষয়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচারও সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও শুণ্ডনযোগ্য; কারণ প্রসাদ-সেবনাদি কর্ম-জড-ম্মার্ত্ত বা মায়াবাদীর মতে ‘ব্যবহারিক কার্য’ হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচারে উহা সম্পূর্ণ পারমাথিক। প্রসাদ-সেবন একটি ভক্তির অঙ্গ, উহা কর্মকলভেগীর ন্যায় ভাত-ডাল-ভোজন বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। যদি প্রসাদাদি সেবন একটি ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া গৃহীত না হইবে, তাহা হইলে মহাপ্রভু, “তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং”, “ভুক্তং ভোজয়তে চৈব” উপদেশ প্রদান করিতেন না বা ভক্তিশাস্ত্রে প্রসাদের ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিত না। আর শ্রীল কবিরাজ গৌরামী প্রভুও কৃষ্ণের প্রসাদ এবং কৃষ্ণভক্তের অবশেষের মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্তন করিতেন না,—

“তাতে ‘বৈষ্ণবের বুটা’ খাও ছাড়ি, ঘৃণা-লাজ।

যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব-কাজ ॥

কৃষ্ণের উচ্ছ্রিত হয় ‘মহাপ্রসাদ’ নাম।

‘ভক্তশেষ’ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান ॥

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।

ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥

এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।

পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥

তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ।

বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥

তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।

কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬৫৮-৬৩)

প্রসাদাদি সেবন বা বৈষ্ণবোচ্ছিক্ত-গ্রহণ যদি তথাকথিত ব্যবহারিক-সামাজিক বিচারের অধীন কর্ম-মধ্যে গণ্য হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু একরূপ কথা বলিতেন না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের প্রসাদে জীবিতবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা শূদ্রের স্পৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা অন্তঃপ্রসাদ সুতরাং স্পৃষ্ট-স্পৃষ্ট বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে, ইহা শুদ্ধ-নিষ্ঠা-পান্য বা ফল-প্রসাদ সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট হইলেও স্মার্তসমাজের আইনকানুনানুসারে গৃহীত হইতে পারে,—এইসকল বিচার ‘ব্রহ্মবল্লীবিধিকার’ কৃষ্ণ-প্রসাদে আনয়ন করিলে, কোনও দিন কৃষ্ণ-রূপ বা শ্রীনামরূপ লাভ হইবে না। এইরূপ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট চর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ সাধনবলকে অবহেলা করিতেছেন; তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্বল্য-রূপ অনর্থ ও অসৎস্ব স্বপ্নময়; বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃত দেহ ও মনের ধর্মে আসক্ত করিয়া দিবে।

প্রসাদ-বস্তু—কৃষ্ণবস্তু—নির্বিকারবস্তু—অপ্রাকৃতবস্তু—পরম শক্তি-সম্পন্নবস্তু। যদি শূদ্রের স্পর্শে তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব ও পরম পাবনত্ব নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে তাঁহাকে ‘প্রসাদবস্তু’ বলা হইল না, উহা সাধারণ প্রাকৃত-বস্তু-পর্যায়ের গণিত হইল। পতিত ব্যক্তি অপ্রাকৃত পরমপাবন-বস্তু প্রসাদ স্পর্শ করিলে প্রসাদ কিছু পাতিত-ধর্ম-প্রাপ্ত হন না, পরন্তু ‘পতিত’ ‘পরমপাবনের’ সঙ্গবলে পতিতাবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করেন, অর্থাৎ সাধনবল-সম্পন্ন হন। ইহারা এই সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত গৃহে স্বীকার করিলেও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব সমাজের বহির্মুখতাকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়া কার্যাতঃ নিজ-আচরণে শুদ্ধভক্তির অনুকূল আচারসমূহ পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা স্বীয় হৃদয়দৌর্বল্যরূপ অনর্থ, দুর্বুদ্ধি কিম্বা কপটতাকে ‘মহাপ্রভুর আচরণের’ নাম দিয়া সমর্থন করিতে চান।

মহাপ্রভুও—“যে বখা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তৃণেব ভজ্যমাত্মম্”—এই স্ববাক্যানুসারে উন্মুখকে স্তব্ধ ও বিমুখকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কারণ উন্মুখ-তোষণ ও বিমুখ-বঞ্চন, প্রেমবিতরণ ও পাষণ্ডদলন ভগবানের একটা কার্য। মহাপ্রভুর আচরণে কি প্রকার বিমুখ ব্যক্তিসকল বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মহাপ্রভু বিমুখ-গণকে একরূপ বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়াই বিমুখগণ বলিয়া থাকেন,—চৈতন্যদেব বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণের গৃহ বাতীত অন্য স্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রমধর্ম মানেন

নাই, যার তার হাতে খাইয়াছেন, উদ্ধারণ দত্তের (?) পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, নিকটৈজাতি শিষ্য করিয়াছেন, নিত্যানন্দ একজন বর্ণাশ্রমধর্মের উৎসাদনকারী ইত্যাদি ইত্যাদি !

বিমুখগণ এইরূপ নানাভাবে বঞ্চিত হইয়া বলিয়া থাকেন,—আমরা মহাপ্রভুকে মাছু করি, নিত্যানন্দের আচরণ স্বীকার করিতে পারি না। উন্মুখগণ কিন্তু বিমুখগণের এইরূপ প্রজল্পবাক্য শুনিয়া তাহাদের দুর্দশার কথা বুঝিতে পারেন এবং আরও জানেন যে, শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু এই সকল বিমুখ জনকে বঞ্চনা করিবার জন্তই এইরূপ অভিনয় করিয়াছেন, ইহাতে পরম উপকারই সাধিত হইয়াছে, কারণ সুগোপ্য ভক্তি-মহানিধি ‘পাষণ্ড’ ও ‘ভগুগণের’ নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। যাহারা বলেন, মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম মানিয়াছেন, নিত্যানন্দ তদ্বিরোধী; কিম্বা যাহারা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণের মধ্যে পরস্পর অসামঞ্জস্য দেখিতে পান, কিম্বা যাহারা নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণ মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে মনে করেন, তাহারা জগদ্‌গুরু পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অপরাধ করার দরুণ কখনও মহাপ্রভুর কৃপা পাইতে পারিবেন না, তাহাদিগের নিকট ভক্তির দ্বার চিরকদ্ধ—তাহারা ‘ভগু’—তাহারা বঞ্চিত—তাহারা বিমোহিত, কারণ—

“তুই ভাই এক তনু—সমান প্রকাশ।

নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্বনাশ ॥

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।

“অর্ধকুকুটি-ন্যায়” তোমার প্রমাণ ॥

কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত’ পাষণ্ড।

একে মানি আরে না মানি,—এই মত ভগু ॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৭)

যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, যাহারা ‘মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম মানিতেন’ বলিয়া মুখে বলেন, সেই সকল কর্মজড়গণের অন্তরের অন্তঃস্থলের কোন না কোন (তাহাদের) অজ্ঞাত প্রদেশে জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে বলিতে পারেন যে, নিত্যানন্দপ্রভু অবস্থত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংসের লীলাভিনয়কারী ছিলেন, সুতরাং

তাহার স্বতন্ত্র আচরণ সাধারণ জীবের অনুকরণীয় নহে। এইরূপ যুক্তি প্রস্তাবিত হইলেও কিন্তু আমাদের আলোচ্য শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের কোন হানি হইতে পারে না; কারণ প্রথমতঃ মহাপ্রভুই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে গোড়দেশে ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, স্তবরাং আচার্য্যালীলাভিনয়কারী নিত্যানন্দের লোকশিক্ষার্থ আচরণমাত্রেই পরম-হংসের আচরণ—একপও বলা যাইতে পারে না। আর যদি পূর্বপক্ষীয়-গণের যুক্তিও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায়, প্রভুত্বের অন্যতম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু—যিনি একজন আদর্শ-বর্ণাশ্রমী-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অভিনয় করিয়াছেন—যিনি স্বীয় আচার-প্রচারের মাহাত্ম্যাবলে লোকসমাজে আচার্য্যরূপে কীর্তিত হইতেন, তাহার আচরণ কি? তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অভিনয় করিয়া—কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে বাস করিয়া শত শত উৎকৃষ্ট শৌর্যকুলীন-ব্রাহ্মণ থাকিতে যবন-কুলোদ্ভূত এক পুণ্ড্রকে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিলেন কেন? আর স্বয়ং নিজগৃহে মহা প্রভুর সাক্ষাতে মুকুন্দ ও হরিদাসের সচিত্র একত্র বসিয়া যথেষ্টভাবে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্টভোজন করিলেনই বা কেন? অতএব যদি পঞ্চন্যায়াবয়ব লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে বিষয়, সংশয় ও পূর্বপক্ষগুলির মীমাংসা সঙ্গতি দ্বারা সাধন করিতে হইবে। তিন প্রভুর আচরণে নিশ্চয়ই সঙ্গতি আছে, অর্থাৎ মহাপ্রভুতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আচরণের বিরুদ্ধ আচরণের প্রসক্তি নাই। অতএব মহাপ্রভুর আচরণ নিশ্চয়ই অপর প্রভুত্বের আচরণের বিরোধী নহে। মহাপ্রভু কেবলমাত্র বিমুখ-বঞ্চনার জন্য যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে বিমুখগণ মোহিত হইতে পারেন, কিন্তু সেবানুগুণ তাহাতে মোহিত না হইয়া বিচার করেন যে, মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ বা মহা-মহাপ্রসাদ বিধি বৈষ্ণবে অপরাধময়ী জাতিবুদ্ধির আদর্শ স্থাপন করিয়া কখনও নিজেপদিষ্ট শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদা নিজেই লঙ্ঘন করিবার শিক্ষা প্রচার করেন নাই। তিনি বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ও মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ভাত-ডালবুদ্ধি—অসুগুণের নরকগমনের সেতু-স্বরূপ, ইহাই কোটিকণ্ঠে কীর্তন করিয়াছেন।

কোন কোন দুর্বুদ্ধিযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বলিতে পারেন,—শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহা-বৈষ্ণবকেই পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান

করিয়াছিলেন, মুকুন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহাবৈষ্ণবের সঙ্গেই একত্র ভোজন করিয়াছিলেন—এইরূপ মহাবৈষ্ণব এখন কোথায়? সুতরাং এখন মহাপ্রসাদে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকের পথে ধাবমান হওয়াই কর্তব্য। এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ দুৰ্দ্ধৃতিমূলক ও বিচারকের দুৰ্ভাগ্যজ্ঞাপক; কারণ শূদ্রাদি মানবজাতির স্পর্শ দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণা কুকুরের মুখ-ভ্রষ্ট কৃষ্ণপ্রসাদান্নও ‘মহাপাবন’ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

“কুকুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।

ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সৰ্বপাপাপনোদনম্॥

(স্কন্দপুরাণ উঃ খঃ ৩৮।১৯)।

—মহাপ্রসাদ সেবনে সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুকুরের মুখ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণ-গণেরও ভোজনীয়।

যে ভিক্ষা গ্রহণে উদরপূতির জন্য অন্যের নিকট আর খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তাহার নাম ‘স্থূলভিক্ষা’। আর যৌমাছি যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ নানা স্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বাঁহারা উদর পূরণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তি ‘মাধুকরী’। স্থূলভিক্ষা একজন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতেই গৃহীত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তিবিশেষের দোষ ভিক্ষা-গ্রহীতায় স্পর্শ করিতে পারে,—“বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্টি হয় মন”। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫০) এই জগৎ আত্মমঙ্গলের ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তিবিশেষের সদাচারি বা বৈষ্ণবতা-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে সেই ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ভিক্ষা করেন না। বহু লোকের গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তাহাতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দোষ সঞ্চারিত হইতে পারে না জানিয়া তাঁহারা মধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করেন। বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিপ্র, অথবা অস্থান্য বর্ণ-অপেক্ষা বিপ্রগণই সমধিক সদাচার-সম্পন্ন; তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুসেবাভংগর। বিপ্রের বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের গৃহে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীঅর্চা বর্তমান; কিন্তু বৈষ্ণবী দীক্ষায় অদীক্ষিত বিপ্র বা বিপ্র ব্যতীত বর্ণান্তরে ইতর কৃত্যাদির অবকাশ থাকায় তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ-সদাচারাতাব।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০৪ পৃষ্ঠার পর)

ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনের মানসে ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে দর্শনার্থীরা ভীড় করেন। স্বর্গে নন্দনকানন সমাবৃত দেবদেবীর অবস্থান। ভোগের চরম অবস্থা বিদ্যমান। বহু পুণ্যফলে স্বর্গবাস হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। স্বর্গের বর্ণনার তুলনায় ভূস্বর্গকাশ্মীর অতি হেয়। তবুও তুলনামূলক নামকরণ ভূস্বর্গ কাশ্মীর। এখানে বর্ণাঢ্য পোষাকের বা রূপের কোন জৌলস নাই। তবুও মোহবশত লোকজন আসে একটা কিছু আকর্ষণে। শহরের সৌন্দর্য্যও বড় আকর্ষণ, এটা বলা যায় না। ডাল লেকের একটা আকর্ষণ আছে। লেকের চারপাশে নিশাতবাগ, শালিমার গার্ডেন, চার চিনার, নেহেরু পার্ক ইত্যাদি দেখিবার আকর্ষণ দর্শনার্থীদের ক্ষণিক আনন্দ সঞ্চার করে। শ্রীনগর শহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত গুলমার্গ, শোনমার্গ, উলার হ্রদ প্রভৃতি দেখিবার জন্তও কিছু কিছু লোক কষ্ট স্বীকার করেন। প্রকৃতির অপূর্ণ সমাবেশ কাশ্মীর উপত্যকার চারিপাশে অবস্থিত। তবে পঁহেলগাঁতে বহু বাগান বা লেকের সমাবেশ না থাকিলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শ্রীনগর হইতে অনেক পরিমাণে চিত্তাকর্ষক। শাস্ত্র পরিবেশ, কোন প্রকার হৈ চৈ নাই। যাহারা শাস্ত্র পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে মনে হয় পঁহেলগাঁ শ্রেষ্ঠ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার কথা মনে পড়িয়া গেল—

“বহুকাল ধরি, বহুদেশ ঘুরি দেখিয়া এসেছি সিদ্ধু।

দেখা হয় নাই নম্রন মেলিয়া দুখার হইতে দু'পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু ॥”

নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে প্রকৃতির শোভা বাংলাদেশে প্রচুর। এই শোভার পূর্ণ বিকাশ হয় বর্ষাঋতু ও শরৎঋতুতে। বিভিন্ন কবির লেখনীতে এই দুই ঋতুর বর্ণনা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শস্ত-শ্যামলা বঙ্গভূমির সৌন্দর্য্য ছাড়াও পাহাড়-পর্বতের সৌন্দর্য্য কোন অংশে বেশী আছে বলিয়া আমি মনে করি না, দার্জিলিং জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। দেশ-বিদেশের বহু পর্য্যটক দার্জিলিং-এ ভীড় করেন হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন রূপ দর্শন করিবার জন্ত।

যাহা হউক, আমরা যথানিয়মে কাশ্মীর উপত্যকার কিছু কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম “সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন” উপলক্ষ্য করিয়া। এখন আমাদের শ্রীনগর হইতে বিদায়ের পালা। তীর্থযাত্রীগণ কাশ্মীর হইতে কেনাকাটা শেষ করিয়া বিশ্রাম রত। সেই সুযোগে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে শ্রীঅমরনাথ দর্শনের পোষাক-পরিচ্ছদে পরিষ্কৃত একটি ফটো তুলিলেন। আগামীকলা চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুতি-পর্ব চলিতেছে। জম্মু বাওয়ার জন্য Reservation-এর ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে।

পরের দিন ভোর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে জম্মু যাইবার জন্য Tourist Centre-এ সকাল ৬-৩০ মিঃ পৌঁছিলাম। কাশ্মীর উপত্যকা তথা শ্রীনগরকে বিদায় জানাইয়া আমরা জম্মু-কাশ্মীর স্টেটবাসে আরোহণ করিলাম। বাস-সকাল ৮-১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করিল ২৯৪ কি মি, পথ অতিক্রম করিবার জন্য। বিলাস নদীর আঁকা-বাকা পথ অতিক্রম করিয়া বাস দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। শ্রীনগর ও জম্মুর রাস্তা খুবই দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। উপরে পাহাড়, নীচে গভীর খাদ। বাস চালকের কোন-রূপ অনুমনন্বতা হইলে বিপদের আশঙ্কা বেশী। রুষ্টি হইলে পাহাড়ী রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়; ধ্বস নামিবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কোথাও কোথাও রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া যায়। তবে জম্মু হইতে শ্রীনগরের রাস্তা মিলিটারীর অধীনে থাকার দরুণ রাস্তা ততদূর শোচনীয় অবস্থায় থাকে না। সদা সর্বদা সতর্ক প্রহরায় থাকে। এই দুর্গম রাস্তা যাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে তাহার যত্নের ক্রটি নাই।

যাহা হউক, আমাদের বাস দ্রুতগতিতে জম্মুর দিকে ধাবমান। চলার পথে কাজিগুদ (৭০ কিঃ মিঃ) নামক একটি স্থানে বাস বিশ্রাম নিল। যাত্রীগণ প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করিলেন। এই স্থানে একটি Tourist Centre আছে। দর্শনার্থীরা প্রয়োজনবোধে এখানে বিশ্রাম ও রাত্রি যাপন করিতে পারেন। আমরা প্রত্যাবর্তনের পথে ভেরীনাগ দর্শন করিলাম। এখানে মুঘল বাদশাদের প্রাচীন প্রাসাদ আছে। এখানকার ক্যানেল হইতে তীব্র-গতিতে জলস্রোত ধাবমান। উচু নিচু পাহাড় ডিঙ্গাইয়া এখানে আসিতে হয়। মনে হইল চলার-পথে মেঘের মধ্য দিয়া আমাদের বাস নিম্নদিকে অগ্রসর হইতেছে। ভেরীনাগ দর্শনান্তে আমাদের বাস চলিতে চলিতে বিখ্যাত বানিহাল Tunnel অতিক্রম করিল (দীর্ঘ প্রায় ৮ কিঃ মিঃ)। একটি

পাহাড়ের ভিতর দিয়া রাস্তা করা হইয়াছে শ্রীনগরকে নিকটতর করিবার জন্য। টানেলের বাহিরে সবুজ ও লাল সংকেত আছে, কারণ ভিতরে একটি মাত্র রাস্তা। এই রাস্তাকে নিরাপদে অতিক্রম করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা, টানেলের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা আলোকিত, লোকজন সদাসর্বদা কণ্ঠরত, যাচাতে পাহাড়ের কোন অংশ ভাঙিয়া যাত্রীদের বিপদের আশঙ্কা না হয়। পাহাড়ের গা বহিয়া নিরন্তর জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অবশেষে আমরা নিরাপদে ২৯৪ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করিয়া রাত্র ৯-৪৫ মিঃ জন্মুতাওয়াই রেলস্টেশনে পৌঁছিলাম। আমাদের চলার পথে উধমপুরও দর্শন করিয়াছিলাম।

ইং ১৮।৮।৭৬ আজ বুধবার জন্মাষ্টমী। সকাল হইতে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলাম, বৈকাল বেলা আমরা স্টেশন হইতে ৩৪ মাঃ দূরে অবস্থিত জন্মু শহরে গেলাম 'Taxi' করে।

জন্মু শহরে পৌঁছিয়াই নজরে পড়িল অধিকাংশ গৃহের উপরেই T.V. set এর এরিয়াল। একটু বিস্ময় জাগিল, কারণ কলিকাতার মত শহরেও এত ঘন-ঘন অর্থাৎ ২৩ বাড়ীর পর পরই T.V. set-এর এরিয়াল নাই। শহরটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমরা শহরের বিখ্যাত শ্রীরাম-সীতার-মন্দির, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির এবং জন্মু রাজাদের প্রাচীন কৌস্তিসহ মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিলাম। রাস্তাঘাট খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। কাশ্মীর ও জন্মুর তুলনামূলক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য জন-বসতি ও লোকজনের আচার ব্যবহারে বিগাট পার্থক্য বিদ্যমান। জন্মুকে মনে ৩য় হিন্দুস্থানীদের শাসিত একটি শহর বিশেষ। কারণ কাশ্মীর তথা শ্রীনগর ও জন্মুর অধিবাসীদের চালচলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় অনেক মিল নাই, যদিও একই সরকারের অধীন একটি রাজ্য।

এক্ষণে, আসা যাক আমাদের তীর্থযাত্রার কথায়। জন্মাষ্টমীর দিনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কৃত্য শ্রীভাগবত পারায়ণ বা কৃষ্ণসংস্করীয় অন্যান্ত গ্রন্থ-পারায়ণ বা রুক্মলীলা-বিষয়ক কীর্ত্তন। আরাধ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ভজন-পরায়ণ মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত, গৃহী-ত্যাগী সকলেই সেবাপর বৃত্তি লইয়া ধ্যান-ধারণা করেন শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতি উৎপাদনের জন্ত। সেই অবতারী-পুরুষের জন্মজয়ন্তীতে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহের উপাসককে ছলে বলে যেভাবেই হউক সেই সচ্চিদানন্দময় বিষয়বস্তুর ভাবধারাকে আশ্রয় করিতে হইবে।

সদ-বস্তুর জন্য নিজেকে সদ হইতে হইবে। সদ-বৃত্তির দ্বারা সদ-বস্তুর প্রীতিমূল্য সেবা করিতে হইবে। এই ভাব জগতে বিরল, সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের দর্শনও বিরল।

রাত ১০-৪৫ মিঃ অমৃতসর এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিবস (১৯৮৭৬) শোর ৫টায় অমৃতসরে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে আমাদের স্থান করিলাম। শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভু তাঁর নিজকাৰ্য্য নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের প্রসাদ সেবার কোন ক্রটি না হয়, সেই দায়তার পুরামাত্রায় সদ্যাবহার করিতে ব্যস্ত। সত্যি কথা বলতে কি, যাহারাই শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভুর মাধ্যমে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চই তাঁহার রান্না-কাৰ্য্যের অদ্ভুত পারদর্শিতার কথা স্মরণ করিয়া থাকিবেন।

এই অবসরে আমরা শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভুর আনুগত্যে অমৃতসর সহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে বাহির হইলাম। শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভু ও শ্রীপাদ রামানন্দ প্রভু পরে আমাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। অমৃতসরে আসিয়াই প্রথমে দর্শন করিলাম—আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ও চিত্তকর্ষক শ্রীবিগ্রহগণ (১) শ্রীরাধাকৃষ্ণ, (২) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, (৩) শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্ন ও হনুমান-মন্দির। গতকলা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এখানে বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণ হইয়াছিল মহাসমারোহে। আজ আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের মিষ্টি প্রসাদ গ্রহণ করিলাম উদ্যোক্তাদের হাত হইতে; এখনও শ্রীমন্দিরে প্রচুর ভীড়। আমাদের যাত্রাপথে এই প্রথম শ্রীরাধাগোবিন্দের ভুবনমোহিনী শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম। যাত্রীগণও বেশ পুলকিত এই মন্দিরের বিগ্রহগণের দর্শন লাভে।

তৎপর আমরা অমৃতসরের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণমন্দির গুরুদ্বারা দর্শন করিলাম। এই মন্দিরের অবস্থান একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে। ভূমির সঙ্গে পুল-দ্বারা সংযোগ করা হইয়াছে। বহু যাত্রীর এখানে সমাগম হয়। মন্দিরের ভিতরে শিখদের ‘গ্রন্থসাহেব’ বিরাজমান। ভক্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া সদাসর্বদা কীৰ্ত্তনানন্দে ব্যস্ত। এখানে যেন আনন্দের ফোয়ারা বহিয়াছে। সকলেই সদা হাসি ও প্রফুল্ল। মনে হয় যেন ভক্তগণ এই পবিত্র পরিবেশে আসিয়া নিজেকে ধষ্টা মনে করিতেছেন। শহরের ধনী দরিদ্র সকল শিখরাই এখানে আসিয়া ভক্তিভাবে দর্শন করিয়া যান। হিন্দুদেরও কোন ব্যতিক্রম নাই। তবে মস্তকে কিছু ঢাকা দিয়াই শিখপ্রথা অনুযায়ী তাঁহাদিগকে আসিতে হয়।

স্বর্ণশূর্য্যদ্বারাকে ঘিরিয়া পুকুরের চারিদিকে বড় বড় ইমারত গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে শিখ-মিউজিয়ামই ঐগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এই মিউজিয়ামে শিখদের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রগুলি ও ঘটনার বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক। বহু সময় অতিবাহিত করিলে সম্পূর্ণ দর্শন পূর্ণমাত্রায় হয় এবং শিখদের শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিহাস জানা যায়। আমরা এই সমস্ত দর্শন করিয়া ইতিহাস বিখ্যাত সেই জালিয়ান-ওয়ালা বাগে সম্রমের সহিত বীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইলাম। শহরের মধ্যেই এই শ্রেষ্ঠ বাগ। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ইতিহাস কুখ্যাত ডায়াচ সাহেব মিছিলকারীদের উপর নৃশংসভাবে গুলি চালাইয়া বহুলোককে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন বিশ্বের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া পাঞ্জাব-বাসীদিগের এখনও শিহরণ জাগে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের পার্শ্ববর্তী দেয়ালের গায়ে এখনও সেই গুলির দাগ দর্শন হয়। পার্কটিকে সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। একটি শহিদ বেদীও করা হইয়াছে মধ্যস্থলে। বাগের প্রথম মুখেই শহীদদের প্রতিমূর্ত্তি ও বাণী সুন্দরভাবে ধরিয়া রাখা হইয়াছে একটি মঞ্চের মধ্যে।

প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রীগণ কিছু কিছু উণের জামা ও কল্লল ক্রয় করিলেন। ছপুরে প্রমাদ সেবাক্তে বৈকাল ৬ ঘটিকায় ট্রেনযোগে রওনা হইয়া পাঠানকোটে রাত্র ৯৩০ মিঃ পৌঁচিয়া বিশ্রামাগারে রাত্রি যাপন করিলাম। সন্ধ্যা হইতেই প্রবল বৃষ্টিপাত হইতেছিল। এই পাঠানকোটই জম্মু-কাশ্মীর যাওয়ার রাস্তা। পরবর্ত্তীকালে জম্মু-তাওয়াই রেললাইন হওয়ায় কাশ্মীর যাওয়ার সহজপথ হইয়াছে। পাঠানকোট বহু পুরান শহর। পাঠানকোট শহরে কয়েকটি দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিলাম। যাত্রীগণ এখান হইতে আপেল সংগ্রহ করিলেন দেশে লইয়া আসিবার জন্য। পাঠানকোট হইতে রাত্র ১০টার ট্রেনযোগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা (ইং ২২।৮।৭৬) ববিবার নিরাপদে সুদীর্ঘ ২২দিন পর গোধূলীলগ্নে ৬।০ ঘটিকায় কলিকাতায় মঙ্গলমত পৌঁছিলাম। বিরত-বিচ্ছেদে ভরপুর হৃদয়ে যাত্রাপথের দর্শনের স্মৃতিটুকু সন্মল করতঃ প্রভুগণকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইয়া পরস্পরে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ আবাসস্থল অভিমুখে গমন করিলাম।

— শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

বৈষ্ণব-মত-পঞ্চক *

শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ

বিষ্ণু সর্বোত্তম । জগৎ সত্য । ঈশ্বর, জীব ও জড়ের মধ্যে নিত্যভেদ বর্তমান । জীবের মধ্যে যোগ্যতা-অনুসারে তারতম্য নিত্য বিদ্যমান । জীবের স্বরূপানুগত ধর্মের অভিব্যক্তিই মুক্তি । নির্মলা ভক্তিই স্বরূপানুগত ধর্মের অভিব্যক্তির সাধন ; শব্দ, অহুমান ও প্রতাক্ষ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ । শ্রীহরিই একমাত্র অখিল-আত্মাবেগ ।

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে তত্ত্ব দ্বিবিধ । বিষ্ণুই একমাত্র সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র তত্ত্ব ।

সৃষ্ট জীবের সহিত বিষ্ণুর ভেদ বর্তমান । ব্রহ্ম পরম-মহৎ-পরিমাণ, জীব অণুপরিমাণ ; ব্রহ্ম সর্বদোষ-বিনির্মুক্ত, জীব দোষপূর্ণ ; ব্রহ্ম অনন্ত গুণযুক্ত, জীব পরিমিত গুণ ; ব্রহ্ম নিতামুক্ত, জীব সংসার-বদ্ধ ; এই দুইটি তত্ত্বের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না ।

ব্রহ্ম-সম্প্রদায় এই মতের অনুগ । এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীমধ্বাচার্য্য ।

শুদ্ধাট্টদ্বৈতবাদ

বস্তুর অংশ জীব ; বস্তুর শক্তি মায়া ; বস্তুর কার্য্য জগৎ । হলাদিনী এবং সন্নিঃশক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহই ঈশ্বর । অবিদ্যাসংবৃত্ত ও সংক্লেশসমূহের আকর-স্বরূপতাই বদ্ধজীবের লক্ষণ । অংশী ঈশ্বরের সহিত অংশস্বরূপ শুদ্ধ জীবের যে সেবা-সেবকভাবে অদ্বয়জ্ঞানাবস্থা ; সেই শুদ্ধজ্ঞান হইতে বিচ্যুত ও উপাধিবশতঃ জড়ের ভেদগত সত্তার দর্শনমূলে নিজকে অবিদ্যার দ্বারা আবৃত এবং সংক্লেশের আকরস্বরূপ বলিয়া দ্বিতীয়জ্ঞানই বদ্ধ-জীবের অভিমান । ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ ; ঈশ্বর-স্বপ্রকাশ ও পরানন্দস্বরূপ । জীবও অংশীর অংশস্বরূপে স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ হইয়াও দ্বিতীয়া-ভিনিবেশবশতঃ অত্যন্ত দুঃখের ভূমিকায় প্রকাশিত ।

রুদ্র-সম্প্রদায় এই মতের অনুগ । শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য । প্রসিদ্ধ ভাগবত-টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই সম্প্রদায়ভুক্ত ।

বিশিষ্টাট্টদ্বৈতবাদ

অদ্বয় ব্রহ্ম—বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত । চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং কলেবর । দুইই তাঁহার আশ্রিত ; ভোগ্য, নিয়মা ও কার্য্যরূপে কারণ-

১৩৪১ সালের ২য় বর্ষের ৮ম ও ৯ম সংখ্যা-যুক্ত ‘কীর্ত্তন’ পত্রিকায় শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভুভূত অসমীয়া প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ । —শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

রূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক। অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান ; তাহার কার্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্তমান। গুণী-শব্দের অর্থ—গুণসমূহবিশিষ্ট ; চিৎ ও অচিৎ—কারণরূপীগুণী ব্রহ্মের কার্যানুকূল গুণ বা বিশেষণ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যথাভাৱে জ্ঞান, অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রীতির সহিত পুরুষোত্তমের চরণযুগলের ধ্যানার্চন-প্রণামাদিই অভিধেয় এবং তৎপদ-প্রাপ্তিই প্রয়োজন।

তত্ত্ব ত্রিবিধ—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ—জীবাত্মা, অচিৎ—জড়, ঈশ্বর চিদচিৎতের নিয়ামক পুরুষোত্তম নারায়ণ। পরতত্ত্ব স্বশক্তিদ্বারা এই ত্রিবিধ-রূপে নিত্য প্রকাশমান।

শ্রী-সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত-মতাবলম্বী। শ্রীরামানুজ এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

সমস্তবস্তুই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু হইতে অসদ্বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে না। বস্তুবিজ্ঞানই নিখিল-বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব। শাস্ত্রের কোনস্থানে অদ্বৈতবাক্য কোনস্থানে দ্বৈতবাক্য এবং কোনস্থানে উভয়নিষ্ঠ-বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত কেবলাদ্বৈতবাদ কোনমতেই শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্রুতি ও স্মৃতি আলোচনা করিলে অদ্বৈত ও দ্বৈত—এই দুই শাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

জড়পদার্থ ত্রিবিধ—কাল ও মায়া। তাহার মধ্যে কাল—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতহিসাবে পুনঃ ত্রিবিধ। ভগবানের ইচ্ছায় কাল ক্রিয়ামীল। চিৎ বা অপ্রাকৃত-কালের মায়িক দর্শনই প্রাকৃত বা মায়িক কাল। ছায়াধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়া বা প্রকৃতি চিৎবিকারমাত্র ; সমস্ত জড় জগৎ ও বদ্ধজীবের স্থূল আর লিঙ্গ-দেহ অচেতনতত্ত্ব।

সনক-সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী। শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীনিম্বাদিত্য এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কৰ্ম্ম—এই পঞ্চতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ পরম বস্তু। তিনি নিখিল নিগমবেদ্য। এই বিশ্ব সত্য। ব্রহ্ম ও বিশ্বের ভেদ সত্য। জীব অণুচৈতন্যবিশেষ, সত্য এবং নিত্য কৃষ্ণদাস। জীবসমূহের মধ্যে সাধনগত ভেদ বা জীবে জীবে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তিই মোক্ষ, পরা ভক্তিই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। প্রতাপ, অহুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই চিৎ এবং অচিদ্রূপে পরিণত। পুরুষোত্তম যেমন

অবিচিন্তাশক্তি. শক্তিমানের মধ্যেও যাহা ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অচিন্তা। শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারজনিত প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন।

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীচৈতন্যের মত এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইয়া একটি পৃথক্ তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্বপ্রচলিত বৈষ্ণবমত-চতুর্থাংশের এক অতি অচিন্তা ও অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই মতটি বৈদান্তিক সকলের নিকট অতি সমীচীন বৈদান্তিক সিদ্ধান্তরূপে সমাদর লাভ করিয়াছে।

“শ্রীচৈতন্য যেই কহে, সেই মত সার।

আর যত মত দেখ সব ছারখার ॥

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদে ভাগবত জ্ঞানি।

চৈতন্য যে না মানে তারে ‘দৈত্য’-মধ্যে গণি ॥”

—ইহাই বৈদান্তিক সকলের অভিমত।

দক্ষিণ ভারত-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

স্কন্দপুরাণে বৈষ্ণবচলকে বৈকুণ্ঠসদৃশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং যজ্ঞ, তপ, দান ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন অপেক্ষা এখানে শ্রীবালাজী দর্শন করিলে কোটীগুণ অধিক ফল হয় বলিয়া বর্ণনা আছে। ‘তিরু’-অর্থে শ্রী-সম্পন্ন এবং ‘মলয়’-বা মালাই অর্থে পর্বত। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন পর্বত অথবা ‘বৈষ্ণব’-অর্থে পাপ, ‘কট’-অর্থে নাশক এবং ‘অচল’-অর্থে পর্বত। সুতরাং ‘বৈষ্ণবচল’ অর্থই পাপনাশক পর্বত। এই পুণ্যশিখরে পূর্বাপর সকল আচার্য্যগণ গিয়াছেন এবং শ্রীল রামানুজাচার্য্য এবং তাঁহার অনুগামী পরবর্ত্তি আচার্য্যগণ অর্থাৎ শ্রী-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এখানকার সেবাধিকারী। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত হরিজন মহারাজ এখানকার মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণনা করায় যাত্রীগণ হৃষ্টচিত্ত হন।

যাহা হউক বৈষ্ণবগণের প্রচেষ্টায় ও শ্রীবালাজীর কৃপায় আমরা সকলেই সফলভাবে বিগ্রহরূপী শ্রীলক্ষ্মী ও তাঁহার হৃদয়-নাথকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইলাম। তদনন্তর সেখানে প্রভুগণের সংগৃহীত মন্দিরের প্রসাদ পাইয়া রেণিগুটা প্রত্যাবর্ত্তন করি। রেণিগুটায় ফিরিয়া দেখি শ্রীপাদ মুরলী প্রভু একাই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিভিন্নস্থানের রেলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমাদের প্রোগ্রামেরও হেরফের দেখা দিয়াছে।

ইহার ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু মাদ্রাজে থেকে গিয়াছেন এবং একটি Part order করিয়া আমাদের Tourist coach যাত্রাতে আর্কোণামে আসে তাহার ব্যবস্থা করিয়া মুরলী প্রভুর হাতে কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরের দিন আমাদের টুরিষ্ট কোচ আর্কোণাম যাওয়ার গাড়ীতে সংযোজিত হয় এবং ট্রেন অনেক দেরিতে আর্কোণামে পৌঁছে। রাত প্রায় ৯টা (ইং ১১।১১।৭৭), তখন আমরা আর্কোণামে পৌঁছি এবং দেখিতে পাই নবযোগেন্দ্র প্রভু আমাদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা সকলেই নিকৃষ্টিগ অনুভব করি। রেলওয়ের যাত্রীনিবাস গৃহে আমাদের রান্নাদি ও প্রসাদ পাওয়া হয়। এইদিন রাতে প্রচুর বর্ষণ হইতেছিল। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তি অঞ্চলে (তাজোর, কুম্ভকোণম প্রভৃতি) ভয়াবহ ঝড় ও প্লাবনের সংবাদ এবং রেলওয়ের যোগাযোগ ছিল হওয়ার সংবাদ পাওয়া স্থানীয় অধিবাসীগণ সকলেই ভীষণ ভয়ান্ত ও চিন্তিত হইয়া পরিয়াছিলেন। আমরা এই অবস্থাতেও শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয়ে থাকিয়া যথারীতি কীর্ত্তনাদিতে বিরত হই না। যাত্রা হটুক পরে বৈকালে আমাদের গাড়ী কাঞ্চীপুরম অভিমুখে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা হয়। এখানেই আমাদের টুরিষ্ট কোচ (ব্রড গেজ) পরিবর্ত্তন করিয়া মিটার গেজের বগিতে আসন সংরক্ষিত হয়। আমরা এখান হইতে কাঞ্চীপুরমে রাতে পৌঁছি।

কাঞ্চীপুরম অর্থাৎ স্বর্ণ-নগরী। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের কান্ধী বলা হয়। কাঞ্চীপুর দুইভাগে বিভক্ত - বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। বিষ্ণু-মন্দিরের নামানুসারে ঐস্থান বিষ্ণুকাঞ্চী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং শিবজীর অবস্থান-ক্ষেত্রকে শিবকাঞ্চী নামে বিদিত। শিবকাঞ্চীর শিবজীকে একান্তনাথও বলা হয় : এখানে কামাক্ষীদেবীর মন্দিরও আছে। শিবজী বৈষ্ণবগণের চির নমস্কা বা প্রণম্য। বৈষ্ণবের কৃপায়ই ভগবান্ সহজ-লভ্য হন। বৈষ্ণবের কৃপা আতান্ত্রিক মঙ্গলকামীগণ সর্বদাই কামনা করিয়া থাকেন। এই ভরসায় পরমপূজ্য দেবাদি-দেব মহাদেব—শিবজীর শ্রীচরণ দর্শন কামনার সর্বাগ্রে শিবকাঞ্চীতে একান্তনাথের দর্শনলালসায় তাঁহার শ্রীমন্দিরে উপনীত হইয়া কৃপাভিক্ষা করি। এস্থলে শিবজী ক্ষিতি-মূর্ত্তি-রূপে বিরাজমান। এস্থানে শ্রীবিগ্রহ মূন্ময় বলিয়া—জল, পুষ্প বা ভোগ্য-দ্রব্য কিছুই দেবাঙ্গে অর্পিত হয় না।

বৈষ্ণবপ্রবর পরমকারুণিক আশুতোষের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনে উপনীত হইলাম। তথায় প্রথমে ভক্ত-বিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহ-দেবের দর্শন করিয়া শ্রীবরদরাজ স্বামী বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হই। মূলমন্দিরে উষ্ণিষার পাঁচটি সোপান রৌপ্যদ্বারা মণ্ডিত। শ্রীবিগ্রহ চতুর্ভুজ বিষ্ণু—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বহুবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। মস্তকের রত্নময় ক্রিটটির উপর হীরকখচিত দীপালোকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান দেখাইতেছিল। বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী অপেক্ষা অধিক শ্রী-সম্পন্ন বলিয়া মনে হইল। শান্ত্রে বর্ণিত আছে একসময় স্বয়ং ব্রহ্মা এই কাঞ্চীতে আগমনপূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এখানকার বেদবতী শ্রোতস্থিনীদ্বারা ভাগীরথী সরস্বতীর ন্যায় দক্ষিণাত্যে পুনঃসলিলা।

কাঞ্চীপুরমে শ্রীবামনদেবের মন্দিরও রয়েছে। এতদ্ব্যতীত সহরের মধ্যে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নামে সাতটি তীর্থ আছে। কথিত আছে, এই সকল তীর্থে স্নান করিলে বহুপ্রকার পাপ ক্ষয় হয়।

কাঞ্চীপুরমের পর আমাদের লক্ষ্যস্থল পক্ষীতীর্থ। পরের দিন আমরা আমাদের সংরক্ষিত কোচেই চিৎপলপুট ষ্টেশনে পৌঁছি। সন্ধ্যায় ষ্টেশনে আমাদের কামরাতেই শ্রীবিগ্রহের আরতি-কীর্তন হয়।

২৮শে কা্তিক (ইং ১৪।১১।৭৭) সোমবার প্রাতেঃ আরতি দর্শন ও কীর্তনাদি শ্রবণান্তে আমরা পক্ষীতীর্থ দর্শন মানসে সকাল সকাল রিজার্ভ-বাসে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতে পক্ষীতীর্থের দূরত্ব ১০।১২ মাইলের মতো। পর্বত-শিখরে উক্তস্থান অবস্থিত। উহাকে ‘ত্রিকুণ্ডলা-কুণ্ডম’ও বলেন। পর্বতশিখরে বেদগিরীশ্বরের মন্দির, প্রস্তর-প্রাচীর পরিবেষ্টিত, দেখিতে একটি দুর্গবিশেষ। পাহাড়টির উচ্চতা প্রায় ৫০০ শত ফুট। ৫১২টি সিঁড়ী অতিক্রম করিয়া বেদগিরীশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হই। একটি প্রস্তর নির্মিত অতিকায় বৃষ মন্দির-সোপান সম্মুখে দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত। প্রকাণ্ড লোহ-নির্মিত দ্বার অতিক্রম করিয়া মূল মন্দির-মধ্যে বেদগিরীশ্বর মহাদেব দর্শন মানসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আরতির সময় বিগ্রহটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম,—কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত লিঙ্গ-মূর্তি। রৌপ্য নির্মিত শিব-শঙ্খ অঙ্গে শোভিত। লিঙ্গোপরি ধাতু নির্মিত ভীমকায় ফণী ফণা বিস্তার করিয়া আছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব প্রতিবৎসরেই শ্রীঝুলনযাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বৎসরেও মঠের রক্ষক ত্রিদিগ্বিদগণী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের উদ্যোগে ও মঠের অধ্যক্ষ দেবকরন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত অনুষ্ঠানের বিপুলভাবে আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে বিগত ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৯৮৭) সোমবার হইতে ১লা ভাদ্র (ইং ১৯৮৭) শুক্রবার পর্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী প্রত্যহ মঙ্গলারতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্তন ও চায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ও রাম-লীলাদি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে পার্শ্ববর্তি স্থান হইতে প্রত্যহ প্রচুর ভক্তগণের সমাগম হইয়াছে এবং প্রতিদিনেই সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীঝুলনযাত্রার তাৎপর্য ও এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভক্ত ও অন্যান্য আধিকারীক দেবতাগণের গুরুত্ব বা ক্ষমতার পরিধি, শ্রীবন্দনতত্ত্ব ও মায়া প্রভাব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিভিন্ন দিনের আলোচ্য বা বক্তব্যবিষয় পরিবেশন হইয়াছিল।

শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পরদিবস অর্থাৎ ২রা ভাদ্র (ইং ১৯৮৭) শনিবার সাধারণ-মহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র ভক্তগণকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

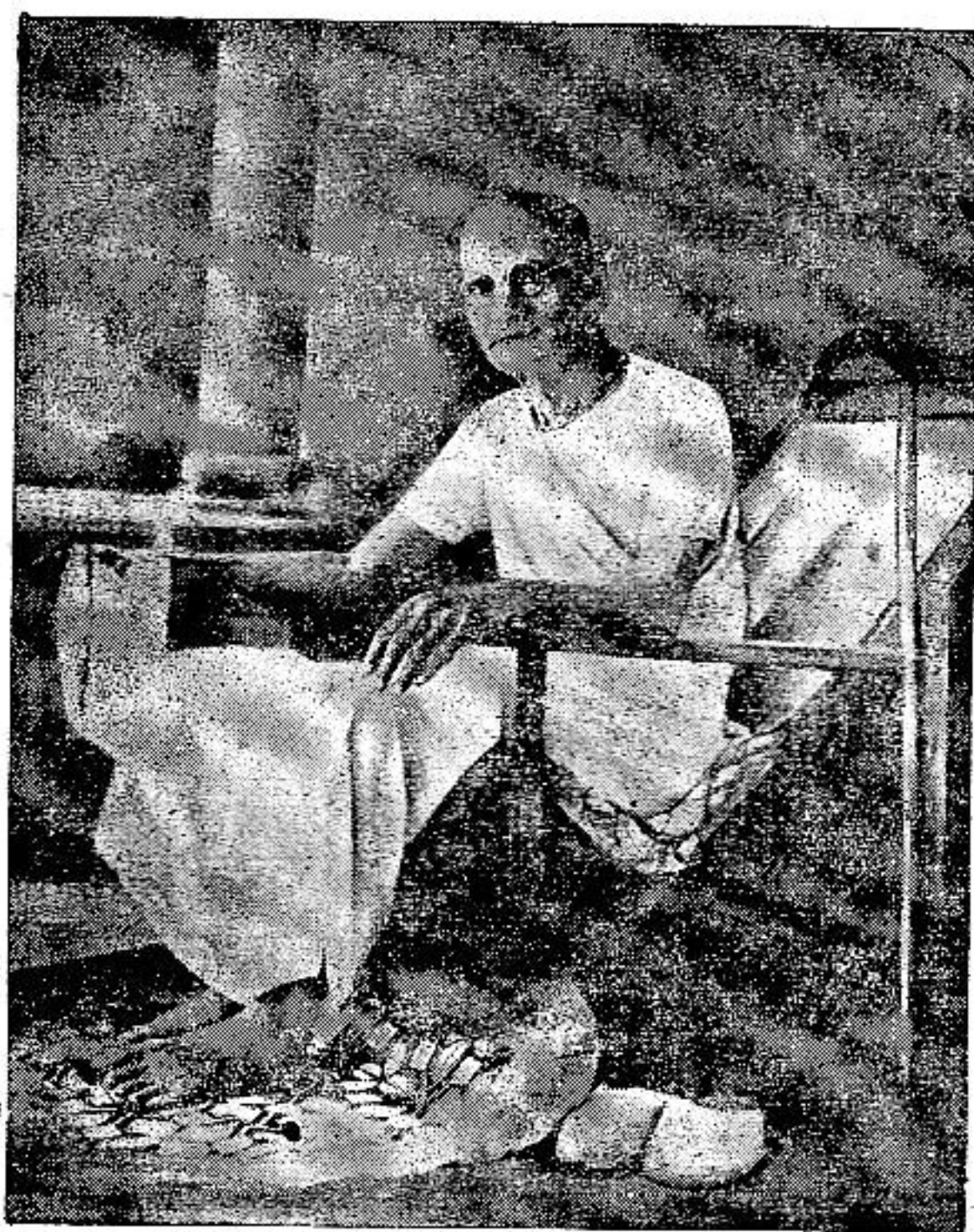
এখানকার নবমন্দিরের নির্মাণ-কার্য কিছুপরিমাণে হওয়ায় সজ্জনগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার অসমাপ্তকার্য সম্পন্নের জন্য সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা করিবেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ যশোদানন্দনন্দাস ব্রজবাসী, শ্রীপাদ বাণীনাথদাস ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ বলরামদাস ব্রজচারী প্রভৃতি প্রভুগণের সেবা-প্রচেষ্টা ভক্তগণের আনন্দ বর্ধন করিয়াছে।

—শ্রীশ্রীকান্তদাস ব্রজচারী

॥ শ্রী শ্রী গুণগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্ষ্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১০ম বার্ষিক বিব্রহ-মহোৎসব



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

৩০শে ভাদ্র, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।৯।১৯৭৮

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিতপূর্বিকেষম্ —

সাদর সম্ভাষণপূর্বিকেষম্—

আগামী ৩০শে পদ্যনাভ, ২৯শে আশ্বিন (ইং ১৬।১০।৭৮)
সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী
শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ভাস্করীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম
ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদত্তান কেশব গোস্বামী
মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ এবং
তৎশাখা মঠসমূহে ১০ম বর্ষপূর্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে
আপনি স্বাশ্রয় যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-
দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা
নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

২৯শে আশ্বিন, ইং ১৬।১০।৭৮ সোমবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী কীর্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিষ্ঠতা যয়ান্না সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পনন
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ

অনিকুল, ২ দামোদর, ৪৯২ গোরাঙ্গ
বুধবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮৫ ; ইং ১৮।১০।১৯৭৮

৮ম সংখ্যা

সানুবাদং পাণ্ডবাদিকৃতম্

শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

সুভদ্রা উবাচ—

একোহপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো,

দশাশ্বমেধাবভূথৈর্ন তুল্যঃ ।

দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম,

কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥১৩॥

সুভদ্রাদেবী বলিলেন,— শ্রীকৃষ্ণকে একবার প্রণাম করিলে যে ফল প্রাপ্ত
হওয়া যায়, দশাশ্বমেধ-যজ্ঞদানের ফলও তাহার সমান নহে, কারণ দশাশ্ব-
মেধীর পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীর পুনরায় সংসার-প্রাপ্তি হয় না ॥১৩॥

অভিমন্ত্যাকুবাচ—

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে,

গোবিন্দ গোবিন্দ রথাজপাগে ।

গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ,

গোবিন্দ গোবিন্দ নমো নমস্তে ॥১৪॥

অভিমুখ্য বলিলেন—হে মুরারে, চক্রপাণে, হে গোবিন্দ, হরে, হে মুকুন্দ, কৃষ্ণ, তোমায় বার বার প্রণতি জানাই ॥১৪॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ—

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ ।

শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো, মাং ত্রাহি সংসার-ভুঞ্জ-দষ্টম ॥১৫॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—হে শ্রীরাম, নারায়ণ, বাসুদেব ! হে গোবিন্দ, বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ, কৃষ্ণ ! হে শ্রীকেশব, অনন্ত, নৃসিংহ, বিষ্ণো ! আমাকে সংসাররূপ সর্প দংশন করিও, আমায় ইহার হাত হইতে ত্রাণ করুন ॥১৫॥

সাত্যকিরূবাচ—

অপ্রমেয় হরে বিষ্ণো কৃষ্ণ দামোদরাচ্যুত ।

গোবিন্দানন্দ সর্বেশ বাসুদেব নমোহস্ত তে ॥১৬॥

সাত্যকি বলিলেন,—হে অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন, হরে, বিষ্ণো, কৃষ্ণ, দামোদর, অচ্যুত ! হে গোবিন্দানন্দ, সর্বেশ্বর, বাসুদেব ! আপনাকে প্রণাম করি ॥১৬॥

উদ্ধব উবাচ—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য য়েহৃদেবমুপাসতে ।

তৃষিতা জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি তুর্ভগাঃ ॥১৭॥

উদ্ধব বলিলেন,—যাহারা ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অল্প দেবতার উপাসনা করে, তাহারা তুর্ভাগ্যবন্ত, কারণ গঙ্গাতীরবাসী হইয়াও পিপাসার সময়ে কূপের জলপানের বাঞ্ছা করে ॥১৭॥

ধৌম্য উবাচ—

অপাং সমীপে শয়নাশনে গৃহে, দিবা চ রাত্রৌ চ পথা চ গচ্ছতা ।

যতন্তি কিঞ্চিং সুকৃতং কৃতং ময়া, জনার্দনন্তেন কৃতেন তুশ্যতু ॥১৮॥

ধৌম্য বলিলেন,—জলাশয়ের নিকটে, গৃহে ভোজন ও শয়নকালে, দিনে অথবা রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কিঞ্চিং পরিমাণেও সুকৃতি অর্জন করিয়া থাকি, তবে উহা দ্বারা জনার্দন তুষ্ট হউন ॥১৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

আৰ্ত্তা বিষগ্নাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা, ঘোরেষু ব্যাভ্রাদিষু বৰ্ত্তমানাঃ ।

কীৰ্ত্ত্য নারায়ণ-শব্দমাত্রং, বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥১৯॥

সঞ্জয় বলিলেন,—পীড়িত, দুঃখিত, অবসন্ন, ভীত বা ভীষণ দুর্গমে ব্যাভ্রাদি-
সঙ্কুলস্থানে অবস্থিত হইয়া যদি কেহ নারায়ণ-শব্দমাত্র কীৰ্ত্তন করেন, তবে
দুঃখবিমুক্ত হইয়া সুখী হইবেন ॥১৯॥

অক্রুর উবাচ—

অহং তু নারায়ণ-দাস-দাস, দাসস্ত দাসস্ত চ দাস-দাসঃ ।

স্ত্যগ্ন দৈশো জগতো নরাণাং, তস্মাদহং চান্নতরোহস্মি মোকে ॥২০॥

অক্রুর বলিলেন,—জগতে যদি মানুষের অন্য কেহ ঈশ্বর থাকেন, আমি
তাহার দাস নহি, কিন্তু আমি নারায়ণের দাসের-দাসের এবং তাহার দাসের-
দাসের-দাসানুদাস ॥২০॥

বিদুর উবাচ—

বাসুদেবস্ত যে ভক্তাঃ শাস্তাস্তদগতমানসাঃ ।

তেষাং দাসস্ত দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥২১॥

বিদুর বলিলেন,—যাহারা বাসুদেবের ভক্ত, শান্ত ও তদগতচিত্ত, আমি
জন্মে জন্মে তাহাদের দাসানুদাস হইব ॥২১॥

ভীষ্ম উবাচ—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু ।

ব্রাহ্মি মাং কুপয়া কৃষ্ণ শরণাগত-বৎসল ॥২২॥

ভীষ্ম বলিলেন,—হে আশ্রিতবৎসল কৃষ্ণ! বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় ও
হরিস্মরণের বিপরীতকালে কৃপাপূৰ্ব্বক আমাকে ব্রাণ কর ॥২২॥

দ্রোণাচার্য্য উবাচ—

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ দৈত্যা-ত্রৈলোক্যনাথেন জনাৰ্দ্দিনেন ।

তে তে গতাস্তন্নিলয়ং সমস্তাঃ ক্রোধোহপি দেবস্ত বরেণ তুল্যাঃ ॥২৩॥

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—চক্রধারী, ত্রৈলোক্যনাথ, জনাৰ্দ্দনকর্তৃক যে-সকল
দৈত্য নিহত, তাহারা সকলেই তাহার ধামে গমন করিয়াছে ॥২৩॥

কৃপাচার্য্য-উবাচ—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে

মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব ।

ভৃদ্ ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-

ভৃত্যশ্চ ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥২৪॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—আমার এই জন্মের ফল—হে মধুকৈটভারে ! আমি যে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিতেছি—ইহাই আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ । হে লোকনাথ ! আমি আপনার ভৃত্য-ভৃত্য-সেবক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যের ভৃত্য—ইহাই চিন্তা করিবেন ॥২৪॥

অশ্বখামোবাচ—

গোবিন্দ কেশব জনার্দন বাসুদেব

বিশ্বেশ বিশ্ব মধুসূদন বিশ্বনাথ ।

শ্রীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুঙ্করান্ধ

নারায়ণাচ্যুত নৃসিংহ নমো নমস্তে ॥২৫॥

অশ্বখামা বলিলেন,—হে গোবিন্দ, কেশব, জনার্দন, বাসুদেব ! হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বস্বরূপ, মধুসূদন, বিশ্বনাথ ! হে শ্রীপদ্মনাভ, পুরুষোত্তম, কমল-লোচন ! হে নারায়ণ, অচ্যুত, নৃসিংহ ! তোমার প্রণাম করি ॥২৫॥

কর্ণ উবাচ—

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি

নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি

ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণানুজন্তুরেণ

শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্ ॥২৬॥

কর্ণ বলিলেন,—হে শ্রীনিবাস ! ভক্তিভাবে তোমার পাদপদ্ম ভজন করিব, উহা ছাড়া অন্য কিছু বলিব না, শুনিব না, চিন্তা বা স্মরণও করিব না এবং অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব না । হে পুরুষোত্তম ! তোমার পাদপদ্মের দাস্য প্রদান কর ॥২৬॥ (ক্রমশঃ)

দব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্‌গের জীবনী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

(৪) শ্রীভক্তাজিষ্মরেণু

(ভক্তাজিষ্মরেণুর তামিল নাম তোণ্ডারড়িপ্পডি আল্‌বর্‌)

ভক্তাজিষ্মরেণু বা বিপ্রনারায়ণের জন্ম, বাল্যজীবন ও স্বরূপ

২৮৮ কলিগতাব্দে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যান্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শোলীয় ব্রাহ্মণ-বংশে অগ্রহায়ণ মাসে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তাজিষ্মরেণুর পূর্বনাম বিপ্রনারায়ণ। বিপ্রনারায়ণ স্বভাবসিদ্ধ যোগী ছিলেন। পার্থিব সংসারগামনা তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামাণ্ডাজীও বৈষ্ণবগণের বিশ্বাসমতে ভক্তাজিষ্মরেণু নারায়ণের বনমালার অবতার। বৈষ্ণবস্ত্রী নামক বনমালা নারায়ণের গলদেশে শোভা করে।

শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের আটপ্রকার মাল্যসেবার মানস

একদা বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে পরমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিবার মানস করেন। তুলসী ও পুষ্পাদি উৎপন্ন করিয়া উহা ভগবানে সমর্পণই তাঁহার একমাত্র সেবা ছিল। অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, তপস্যা, জ্ঞান এবং সত্যরূপ অষ্ট প্রকার মানস পুষ্পার্চন স্বরূপ আট প্রকার পুষ্পমালা দ্বারা তিনি বিষ্ণুর প্রীতির জন্ত চেষ্টা করিতেন।

দেবদেবী-নাম্মী এক বারনারীর ভক্তাজিষ্মরেণুর দর্শন লাভ

ভক্তাজিষ্মরেণু এবম্প্রকারে শ্রীরঙ্গনাথের সেবাপরায়ণ হইয়া নিচুলাপুরী বা উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে পুষ্পকানন নির্মাণ করিলেন। তিরুঙ্করম্বানুর নিবাসিনী অতুল্য রূপযৌবনসম্পন্ন দেবদেবী নাম্মী এক বারনারী তৎকালে চোলরাজ-প্রাসাদে যাতায়াত করিত। একদিন সেই স্ত্রীলোকটি নিজ ভগিনীর সহিত প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমন-কালে ভক্তাজিষ্মরেণুর পুষ্পতুলসী কানন সন্দর্শনপূর্বক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিল। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ভক্তাজিষ্মরেণুকে কানন মধ্যে বৃক্ষাদি সেবানিরত দেখিতে পাইল।

ভক্তাজিষ্মরেণুকে মোহিত করিবার জন্য দেবদেবী- বারবনিতার অপচেষ্টা

দেবদেবী তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটী কি পাগল ? সে একাগ্রমনে কাননজ বৃক্ষাদির পরিচর্যায় এতাদৃশ বাস্তব যে, আমাদের আকর্ষণ ইহার নিকট একরূপ ক্ষুদ্র হইল কেন ? তৎপরে সে বলিল, ভগবন্তের বাহুবল্লর প্রতি স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে। তাহাদের পরস্পর এই ভক্তের সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা হইল। পরে ভগিনী কহিল, তুমি যদি উহাকে স্বীয় রূপ-লাবণ্যে মোহিত করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে আমি তোমার ছয়মাস বিনা বেগনে পরিচর্যা করিব। দেবদেবীও প্রতিজ্ঞা করিল যে, উহাকে মোহিত করিতে না পারিলে আমি তোমার ঐরূপ ভাবে সেবা করিব। ঐরূপ কথোপকথনান্তে ভগিনীর হস্তে অলঙ্কারাদি বেশভূষা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া সাধুব চরণে আসিয়া নানা দৈন্য প্রণতি জ্ঞাপন করিল। সরলচিত্ত ভক্ত, কপটিনীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাহার বৃক্ষাদির পরিচর্যা ও সকল বিষয়ে সাহায্যে প্রতিশ্রুতি হওয়ায় তিনিও তাঁহার কথায় সন্মত হইলেন।

ভক্তাজিষ্মরেণুর বারবনিতাকর্তৃক গুপ্তাভিনয়

কিছুদিন পরে একদিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আর্দ্রবসনা সন্দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া দেবদেবীকে গৃহে আহ্বান করিলেন। সেও সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ মনোগত অভিপ্রায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে লাগিল। সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণ দিন দিন সাধুবল হারাইতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশকৈঙ্কর্য্য ক্রমশঃ দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই পরিণত হইল। দেবদেবীও সুযোগ পাইয়া এক্ষণে বর্ষান্তে স্বল্লার্থ দেখিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। বিপ্রনারায়ণও নিজ দুর্বলতাবশে দেবীর অনুগামী হইলেন। ক্রমে দেবদেবী বিপ্রনারায়ণকে হতাদর করিতে আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে শ্রীরজনাত্মকর্তৃক তাঁহার উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি

একদা বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরজনাত্ম লক্ষ্মীসহ সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মী বিপ্রনারায়ণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাহাদের পূর্বপরিচিত দাস। কাল-

বৈষ্ণো একপ ভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় দশা লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরঙ্গনাথকে বিপ্রনারায়ণের কথা জানাইলেন এবং নিজদাসকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়ার্জ হইয়া অসুরোধ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ হাস্তমুখে লক্ষ্মীর অভিলাষপূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভক্ত-রক্ষার কৌশলস্বরূপ দেবদেবীকে শ্রীরঙ্গনাথের স্বর্ণপাত্র-দান

ভক্তবৎসল ভগবান্ রঙ্গনাথ নিজ ব্যবহার্য্য একটি স্বর্ণপাত্র লইয়া দেবদেবীর দ্বারদেশে ভূতাবেশে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে পদাঘাত দ্বারা দেবদেবীর দ্বারোদঘাটনে চেষ্টা করিলে দেবদেবী বাহির হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঙ্গনাথ কহিলেন, আমি আমার প্রভু বিপ্রনারায়ণ কর্তৃক আদিত হইয়া তোমাকে এই স্বর্ণপাত্রটি দিবার জন্য আসিয়াছি। অনতিদূরেই তোমার জন্ম বিপ্রনারায়ণ অপেক্ষা করিতেছেন। স্বর্ণপাত্র পাইয়া বারনারী আগ্রহসহকায়ে বিপ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। শ্রীরঙ্গনাথদেবও অদর্শন হইলেন।

স্বর্ণপাত্র অপহৃত মনে করিয়া সেবকগণের রাজদ্বারে অভিযোগ-হেতু বিপ্রনারায়ণের কারাদণ্ড

প্রাতঃকালে রঙ্গনাথের পূজকগণ স্বর্ণপাত্র না পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাপন করিল। নিচুলাপুরাধিপতিও একথা জ্ঞানিতে পারিলেন। দেবদেবীর জনৈক দাসী, মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট বিপ্রনারায়ণ-কর্তৃক ঐ প্রকার স্বর্ণপাত্র প্রদানের কথা গল্পচ্ছলে বলায়, রাজাদেশবশে তাঁহারা উভয়েই রাজদ্বারে নীত হইলেন। রাজা দেবদেবীর অর্থদণ্ড করিলেন এবং বিপ্রনারায়ণের নিকট দেবদেবীর কথিত ঘটনাবলী অমিল হওয়ায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

ভক্তের কারা-ক্লেশ দর্শনে শ্রীলক্ষ্মীর পুনরাবেদন

লক্ষ্মী ভক্তের এই দুর্দশা রঙ্গনাথকে পুনরায় করুণাপরবশ হইবার প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা প্রাতে উঠিয়া বহু সমাদরে বিপ্রনারায়ণকে উন্মুক্ত করিলেন এবং দেবদেবীর অর্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

অমৃতপ্ত বিপ্রনারায়ণের অপরাধ মোচনের জন্য স্বয়ং

ভক্তাজিযুরেণু-নাম গ্রহণ.

বিপ্রনারায়ণ স্বীয় প্রাক্তন কর্মবিপাক এবং পরমকারুণিক প্রভু রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পাদোদক গ্রহণ এবং পদধূলিদ্বারা স্বীয় শিরোদেশ পবিত্র করিলেন। তদবধি নিজ-অভিলাষ-মতে তাঁহার নাম ভক্তাজিযুরেণু বা তামিল ভাষায় তোণ্ডীরডিপ্পডি নামে প্রচার করিলেন। তিনি সাধারণ লোকের চায় বহু তীর্থস্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প মনোমধ্যে স্থান দিলেন না। কেবল শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি “তিরুমলই”-নামক শ্রীরঙ্গরাজের স্তব-গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদেবীর চিত্তশোধন ও শ্রীরঙ্গনাথের সেবালাভ

দেবদেবীও এই ঘটনায় বিশেষ শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহাতেও সাধুত্ব দেখা দিল। তিনি নিজবিত্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গনাথে অর্পণ করিয়া সেবা-কার্যে ব্রতী হইলেন।

বিপ্রনারায়ণের রচিত গ্রন্থদ্বয়

ভক্তাজিযুরেণু ‘তিরুমলই’ নামক গ্রন্থ ব্যতীত আর একখানি তত্ত্ব-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম—‘তিরুপপল্লিয়েডুচ্চি’ অর্থাৎ পরমাত্মার জাগরণ। উভয় গ্রন্থই তামিল-কবিতাপূর্ণ। তিরুমলই অর্থাৎ ধন্য মালিকা। কথিত আছে, ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠগামী হন।

চতুর্থ প্রাকার নির্মাতা তিরুমঙ্গলই ভক্তাজিযুরেণুর কৃপাপাত্র

তিরুমঙ্গলই নামক দাতা ভক্ত যে-কালে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার নির্মাণ করেন, তখন তিনি ভক্তাজিযুরেণুর তুলসী-কানন রক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জগু তিনি তিরুমঙ্গলইকে বিশেষ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা ‘গুরু-পরম্পরায়’ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

(ক্রমশঃ)

— শ্রীল প্রভুপাদ

(৬) লৌল্য

লৌল্য অর্থাৎ চাক্ষুর্যের প্রকার-ভেদ

‘লৌল্য’-শব্দের অর্থ—চাক্ষুর্য, লোভ ও বাসনা। চাক্ষুর্য দুই প্রকার অর্থাৎ চিত্ত-চাক্ষুর্য ও বুদ্ধি-চাক্ষুর্য। ইন্দ্রিয়ানুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত মন যে-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাতেই চিত্তে রাগ বা ঘেঘ জন্মে। অতএব চিত্ত-চাক্ষুর্য দুই প্রকার অর্থাৎ রাগানুগত চিত্ত-চাক্ষুর্য ও ঘেঘানুগত চিত্ত-চাক্ষুর্য। শ্রীগীতায়—

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ (গীঃ ২।৬৭)

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-দিগের মধ্যে যে-ইন্দ্রিয়ের অনুবর্তী হইয়া অযুক্ত-ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

রাগ-ঘেঘাত্মক চিত্ত-চাক্ষুর্য ভক্তির দ্বারা জিত

আবার বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়স্যোদ্রিয়স্যার্থে রাগ-ঘেঘৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োর্ম বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপস্থিনৌ ॥ (গীঃ ৩।৩৪)

ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ-ঘেঘ ব্যবস্থিত হয়। সেই রাগ-ঘেঘের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যেহেতু রাগ-ঘেঘই শত্রুদ্বয়। চিত্ত-চাক্ষুর্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করিতে হইলে মহাদেবী হরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

কর্মা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ভক্তিদ্বারা নিয়মন কর্তব্য

ভক্তির আজ্ঞা এই যে, বিষয়ই যখন চিত্তের চাক্ষুর্যের হেতু এবং চিত্ত-চাক্ষুর্যই যখন ভক্তি-সাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্ভাগ-রূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভুক্তি-তত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, পায়ু ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়। ইহাদের যত বিষয় আছে, সে-সমুদায়ে ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করিলে চিত্ত ভগবানে নিশ্চল হয়; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়। সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিলে ভক্তিরই অনুশীলন হয়। সেই সেই বিষয়ে যে-যে অংশ ভগবদ্-ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে, তাহাতে ঘেঘকে এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলতা থাকে,

তাহাতে রাগকে নিয়মিত করাই কর্তব্য। কিন্তু যত দিন বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর না হয়, তত দিন কি করিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি করা যাইবে? অতএব বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর হইলে বুদ্ধি-বলে চিত্ত তদ্বিষয়গত রাগ-দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারিবে।

বুদ্ধি দ্বিবিধ—(১) ব্যবসায়াত্মিকা, (২) বহুশাখা

মনের সদসদ্বিষয়িনী বৃত্তিকে 'বুদ্ধি' বলে। সেই বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'বহুশাখা-সমন্বিতা' বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক প্রকার; বহুশাখা-বুদ্ধি অনন্ত প্রকার। যথা, গীতায়—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈহ কুরুনন্দন!

বহুশাখা হনন্তান্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ (গী: ২।৪১)

ব্যবসায়ীদিগের বহুশাখা বুদ্ধি হইতে কাম, স্বর্গ-গমনাভিলাষ ও ভোগৈশ্বর্য্য-গতিদায়ক ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্য এবং চিহ্নগতের অনঙ্গীকার— এই সকল উৎপাতের উদয় হয়। সুতরাং—

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিবীধতে ॥ (গী: ২।৪৪)

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের বহুশাখাময়ী বুদ্ধিদ্বারা তাহাদের চিত্ত অপহৃত থাকে। কান্ধে-কাজেই তাহাদের এক আত্মতত্ত্বে সমাধির উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি নিয়মিত হয় না। সমাধিতে তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চলা, তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী।

স্থিত-প্রজ্ঞ ও স্থিত-ধীর লক্ষণ

প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্ সর্জনান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মনোবাত্মনা তুক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেহুদ্বিগমনাঃ সুখেহু বিগতস্পৃহাঃ।

বীত-রাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুক্তিচ্যতে ॥ (গী: ২।৫৫-৫৬)

হে পার্থ! যখন যখন আত্মাতেই আত্মদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোগত কামকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যখন দুঃখে অদ্বিগমন ও সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ-বজ্জিত হ'ন, তখন তিনি স্থিতধী যুনি হইতে পারেন। এই উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সহিবার যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই শ্রীগীতার এই দুই শ্লোকে স্পষ্টীভূত।

প্রাকৃত-বুদ্ধি মনের, অপ্রাকৃত বুদ্ধি আত্মার

এখন জ্ঞাতব্য এই যে,—বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে-বৃত্তি সদসদ্ বিচার করে তাহা একপ্রকার বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত-বুদ্ধি এবং আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসদ্ বিচার করে, সে-বুদ্ধি অন্য-প্রকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত। এইজন্য গীতায়—

ইন্দ্রিয়ানি পরান্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেয়ঃ পরন্তু সঃ ॥ (গীঃ ৩।৪২)

জড়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়-সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; কেন-না মনের চিত্তবৃত্তির বলে ইন্দ্রিয়-সকল কৰ্ম্ম করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি আত্মগত-বৃত্তি, অতএব মনের নিয়ন্তা—প্রভু ; কোন জড়াহঙ্কারের অধীন হইয়া বুদ্ধিও বিকৃতভাবে প্রাকৃতত্ব স্বীকার করে। জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বরূপ শুদ্ধাহঙ্কারের অধীন থাকিলে বুদ্ধি সর্বদাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ। বুদ্ধি যাহার বৃত্তিমাত্র, সেই চিৎকণ জীব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চিন্ময় অহঙ্কার, ও চিত্তলে বলবতী বুদ্ধির পরাক্রম

জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ-চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস্যভিমান-রূপ চিন্ময়-অহঙ্কার উদিত হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার শুদ্ধবৃত্তি-স্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিত্তস্তর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম বাতীত অন্য কাম থাকে না এবং তিনি প্রাকৃত কামকে তুচ্ছ বলিয়া দূর করেন। এই অবস্থায় ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’ ও ‘স্থিতধী’—এই দুইটী নামে জীব পরিচিত হন। চিত্তলে বলবতী হইয়া বুদ্ধি তখন নিষ্কলা হয় এবং মনকে ও চিত্তকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে গ্রহণ করে। বুদ্ধির আক্সাক্রমে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে আনে ; ‘ইন্দ্রিয়গণের অর্থে’ অর্থাৎ বিষয়-সমূহে কৃষ্ণদাস্যাত্মকুল ভাবকে ব্যাপ্ত করে। ভক্তিপথে ইহাকেই ‘ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ’ বলে।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের উপায়

শুদ্ধ জ্ঞান-বৈরাগ্যমার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না। যথা, শ্রীগীতায়—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারাস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জ্যং রসোহিপাস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ (গীঃ ২।৫৯)

কেবল ভোগ-পরিত্যাগী দেহীর বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়-রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু বিষয়-রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্য-রসরূপ

চিদ্রস বিষয়ে মিশ্রিত করিলে সেই রস বিষয়-বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত চৈদ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ চৈদ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তের এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রক্ষা করা। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-চাঞ্চল্য, ও চিত্তচাঞ্চল্যরূপ বিষয়-লৌল্য দূর হয়।

**কর্ম-যোগ-বৈরাগ্য-জ্ঞান-দানাদি বুদ্ধি-চাঞ্চল্য বিনাশ করিয়া
ভক্তি-লাভই কর্তব্য**

বুদ্ধির চাঞ্চল্যক্রমে মতি স্থির হয় না। কখন কর্মমার্গে, কখন যোগমার্গে, কখন শুদ্ধ-বৈরাগ্য-মার্গে, কখন বা শুদ্ধ-জ্ঞানমার্গে চঞ্চলা বুদ্ধি বিচরণ করে। চঞ্চলতা ত্যাগ করাইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিতে স্থির করিবার জন্য শ্রীভাগবতে একাদশে কথিত হইয়াছে—

যং কর্মভির্ঘতপস্য জ্ঞান-বৈরাগ্যাতশ্চ যং ।

যোগেন দান-ধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতবৈরপি ॥

সর্বং মদুক্তিযোগেন মদুক্তো লভতেইক্ষমা ।

স্বর্গালবর্গং মদ্ধাগ কথঞ্চিদু যদি বাঞ্জতি ॥

ন কিঞ্চিং সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।

বাঞ্জন্তাপি যয়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৪)

কামা, নিত্য ও নৈমিত্তিক-রূপ কর্মদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গ-যোগ, কচ্ছত্রত, প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা যাহা লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-বৈরাগ্য-চেষ্টাদ্বারা যাহার উদয় হয়, কর্ম-জ্ঞানাদি-যোগদ্বারা যে-ফল নির্দিষ্ট আছে, দান-ধর্ম ও অন্য যতকিছু শুভকর্মদ্বারা যাহা কিছু আশা করা যায়—সে-সমস্তই আমার ভক্ত আমার বিদ্বদ্ব-ভক্তিযোগ দ্বারা অতি সহজে লাভ করেন। কর্ম-দ্বারা যে স্বর্গাদি-লাভ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা যে অপবর্গ-প্রাপ্তি এবং কর্ম-মার্গীয় শুদ্ধার্চন-ব্রতদ্বারা যে উচ্চ-লোকাदिতে গমন হয়, সে-সমুদায় তত্ত্ব উপায়দ্বারা অতি কষ্টে ঘটিয়া থাকে ; মদুক্তগণ ইচ্ছা করিলে সেইসকল ফল অতিশয় সুখের সহিত স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা সাধু, ধীর ও আমার একান্ত ভক্ত, তাহারা মদত্ত কৈবল্য অপুনর্ভবও বাঞ্জা করেন না। আমার সেবা-সুখই তাহারা স্বভাবতঃ ভালবাসেন।

এই সমস্ত বিচার করতঃ ভক্তিসাধক পুরুষ চাঞ্চল্যরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রকাশ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

‘মা’ ‘মা’ বলিয়া কৃষ্ণ দোড়াইয়া আসিল ।
যশোদার কোলে উঠি’ গলা জড়াইল ॥
যত কঁাদে কৃষ্ণচন্দ্র, তত কঁাদে মাতা ।
গঙ্গার ধারা যেন বহে যায় সেথা ॥
আর কঁাদে নন্দরাজ কৃষ্ণে বুকে ধরি’ ।
কঁাদে যত ব্রজবাসী কানুধনে হেরি’ ॥
নাচে গাহে হাসে কঁাদে ব্রজবাসীগণ ।
যত সব ব্রজজন উল্লাসে মগন ॥
যশোদামাতার প্রতি হেরি’ কৃষ্ণ-প্ৰীতি ।
হৃৎখে ম্লান হয়ে রহে পদ্মা ও দেবকী ॥
অন্তর্যামী কৃষ্ণচন্দ্র বুঝি তাদের মন ।
একে একে তাদিগেরে দিল পরশন ॥
দেবকীর অঙ্কে যবে উঠিল কেশব ।
মাতৃ-স্নেহে দেবকীর হৃদি বিগলিত ॥
নারদ কহিল তব,—‘এ রীতি কেমন ?
এক পুত্রের দুই মাতা হয় কি কখনো ?’
কৃষ্ণ কোন্ জননীর পুত্র সত্য হয় ।
কে তা’র আসল মাতা ল’ব পরিচয় ॥
দুইমাতা-ক্রোড়ে আজ গোপাল উঠিল ।
গোপাল-পরশে তা’রা আনন্দে মজিল ॥
তবু যে মাতার স্তনে দুঃখ নাহি করে ।
বাৎসল্যময়ী মাতা কে বলিবে তারে ?
যে মাতার স্তনে দুঃখ করিল আজিকে ।
আসল মাতা বলি’ তা’রে গাহে সর্বলোকে ॥
ঋষির বচনে সবে বিষয়-পুলকে ।
প্রকৃত জননী বলি’ বুঝে যশোদাকে ॥

যশোদা পাইল যেই কৃষ্ণ-পরশন ।
 তবে তাঁ'র স্তন দুহু তিতিল বসন ॥
 বাসুদেব কৃষ্ণ উদি' কংস-কারাগারে ।
 সেই রাत्रে নীত হয় নন্দ-রাজ-ঘরে ॥
 কারাগারে কৃষ্ণচন্দ্র ছিল যতক্ষণ ।
 দেবকীর স্তন-দুহু পিয়ে নাই তখন ॥
 নন্দালয়ে কৃষ্ণ বসি' যশোদার ক্রোড়ে ।
 যশোদার স্তন দুহু পিয়ে প্রাণ ভরে ॥
 ব্রজে বাসুদেব হৈল নন্দের নন্দন ।
 তাঁরে-পেয়ে প্রেমানন্দে মাতে ব্রজজন ॥
 পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি ব্রজ-প্রাণে হয় ।
 গোপী-আনুগত্য বিনা কৃষ্ণ লভা নয় ॥
 ব্রজধামে কৃষ্ণ সর্ব সাধুর্ষা প্রকাশিল ।
 কৈশোরাবধি লীলা করিল সফল ॥”

প্রভাস-ব্রজের কথা অতি চমৎকার ।
 বক্তা ও শ্রোতার পায় আনন্দ অপার ॥
 নিভৃত গৃহেতে বসি' বোহিণী জননী ।
 গাহিতেছে এইভাবে ব্রজের কাহিনী ॥
 গৃহ-দ্বারে কৃষ্ণ-বল্লাই আসি' বহুক্ষণ ।
 ঐ সকল ব্রজ-কথা করয়ে শ্রবণ ॥
 মাতা-কণ্ঠে ব্রজলীলা শুনিতে শুনিতে ।
 সুভদ্রা সহিত তাঁ'রা মজে মহাভাবে ॥
 হেনকালে নারদ ভরা হয়ে উপনীত ।
 তাঁদের প্রেম-মূর্তি দেখি' হইলা বিস্মিত ॥
 কৃষ্ণ-সুভদ্রা-বলরাম মূর্তি অপরূপ ।
 হস্ত-পদ সঙ্কুচিত, আঁখি বিস্ফারিত ॥

হেন প্রেমময় মূর্তি নেহারি নারদ ।
 প্রণমি তাঁদের পদে করে বহু স্তব ॥
 নারদ-ভক্তিতে তাঁরা হৈয়া বড় প্রীত ।
 পূর্বের মতন পুনঃ ধরে সহজ রূপ ॥
 প্রার্থনা করিল ঋষি তাঁদের চরণে ।
 ‘হেন মূর্তি পূর্বে কভু দেখিনি নয়নে ॥
 লবণ সমুদ্রতীরে নীলাচল ধাম ।
 হেন মূর্তি প্রকাশের অতি রম্যস্থান ॥
 হেন প্রেমময় মূর্তি যা’তে লোকে হেরে ।
 তাই প্রকাশিত হইও পুনঃ সিন্ধুতীরে ॥’
 কৃষ্ণ-সুভদ্রা-বলাই—এ’ প্রার্থনা শুনে ।
 ‘তথাস্তু’ বলিয়া বর দিলা তৎক্ষণে ॥
 নীলাচলে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম ।
 বিগ্রহরূপে শ্রীমন্দিরে করে অবস্থান ॥
 উৎকলরাজ ইন্দ্রজ্যম্ব স্বপ্নাদেশ লভি’ ।
 শ্রীবিগ্রহত্রয় স্থাপে সেবা-পূজা লাগি’ ॥
 ‘শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র’ স্বয়ং দারুবন্ধরূপে ।
 ‘জগন্নাথ’ নামে আজো নীলাচলে রাজে ॥
 যে-স্থানে দারুবন্ধ আত্ম প্রকাশিল ।
 গুণ্ডিচা মন্দির বলি’ তাহা খ্যাত হইল ॥
 রথযাত্রার প্রবর্তন হয় সেইকালে ।
 আজিও শ্রীরথযাত্রা হয় নীলাচলে ॥
 গুণ্ডিচা মন্দিরেরই সুন্দরাচল নাম ।
 তাহাই মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন ধাম ॥
 নীলাচল ধাম হৈল দ্বারকা-স্বরূপ ।
 ঐশ্বর্য্য লীলাপীঠ নামেও তাহা খ্যাত ॥
 রথে চড়ি’ জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম ।
 দ্বারকা ত্যজিয়া ধায় বৃন্দাবন ধাম ॥

বৃন্দাবনে গোপীসাথে বিহার করিবারে ।
 রথো 'পড়ি' ধায় কৃষ্ণ রঞ্জিয়া লক্ষ্মীরে ॥
 সপ্তাহকাল রহি' মাধুর্য্যালীলা-পীঠে ।
 ফিরে আসে পুনরায় ঐশ্বর্য্য লীলাপীঠে ॥
 এইভাবে রথযাত্রা হয় প্রকাশিত ।
 রথাগ্রে ভক্তেরা করে নৃত্য গীত ॥
 রথে শ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম ।
 অধিকার মহাভাবে রহে বিচরমান ॥
 পুনর্জন্ম এড়াইতে কন্মী জ্ঞানীগণে ।
 সমবেত হয় রথ-যাত্রা-দরশনে ॥
 সকল কামনা ত্যজি' শুদ্ধভক্তগণ ।
 কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ্যে রথাগ্রে করে নৃত্য-কীর্তন ॥
 সর্বকাল ঐ মূর্তি রাজে পুরীধামে ।
 যুগে যুগে সেবা-পূজা করে ভক্তগণে ॥
 'জগন্নাথ-প্রকাশ'-কথা বড় সুমধুর ।
 শুনিলে তা' হৃদি হয় প্রেমে ভরপুর ॥
 মাঝে সুভদ্রা, দুইপার্শ্বে কৃষ্ণ-বলরাম ।
 ঠিকরি পড়িছে তাঁদের রূপ-অভিরাম ॥
 সর্বকালে রাজে তাঁরা নীলাচলধামে ।
 প্রলয়কালেও কিছু নাহি হয় সে'-স্থানে ॥
 তাঁদের মাহাত্ম্য হেন বড়ই বিচিত্র ।
 তাঁদের অবস্থানে পুত নীলাচলক্ষেত্র ॥
 নিত্য সেব্যরূপে তাঁরা রাজি' এ' ভুবনে ।
 পালিছে সেবকগণে সদা স্নেহ-দানে ॥
 বন্দি' তাঁদের চরণ, গাহি' লীলা-গুণ ।
 তাঁদের পদ-সেবা যাচে এই অধম ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীনাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং

শ্রীনামকীর্তনের নিত্যত্ব *

বৈষ্ণবসকল শ্রীনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের অনেকে শ্রীনামকে মন্ত্র বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে নাম ও মন্ত্র এক নহে।

‘কীর্তনীয়ঃ সদা চরিঃ’—কি বক্ত, কি মুক্ত সকল অবস্থায় শ্রীহরিরই কীর্তন করিতে হয়। নাম এবং মন্ত্রের দ্বারা শ্রীহরির কীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হরির কীর্তন,—কীর্তন ও জপের দ্বারা করা হয়। কীর্তনে নাম এবং জপমন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

শ্রীনাম প্রণবযুক্ত হইলে এবং নমঃ শব্দাদির দ্বারা অঙ্গীকৃত হইলে ‘মন্ত্র’ নামে অভিহিত হয়। ‘নমঃ’ শব্দের অর্থ—স্বল লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অঙ্কুর পরিভাষা। ইহাকেই আত্মসমর্পণ বলে। মন্ত্রে ‘নমঃ’ শব্দ বা আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্য থাকায় চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ হইয়াছে। নামে সম্বোধন বিভক্তি আছে। ‘ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ’—এইটি মন্ত্র, এবং হরে কৃষ্ণ.....রাম রাম হরে হরে। এইটি নাম।

মন্ত্র মনে মনে জপা ও নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনীয়। শ্রীমন্ত জপ করিয়া সাধক মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম কীর্তন করিয়া সাধক নামমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে আহ্বান করেন। খোল-করতাল লইয়া অথবা তুলসীর মালিকায় কীর্তন করা হয়।

‘নাম-নামিনোহভিল্লভাৎ’—শ্রীভগবান্ নাম-মূর্ত্তি—“যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিতে ফিরে আপনি শ্রীহরি।” পুনঃ “পরিচর্যা ভগবতো যাবতাঃ পূর্বসেবিতাঃ। তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব শযুক্তানামমূর্ত্তয়ে।” (ভাঃ ৪।৭।৫৮) শ্রীভগবান্ মন্ত্র-মূর্ত্তিও। নাম ও মন্ত্রকে ভগবানের মূর্ত্তি বা বিগ্রহ বলিয়া না জানিলে নাম ও মন্ত্রকে ‘শব্দ-সামান্যবুদ্ধি’ করিয়া মহা অপরাধের অনুষ্ঠান করা হয়।

* শ্রীল নিয়ানন্দ দেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভু অসমীয়া ভাষায় সম্পাদিত ‘কীর্তন’ পত্রিকায় ১৩৪০ সালের ২য় বর্ষ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

শ্রীনামকীর্তনের নিতাত্ত্ব—পূর্বোন্নিখিত কি বন্ধ, কি মুক্ত, সকল অবস্থাতেই শ্রীনাম কীর্তন করিতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীনাম মুক্তিকুলের উপাস্য। বৈকুণ্ঠ কীর্তন-বিলাসের স্থান। মুক্তসকল প্রপঞ্চে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত এই কীর্তন প্রকাশ করেন। শ্রীনাম-কীর্তন মুক্তি-লাভের একটি উপায়মাত্র না হইয়া এষ্টটি উপেয়ও। বদ্ধজীব শ্রীনাম-কীর্তনের সঙ্গ করিতে করিতে ভক্তনের পরিপক্ক অবস্থায় উপনীত হইলে শ্রীনামের মুক্তি-দর্শন করিয়া ও সেবকের ভাব লইয়া বিত্ত্বভাবে শ্রীনাম প্রভুর কীর্তন করেন।

কলিকালে শ্রীনামকীর্তনই একমাত্র সাধনরূপে প্রচারিত হইলেও ইহার বিভ্রাট কলিকালেই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। শঙ্কর-বৈদান্তিকসকলের মায়াবাদ আসুরিক ভাবাপন্ন। উহা মানুষের চিত্তকে এই অধিকার করিল যে, শ্রীনামকীর্তনের উপেয়ত্ব বা নিতাত্ত্ব ধ্বংস হইল। মায়ার 'তুলি' চোখে পরিয়া তাহারা মায়া ছাড়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাহাদের ভগবান্ মায়িক, ভগবদ্বিগ্রহ মায়িক, জীবভাব মায়িক,—সব মায়িক; যাহা দেখিতে পাই, যাহা শুনিতে পাঠি, যাহা চিত্তা করি—সবই মায়িক। আমি মায়াজালে আবদ্ধ। বদ্ধভাব সত্য, কিন্তু তুংখে প্রলীড়িত হইয়াও যদি সৌভাগ্য-গুণে মায়ামুক্ত হই তখন আমি আর 'আমি' থাকিব না। আমি কি হইয়া যাই তাহাও বলিতে পারি না; ইহাই নির্বিশেষ জ্ঞান—মায়াবাদী বা বিবর্তবাদের লক্ষ্য। তাহারা নাম কীর্তন করেন শ্রীনাম তাগের প্রয়াসে,—শ্রীনামকে গ্রহণের ভুল নয়।

আজ হাটে-বাজারে সবাই এট বিচারের পরিপন্থী এবং তাহার জন্ত কেহই নামে ফল না পাঠিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মানা ধরণের ইতর সাধনের আশ্রয় লইয়াছেন। “নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন।” স্তবরাং অপরাধী ব্যক্তি কি প্রকারে নামের ফল—‘কৃষ্ণ-ভক্তি’ লাভ করিতে পারে? অপরাধীর কীর্তনের উদ্দেশ্যই হইল হৈতভাব ধ্বংস করা। হৈত বা সেবক-সেবাভাব দূর হইলে ভক্তি আর থাকে কোথায়?

এই প্রকার অপরাধময় কীর্তনের স্বরূপ প্রকাশ করিতে এখানে দুই একটি কীর্তনের উল্লেখ করা হইল—

রূপ-সাগরে ডুবি দিযেছি

অরূপ রতন আশা করি।

* * * *

অমর হ'য়ে রব মরি ॥

প্রাণের বীণা নিয়ে যাব

সেই অতলের সভা মাঝে ।

চিরদিনের সুরটি বেঁধে

শেষ গানে তা'র কান্না কেঁদে,

নীরব যিনি তাহার পায়ে

নীরব বীণা দিব ধরি ॥ (গীতাজলী)

“কলিকালে শরণ-কীর্তনরূপা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ।” ভক্তিধর্ম নাম-ধর্ম ।
ঈশ্বরে কায়মনোবাক্যে শরণ, ভজন এবং ঈশ্বরের গুণানুশ্রবণ, কীর্তন—যে
গুণ এবং নাম ঈশ্বরে মায়ায় দ্বারাষ্ট মানুষী তহু ধারণ করিয়া তাহার ভক্ত-
সকলকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ করিয়াছেন ।’ (বাঁহী ২১শ বর্ষ,
৬ষ্ঠ সংখ্যা—তত্ত্বকথা)

‘নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ।’—অপরাধ-শূন্য হইয়া কীর্তন
করিতে জীবকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে সংকীর্তন শিরোমণি প্রেমাবতার
শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

নাম বিগ্রহ-স্বরূপ তিন একরূপ ।

তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান্ রূপহীনবস্তু নয় । তাঁহার অবতারও মায়িক নয় । ‘কৃষ্ণস্ত
ভগবান্ স্বয়ং’, ‘জ্যোতিরাত্মকরে হৃদি দীভুং শ্যামসুন্দরং’ অবতারী কৃষ্ণতত্ত্বকে
অথবা তাহার বরাহ-নৃসিংহাদি অংশ-কলা অবতার সকলকে মায়িক তত্ত্ব
ধরিয়া লইয়া রূপবজ্রিত কোন তত্ত্বকে ঈশ্বরের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করতঃ আদি
কবি ব্রহ্মার উপদেশটাকে ‘নীরব’ বলিয়া ধরিয়া লইলে, আমার বীণাও
একদিন নীরব হইবে এবং আগিও একদিন নীরব হইব সত্য । নিত্য বিশেষ
সম্পন্ন ভগবান্ এবং জীবের বিশেষত্ব ধ্বংসকারী সাযুজ্য বা নির্বাক মুক্তি
অবস্থান শাস্ত্রে আছে কিনা বলতে পারি না । থাকলে, তদ্রূপ-অবস্থাকে
(বর্তমান সাযুজ্য ঘোর বিরোধী) বেজ বরুয়ায়, “যুকৃত সকলে গায়ে রাম নাম
বসত অধিক জানি ।”—এই সিদ্ধান্তের সহিত কিরূপে সামঞ্জস্য করিতে
চাহিয়াছেন বলিতে পারি না । যুক্ত যদি নিজ বিশেষত্ব বা সেবক ভাব না
হারিয়ে কৃষ্ণ কীর্তন করিতে পারে তাহা হইলে কৃষ্ণ কেন নিজ বিশেষত্ব বা
সেবাভাব বজায় রাখিয়া তাহা গুনিতে পারে না, তাহা আমাকে বুঝিয়ে দিবে
কি ? অবশ্য তাহা শ্রীধরদেবকে ছাড়িয়া শুদ্ধরূপে সাযুজ্যবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসের (১) স্থানক হইয়া কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিলে দাকার হইতে নিরাকার পর্য্যন্ত যাওয়ার আগ্রহ রাজ্য রাখিতে হইলে, তাহার এইরূপ উক্তির সামঞ্জস্য, শাস্ত্র-বাক্য সহিত না হইলেও বিষ্ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীগণের বাক্যের সহিত অবস্থিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নারদ সর্বদা বীণা বাজিষে হরিনাম গাইয়া বেড়ান। সাধু-গুরু-শাস্ত্রমুখে আমি ইচ্ছাই শুনি। কেহ যদি নারদের আদর্শরূপে চলে না, শাস্ত্রের বৈদান্তিকের আদর্শ লইয়া বীণা বা বাঁজী (বাঁশী) নীরব করিয়া, অমর হইয়াও মরিয়া থাকিতে চায়, সেই ধরনের কীর্তনকে সর্পে ধরা বেড়ের কীর্তনের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। সর্পে ধরা বেড় যতক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার করিবে ততক্ষণ সাপে তাহাকে গিলিয়া ফেলে নাই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু গিলিয়া ফেলিলে তাহার চীৎকার আর শোনা যায় না। তদ্রূপ হরিকীর্তন করা বা করার প্রবৃত্তি বন্ধ হয় তাহার,—যাহাকে মারাকুপ-সর্প সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে।

‘কৃষ্ণ বতিস্মুখ বাঞ্ছে ভোগ-সুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥’

কীর্তন করার ইচ্ছা না থাকা কৃষ্ণ-বতিস্মুখ ও ভোগীর লক্ষণ। কৃষ্ণ-কীর্তনকারী ও মায়া কীর্তনকারীর মধ্যে ইচ্ছাই পার্থক্য।

প্রশ্নোত্তর ভিত্ত

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৩ পৃষ্ঠার পর)

বিপ্রগৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য সহজেই লভ্য, কারণ তদানীন্তন বিপ্রগণ অধিকাংশই সদাচার-সম্পন্ন ও ঐকান্তিক বিষ্ণুপাসক ছিলেন। ব্রজবাসী বিপ্রগণ সকলেই কৃষ্ণোপাসক; ব্রজবাসী দূরে থাকুক, পশ্চিমের বিপ্রমাত্রেই কৃষ্ণোপাসক, রামোপাসক, নারায়ণোপাসক বা নৃসিংহোপাসক অর্থাৎ কোনও না কোন বিষ্ণুমূর্তির উপাসক। পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশীয় বিপ্রগণ কেহই অমেধ্যাদি গ্রহণ করেন না। বিপ্রোত্তর জাতির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে অমেধ্যাদি গৃহীত না হইলেও কোন কোন স্থলে পলাও প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য গৃহীত হয়। কিন্তু বিপ্রগণ সর্বদা বিষ্ণুসেবা করেন বলিয়া সেই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা শঙ্খ-চক্রে-উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করেন। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন যে-সময়ে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে যবন-

সংসর্গে পশ্চিম প্রদেশের লোক সদাচার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচরিতামৃতের লেখনী হইতে স্পষ্ট জানা যায়,—

“পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার ।

তঁাহা প্রচারিল দুই ভক্তি-সদাচার ॥” (১৫: ৮: আ: ১০৮৯)

শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন অষ্ট গুণ অপেক্ষা বৈষ্ণব-ভাক্ত্যনুগৃহে বা বৈষ্ণব-দীক্ষায়-দীক্ষিত বিপ্রের গৃহে ভক্তি-সদাচারের সহিত পুণ্ডিত শ্রীহরির নৈবেদ্যের সম্ভাবনা জানিয়া এবং অতঃপর তাহার অভাব জানিয়া বিপ্রগৃহেই স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করিতেন । কিন্তু এইরূপ বিচারে বঙ্গদেশের কয়টি বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করা যাইবে, তাহা বিশেষ সমস্যার কথা । অত্যান্য সদাচারের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের বিপ্র-গৃহসমূহ অনুসন্ধান করিলে এমন কয়টি বিপ্রগৃহ পাওয়া যাইবে, যেখানে কোনও না কোনপ্রকারে অমেধ্যাদি গৃহীত না হয় ? হাঁহারা পশ্চিম দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, পশ্চিম দেশের শূদ্র জাতিও বঙ্গদেশের সর্বোচ্চ জাতি বর্ণের হস্তপুষ্ট জল গ্রহণ করিতে চান না । কারণ তাঁহাদের ধারণা যে, বঙ্গদেশীয় মাত্রেই অমেধ্যাদি ভোজন করেন । পশ্চিমদেশ-ভ্রমণকালে আমরা কোন কোন ধর্মশালায় এরূপ ভিজ্জাসিত হইয়াছি,—“আপনারা কি বঙ্গদেশীয় গোহামী ?” তাঁহাদের এরূপ প্রশ্নের কারণ কি ভিজ্জাসার ফলে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় গোহামিগণ মৎস্ত ভক্ষণ করিয়া থাকেন । আমরা উহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যাশিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন । সকল স্থানেই আমরা বলিয়াছি যে, যে-সকল ব্যক্তি বা যে-সকল বিপ্র কোন প্রকার অমেধ্য গ্রহণ করেন, তাহাদের হস্ত পুষ্ট জল পর্যন্তও আমরা কখন গ্রহণ করি না ; কিন্তু বঙ্গদেশীয় সর্বোচ্চ জাতি-প্রভৃতির খাদ্যাদি বিষয়ে অনাচার প্রত্যাশ করিয়া কিংবা পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া পশ্চিম দেশবাসীর অনেকের এরূপ বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাহারা তদ্বিরুদ্ধে কোন কথায় কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন নাই । অতএব পারমাণবিক-সদাচার-বিষয়ে স্বদৌর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের অদৈব সমাজের অধীন হইতে হইবে, ইহা কখনও আচার্যাগণের অনুমোদিত পন্থা নহে । শ্রীল গোপাল ভট্ট ও শ্রীল সনাতন প্রভুর বিচার গ্রহণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়—“অশুকাঃ শূদ্রক্লাহি বাক্ষণাঃ কলিসন্তবাঃ ।

তেষামাগম-মার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রোতবহুনা ॥”

(হ: ভ: বি: ওম বি: ৩ সংখ্যাপ্রতি দ্বিগুণ্যামলবাক্য)

—কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্যব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা —শূদ্রদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মাহুষ্ঠানমার্গে নির্মলতা নাই। পাঞ্চ-রাত্রিক বিধানই তাঁহাদের শুদ্ধি।

“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসুং রসবিধানতঃ।

তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥”

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যায়ুত তত্বসাগরবচন)

—যে রূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাতেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

পারমাণিক-বিপ্লব প্রদত্ত অল্পই পারমাণিকের গ্রহণীয়—ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র ও মহাজনের আচরণ সমর্থন করিয়া থাকে।

২। তারক-ব্রহ্মনাম ও অন্যান্য কৃষ্ণনামে কোন ভেদ নাই। নামী-কৃষ্ণ-যে রূপ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদবর্তিত অদ্বয় বস্তু, তদ্রূপ শ্রীনামও স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদবর্তিত অদ্বয় বস্তু। তবে অচিন্ত্য শক্তিশলে সেই অদ্বয় বস্তুতে ভেদ-ব্যপদেশ আছে। সেই ভেদ-প্রতীতি ভেদ-প্রতিনিধি-“বিশেষের” দ্বারা সাধিত হয়। স্বয়ংই প্রভু-কৃষ্ণ, বলিয়া শ্রীনাম—ইতরকর্ম্ম-নিরপেক্ষ। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরস্চরণের ব্যবস্থা (হঃ ভঃ বিঃ ১৭ বিঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরস্চরণ-বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই তখন পুরস্চরণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু শুদ্ধনাম অনর্থযুক্ত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না : এই জন্যই নারদাদি-ঋষিগণ এবং শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ (ভক্তিসমুৎপত্তি ২৮৩ সংখ্যায়) দেহাদি-সম্বন্ধে কদর্যশীল বিহ্বিপুচ্ছিত ব্যক্তিগণের দেহাভিনিবেশ সম্বোধ-করণার্থ নারদপঞ্চরাত্রাদি-প্রোক্ত পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমদ্ব্যাক্রান্ত ও স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

“কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-ঘোচন।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥”

(টেঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

কৃষ্ণনাম অসীম শক্তিসম্পন্ন, ভগবান্ স্বীয় সর্বশক্তি কৃষ্ণনামে নিহিত রাখিয়াছেন : আবার মন্ত্রও নামাত্মক বটে। কিন্তু ‘মন্ত্র’ ও ‘মহামন্ত্র’ শ্রীনামে যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে, তাহা আমরা শ্রীমদ্ব্যাক্রান্ত-প্রোক্ত উপরি-উক্ত বাক্য হইতেই জানিতে পারি অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রে যে সম্প্রদানবাচক এবং প্রাকৃত-

অহঙ্কার-নিষেধক 'চতুর্থী-বিত্তিক্তি' ও 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই মন্ত্র জপ-প্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে শরণাগতি-প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন ; তখন মুক্তকুলের উপাস্যমান স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধনাম সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে সেই সমর্পিতাত্মা অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ তিহ্বায় স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন । তিনি তখন নাম-প্রভুর কৃপায় নামী-কর্মের চরণ-কল্পরক্ষ হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন । নাম স্বয়ংই পরিপূর্ণশক্তিসম্পন্ন সুতরাং নামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরস্চরণের অপেক্ষা করে না ; তবে অনর্থযুক্ত জীব যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রের উচ্চারণাদির মধ্যে যে-সমস্ত বাবধান থাকে, সেই সকল বাবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরস্চরণের ব্যবস্থা । পুরস্চরণাদি অনুষ্ঠান 'ফলদায়ক' বা 'বীৰ্য্যদায়ক' প্রভৃতি বাক্য সাধকনিষ্ঠ অর্থাৎ উহা সাধক ও মন্ত্র-স্বরূপের মধ্যে যে বাবধান, তাহা দূর করিয়া সাধককে মন্ত্রের দ্বারা নামের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন ; এই জন্যই পুরস্চরণসম্পন্ন মন্ত্র 'ফলদায়ক' বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন ।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রভু কৃষ্ণ-

* পুরস্চরণের প্রকার বহুবিধ । মন্ত্রজপাদি স্তম্ভভাবে হইবার জন্যই পুরস্চরণের ব্যবস্থা । গুরু-সেবাই পুরস্চরণ ; কেবলমাত্র গুরু-প্রসাদের দ্বারাই পুরস্চরণ সিদ্ধ হয়, যথা—

‘অথবা দেবতারূপং গুরুং ধাত্বা শ্রতোষয়েৎ ।

তস্য ছায়াভূগামী শ্রাদ্ধজ্যুস্তেন চেষ্টসে ॥

গুরুমূলমিদং সর্বং তস্মান্নিতাং গুরুং ভজেৎ ।

পুরস্চরণহীনোহপি মন্ত্রী সিদ্ধিরসংশয়ঃ ॥

যথা সিদ্ধরসম্পর্শাত্মা ভবতি কাঞ্চনম ।

সন্নিধানাদ্গুরোরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥”

(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০)

অর্থাৎ পুরস্চরণের প্রকারান্তর বলিতেছেন,— গুরুদেবকে কৃষ্ণাভিন্নদেবতা জানে চিত্তনপূর্বক তাঁহার স্তুতি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়াভূগামী হইয়া অবস্থান করিবে । পুরস্চরণাদি যাবতীয় কৃত্যই গুরুমূলক ; সুতরাং নিতা শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে । পুরস্চরণাদি-হীন হইলেও গুরুসেবাতৎপর মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই । যেকণ সিদ্ধরসসম্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন ।

নামের পুরস্চরণ করান নাই, পরন্তু কৃষ্ণমন্ত্রে পুরস্চরণ করাইয়াছেন অর্থাৎ অগ্নি-নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ইত্যেব জীবনশিক্ষার্থ নীচসঙ্গী, নীচজাতি, বিষয়-মগ্ন অনর্থযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরস্চরণাদি দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণে আত্মসমর্পণই মন্ত্রসিদ্ধি—ইহা জানাইয়াছেন। ‘কৃষ্ণ নামে’ স্থানে ‘কৃষ্ণমন্ত্রে’—এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। ‘কৃষ্ণমন্ত্রে’—এইরূপ বস্তুস্তুপদ প্রয়োগ না থাকিয়া ‘কৃষ্ণমন্ত্রে’—এই সমুদায়পদ প্রয়োগ থাকায় কৃষ্ণমন্ত্রে শক্তিবিধির কথা না বুঝাইয়া বাক্যটির সাধকনিষ্ঠতাই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছে।

৩। শ্রীরাধিকা নিখিল শক্তির অংশিনী। তিনি সর্বরাধ্যা—ইহা সর্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই সর্বশাস্ত্রশ্রীশ্রুতপা, আশ্রয়-শিরোমণি মহালক্ষ্মীর পাদ-পদ্মসেবা তাঁহার কাঙ্ক্ষাহরুপা সর্ব-সমীচণের মনোবৃত্তি সন্দেহ নাই। শ্রীতুলসীদেবী সর্বকান্তাশিরোমণি অংশিনী শ্রীরাধিকার অংশরূপা; শ্রীবৃন্দা-দেবী নিরন্তর শ্রীরাধার পাদপদ্মসেবাই বাঞ্ছা করেন, তাঁহার অন্য কোন দ্বিতীয় অভিলাষ নাই। কিন্তু শ্রীতুলসীদেবী আমাদের গুরুরূপা—আমাদেরও পরমরাধ্যা। যেমন আমাদের পরমগুরুদেবের চরণসেবা আমাদের গুরুদেব বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, আমাদের পরমগুরুদেবের চরণ-সেবাই তাঁহার মনো-হুঁচুই, আমাদের গুরুদেব আমাদের পরম গুরুদেবকে হতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে পারেন, তাঁহার চরণের শিরে ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আমি গুরুদেবের শিষ্যত্রে ‘গুরুদেবের মনোহুঁচুই পূরণ করিব’ বলিয়া আমার ‘গুরুদেবকে ঘাড়ে ধরিয়া যদি তাঁহার গুরুদেবের চরণে নত করাইতে যাই কিম্বা আমার পরমগুরুদেবের মস্তকে তাহা মূর্ছন করিতে যাই, তাহা হইলে ঐরূপ আচরণ দ্বারা আমার গুরুদেবের মনোহুঁচুই-পূর্তিরূপা সেবা করা দূরে থাকুক, গুরুর চরণে ভীষণ অপরাধ করা হইল; গুরুকে ‘গুরু’ জ্ঞান না করিয়া ‘শিষ্য’-স্থানীয় অসিদ্ধ, মর্ত্যজীববিশেষ জ্ঞান করা হইল অর্থাৎ আমার গুরুদেব তাঁহার গুরুর (আমার পরমগুরুর) সেবায় সতত নিযুক্ত নছেন, সতত তাঁহার চরণে প্রণত নছেন, আমি তাঁহাকে আমার শিষ্যের ন্যায় তাঁহার গুরুর চরণে ভক্তি শিক্ষা দিতে পারি, কাণে ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার গুরুর চরণে প্রণত করাইতে পারি, তাঁহাকে আমি সেবা শিখাইতে পারি—এইরূপ দুর্বুদ্ধি ও দুরাচার প্রাকৃত সহজিয়াগণে বিদ্যমান থাকিলেও শুদ্ধভক্ত-গণের নিকট কখনও আদৃত হইতে পারে না, আর আমার শ্রীগুরুদেবেরও ইহাতে মনোহুঁচুইপূর্তি হয় না, কারণ শ্রীগুরুদেব মর্যাদা-লজ্জণ সহ করেন

না ; যেহেতু তিনি লোক-শিক্ষক আচার্য্য । এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে, আমার গুরুদেব তাঁহার শ্রীগুরুদেবকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম, সেবা-শ্রদ্ধা করিতে পারেন; কিন্তু আমি আমার গুরুকে তাঁহার গুরু-সেবার জন্য উপদেশ বা শিক্ষা দিতে পারি না । আমার গুরুদেবকে তাঁহার গুরুদেবের চরণে স্থাপন করিতে পারি না, কারণ ঐক্লপ দুর্লভতার মধ্যে গুরুতে মর্ত্য-বুদ্ধিরূপ অপরায় নিহিত থাকে । আমার গুরু তাঁহার গুরুর চরণে নিত্যকাল অবস্থিত নহেন—তাঁহার চরণ হইতে বদ্ধ জীবের জ্বাঘ বিচ্যুত—ঐক্লপ দুর্লভতা আমাকে গ্রাস করিয়া আমাকে অনন্ত নরকের পথে পথিক করে । শুদ্ধ প্রেমিক বৈষ্ণবের স্বভাব এই যে, তিনি নিরন্তর হরিদাস্তে নিযুক্ত থাকিয়াও নিজকে প্রেমগন্ধহীন বলিয়া জানেন, কারণ,—

“প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।

সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য-ভক্তি দান ।

আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান ॥

তোমার নিতাদাস সুই তোমা পাসরিয়া ।

পড়িয়াছোঁ ভবান্নবে মায়াবন্ধ হইয়া ॥” (ক্রমশঃ)

দক্ষিণ ভারত-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

মুম্বাইর প্রদক্ষিণ করার সময় দেখিলাম উক্ত মন্দিরের সোমাসকাশি মূর্তি অর্থাৎ হরপার্বতী মধ্যে গণেশ মূর্তি খোদিত রয়েছে । দক্ষিণ প্রাচীরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুমূর্তি ও তন্নিম্নে মার্কণ্ডেয় ঋষির মূর্তি বিরাজিত । মন্দিরের বহির্গাতে যোগিনী দক্ষিণামূর্তি খোদিত আছেন । এখানকার সম্পর্কে কথিত আছে যে, দেবাদিদের মহাদেব কোন সময়ে এইস্থানে তপস্তা করিতে ছিলেন এবং তাঁহার ভক্ত মন্দী পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন; সেই সময় শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় প্রভু-আজ্ঞায় মহাদেবের সাক্ষাৎ করিতে আসেন । গরুড় বিষ্ণুর আজ্ঞা জানান সত্ত্বেও মন্দী তাঁহাকে দর্শনে বাধা প্রদান করেন । মন্দী যখন একান্তই গরুড়কে অগ্রসর হইতে দিলেন না তখন গরুড় অগত্যা আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া উচ্চস্বরে মহাদেবকে ডাকিতে

লাগিলেন। তচ্ছুবণে শ্রীমহাদেব মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রভুর বাক্যে অবমাননা করার জন্য ক্রোধিত হইয়া নন্দীকে অভিশাপ প্রদান করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করেন। নন্দী বেকুলিত হইয়া উগ্র তপস্যা করায় দীর্ঘকাল পর তিনি শাপবিমুক্ত হন। তদবধি এই স্থানকে বেদগিরি বলে। আরও কথিত আছে যে, বেদ মূর্তিমান হইয়া এইস্থানে পরম বৈষ্ণবপ্রবর শিবজীর উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অমরাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র একবার এইস্থানে শিবোপাসনা করিয়াছিলেন।

এর পর পক্ষীতীর্থের বহু আকাজক্ষীত ‘পক্ষী’ দর্শনের আশায় প্রায় ২৬টি সিঁড়ী অবতরণ করিয়া পূর্ববর্ণিত ঘরের পার্শ্ব দিয়া আরো ১২/১৪টি ধাপ নামিয়া একটি সমতল পর্বত-উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। উক্ত স্থানে একটি বেদীযুক্ত চালাঘর আছে। এর অনতিদূরে একটি দল্ল উচ্চ গিরিশৃঙ্গ তালুভাবে যেন দক্ষিণ গগণে উঠিয়াছে। সেখানকার পূজারীপাণ্ডা ভোগের হাঁড়ী ও পুজার উপকরণাদি লইয়া ঐ গিরোপরি উঠিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে দুইটি শকুনিপ্রায় পক্ষী শূণ্ডে কয়েকবার ঘুরিয়া ঐস্থানে আসিয়া বসিল। পাণ্ডাজী পক্ষীকে প্রণাম করতঃ এবং নানাপ্রকার সুবস্তুতি-দ্বারা আহ্বানপূর্বক ঘৃতপূর্ণ বাটী সম্মুখে রাখিলেন এবং ঘৃতপাকান্ন অন্ন থালায় করিয়া দিলেন। তখন নির্ভয়ে ও সানন্দে ঐ পক্ষীদ্বয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গলিত শব্দাদী শকুনপ্রায় সেই পক্ষীদ্বয় তাহার আহার শেষ করিয়া পক্ষ বিস্তারপূর্বক সুদূর নীলাকাশে মিলাইয়া গেল।

এই পক্ষীতীর্থের পক্ষীর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে প্রাচীন ইতিহাসে কথিত আছে যে, কোন দুইজন যোগীপুরুষ ভগবৎ সমীপে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া গলিত শব্দক পক্ষীর দেহ প্রাপ্ত হন। পূর্বজন্মের স্মৃতির ফলে জ্ঞান ও স্মৃতি উহাদিগকে ঘৃণিত শকুনের আহার হইতে বিরত রাখিয়াছে। শুধু কর্মফল বা অভিশাপ ভোগ করিবার জন্তই এই শকুন-দেহরূপ ধারণ করিয়া আছেন; তাই প্রত্যহ শুধু পাপক্ষয়ের জন্ত বেদগিরির দেবমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রসাদ ভক্ষণ করেন। উহাদের সম্পর্কে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, উহারা প্রাতে বারানসীতে গঙ্গাস্নান, মধ্যাহ্নে বেদগিরির দেবমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রাত্রে রামেশ্বরে রাত্রি যাপন করেন। আমরা সুকৃতভাবে দর্শনাদি সমাপ্ত করতঃ পর্বত হইতে অবতরণ-পূর্বক চিঙ্গলপুটে প্রত্যাবর্তন করি।

১৫ই নভেম্বর, মঙ্গলবার সকাল সকাল প্রসাদ পাইয়া আমরা বাসযোগে মহাবলীপুরম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা যেন-রাস্তা দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম উহা দর্শনে মনে হইল সমুদ্রের মধ্য দিয়া যেন পথটি সর্পাকৃতি-রূপ ধারণ করিয়া আঁকাবাঁকাভাবে গন্তব্যস্থলের সহিত সংযোগ করিয়া আছে। এইরূপ পথকে অতিক্রম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম ও কর্মবীরগণের কীৰ্ত্তি-কলাপের পুণ্যভূমি যাহা ভগ্নাবস্থায় আজও গৌরব বহন করিয়া আছে সেই মহাবলীপুরমে প্রবেশ করিলাম। পূর্বে এখানে হিন্দুগণের সাতটি পাশাপাশি সমুদ্রতটে মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, মন্দিরের ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বর্ণাবৃত তাম্রপাত-দ্বারা মণ্ডিত ছিল। ইহার উপর জ্যোতির সৃষ্টি করিত; সেই জ্যোতির্ময় দৃশ্য বঙ্গপোসাগরে ভাসমান পোতের ন্যাবিকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইত। তজ্জন্যই ওলন্দাজগণ এই স্থানটিকে Seven Pagodas বা সপ্ত স্বর্ণমন্দির নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কথিত আছে, দর্পহারী ভগবান্ নারায়ণ দানববীর দৈত্যকুলাধিপ বলিকে চলনা করিয়া এই স্থানেই ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিয়া লইয়া-ছিলেন। দ্বিপদে ভগবান্ স্বর্গ-মত্তা অধিকার করিয়া লইয়া তৃতীয় পদে বলিকে পাতালে প্রেরণপূর্বক ‘দর্পহারী’ নাম সার্থক করিয়াছেন। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ পাতালকে আমেরিকা নামে অভিহিত করেন। অবশ্য ‘বলিভিয়া’ নামে দেশ অত্যাপিও আমেরিকায় বর্তমান। এই বলিভিয়া নগরকে বলিরাজের নগর বলিয়া অনুমান করেন।

খ্রীষ্টীয় ৬০০ শত শতাব্দীতে বল্লভ বংশীয় রাজগণ কাঞ্চী হইতে মহাবলী-পুরম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহাবলীপুরমের দক্ষিণে সমুদ্রতটে পাঁচটি রথ বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রচণ্ড কালের অব্যাহত গতিতে সকলই প্রায় এখন বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। মন্দিরগুলি সুবহু পাষাণখণ্ড খোদিত করিয়া নির্মিত। কতকাল পূর্বে কত পরিশ্রমে এই সকল পাহাড়-খুদিত মন্দির হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কথিত আছে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক পর্বতে মন্দির বা গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং যিনি যে-ঘরে বাস করিতেন তত্তৎ নামে সেই ঘর বা রথ অভিহিত হইয়াছে। উত্তর দিকের প্রথম

মন্দিরটিই দ্রৌপদীর ঘর নামে কথিত। পাণ্ডবগণের মন্দির ব্যতীতও জলায়তন নামক মন্দির আছে,—ইহা সমুদ্রের বেলাভূমিতে স্থাপিত। ইহার কতকাংশ সমুদ্র তাহার অতল গর্ভে গ্রাস করিয়াছে। সমুদ্র মহোচ্চমে তরঙ্গাবলীর দ্বারা মন্দিরগাত্রে আঘাত করিতেছে; কিন্তু শিল্পির অসাধারণ রচনাকৌশল এখনও সমুদ্রকে পরাহত করিয়া রাখিয়াছে। তামিল-গ্রন্থের মতে এই সংগ্রাম বোধহয় দুই হাজার বৎসর বাণীয়া চলিতেছে; কিন্তু মন্দির আজও সর্গৌরবে প্রাচীনকীৰ্ত্তি ঘোষণা করিয়া দণ্ডায়মান রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পর্বতখোদিত মন্দিরগাত্রে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা, বরাহমূর্ত্তি, বামন অবতার, অৰ্জুন তপস্যারত অবস্থায় ধ্যানমগ্ন—কঠোর তপস্যায় তাঁহার শরীর যেন জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন দ্বীতলা মন্দির, দোলস্তুম্ভ মন্দির, গণেশের মন্দির, ধর্ম্মরাজের সিংহাসন প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাবলীপুরম্ দর্শন শেষ করিয়া রাসযোগে চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

১৬ই নভেম্বর, আমাদের অনেকেই পণ্ডিচেরী দর্শন-কামনায় সকাল সকাল প্রসাদ পাইয়া বেড়িয়ে পড়েন। উহা আমাদের দর্শনীয় তালিকায় না থাকিলেও যাত্রীগণের আকাজক্ষা হেতু উহার ব্যবস্থা করা হয়। ঋষি অবিন্দের আশ্রম দর্শন করাই বাঙ্গালীগণের পণ্ডিচেরী দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রোগ্রামে আমার নাম সন্নিবেশিত না থাকায় যথাযথ বর্ণনা করা হইতে বিরত হইলাম।

পরবর্ত্তি গন্তব্যস্থল হইল **শ্রীরামেশ্বর**। প্রায় সপ্তাধিককাল চিঙ্গেলপুটে অবস্থান করার পর শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু সোজা মাদ্রাজ চলিয়া যান। মাদ্রাজে রেলওয়ের C.O.P.S. অফিস হইতে সোজা রামেশ্বর যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। এখান হইতে Main line-এর পথ বন্ধ থাকায় ভিল্পপুরম্ হইতে সোজা ত্রিচিনাপল্লী হইয়া ডিণ্ডিঙ্কলের পথে মাদুরাই ও তথা হইতে মানামাদুরাই এবং মানামাদুরাই হইতে সোজা রামেশ্বরে পৌঁছি। আমাদের গাড়ী যখন একের পর এক ষ্টেশন অতিক্রম করিতেছিল তখন লাইনের দুইধারে বাড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ঙ্করী ক্ষত-চিহ্ন তথা বগার ধ্বংসাবশেষ দেখে দেখে আমাদের গা সিউরে উঠিতেছিল। গাড়ী মন্থর গতিতে এগুতেছিল। অবশ্য মানামাদুরাইর পর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

আমরা প্রাতঃকালিন অনেক আকাজক্ষীত রামেশ্বরক্ষেত্রে স্তুপ্তভাবে উপনীত হইতে পারিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে সুযোগ পাইলাম। সেখানে

পৌছা মাত্র আমরা সকলেই পুণ্যতোষা অদীম মলীলরাশি সমন্বিত নীলাম্বু-
ধিতে স্নান করার মানসে সকলেই বেড়িয়ে পরিলাম। ঘোটক-যানে
সোজা সমুদ্র-সৈকতে উপনীত হইয়া দেখিলাম এখানে শ্রীক্ষেত্রের ন্যায়
হিরণ্যগর্ভ তরঙ্গমালায় উদ্বেলীত নহেন। আমরা বেশ আরামে স্নানাদি
করিয়া বহু আকাঙ্ক্ষীত শ্রীরামেশ্বর-মন্দির অভিমুখে রওনা হইলাম।

শ্রীরামেশ্বর হিন্দুগণের পবিত্র পীঠস্থান। কিন্তু শ্রীরামেশ্বর সম্পর্কে দ্বৈত
মত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-- 'রাম ঈশ্বরো যশ্চ সঃ' ইতি রামেশ্বরঃ—
—বহুব্রীহি সমাস অর্থাৎ রাম ঈহার ঈশ্বর। আবার 'রামস্য ঈশ্বরঃ যশ্চ সঃ'
ইতি রামেশ্বরঃ— ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ রামের যিনি ঈশ্বর। এই
প্রসঙ্গে পৃথক্ মতবাদ দৃষ্ট হইলেও বৈষ্ণব তথা শৈবগণ উভয়েই এই স্থানে
উপনীত হইতে দেখা যায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীপূর্বক
দর্শনাদি করিয়া আন্ততোষ বৈষ্ণবপ্রবর শিবজীর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়া
থাকেন। ইহার সম্পর্কে দ্বিমত দেখা দিলেও উক্ত প্রসঙ্গে বক্তব্য
এই যে, কোনটী যুক্তিযুক্ত সে-বিষয় পাঠকবর্গকে সুস্থ বিচার করিয়া
দেখিতে অস্বরোধ জানাই। তবে মন-কল্লিত চিন্তাধারা লইয়া ইহা
বিচার্য হইতে পারে না। বৈষ্ণবকুল-চুড়ামণি শ্রীশিবজী দেবাদিদেব আখ্যায়
আখ্যায়ীত। বিষ্ণুর অপত্যার্থে 'বৈষ্ণব' পদবাচ্য। 'বিষ্ণু' ঈশ্বরতত্ত্ব—কৃষ্ণের
উপাসকও বৈষ্ণব বলা হয়; কিন্তু কাক্ষ' বলা হয় না। কারণ তত্ত্বতঃ
একই বস্তু তবে রসবৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাই রস বিচারে কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বা
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদ উপনিষদ পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু
বা কৃষ্ণ দেবতার অন্তর্গত নহেন পরন্তু অসমোদ্ধি-তত্ত্ব। শ্রীশিবজী দেবতা-
গণেরও দেবতা অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ যিনি, স্তূতরাং
তাহাকেও কিন্তু অসমোদ্ধিরূপে দেখা যায় না। কারণ তাহারও একজন
উপাস্তা-তত্ত্ব আছেন। আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে
পাই পরিদৃষ্টমান জগতের স্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্ম। ব্রহ্মসংহিতায় তিনি স্বয়ং
বলিয়াছেন,— ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্ ॥

এখানে পরম-ঈশ্বর আখ্যায় আখ্যায়ীত হইয়াছেন 'কৃষ্ণ'—তিনি কিরূপ ?
—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ যিনি নিত্য আনন্দময়। আবার বলিয়াছেন,
তিনি অনাদিরও আদি 'গোবিন্দ' অর্থাৎ যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত বা

জানেন। এবং যিনি সর্বকারণের কারণ। সুতরাং কখনই যে মূলপুরুষ বা মূলধার তাহাই প্রতিভাত রহিয়াছে। এই মূলধারকে আশ্রয় করিয়াই শিবজী দিগম্বর হইয়াছেন। অর্থাৎ যিনি তাঁহার প্রভুর নামানন্দে মাতোয়ারা হইয়া বিবশপ্রায় অর্থাৎ বাহ্যরত্নের পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি তাঁহার প্রভুকে কত ভালবাসেন তাহা বলবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন করে না। এই হেন যিনি, তিনি কি কখন তাঁহার প্রভুর ‘প্রভু’ হইবার ঘৃণতা করিতে পারেন? প্রভু কোন সময় কৃপাপূর্বক তাঁহার ভৃত্যকে বা অশ্রিতকে সম্মান প্রদর্শন করেন—ইহা বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা সাপেক্ষ। কিন্তু তাই বলে তিনি (বিশ্বনিয়ন্তা) বাধ্য থাকেন উহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। ভগবান্ করুণাময় স্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষ। তবে ভক্তের মর্যাদা বর্দ্ধনের জন্য তিনি ভক্তকে সম্মান প্রদানপূর্বক ভগতে ভক্তবাৎসল্যতা বিঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাই তিনি কখন কখন ভক্ততত্ত্ব হইয়া যান—ইহা তাঁহার অপরিণীম করুণারই নিদর্শন।

“পঞ্চমুখে ‘রাম-নাম’ গান ত্রিপুরারী।” ত্রিপুরাসুরের যিনি ‘অরি’ অর্থাৎ পঞ্চানন নাভু—তিনি কি স্বরাট স্বতন্ত্র? যদি তাই হইবেন তবে কেন তিনি রাম নামে মাতোয়ারা? তাঁহার আজ্ঞাবাহী হইয়া তয়োত্তরের কর্ণধাররূপে ধ্বংশের অধীশ্বর হইয়াছেন? এখানে বিচার করিলে দেখা যায় তাঁহারও একজন নিয়ন্তা আছেন,—সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, পরন্তু আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। যিনি ভৃত্য, তিনি কি করিয়া ঈশ্বর হন? অতএব, রাম যাঁহার ঈশ্বর, তিনিই রামেশ্বর প্রযোজ্য। বৈষ্ণব-কুলশেখর—রামগত প্রাণ হইয়া যিনি কালজয়ী হইয়াছেন, সেই দেব-শাসি-বন্দিত মৃত্যুঞ্জয় পরম ভাগবত শিবজীর কৃপাভিক্ষা করার মানসে রামেশ্বরের মূল-মন্দিরে উপনীত হই। সৌভাগ্যক্রমে এই দিন ছিল শ্রীহরিবাসর তিথি অর্থাৎ উৎখানৈকাদশী। পরমপবিত্র হরিবাসরে শ্রীহরির আপনজন, যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়ত্ব হেতু হরি-হর একাত্মা নামে সুবিদিত,—সেই কালজয়ী কারুণিকের শ্রীচরণ-সরোজে পলত হইয়া কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করি,—“হে বরদ! তুমি আশুতোষ, কখন তোমার হৃদয়ের ধন—কৃপাভিক্ষা কৃপাপূর্বক দান করুন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী

আদর্শ ভ্রাতার পত্র

শ্রী শ্রীগুরুগোরাঙ্গী কথিতঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা, পিন-৭৯৪০০১
জিলা—গারোপাহাড় (মেঘালয়)।
ইং ১৩.৯।১৯৭৮

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবদ্যুতিপূর্ব্বকেষু—

স্নেহের * * *! স্নেহাশীষ জানিবে। আশা করি শ্রীগুরুকৃপায় ভজনকুশলে আছ। শিলিগুড়ি হঠতে তারিখবিহীন একখানা Inland letter-এর পত্র পাইয়াছি, তাহাতে ঠাকুরমার পরলোকগমন ও বাবার দীনবেশ দেখিয়া অতান্ত দুঃখ পাইয়াছ এবং তজ্জন্য তুমি সান্ত্বনা বাণী প্রার্থনা করিয়া যে পত্র চাহিয়াছ তাহার উত্তর নানা বামেলায় সময়মত দিতে পারি নাই।

আজ শ্রীএকাদশীর কিছু অবকাশে পত্র লেখিতেছি। এ জগতে আমি, তুমি, পিতাঠাকুর মহাশয় আমরা মায়াবদ্ধ জীব। শ্রীভগবানকে ভুলিয়া “কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে নরকে বা কভু। কভু রাজা, কভু প্রজা কভু দাস প্রভু ॥” অতএব ভগবৎ বিস্মৃতি বশতঃ পিতার জীবনে রাজাহারা কাঙাল বেশধারী রাজার ন্যায় অবস্থা এ জগতে আশ্চর্য্য বা দুঃখের বিষয় নহে। বাবা ইতিপূর্ব্বে যে অর্থের অপব্যবহার করিয়াছেন, মা লক্ষ্মী কেন তাহার কাছে থাকিবেন? থাকা উচিত নহে। অপব্যয়ী পিতার জীবনে সে-দুঃখের প্রয়োজন আছে। দুঃখই মানুষকে আগুনে পোড়া খাঁটি সোনায়ে রূপান্তরিত করে। দুঃখ বিনা এ মহিতে কেহ স্থায়ী হইতে পারে না। জীবনে দুঃখ না পাইয়াই যিনি অর্থাদি লাভ করেন, অর্থের সদ্ব্যবহার তাহারা করিতে শেখে না। তাহারা বাবার মত ঐক্লপ বেপরোয়া হন। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাহীন ব্যক্তিগণ জীবনে ধনজন, সহায়-সম্পদ হারাইয়া অশেষ দুঃখ পাইয়া থাকেন। এটা যে কেবল বাবার বেলায়ই তাহা নহে। সবার ক্ষেত্রেই সে-কথা প্রযোজ্য। পিতার দৈন্য-দুর্দশা দেখিয়া তোমার শোক করা আদৌ উচিত নহে। ‘স কল্পা ফলভুক্ পুমান্’ একথা স্মরণ করিলে দুঃখের অবসান হইবে। তুমি, আমি, রাজা, প্রজা, আত্মসন্তুষ্ট পর্য্যন্ত সবাই যখন একই নিয়ম মানিতে বাধ্য তখন তোমার, আমার বা বাবার বেলায়ই বা বাতীক্রম হবে কেন? আমি দূরে থাকিলেও তাহারা আজ যে শোচ্য অবস্থা ভোগ করিতেছেন তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি কিন্তু তাহাদের অপব্যয় ও সময়ের ক্ষতি সাধন তাহাদিগকে যথার্থ সাজা দান করিবে।

ভগবৎ সাধন ভঞ্জন-পারায়ণ সাধকের বিচার থাকিবে—পূর মরে মরুক, সহায়-সম্পদ বন্টার জলে ভেসে যায় যাক। সাধক থাকবে নিশ্চল। কোন প্রকার ঝড়-ঝঞ্ঝা তাহাকে বিচলিত করিয়া শ্রীহরির সেবা হইতে দূরে নিতে সমর্থ হইবে না। তুমি এ অনিবার্য বিষয় লইয়া চিন্তা বিভ্রান্ত করিবে না। মর্কদা হরিসেবোন্মুখ ও আমি 'বৈষ্ণবদাস' অতিমান দৃঢ় হইলে জাগতিক পিতামাতার দুঃখ-দুর্দশা মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে না।

ঠাকুমার বিষয় হয়তো তুমি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ তাহা হওয়া স্বাভাবিক। যাহাদের কোলে-পিঠে মানুষ হওয়া যায়, স্বভাবতই তাহাদের জন্ম নানাপ্রকার দুঃখাদি আসিয়া চিত্তকে বাধিত করে বটে। কিন্তু ঠাকুরমা পরলোকগমনের সময় হইয়াছিল। এ অবস্থায় বার্কিকোর দুঃখ-যন্ত্রণা পাওয়ার পরিবর্তে দেহান্তরই শ্রেয়স্কর। আত্মার চিন্ময়ত্বহেতু নশ্বরদেহ পরিত্যাগ-বিধি জীবের সমীচীন। জীবাত্মার যদি এ দেহান্তর বিধি না থাকিত তবে দুঃখের আর অবধি থাকিত না। সুতরাং দেহের জন্ম, বর্জন, ক্ষুধা, জ্বালা ও মৃত্যু—জীবেরই হিতের নিমিত্ত ঈশ্বরের বিধান। তাহার বিপরীত ইচ্ছা করা উচিত নহে।

জাতস্য ধ্রুব মৃত্যু জন্ম ধ্রুবমতস্ত চ।

তস্মাৎ অপরিহার্যার্থে নানোশোচতি পণ্ডিতঃ ॥

সুতরাং মৃতব্যক্তির জন্ম শোক করা উচিত নহে—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। ঠাকুরমা যথাযথ ভাবে কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া তোমাকে মঠে আসিবার অনুমতি দিয়া তাহার মানবধর্মের যথার্থ কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। তাহার আত্মার উন্নতি অনিবার্য।

আমরা এখানে ১২ জন মঠবাসী আছি। মহা ধুমধামে প্রদর্শনী ইত্যাদি করিয়া শ্রী শ্রীমূলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ধর্মসভারও আয়োজন হয়। পূজাপাদ শ্রীল বৈষ্ণব মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আমরা বক্তৃতা দিচ্ছি। A. D. M. মহাশয় ছিলেন প্রধান অতিথি। বক্তাক্রমে ছিলেন প্রফেসর, শিক্ষক এবং অধ্যাপক ভদ্রমহোদয়। পূজাপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজকে এবং অষ্টান্য বৈষ্ণববৃন্দকেও আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি জানাইবে। অধিক কি—অত্রস্থ কুশল জানিবে।

শ্রীবৈষ্ণব-দাসাভিলাষী—

শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

ককালপ্রাসী বন্যার

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় ষষ্ঠের

সেবকবৃন্দের ত্রাণকার্য

শরণাতীত কালের স্রোতে বহু স্মৃতি ইতিহাসের পাতায় বিস্মৃতির রেখা রচনা করিয়া যায়। এই বিস্মৃতির মধ্যে কখন কখন কালের তাণ্ডব-গতি সমাজ-জীবন তথা মানব-জীবনে এক একটা প্রবাহের সৃষ্টি করে। তখন আমরা অতীতের প্রতিচ্ছবির অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধানে যদি উহার নজির খুঁজিয়া পাই, তখন বেদনার মধ্যে একটা শান্তনার সুর বেজে উঠে। কিন্তু অতীতে যদি সেইরূপ কোন ঘটনার অবকাশ ঘটে নাই বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন সমাজ-জীবনে একটা বড় বকনের আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গের বুকে যে রূপ প্রলয়ঙ্করী বন্যা জনজীবনকে বিধ্বস্ত করিল, ইহা প্রকৃতির এক রোষিত ঘোষণার দিগ্‌দর্শনেরই নিদর্শন। জীব-জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিলেও আবাহমান কাল হইতেই— এই প্রকৃতির সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার হেরফের হইবারও কোন লক্ষণ নাই। প্রবল প্রতাপ-শালিনী প্রকৃতি কখন কখন কোমলপ্রাণা করুণার প্রতিক অনুকূলা লাস্যময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু অনাচারে পরিপূরিত অথচ ঔর্দ্ধত্বের পরিসীমাকে অতিক্রম করিয়া জন-জীবন যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতির বিরুদ্ধে অশনি সংকেত করিতে থাকেন— তখন মনে হয় তিনি রোষলোচনা হইয়া অনায়াসে পর্ষাদস্ত করেন অপরিণামদর্শীগণকে। কিন্তু জন-জীবন বাঁচার তাগিদ ছাড়িতে পারে কি? তজ্জন্মই আত্মপক্ষ রক্ষার্থে মানুষের এত প্রচেষ্টা—তাই সমাজ-জীবনে প্রবল সঙ্ঘাত।

এই সঙ্ঘাতের মধ্যেও নিরাশ হইলে চলিবে না। জীবনাভিযানে প্রবল বিপত্তির মধ্যেও দূরদর্শীতার স্বক্ষাভিযান প্রবর্তিত করিয়া প্রকৃতিকে অনুকূল পন্থায় নিয়ে আসার জ্ঞান উদ্যোগী হইতে হইবে। অভিজ্ঞানের গরিমায় ধাহারা দীপ্তিমান—সেই প্রধিতযশাঃ সমাজকল্যাণীগণের লক্ষ-জ্ঞানের পরিমাপে উদ্ভাসিত চিন্তাস্রোতকে বাস্তবরূপায়নে ব্রতী হওয়াই সমীচীন। নচেৎ যদি গণগড্ডলীকার অমূলক প্রচেষ্টার ধারক-বাহক হইবার

দূরাকাঙ্ক্ষা পূরণে ত্রুতী হইবার অপধারা রূপায়ীত হয় তবে বর্তমানে তো কল্যাণপ্রদ হইবেই না পরন্তু অদূর ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহরূপ ধারণ করিবে। স্মতরাং রক্ষকের ভূমিকায় তক্ষকরূপী জীবাংশীরই ভূমিকা রচিত হইবে। তাই কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গণ্ডীবদ্ধ অংশবিশেষের ভাবনাকে প্রতিহত করিয়া সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রগামী হইলে ইহার ফল নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ হইবে। ইহা না হইলে যে-তিমিরে—সেই তিমিরেই সমাজ-জীবন নিপতিত থাকতে বাধ্য। অতএব নিরপেক্ষ পদক্ষেপ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

পাঠক-পাঠিকাগণ! এখন নবদ্বীপের ভয়াবহ বন্যাকালিন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সদস্যবৃন্দের বন্ধা-কবলিত জনগণের প্রতি উদার ও নিরলস সহায় সহানুভূতির কথা ক্ষুদ্র লেখনীতে কিছু ব্যক্ত করিবার আশা করিতেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুখ্যত আধ্যাত্মিকবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবজগতের আত্মিক-কল্যাণে ত্রুতী। জগতের কল্যাণকামীগণের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ন কার্য-কৌশল পরিলক্ষিত দেখা যায়। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। সমাজ-কল্যাণকামীগণ নিশ্চয়ই সকলেই জন-জীবন বা সমাজ-জীবন এমনকি জীব-জগতের মঙ্গলচিন্তায় সেবাত্রুতী। কিন্তু এর দ্বারা এবং ফল উভয়ের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব বজায় রাখে। জগতে প্রত্যেকেই অন্যে অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এই সহানুভূতির অবস্থাও পৃথকাকারে যেমন আসিবে ফলেরও (Result) যে হেরফের ঘটিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই যে পরিণতি (Result) এখানেই বিচার্য থাকবে, কে কি ধরণের মঙ্গলকামী; কাহাদের সহানুভূতি দীর্ঘ-প্রসারী। জগৎ বিনিময়-কেন্দ্রীক। এক একটার বিনিময়ের আশা মানুষ ছাড়তে পারেন না। এই যে প্রতি-বিনিময়ের আশা—ইহার মধ্যে নিজব্যক্তিকেন্দ্রীক অথবা আর কিছু কিনা তাহা ষথার্থভাবে বিচার করিলে তবেই আমরা প্রকৃততে বুঝতে পারব, কে—কাহারা প্রকৃত মঙ্গলকামী। আর এই মঙ্গলের গতিই বা কতদূর—কত দিনের! না কালাতীত?

আমরা যখন কাল বা কালাতীত নিয়ে বিচার করিতে এগিয়ে আসিবার প্রেরণা পাই, তখনই ভারতীয় চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিকবাদের কথা অজ্ঞাত-

সারে এসে পরে। সনাতন ধর্মাবলম্বিগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এই জন্মান্তরবাদ দিব্যপ্রজ্ঞায় প্রজ্ঞানী ত্রিকালজ্ঞ আর্ষনিচয় যে-চিন্তাপ্রোতের বীজবপন করেছিলেন এই ভারতাত্মার বুকে—তাহাকে কালের কুটীল গ্রাসে উৎপাটন করিতে পারে না। সেই কালজয়ী চিন্তাপ্রোত আবাহমান কাল হইতেই সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যদি সেই প্রজ্ঞায় অবগাহন করিতে পারি, তবে ইহ এবং পারলৌকিক উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচিত হইলে এক অনাবিল প্রোতের প্রবাহমানা রচিত হইতে পারে। মানুষ আত্মকেন্দ্রীক হওয়ার জন্য শুধু বাচার তাগিদেই ব্যস্ত—কিন্তু সেই বাচা কতক্ষণ বা কতদিনের জন্য—উহা ভাববার অবকাশ কতজনের? আমাদের যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবনার অবকাশ আসিবে না ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ শান্তির প্রচেষ্টার কথা যতই মুখে বলুক না কেন প্রকৃততে মানুষের আন্তরিক উন্মেষণার কথা ভাবতে পারিবে না। এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা আসিবে না ততদিন পর্য্যন্ত সমবটনের সহানুভূতির কথা শুধু মুখেই কপটান ছাড়া বাস্তবরূপ রূপায়ীত হওয়া অসম্ভব। অন্তর্নিহিত ভাব যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে পারিবে না—ততদিন পর্য্যন্তই দীর্ঘ-পাশে কবলীত হওয়ায় জিহ্বাংসার সমীরণই প্রবাহমান হইতে থাকিবে। এই যে অন্তর্নিহিত অবস্থা—এর জগুই সত্যদ্রষ্টাগণের অবদান সমাজ-জীবনে অপরিহার্য। তাই তাঁহারা ক্ষণিকের সুখ লাচ্ছন্দে বাচার তাগিদে—অথবা—প্রতিষ্ঠার বা ক্ষমতা লুলুপতার জন্য কর্মে ব্রতী হন না। তাঁহাদের জীবনটিই হইল সেবাময়—সেবাব্রতী। সেই ব্রতে জনগণকে উদ্ধৃদ্ধ করিয়া জীব-জগতের আত্যাঙ্গিক (নিত্য) মঙ্গল বিধানের স্বপ্নেই তাঁহারা বিভোর হইয়া নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও তাঁহাদের সাধনায় রত থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে একটা লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, তাঁহারা নিয়তই মনে করেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ

সামান্যমেতৎ পশুভিনরাণাম্।

ধর্মো হি তেষাং অধিকো বিশেষো,

ধর্মোহ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

আহার-নিদ্রা-ভয়-কামক্রিয়া যখন সমস্ত জীবনিচয়ের মধ্যে বর্তমানা, তখন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? সুতরাং জগতে বাচিবার তাগিদে

কার্য্যানুষ্ঠান করিলেও নিত্যমঙ্গলের উক্ত মানুষকে অবশ্যই ধর্ম-যাজন করিতে হইবেই। কেননা ধর্মধারাটাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অতএব তাঁহারা মরণের যুগেও অমৃতের বাণী শুনাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের দুর্দৈব এই যে, ধর্মের কথা শুনিলেই আমরা আতকাইয়া উঠি। ইহা নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্য উদয়-কারক নহে—পরন্তু আত্ম-হননকারক; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা কখন কোন বিপদাপন্ন বা আশু কষ্টের সম্মুখীন হইলে—বা-বা-রে, মা-রে বলি। কিন্তু কই তখন নির্দাক থাকিলেই বা দোষ কি? অথবা নির্দাকই বা থাকিতে পারা যায় না কেন? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে স্বভাবগত বা জন্মগত একটা কিছু হেতু আছে। এবং ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমরা শান্তনা বা দৃঢ়তাও অনেকখানি ধারণ করি। এবং তৎসহ প্রতিকারে এগিয়ে মোকাবিলা করিতে পিছু হই কি?

ধর্মজগতে বিচরণশীল মহানুভবগণ তাই ঈশ্বর সাধনায় নিমগ্ন থাকিলেও জগতের বিভীষিকাময় কোন অবস্থায় জগদ্বাসীগণকে শান্তনা দিবার জন্যই সাধারণ কন্মীর ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে এসে সহায় হন। কিন্তু এই সহায়কের উদ্দেশ্য, মানুষ ভ্রান্তি-বিজড়িত অবস্থায় না থেকে শরীরের চিন্তার পরেও যেন এমন একটা বস্তুর চিন্তা করেন—যাহা অবশ্যই উপলব্ধীর বিষয়। কেননা, যে শরীরের জন্ত এত দরদ, কিন্তু ঐ শরীর পরিচালিত হওয়ার হেতু কোথায়—এই দরদী শরীর থাকলেও তো কোন সময় এমন ‘কী’ একটা জিনিষের যেন অভাব ঘটে যার জন্য এই শরীর সর্বদা সুন্দর থাকলেও অচল হইয়া পড়ে। অথচ সেই যে অচলের হেতু, উহার সম্পর্কে আমরা কেন ওয়াকিবহাল হইতে এগিয়ে যাব না? সুতরাং ধারক এবং বাহক দুইয়েরই অনুসন্ধানী যাহারা তাহারা প্রকৃতিতে আমাদের কল্যাণ-কামী। এই কল্যাণকামীগণের সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য বর্তমান বর্ষের প্রলঙ্ঘনরূপ বন্যায় আমার ঘটিয়াছিল। খবরের কাগজ আকাশবাণী तथा লোকমুখে যখন বিভিন্নস্থানের বন্যার কথা কর্ণগোচর হইতেছিল—তখন নবদ্বীপের উপকণ্ঠগুলির অনেক অংশই জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং সহরও প্রায় ডুবুডুবু। এরই এক সন্ধিক্ষণে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহারাজের সহিত আমার দেখা হয়—তিনি আহ্বান করেন আমাকে। শ্রীমদ্রবীন্দ্র সরকার ও আমি যখন তাঁহাদের মঠে উপনীত

হই—তখন দেখি মঠের অনেকেই তাঁহাদের সমিতির অফিসে বসে জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন, কি করিয়া এই ভয়াবহ বন্যায় জনসাধারণকে সহায় সহানুভূতি করা যায়। সেদিন ছিল ২ই আশ্বিন, ১৩৮৫ (ইং ২৬।৯।৭৮) মঙ্গলবার এবং কিয়ৎদিন পূর্বে সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মহারাজ কিছু ব্রহ্মচারীবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া বিভিন্ন বন্যাকবলিত স্থানে বেড়িয়ে গিয়েছেন। বন্যার জল-বর্ধনের ক্ষীপ্রতা দেখে আশঙ্কা আরও ঘনিভূত হইতেছিল। বর্ষণমুখী আকাশের গতিও মোটেই ভাল মনে হইতেছিল না। নৌকার সমস্যাটাই তখন একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এর মধ্যে আমার উপরেই তাঁহারা নৌকার দায়িত্ব আরোপ করেন। বন্যাকবলিত স্থান হইতে জলমগ্ন ব্যক্তি তথা গবাদি পশু ত্রাণের জন্য এই কার্যে জলযানের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাঁহাদের উদার প্রচেষ্টা সাফল্যের সহায়কস্বরূপ নৌকার গুরুদায়িত্ব আমি অকাতরেই লইতে স্বীকৃতি দিলাম। তাই শ্রীস্বপন সরকার, শ্রীগণেন্দ্র মুখার্জী প্রভৃতি আরও কিছু যুবকগণের সহায়তায় নৌকা লইয়া মঠের স্বামী বি, ভি, সন্ন্যাসী মহারাজ, সর্বশ্রী নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, যত্নবর ব্রহ্মচারী, অদ্বয়গোবিন্দ ব্রজবাসী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও আরও অনেকের সহায়তায় বন্যাকবলিত লোকজনদের উদ্ধার-কার্যে এগিয়ে যাই। ১০ ও ১১ আশ্বিনের প্রবল বর্ষণে যদিও আমাদের অনেক কষ্টস্বীকার করিতে হইয়াছিল তবুও একটি শান্তনার বিষয় এই যে দুর্গত সহস্র সহস্র ব্যক্তির সেই দুর্দিনকালে তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পেরে নিজকে সৌভাগ্যবান মনে হইতেছিল। অবশ্য এর মূলতঃ প্রেরণার উৎস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনাধীন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের কিছু সেবকবৃন্দের।

প্রায় দেড় সহস্রাধিক বন্যাক্রান্ত জনসাধারণ তথা কিছু গবাদি পশু উক্ত গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। আশ্রমের ভক্ত-বৃন্দের আন্তরিক তথা সৌজন্যমূলক ব্যবহারে এই দুর্দিনের মধ্যে শান্তনার নিবির খুজ্রে পেয়েছেন অনেকে—ইহা সত্যিই প্রাণকে আন্দোলিত করে। এই ত্রাণ-কার্যের সময় মঠ হইতে ১১৮ কুইন্টাল চাউল, ৩ কুইন্টাল আলু, দুইশতাধিক বাচ্চাদের জন্য জামা-প্যান্ট এবং সমিতির নিজস্ব বাগানের প্রায় পঁচিশ মণ ওল, দুই মণ চীনা বাদাম প্রভৃতিও বিতরণ করেন। তদুপরি নগদ প্রায় সারেচার হাজার টাকা দীন-দরিদ্রদেরকে দান

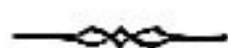
করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ডাঃ অবনীন্দ্রীবন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং সমিতির ডাঃ বসুদেব ব্রজবাসী (হোমিও) প্রমুখ চিকিৎসকগণের সহায়তায় প্রায় ৩০ হাজার টাকার ঔষধ-পথ্যাদিও জনসেবায় নিয়োগ করেন।

বিগত ১৯৭১ সনের প্রবল বন্যায় যদিও উক্ত মঠে জল প্রবেশ করিয়াছিল তথাপিও বাসগৃহগুলি জলমগ্ন হয় নাই। কিন্তু এই বৎসরের বন্যায় মঠের একতলার বেশীর ভাগ ঘরই জলমগ্ন হইয়াছে। তাই দ্বিতল ঘরগুলিতে বস্তাকবলিত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দেওয়া বাদেও সমস্ত ছাদে ত্রিপল, তাঁবু প্রভৃতি-দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক শরণাশ্রয়ী ব্যক্তিগণের বাসপোযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিতে-সমিতির কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বন্যার জল যখন কমিতেছিল তখন সমিতির খরচেই মঠে একটা নঙ্গরখানা খুলিবার জন্য শ্রীমৎ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় প্রশাসক-বিভাগের সহিত কয়েকবার যোগাযোগ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উহা করিতে দিতে অস্বীকৃত হন। কারণ এর ফলে মহামারীর প্রকোপ হইতে পারে বলিয়া তাহারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু বহিরাগত বস্ত্রপীড়িত জনসাধারণ ব্যাপকভাবে ঐ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেও মঠ-সংলগ্ন-প্রাঙ্গনস্থিত লোকজনদের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা মঠ কর্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন।

বন্যাকালীন প্রশাসন-অধিকর্তা শ্রীডি. কে. চৌধুরী (S.D.O., Flood-in-Charge, Nabadwip), শ্রীএন. কে. মুখার্জী (B.D.O., Flood-in-Charge, Nabadwip), শ্রীজে. সি. ঘোষ (প্রশাসক, নবদ্বীপ পৌর-সংস্থা) তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সর্বদলীয় নেতা ও কন্ম্যূরদের অকুণ্ঠ সহায়-সহায়ভূতি পেয়েছেন বলিয়া মঠ-কর্তৃপক্ষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় মঠের এইরূপ সেবা-প্রচেষ্টা দর্শনে জনসাধারণ যেমন প্রীতিলভ করিয়াছেন—তাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠান নবদ্বীপের অন্ততম গৌরবের সম্পদ, উপরন্তু ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণে বরণীয়, এতে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়
নবদ্বীপ (নদীয়া)।



বন্য

বিগত 'বন্যায়' দেশে ঘটিল বিপন্ন ।
ধ্বংস, গৃহ-পশু-পাখী আর ধন-জন ॥
হায় ! ক'ত দুঃখ জীবের করে হাহাকার ।
কে কোথায় গেল চলে নাহিক বিচার ॥
'বন্যায়' ভেসে করে হাবুডুবু যখন ।
ব্যাকুলিত সবে কি করে বাচি' জীবন ॥
কোথায় রহিল বাস্তু দালান কোঠা ।
কোথায় গেল বিত্ত-দার আপুজন যথা ॥
ক্ষুদ্র বৃহৎ কত আশা সবার মন ।
সবই ব্যর্থ তাহা বন্যায় বিসর্জন ॥
(যেমন) নদীর-তীরে যাহার নিরবধি বাস ।
কবে লবে ভাঙ্গিয়া ভাবনা বারমাস ॥
নদীর 'স্বভাব' সদা ভাঙ্গা আর গড়া ।
যেদিকে ভাঙ্গে সেদিকে করে সর্বহারা ॥
নদীর 'স্বভাব' ইহা জানে চিরন্তন ।
জেনেও করিয়াছে তীরে 'বাস-ভবন' ॥
তাহাতে নদী যদি করে উৎপীড়ন ।
আরোপ করে তখন বিধির লিখন ॥
কর্ম্য করেছে যাহা—লিখেছে 'বিধি' তাহা ।
বুঝা 'বিধির' আরোপ করেন ইহা ॥
'স্বতন্ত্রতা' ঈশ্বরের করুণার দান ।
কৃষ্ণোন্মুখে নিষ্ক্রিয় বিধির বিধান ॥
(তদ্রূপ) ভব-সমুদ্র মাঝে করিয়াছে বাস ।
তাহার অধিষ্ঠাত্রীদেবী মায়ার নিবাস ॥
এ ভবে ভরা জীবের অশেষ যাতনা ।
উদ্ধারিতে পথ নাই 'কৃষ্ণ-ভক্তি' বিনা ॥
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি শোক-ভাপে পূর্ণ ।
দুর্ভিক্ষ-ভূমিকম্প আর বন্যা অনুক্ষণ ॥
চলিয়াছে, চলিবে তাহা আব্রহ্মকাল ।
'মায়া-মুগ্ধ' জীব ভুঞ্জিবে চিরকাল ॥

এই সব লইয়া জগতের সৃজন ।
 যাহা হইতে জীবের তাড়ন ভৎসন ॥
 মায়ার রচিত এই জগত সংসার ।
 'কৃষ্ণ-বহির্মুখ'-জীব (তাতে) করেন বিহার ॥
 "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।
 অতএব মায়া ভারে দেয় 'সংসারাদি-দুঃখ' ॥"
 'মায়ার' উৎপীড়ন ভৎসন তাড়নে ।
 নির্লজ্জ হইয়া তবু ভ্রমে অকারণে ॥
 জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।
 ভোগ-বাস্তা হেতু শৃঙ্খলিত মায়াপাশ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—অজ্ঞানের প্রতি
 'শ্রদ্ধাহীন' জনার নাহি আমাতে রতি ॥
 কোনকালে আমাকে না পাইবে সে'জন ।
 ধরং মৃত্যুরূপ সংসারে পুনরাবর্তন ॥
 নানা ঘোনি ভ্রমি জীব সংসার-কাননে ।
 'সাধু-সঙ্গ' মিলে যদি কোন ভাগ্যবানে ॥
 সাধু-সঙ্গে হয় 'সুদৃঢ়ভক্তির' উদয় ।
 'ভক্তি'-প্রভাবে তাহার সংসার হয় ক্ষয় ॥
 তবে তাহার গমন 'শান্তি-নিকেতন' ।
 যেথা নাই মায়ার দৃঢ় উৎপীড়ন ॥
 জড়া-ব্যাধি-জন্ম-মৃত্যু কালের বিক্রম ।
 প্রলয়-বন্তা হইতে হ'বে উন্মোচন ॥
 সেথা আছে শুধু 'ভালবাসাবাসি' ।
 নিত্যানন্দ রসার্ণবে প্রেমের বিলাসী ॥
 সেই 'প্রেম-বন্তা' বহে নিত্য ধরাধামে ।
 তাহাতে ডুবিয়া যায় 'গোলোক-বৃন্দাবনে' ॥
 এ হেন 'বন্তায়' ডুবিতে ছিল বড় সাধ ।
 কর্ম-দোষে 'রমাপতি' পড়ে গেল বাদ ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুন্দর

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ন্তঃ

স বৈ পুংসাং পুরো বর্ষো যতো ভক্তিবোধোক্ষজে ।



অষ্টৈতুকা প্রতিষ্ঠতা যত্না সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর
অধোক্ষজে অষ্টৈতুকী ভক্তি বিব্রশৃণু ।

অন্য ধর্ম সূর্যরূপে পালে যেই জন ;
হরি-কথার রতি নৈলে গাও সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ

কারগোবিন্দাচী, ২ কেশব, ৪৯২ গোবিন্দ
রত্নস্পতিদাস, ২৯ কার্তিক, ১৩৮৫ : ইং ১৬ : ১১ : ১৯৭৮

৯ম সংখ্যা

সানুমান্দং পাণ্ডনাদিকৃতম্ শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

নমো নমঃ কারণবাসিনায়, নারায়ণায়ামিত-বিক্রমায় ।

শ্রীশঙ্ক-চক্র-গদাধরায়, নমোহস্ত তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥১৭॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,— হে অসীম তেজঃশালিন্ নারায়ণ ! তুমি বামনদেবের ও
কারণরূপ, তোমার বার বার প্রণাম জানাই । হে শঙ্ক-চক্র-পদ-গদাধারিন্,
পুরুষোত্তম ! তোমার চরণে প্রণত হই ॥২৭॥

গান্ধারী বাচ—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ।

ত্বমেব বিদ্যা ত্রিবিণঃ ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং সম দেবদেব ॥২৮॥

গাঙ্গারী বলিলেন,— হে দেবদেব ! তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই স্বামী, তুমিই সখা, তুমি বিজ্ঞা, তুমিই ধন, তুমিই আমার সর্বস্ব ॥২৮॥

দ্রোণদ্ব্যবাচ—

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব ।

কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোহস্ততে ॥২৯॥

দ্রোণদ্বী বলিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, হে কৃষ্ণ, বিষ্ণো, হৃষীকেশ, বাসুদেব ! তোমার প্রণাম করি ॥২৯॥

জয়দ্রথ উবাচ—

নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেহনন্তমূর্তয়ে ।

যোগেশ্বরায় যোগায় হামহং শরণংগতঃ ॥৩০॥

জয়দ্রথ বলিলেন,—হে দেব, কৃষ্ণ, অনন্তমূর্তে, ব্রহ্ম ! তোমাকে প্রণাম করি । হে যোগেশ্বর, যোগেশ্বর ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম ॥৩০॥

বিকর্ণ উবাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ ।

নন্দগোপকুমার গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩১॥

বিকর্ণ বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নন্দগোপকুমার, গোবিন্দ ! তোমায় বার বার প্রণাম জানাই ॥৩১॥

সোমদত্ত উবাচ—

নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবনা ।

বাসুদেবায় শান্তায় যদুনাংপতয়ে নমঃ ॥৩২॥

সোমদত্ত বলিলেন—হে পরমকল্যাণ, বিশ্বপালক, শান্তমূর্তে বাসুদেব, যদুপতে ! তোমায় প্রণাম করি ॥৩২॥

বিরাট উবাচ—

নমো ব্রহ্মণাদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩৩॥

বিরাট বলিলেন,—হে ব্রহ্মণাদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারিন্, জগতের কল্যাণকারিন্, কৃষ্ণ, গোবিন্দ ! তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাই ॥৩৩॥

শলা উবাচ—

অতসীপুষ্প-সঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্ ।

যে নমস্তুতি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্ ॥৩৪॥

অতদীপুষ্প-সদৃশ রূপবান ও পীতবসন-পরিধানকারী অচ্যুত—গোবিন্দকে
যাহারা সন্মান করে, সংসারে তাহাদের কোন ভয় থাকে না ॥৩৪॥

বলভদ্র উবাচ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্তমগতীনাং গতির্ভব ।

সংসারার্ণব-মগ্ন নাং প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥৩৫॥

বলভদ্র বলিলেন,—ও কৃষ্ণ, ও কৃপালু-কৃষ্ণ! তুমি অগতির গতি হও ।
ও পুরুষোত্তম! সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন জনগণের প্রতি প্রসন্ন হও ॥৩৫॥

শ্রুত উবাচ—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী, গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ ।

সর্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ ॥৩৬॥

শ্রুত বলিলেন,—যেখানে ভগবান্ অচ্যুতের উদার-কথা-প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ
যেখানে মগাবদান্য ভগবান্ অচ্যুতের বীরাবতী কথা আলোচিত হয়, সেখানেই
গঙ্গা, যমুনা, বেণী, গোদাবরী, সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং সমস্ত তীর্থ
বাস করে ॥৩৬॥

যম উবাচ—

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ ।

কিং ত্বয়া নাচ্ছিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥৩৭॥

যম বলিলেন,—নরকে পচ্যমান অর্থাৎ নরক-ভোগ করিতেছে এমন
ব্যক্তিকে যমদেব বলিতেছেন, “তুমি কি কখনও ক্লেশবিনাশকারী কেশব-
দেবকে অর্চনা কর নাহি?” ॥৩৭॥

নারদ উবাচ—

জন্মান্তর-সহস্রেষু তপোধ্যান সমাধিভিঃ ।

নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥৩৮॥

নারদ বলিলেন,—সহস্র সহস্র জন্মব্যাপী তপস্যা-ধ্যান ও সমাধিদ্বারা ক্ষীণ-
পাপ হইলে মহাশ্বেত কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃষ্টরূপে ভক্তি জন্মে ॥৩৮॥

প্রহ্লাদ উবাচ—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।

তেষু তেষ্যচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥৩৯॥

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী ।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥৪০॥

প্রজ্ঞাদ বলিলেন,—হে নাথ, হে স্বচাত! যে-যে সহস্রযোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, সেই সেই জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥৩৯॥

অবিবেকীগণের বিষয়ে যেক্রপ অবিনশ্বর গাঢ়প্ৰীতি থাকে, তোমার স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেক্রপ প্ৰীতি অপসারিত না হয় ॥৪০॥

বিশ্বামিত্র উবাচ—

কিং তস্ম দাটৈঃ কিং তীথৈঃ, কিং তপোভিঃ কিমধ্ববৈঃ ।

যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং, নরাণাং মনসি স্থিতম্ ॥৪১॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মানবগণের হৃদয়স্থিত যে দেবতা, তাঁহাকে যে নিত্য ধ্যান করে, তাহার দান, তীর্থ, তপস্যা ও যজ্ঞের কি প্রয়োজন ? ॥৪১॥

জমদগ্নি উবাচ—

নিত্যোৎসবো ভবেন্তেষাং নিতাক্রীর্নিতামঙ্গলম্ ।

যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তং হরিঃ ॥৪২॥

জমদগ্নি বলিলেন,—যাহার হৃদয়ে ভগবান্ মঙ্গলময় হরি ধৃত বা আবাসিত হন, তাহার গৃহে আনন্দ, শ্রী ও মঙ্গল নিত্য বিরাজমান ॥৪২॥

ভরদ্বাজ উবাচ—

লাভন্তেষাং জয়ন্তেষাং তেষাং নিতাং চ মঙ্গলম্ ।

যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যিনি ভগবান্ মঙ্গলময় হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার জয়, লাভ ও মঙ্গল নিতাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৪৩॥

গৌতম উবাচ—

গো-কোটিদানং গ্রহণেষু কানী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ ।

যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণদানং, গোবিন্দনাম্না ন কদাপি তুল্যম্ ॥৪৪॥

গৌতম বলিলেন,—গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিলে যে-ফল লাভ হয়, গ্রহণের সময় কোটি গাভিদান, কানী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুত কল্পবাস, অযুত যজ্ঞাযুতান ও মেরু-পরিমাণে সুবর্ণদান করিলেও তাহার সহিত কখনও তুলনা হয় না ॥৪৪॥ (ক্রমশঃ)

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(পূর্বাধিকারিত ৩০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৫ পৃষ্ঠার পর)

(১) শ্রীকুলশেখর

শ্রীকুলশেখরের জন্ম, স্বরূপ ও কুল-পরিচয়

কলাক ২৭ বর্ষে কুলশেখর আল্‌বর্‌ পরাভব বংশের পুনর্জন্ম নক্ষত্রে কলিভূমিতে শেররাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুলক থাকিয়া তপস্যা-ফলে কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের কোন্তভূমির অবতার বলিয়া কুলশেখর 'শ্রী'-বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। কল্লিনগর, মলয়ালম বা মালাবার প্রদেশের অন্তর্গত। শেররাজ বা কেররাজগণ কেরলদেশে বহুকাল হইতে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরলদেশ বর্তমান সময়ে ত্রিবাক্সর রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে।

শ্রীকুলশেখরের পরাক্রম ও কেরল, পাণ্ড্য ও চোল

রাজ্যের অধীশ্বর

কুলশেখর কেবল যে কেরলানিধি ছিলেন, এরূপ নয়; তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে, তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোল-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ তিনটি রাজ্যই অতি প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-রাজ্যোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া কুলশেখর নিকটস্থ রাজ্যগণের উপর নিজ-প্রভুত্ব-স্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাণ্ড্য-রাজ্যে সমধিক বলী হইয়া অবশেষে তিনি মানব-বলের ক্ষুদ্রতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্বোত্তম বল-লাভ সিদ্ধান্ত করিলেন।

তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাস, পাণ্ডিত্য ও ভগবৎসেবার

আগ্রহ ও চেষ্টা

সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে কুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দেশ করিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আলোচনাপূর্বক সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অপরিমীম পাণ্ডিত্য হইল। ভগবানের জন্ম ক্রমশঃই হৃদয় মহাবাকুল হওয়ায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীবোদ্ধট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎক্ষেত্রসমূহ দর্শনে অভিলাষ হইল। ভক্তোচিত চেষ্টা-সমূহ ক্রমশঃই তাঁহাতে অব্যাক্ত হইতে দেখা গেল।

কুলশেখর বাহুজ্ঞানশূণ্য ও উন্মত্তপ্রায়

শ্রীরামাষ্টক পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি সংগ্রহ-পূর্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন। পাণ্ডিত্য জ্ঞান-বিহীন হইয়া রামচন্দ্রের সাহায্য-বাণী সেগাভিলাষী হইতেন। তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষৎবর্গ নিজ প্রভুর উন্মত্তচিত্ত বাবহার সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। রাজকাণ্ডের বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনীতিদক্ষ পার্শদ-নিচয় রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। নানা চলে ভক্তগণের উপর রাজার যাগাতে প্রীতির অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের কোন ক্রটি করিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ও মন্ত্রীগণের কূটক্রম ও বৈষ্ণবমর্যাদা স্থাপন

কুলশেখর শ্রীরামচন্দ্রের অর্চামূর্তির পূজা করিতেন এবং অর্চা-বিভূষণ-কল্পে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এইসকল বিষয় বৈষ্ণবগণের উপরে রক্ষা করিবার ভার থাকিত। মন্ত্রিবর্গের কূটক্রম কলে ঐ দেবালঙ্কার হইতে একটি হার অপসৃত হইল। তাহার রাজ-সমক্ষে এই অপহরণ-কার্য্য বৈষ্ণব-দিগের গুরুত্বিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিল।

কুলশেখর তাহাদিগের নিকট ভক্তবল দেখাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি তীর গরল-বিশিষ্ট-ভুজঙ্গ আনয়নের আদেশ করিলেন। সর্প-সমূহ আনীত হইলে তিনি স্বয়ং নিজহস্ত সর্প-বিবরাস্তগত করিয়া মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন যে, “যদি যদিও বন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা এই পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমার হস্ত এই ফণীরূপ কর্তৃক দণ্ডিত হইবে। নতুবা ইহারা আমার হিংসা করিবে না।” রাজহস্ত দণ্ডিত হইল না দেখিয়া মন্ত্রিসমূহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন।

শ্রীকুলশেখরের বিষয়ীর সঙ্গ-ত্যাগের পরিকল্পনা ও শ্রীরজনাত্মের সেবায় পথ-নির্মাণে আত্মনিয়োগ

তদবধি কুলশেখর মনে মনে করিলেন,—

বরং ছতবজ্রালা পঞ্জরানুব্রবতিঃ ।

ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশম্ ॥ (কাত্যায়ন-সংহিতা)

[প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কক্ষচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়।]

বিষয়ী জনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভক্তমোক্ষ বা ভক্তিমাাত্রের অবশ্যই কর্তব্য। একপন্থির করিয়া কুলশেখর পুত্র দূতবতকে রাজ্যভার প্রদানপূর্বক

স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারের চতুর্দ্বারস্থ বহু ও কতিপয় গৃহ-মণ্ডপাদি নির্মাণ করেন। অত্যাধিক শ্রীরঙ্গমন্দিরের পঞ্চসমূহের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে শ্রীকুলশেখরের পথ বলিয়া জ্ঞানপদগণ নির্দেশ করিয়া দিবে।

মুকুন্দমালা-স্তোত্র ও পেরুমাল তিরুমালি গ্রন্থদ্বয়

শ্রীকুলশেখর তামিল-ভাষায় ‘পেরুমাল তিরুমালি’ নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় ‘মুকুন্দমালা-স্তোত্র’ নামক একখানি প্রাজ্ঞল ভক্ত্যাদীপক ভাব-গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দমালার রচয়িতা বলিয়া কুলশেখর আর্য্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবের নিকটে বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রন্থের সুবহুল প্রচার হইয়াছে।

কুলশেখরের অবস্থিতি-কাল বিচার

কুলশেখরের কাল-ন্যাক্ষে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করেন যে, শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। যামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাসকালে তাঁহারাও নিজ-নিজ কার্য্য নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কুলশেখর নিজজন্মার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর উদ্ভাৱের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুলশেখর যামুনের কিছু পূর্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং তৎপূর্বে বিষ্ণুচৈত্র ও গোদা প্রভৃতি দিবাসূরি-সমূহ রঙ্গনাথের আশ্রয়ে ছিলেন।

— শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ

‘বসুমতী’ পত্রিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের শ্রীগঙ্গাদেবীর
মাহাত্ম্যসূচক অভিযত

বসুমতী-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টি অবগত হওয়া যায়,—

“ভাগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদবধি নানাশাস্ত্রে গঙ্গা-মহিমা পরিকীৰ্ত্তিত হইতেছে। যাহারা গঙ্গা মানেন না, মহিমায় তাঁহারা উপহাস করেন। সম্প্রতি রসায়ন-বিজ্ঞানবিৎ একজন সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত আমাদের ভাগীরথীকে উচ্চ সম্পদ প্রদান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। প্রকৃতরূপে স্বক্ষানুস্বক্ষ পরীক্ষা

করিয়া তিনি জানিয়াছেন, গঙ্গাজল সম্পূর্ণরূপে নিষ্কল, তাহাতে কোনপ্রকার অপবিত্রতা অথবা দূষিত কীটানুসত্তা কিছুমাত্র নাই। পৃথিবীর যাবতীয় নদ-নদীতে প্রচুর পরিমাণে অপবিত্র পদার্থ বিদ্যমান আছে, ভারতের গঙ্গা সর্বত্রাংশে সে-দোষবজ্জিত এবং সর্বতোভাবে পবিত্র। * * * একপাত্র গঙ্গাজল তিনি স্বল্পরূপে রূপভাগ (Analysis) করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত গঙ্গা-মাহাত্ম্য সমস্ত সত্য। স্বদেশে পৌঁছিয়া তিনি এই মহৎ আবিষ্কার বিষয় তথাকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন,—গঙ্গা কেবল একাকিনীই পবিত্র নহেন, গঙ্গার সহিত যে-সকল নদ-নদীর যোগ থাকে, সে-সকল স্রোতের জলও পবিত্র হয়। বিশেষ পরীক্ষা-দ্বারা ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উক্ত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বসুমতী-সম্পাদকের অশোভন মন্তব্য

শাস্ত্রে গঙ্গার মহিমা যে-প্রকারে লিপিবদ্ধ, তাহা যদি সেরূপ না হইয়া ঐক্লপ বৈজ্ঞানিক মতানুসারে লিখিত থাকিত, অজ্ঞলোকে তাহা হইলে গঙ্গাকে এতদূর আদর করিত না। ধর্ম্মের গৌরব করিয়া আমাদের শাস্ত্রকার মহাশয়েরা সকল বিষয়েই যে-প্রকার পবিত্র ধর্ম্মভাব আনিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যে-পরিমাণ উপকার হইতেছে, নীরস বিজ্ঞানের প্রমাণ দেখাইয়া তাহার। যদি সেই প্রমাণের উপর সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, আমাদের বোধ হয় তাহা হইলে ভারতের ধর্ম্মভাব কখনই এতদূর বিশ্বজনীন হইতে পারিত না।”

শ্রীল ঠাকুরের প্রতিবাদ

**অপ্রাকৃত জীব সাত্ব্যের ২৪ তত্ত্বের অতীত ; পরব্রহ্ম জীবিস্বর
পাদপদ্ম হইতেই শ্রীগঙ্গার উৎপত্তি**

প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে গঙ্গার একরূপ মহিমা যথেষ্ট নয়। প্রাকৃত অগতে চব্বিশটি তত্ত্ব আছে। জীব পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। জীবের স্থলদেহে চব্বিশটি প্রাকৃত তত্ত্ব আছে। জীবের আত্মা ঐ চব্বিশ তত্ত্বের অতিরিক্ত। তাহা প্রকৃতির অতীত বলিয়া ‘প্রাকৃত’ শব্দে অতিহিত। পরব্রহ্মও সম্পূর্ণ ‘অপ্রাকৃত-তত্ত্ব’। পরব্রহ্মের নামান্তর বিষ্ণু। ‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্’—এই কথাগুলি বেদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। সেই বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গাদেবী উৎপত্তা হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গার জল-সত্তায় যে-কিছু প্রাকৃত মহিমা থাকুক, তাহার চিৎসত্তায় অনন্ত প্রাকৃত মহিমা আছে—ইহা সর্বশাস্ত্র-সম্মত।

শ্রীগঙ্গার প্রাকৃত মহিমা অপেক্ষা অপ্রাকৃত মহিমা প্রচুর, এবং গঙ্গাস্নানে ভক্তি লাভ

যাকিণ পণ্ডিত মহাশয় এবং বঙ্গমণী-পত্রিকার লেখক মহোদয় গঙ্গার প্রাকৃত মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে-মহিমা অপেক্ষা অনন্ত মহিমা গঙ্গাদেবীতে বিরাজমান। শুদ্ধ-ভক্তমণ্ডলী একথা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, গঙ্গার নিকট বাস করিলে এবং গঙ্গাজল পান করিলে হরিভক্তির উদয় হয়। যে-জল পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের চিন্ময় পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত, সে-জলে যে হরি-পাদপদ্মে ভক্তি উদয় করাইবার শক্তি আছে, তাহা শ্রী বাসাদি মহর্ষিগণ সর্বত্র গান করিয়াছেন। জীবাত্মা বলুযিত হইয়া তত্তৎকালে হরি-বিশ্মৃতি-দুঃখে মগ্ন আছেন। গঙ্গাজলে অবগাহন করতঃ যখন তিনি হরিগুণ গান করেন, তখন তাঁহার চিত্তে ভক্তি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। গঙ্গার এই পরম গুণ কেবল ভাগ্যবান লোকেই অনুভব করিতে পারেন। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহারা কেবল প্রাকৃত গুণেই আবদ্ধ থাকেন।

অপরাধী ব্যক্তির গঙ্গাস্নানেও ভক্তিরফলের বাধা

যদি বল, অনেকেই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পান করেন, কিন্তু কখনই হরি-ভজন করেন না, তাহাতে কথা এই, যে-বস্তুতে যে-গুণ আছে, তাহা প্রতি-বন্ধকশূন্য বস্তুতেই ব্যাপ্ত হয়। Electricity (তড়িৎ) নামক বস্তুগুণ, Good conductor (উত্তম চালক) বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়। যে-বস্তু bad conductor (মন্দ চালক), তাহাতে সে-গুণ ব্যাপ্ত হয় না। তদ্রূপ জীব-গণের মধ্যে যাহারা বিশেষ বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন, তাহারা Electri- city (তড়িৎ) দ্বারা bad conductor (হীন চালক)। হরিনাম-বলে যাহারা পাপ করেন, তাহারা নামাপরাধী। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যের ভরসায় যাহারা পাপ করেন, তাহারা গঙ্গাদেবীর প্রতি বিষম অপরাধী। অন্য সমস্ত পাপ গঙ্গাস্নানে দূর হয়, কিন্তু উক্ত অপরাধ গঙ্গাস্নানে দূর হয় না। যাহাদের এই অপরাধ আছে, তাহারা তদ্রূপ bad conductor (মন্দ চালক) যে, গঙ্গার অনন্ত মহিমা অনুভবে সমর্থ হন না। এই কারণেই আজকাল গঙ্গার চিন্ময়ী শক্তি অনেকের উপলব্ধিতে আসে না, কেবল প্রাকৃত জল-ধর্ম-সকলই তাঁহাদের বুদ্ধি-গোচর হয়।

-- শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব

(পূর্ব প্রকাশিত ৩-শ-ধ ৮ম সংখ্যা, ৩০১ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু বৈষ্ণব বা গুরুর ঐক্য দৈন্যবোধক বাক্য জবাব করিয়া—রামচন্দ্র-
পুরীর জ্ঞান গুরুকে উপদেশ বা গুরুকে ‘মায়াবদ্ধ সংসারী জীব’ মনে করিয়া—
তাঁহার উচ্চার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মনোহতীষ্ট সেবার হলে তাঁহার
চরণে অপরাধ করিয়া না বসি এবং তৎফলে চিরতরে কৃষ্ণভজন হইতে
বিচ্যুত না হই।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অপরাধ-নিবন্ধন এই সকল শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের বখা
ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না; আমরা একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ
করিয়া এবিষয়টি আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের
পরমেশ্বরগুরুদেব ঐ বিষ্ণুপাদ অবধূতকুশিরোমণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু
গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রকটাবস্থায় অনেক সময়েই অপরূপ তুল, গঙ্গা-
মুক্তিকা, লঙ্কামরিচ প্রভৃতি বাছুরূপে গ্রহণ করিতেন, মৃতব্যক্তির কন্থাদি
সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিতেন; এক সময়ে সাধারণের মণ-মৃত্ত পরি-
ত্যাগের স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,
‘আমি যখন দেহরক্ষা করিব, তখন যেন আমার গলায় একটি দড়ি বাঁধিয়া
কুকুরের ন্যায় কোন ডোমের দ্বারা সমস্ত নবদ্বীপের রাস্তায় আমার দেহকে
টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; তাহা হইলে আমার শরীরে সমস্ত নবদ্বীপের
রজঃস্পর্শ হইবে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গোস্বামী মহারাজের নির্যাতনের
দিন অনেক ব্যক্তি সেখানে স্ব-স্ব উদ্দেশ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,
তন্মধ্যে বাঁহারা পূর্বে শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের এই সকল
উক্তি শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, বাবাজী মহারাজকে সমাধি
দিবার পূর্বে বাবাজী মহারাজের প্রকটকালে মনোহতীষ্টটি পূরণ করা
একান্ত কর্তব্য অর্থাৎ বাবাজী মহারাজের গলায় দড়ি বাঁধিয়া (!) তাঁহাকে
সমস্ত নবদ্বীপের রাস্তায় ধূলির মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া উচিত!
সেই সময়ে আমাদের পরমগুরুদেব প্রভুপাদ ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী ঠাকুর সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই কথার তীব্র
প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

“আমার গুরুদেবের চিদানন্দময় কালবর কোন অধৈর্য্যে স্পর্শ করিতে
পারে না, তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, তিনি নিত্যবাল গৌরপার্বদরূপে

গৌরলীলাস্থলী নন্দীপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যভরে অত্যন্ত প্রেমের স্বভাব বিবক্ষন যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার বঞ্চিত, তাহার যে-সকল কথা বুঝিতে পারে নাই। নিতাসিদ্ধ গৌরজন আমার শ্রী গুরুদেবের চিদানন্দময় কপেবর কুকুর, শৃগাল বা মর্ত্য শবদেহের ন্যায় গলায় দড়ি দিয়া পদধূলির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার বস্তু নহে— তাহা ভোগ, চণ্ডাল দূরে থাকুক, অত্যন্ত সদাচারী স্মার্ত-ব্রাহ্মণও স্পর্শ করিতে পারেন না; একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবেরই সেই চিদানন্দময় দেহের সেবারিকার আছে, তাহার সাক্ষা স্বয়ং শ্রীমদ্ব্যাপ্তি ঠাকুর হরিদাসের চিদানন্দময় দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ও নিজহস্তে সমাধি দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান করিয়াছিলেন।” এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কোন অপবিত্র ব্যক্তিকে সেই দেহ স্পর্শ করিতে না দিয়া স্বীয় প্রভুর সমাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সমাধি প্রদত্ত হইলে কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া বলিলেন যে, যখন বাবাণী মহারাজ তাঁহার প্রকট-লীলায় অনিকেত থাকিতেন, কখনও বা অশ্লীল তপ্তুল, কখনও বা কাদা প্রভৃতি ভোজন করিতেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার প্রকট-কালীয় অবস্থাবস্থার ন্যায় অনিকেত রাখা হউক এবং অশ্লীল তপ্তুলাদিই ভোগ দেওয়া হউক, তাহা হইলে তাঁহার মনোহতীষ্ট-সেবা হইবে। আমাদের প্রভুপাদ এই কথাও তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ‘এইরূপ কার্যের দ্বারা আমার প্রভুর মনোহতীষ্ট-সেবা দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তাঁহার চরণে ভীষণ অপরাধ-ফলে পাপপুতার পথই প্রশস্ত হইবে। আমার প্রভু দৈন্যবশতঃ যে অতিনয় করিয়াছেন, আমরা নিম্নস্তরে কখনও আমাদের প্রভুকে সেইরূপ মর্ত্য বা মাখক জীবের ন্যায় বিবেচনা করিব না; পরন্তু তাঁহার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট স্থান রচিত হইবে ও অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাঁহাকে ভোগ দিতে হইবে।’

যদি কৃষ্ণপ্রেমসী শ্রীতুলসীদেবী ও কৃষ্ণপ্রেমসী-শিরোমণি শ্রীরাধারানীর পাদপদ্মে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদের আরাধ্যা পূজনীয়া তুলসীদেবীকে—আমাদের এক গুরুকে অস্ত গুরুর চরণে—এক শক্তিকে অস্ত শক্তির চরণে আমি স্বয়ং প্রণোদিত হইয়া প্রদান করিতে পারি না; তাহাতে শ্রীরাধারানীরও সুখ হইবে না, আর মর্যাদা লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ দেখিয়া শ্রীতুলসীদেবীরও তাহাতে মনোহতীষ্ট-পূতি হইবে

না। গুরু বা বৈষ্ণব কখনও সিদ্ধান্তবিরোধ সহ্য করিতে পারেন না; সিদ্ধান্তবিরোধ করিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মনোহতীষ্ট-পৃথি হয় না। আমরা পরাশক্তি শ্রীরাধারাগী বা কৃষ্ণশক্তিবর্গ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবাদির শ্রীহস্তে শ্রীতুলসী স্থাপন করিতে পারি। আর শক্তিমত্তত্বের চরণকমলে তুলসী প্রদান করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, পঞ্চভূতমদো শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু গদাধরাদি শক্তিবর্গের বা শ্রীগুরুর চরণে তুলসী প্রদান করা যায় না। শ্রীতুলসী-প্রণাম ও প্রাচীন পদাদিতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ইহার পিণ্ডীত আচরণ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—অভক্তিমার্গ।

৪। দ্বাদশ-তিলকের দেবতা—কৃষ্ণেরই তদেকান্তরূপ-বৈভববিলাস; ইহা বা দ্বিতীয় চতুর্ভূতের প্রকাশ-বিগ্রহ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে ইহার ভিন্ন নহেন। সাধক জীব নিরন্তর বিষ্ণু-স্মরণ ও দেহকে সচ্চিদানন্দময় ভাবনের সেবোপযোগী কবিতার জন্য হার্ষনাদিকালে তিলকাদি দ্বারা হরি-মন্দিরসমূহ রচনা করিয়া তত্তৎস্থানে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তির অমিষ্টান চিহ্ন করেন, ইহাতে ইহাদের সর্বকণ বিষ্ণুমূর্তি-সংরক্ষণের সহায়তা হয়। নবকিশোর দ্বিভূজ-সুবলীদন ব্রহ্মল্লনন্দনই জীবের একমাত্র আরাধা ও ধোষ; কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণ-রূপ ধানের যোগ্যতা নাই। কারণ লীলাপুরুষোত্তম অচরুপ শীকৃষ্ণের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কাগাই নাই; অনর্থযুক্ত—অনর্থযুক্তের মধ্যে আবার রাগান্বিত-রক্তবাসিনার অনন্ত জাতব্রতি পুরুষগণেরই কিশোর-বংশীদমন-শ্যামরূপ-ধ্যান-যোগ্যতা। অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব; অনর্থযুক্তারহ্য কৃত্রিম উপায়ে কিশোর-রূপ ধানের চেষ্টা পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। অনর্থযুক্তারহ্য নামাত্মকমন্ত্রদ্বারা হার্ষনাদি, হার্ষনাদিকালে ভক্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান, সর্বত্র বিষ্ণুচিহ্ন এবং কৃষ্ণঃ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা অনর্থ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় নামাপরাধ বজ্রিত নামাভাস এবং মৃত নামের সমাভবনাত্মক রূপ-মৃগ-লীলা-সন্দর্শনই সিদ্ধির ক্রমপন্থা। শুদ্ধ নামই নামীর কিশোর-শ্যাম-দ্বিভূজ-সুবলীদন শ্যাম-সুন্দর-রূপ প্রদর্শন করান; ক্রমে তাঁহার মূলে লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তখনই প্রকৃত কিশোররূপ ধ্যান হয়, তখন আর পৃথক ভাবে বিষ্ণুরূপ বা দ্বাদশ আছে দ্বাদশ তিলকের চিহ্নের অবসর থাকে না, যেমন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুর্বীর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়—

“মানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সঙ্ঘাট বঙ্ঘাভব-
 দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সংপৃটিতাস্তুঃ ক্ষুটী।
 ধর্মো মর্ষংতো হৃদম্মনিচয়ঃ প্রাথঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
 চিত্তং চুষতি যাদবেন্দ্রচরণাস্তোজে মমাহনিশম্॥”

কিন্তু বাহ্যে সেই প্রকার জ্ঞাতরতি বা সহজকৃষ্ণকৃবাহুস্মৃতি-পন্ন হইতে পারেন না, যাঁহাদের নিরন্তর ঐকান্তিক কৃষ্ণ-স্মৃতির বাবধান রহিয়াছে, তাঁহারা অর্চনাদি-কালে কেশবাদি দ্বাদশ নামোচ্চারণপূর্বক যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রচনা করিবেন, তাঁহারা সায়াং ও প্রাতঃ-কালে ভগবদর্চনার সময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ও নিজ কল্যানার্থ স্বীয় অঙ্গে হরিমন্দির রচনা করিবেন (হঃ ভঃ বঃ ৪৬৬ ও ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এজেন্দ্রনন্দন সর্বজ্ঞানের আরাধ্য হইলেও তাঁহার বৈভব-প্রকাশ বিষ্ণু-মুক্তি সমূহই অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এই জন্যই শাস্ত্র বলিলেন,—“তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে” অর্থাৎ পুরুষাদি বিমুদ্রাবতার-সমূহকে জানিলেই জীব অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে, নিরন্তরনর্থ পুরুষই কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণধ্যানের অধিকারী। (খ) একই সাধকের পক্ষে এক অদ্বয়তত্ত্ব বিষ্ণুই প্রকাশবিগ্রহ-সমূহ-চিত্তনে চিত্ত-নিষ্কপের সম্ভাবনা নাই। অদ্বয়-বস্তুর স্মৃতিতে দ্বিত্বাভিনিবেশ আসিতে পারে না। (গ) বিষ্ণুমুক্তি-সমূহ বৈকুণ্ঠে স্বীয়ধামে বিরাজিত থাকিলেও জীবকূলে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য অচিন্ত্য-শক্তি-বলে ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব-ধামসহ অধিষ্ঠিত আছেন, আবার সাধকে কৃপা করিবার জন্য সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবরূপে বিরাজিত। বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদানকারণ সমস্তই যখন বিষ্ণু, তখন প্রতি জীবের দেহের সর্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জীবের এই জ্ঞানটী উদ্ধুক্ত থাকিলে জীব এই দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই তত্তদধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বিষ্ণুর সেবা ব্যতীত ইতর বস্তুর সেবা করিতে পারে না। সর্বদেহে ও সর্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ভুলিয়া গেলেই আমাদের ইতরকার্য্যে অভিনিবেশ আসিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অভিনিবেশ দূর করিয়া সর্বত্র কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্বোধন করিবার জন্যই জীবের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্তার প্রণালী পরম-কারুণিক ঋষিগণের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে।

জগজ্জ্ঞান

বর্তমানে একদিকে যেমন নানাবিধ উপধর্ম, বাস্তিগারযুক্ত অপধর্ম, কৃষ্ণ-ভক্তিস্বাভাবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মনোধর্ম ও দেহধর্ম নির্মূল গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাকালকে আচ্ছন্ন করিয়া শুদ্ধভক্তি স্বরূপদর্শনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, তদ্রূপ চিচ্ছিন্নসম্বল্যবাদের ও নানাবিধ অসৎ মনোধর্মের তামসী ছায়াও গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে বিপন্ন করিয়াছে। আজকাল অনেকে বিদেশীয় ধর্মের অনুকরণে শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম বা আত্মধর্মকে একটি পোষাকী ব্যাপার বা ক্লাস্তি ও অবসাদের বিশ্রামাগারের ছায় ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু মনে করিয়া মহাপ্রভুর ধর্মের নামে জগজ্জ্ঞান উপস্থিত করিতেছেন। ইহাদের সর্বপ্রথমেই জানিয়া রাখা আবশ্যিক যে, শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রচারিত ধর্ম পোষাকী ধর্ম বা আত্মেন্দ্রিয় তোষণের জন্য মনুষ্য সৃষ্ট মনোধর্ম নহে, উহা আত্মধর্ম। ঐ আত্মধর্মে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাহুর অবকাশ নাই। কুশেন্দ্রিয় প্রীতীচ্ছা বা কামমনোবাকো নিরন্তর হরিতোষণই এই আত্মধর্মের উদ্দেশ্য এবং উহাই সর্বজীবের সর্বসময়ে স্বরূপ ধর্ম। পোষাকী ধর্মমূহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ। আজকাল অনেকে মহাপ্রভুর ধর্মকে ‘পোষাকী ধর্ম’ মনে করিয়াছেন অর্থাৎ জগতের নানাবিষয় কার্যো, ছল জুয়াচুরী, বাস্তিচারে অথবা উহা হইতে বিরত থাকিয়া নৈতিক আচারে আবদ্ধ, বিশিষ্ট সামাজিক বা নৈতিকরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর—

“কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।

কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে ঘুচে ভবরোগ॥”

—এই উক্তির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া অর্থাৎ নানাভাবে বিষয়-সেবা, জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অর্জনেচ্ছা লইয়া সারাদিনের ক্লাস্তি ও অবসাদের পর সন্ধ্যাকালে থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখিয়া ক্লাস্তি অপনোদন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করার ন্যায় যদি ধর্মের নাম করিয়া এবং ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া ও নামাপরাধকেই ‘নাম’ বলিয়া চালাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তৎসঙ্গে একাধারে ধার্মিক ও প্রামক প্রতিষ্ঠাটা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এমন সুযোগ কে ছাড়ে? এইরূপ কপটতা বা কুটি-নাটী হইতেই আজকাল গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নাম করিয়া সম্মিলন গৃহ প্রভৃতি রচিত হইয়াছে ও হইবার চেষ্টা চলিতেছে।

আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য শিক্ষিত বহুদৈন্য মনুষী তাঁহাদের মনোধর্মের নানাবিধ আকাশকুসুম-সদৃশ স্বপ্নময় চিন্তাশ্রোতে ভাসমান হইয়া এবং উহাকেই ‘শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণা’ মনে করিয়া বিদেশীয় পোষাকী ধর্ম-মন্দিরের অঙ্করণে কোন কোন নগরীতে শ্রীনিত্যানন্দ গোবিন্দদেবের মন্দির ও প্রহরের উদ্দেশে সম্মিলনের স্থান খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সকল মনুষীগণ আরও ভাবিয়াছেন যে, ইহাতে সর্ব ধর্মের লোক তাহাদের স্ব-স্ব অপধর্ম, উপধর্ম বা মনোধর্ম অবস্থিত থাকিয়াও কোন একটি অবসর সময়ে আসিয়া নামাপরাধ-কীর্তনে যোগদান দিয়া পিত্তবৃদ্ধি, নাচা কোঁদা ও পিত্তবৃদ্ধিকায়া এবং ইন্দ্রিয় তর্পণ ত’ আজকাল প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রতি ঘরে ঘরেই চলিতেছে এবং দশায় পড়া ও পিত্তবৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা শরীর উত্তেজিত করার দরুণ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ানুষ্ঠান, গাঁজা, ধূমপান প্রভৃতির কলিহান পঞ্চকের প্রাবল্য মহানগরীগুলিতে সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ সকল কলিহানগুলি পৃথক পৃথক গৃহে থাকিলেই ত’ সমাজের বিশেষ ক্ষতিকর হইত না। এক জায়গায় আড্ডা বাঁধিয়া ঐক্য চেষ্টা করার সার্থকতা কি ?

দ্বিতীয়তঃ আমরা শ্রীগৌরভক্তগণের আচরণে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যে মনোধর্ম ও আত্মধর্মকে এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে যেন নাই। শ্রীমহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে কিছু যবন রাখিয়া হরিনাম সংকীর্তনে অধিকার দেন নাই। যবনত্ব ঘুচাইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াই তাঁহাকে শ্রীহরিনামের আচার্য্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি হরিদাসকে একরূপ বলেন নাই যে,—তুমি তোমার জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম লইয়া থাক ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কিছু সময় তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য হরিনাম করিও। পরন্তু তিনি শ্রীহরিদাসকে প্রকৃত পক্ষে হরিদাস বা সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন-পর একনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের আদর্শরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আবার হরিদাসের আচরণে আমরা কি দেখিতে পাই ? ঠাকুর হরিদাস বারবনিভার স্বধর্ম বাস্তিচার বা ‘বেশ্যাবৃত্তি রাখিয়া’ বেশ্যাকে হরিনাম সংকীর্তনে অধিকার দেন নাই। হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবতের দর্শন ও নঃস্কারাদি রূপ সেবাদ্বারা বৈষ্ণব-পরাধশূন্য পাপীয়সী বেশ্যার ভক্তদানুখী স্মৃতির উদয় হইয়াছিল এবং তাহার উপর আবার হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় শুদ্ধ মহাভাগবতের শ্রীমুখে

অপরাধশূন্য শুদ্ধনাম শ্রবণ করাতে ঐ বেশ্যার নির্কেদ ও আব্রাহ্মানি উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সেই বেশ্যা তাঁহার পূর্ববৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুর হরিনামের চরণে আত্মনিবেদন করায় এবং সর্বতোভাবে অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক নিরন্তর বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিচিতে হরিনাম গ্রহণ করায় তাঁহার মঙ্গলোদয় হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের মতলব অল্পরূপ। আমরা মনে করি, আমরা পূর্ণ-মাত্রায় অসৎসঙ্গ ও বিষয় সেবা করিব, যে-সকল বিষয়ী ব্যক্তি 'গুরু' বলিয়া পরিচিত সেই সকল গুরুরূপকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া যাহাতে বিষয় ও অসৎসঙ্গ হইতে ছুটি না পাওয়া যায়, তজ্জন্য চতুর্দিকে নানাপ্রকার অসৎসঙ্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া রাখিব, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ করিব, ক্রমে ভোগবুদ্ধি করিব এবং অপরাধময় ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা হরিনামের ভান দেখাইয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করিয়া তবৈষ্ণবো-পদিকে মন্ত্র জপ করিতে করিতে নরকপথের পথিক হইব।

পৃথিবীর—পৃথিবীর কেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত চেতন আছে সকলেই শ্রীচৈতন্যের ধর্মের অধিকারী। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম শুধু কোন দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে। কিন্তু ইহাতে তৎসঙ্গে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীচৈতন্যে অচেতন্য—নাই, আলোতে অন্ধকার নাই, প্রেমে প্রাকৃত কাম নাই। অচেতনত্ব রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম গ্রহণ করা যায় না। অচেতনত্ব ত্যাগ করিলে অর্থাৎ চেতনতা বা দিব্যজ্ঞানদাতা চৈতন্য-সেবা-রত সৎগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় ও সর্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও তাঁহার প্রবর্তিত 'শ্রীনাম'-কীর্তনে অধিকার জন্মে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভৃ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ততো হুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংসৃ সজ্জিত বুদ্ধিমান।

সন্ত এবাস্ত চিন্তাস্ত মনো-ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ। (ভাঃ ১:১২৬:২৩)

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।

শ্রীসঙ্গা এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর। (চৈঃ চঃ মধ্য ২:০৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেব "সত্যং প্রসঙ্গানুমবীৰ্য্য সংবিদঃ"—এই শ্লোকে নিষ্কিঞ্চন সাধুজনের যুগোদ্ধারী বীৰ্য্যবতী হরিকথা-সেবনকেই ব্রহ্ম-রতি উদয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অসতের সমাজে, অনা-

ভিলাষী, জ্ঞানী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিসমূহে যে-সকল মিছা হরিকীর্তনের
বাহ্যকার ও বাহ্যভঙ্গর দৃষ্ট হয় তাহা ধারা শ্রীহরি কীর্তিত হন না। শ্রীগৌর-
ভক্তগণের আচরণ ও শাস্ত্রে এই বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।
উদার-মণ্ডের নামে বাতিচারী ও অন্ত্যভিলাষিগণ মহাবদান্য গৌরসুন্দর ও
গৌরভক্তগণের এই অসংসঙ্গ গর্হণ ও সংসঙ্গনিষ্ঠা ও সংঙ্গে শ্রীহরিতোষণকে
অনুদারতা বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাই পরমুৎকৃষ্ণী
ই-সকল মহাত্ম্যগণের পরম কৃপা ও উদারতা। বালক যেরূপ পিতার
শাসনকে অথবা নিকারগ্রস্ত বোগী যেরূপ সৰ্ব্বদ্বৈত উপদেশকে অনুদারতা
মনে কাঁচা থাকেন, তদ্রূপ ইহাও অন্ত্যভিলাষিগণের বাতিচারী ও
নিকার প্রলাপ মাত্র।

শ্রীগৌরভক্তগণ জগতে যত মনোধান্থিকের ধান্থিকত্ব ও অসাম্পূর্ণ মনো-
ভাবা নাটক পরিচয় করিয়া অর্থাৎ অচেতনের দ্বারা পরিচয় করিয়া
চেতনের বৃত্তি-দ্বারা পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহ শ্রীচেতনের সেবা করিবার জন্য
জগতে সর্বজীবকে আহ্বান করিয়াছেন—

হে সাধবঃ, সকলমেধ বিহায় দূরাং ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

শ্রীগৌরঙ্গ-প্রসঙ্গে

গৌরঙ্গ এসেছেন মে গোশোক হ'তে ।

উদ্ধারিয়া জীব সুখসাগরে ভাসাতে ॥

এক ফল্গুনী পূর্ণ শশী তিথিতে,

বৎসর গণনায় চতুর্দশশত-সপ্ত শকেতে ;

নবদ্বীপ ধামে নদীয়া-নগর মায়াপুরে,

হয়েছিলেন উদয় জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ॥

লালিত হ'য়েছিলেন শচীমাতার কোলে,

স্তন্যপান ক'রেছিলেন শিশুকালে ;

শৈশবে কাটায়েছেন কাল হাসিতে খেলাতে,

কাটায়েছেন কাল বাণ্যে অতীব চঞ্চলাতে ;

কৈশোরে সাথীসনে সুরধুনী-জলে,

ক'রেছেন স্নান, সম্ভরণ অতি অবহেলে ;

শুক বসন দিয়াছেন ভিজায়ে নীরে,

রেখেছিল যাহা স্নানার্থীরা গঙ্গাতীরে ;

যৌবনে কীর্তনধারা বরষিয়াছেন পথে গাহিয়ে,

সবারে আনন্দমুখরসাগরে ভাসিয়ে ;

যারা ছিল দূরে দাঁড়ায়ে তীরে,

ভাসিয়েছে বক্ষ আনন্দে নয়ন-নীরে ;

তারা কেহ যায় নাই ফিরে,

শূন্য হৃদয়ে নিজ নিজ ধরে ;

জগাই মাধাইকে আপন মহিমায় করুণাতে,

দিয়াছেন বাধা বিপথে নামিয়া যেতে ;

দান্তিক পণ্ডিতে দিয়া দিব্যজ্ঞান,

দস্ত করেছেন চূর্ণ তাদের হৃৎমনে ;

ক্ষমা ক'রেছেন তাদের সব অপরাধ,

অপরাধীজনের যত মনের বিষাদ ;

বলিতে ভাষা নাহি জুগায় আমার,

করুণা-গাথা হৃদয়-ভাব তোমার ;

লহ প্রভু, মোর অসংখ্য নমস্কার ।

দীন মাগে চরণে আশ্রয় তোমার ॥

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতা—৫৩

সেবাবিচার ও সাম্যবাদ

কৰ্মকাণ্ডীৰ বিশ্বে 'সাম্যবাদ' কথাটীৰ সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্যবাদ জড়-সুবিধাবাদের পন্থিক সামগ্রীবিশেষ। ভিত্তিচ্যুতনের নিখিল-স্বখতাৎপর্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে চেতনপরা বৃত্তির স্বাভাবিকী গতির উল্লাস, তাহাই 'সেবা'। জড়বাস্তি বা সমষ্টি-জগতের সুখ-সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া যে যুক্তি বা নীতির উদয় হয়, তাহাই 'সাম্যবাদ'।

সাম্যবাদের প্রস্তাব এই,—সংসারকেই সমানচক্ষে দেখিতে হইবে। কাহারও প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা কাহারও অধিকতর অঙ্গুদায় সহ্য করা হইবে না। কারণ, উহা সমাজের স্বখ-স্বচ্ছন্দ্যের বিরুদ্ধ। সাম্যবাদের প্রস্তাবকারিগণ বলেন,—একজনকে কেন ভাল খাইতে দেওয়া হইবে, আর একজন কেন খারাপ খাইবেন? একজন কেন শ্রমিক, আর একজন কেন ধনিক হইবেন? একজন কেন দাস, আর একজন কেন প্রভু হইবেন?

সাম্যবাদী যাহাই প্রস্তাব করুন না কেন এবং তাহা ভোগময় জগতের লোকের চক্ষে আপাততঃ যতটুকু যুক্তিযুক্ত ও নীতিপুষ্ট বলিয়া প্রতীত হউক না কেন, এই কৰ্মময় জগতের ধর্মটি এটি, অথবা কর্মের ধর্মই এটি, এখানে উচ্চ বচন-স্তরে অবিচল থাকিবেই। এখানে একজন মনোবয় পরিচ্ছদে বিভূষিত এবং বর্ষা ও আতপ-তাপ হইতে সংরক্ষিত হইয়া নর-ঘানে আরোহণ পূর্বক মন্ডপে বহির্গত হইয়াছেন, আর এক বেচারী—যদিও উচ্চ আরোহীর ক্রাঘট হই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়নিশিষ্ট, তথাপি ভাণ্ডকে বোঁদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, নগ্নপদে, জীর্ণবসনে বিলাসী আরোহীর বোঝা টানিতে হইতেছে। এই কৰ্মময় জগতে ভাণ্ডীর লাল-পালা-মুণ্ডায় বালক ভূমধাগত অসহ্য দুর্গন্ধ ক্লেদপরিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, আর ঐক্লপই সমস্নেহনিদান ও সমবয়স্ক সহানুগণের পিতা ভাগ্যক্রমে কতকগুলি অর্থের অধিপতি হওয়ায় দ্বি-ত্রিতল প্রাসাদের স্বরমা গৃহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ মেধর-গালকের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিবার জন্য মহা-আরামে মল-মূত্রাদি উৎসর্গ করিতেছে। ইহারই নাম 'কর্মরাজ্য'। কর্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে কতকগুলি আরোহী কিছুকণের জন্য উপরের দিকে থাকে, আর কতকগুলি কিছুকণের জন্য নিম্ন-দিকে যায়। আবার দোলা ঘুরিয়া নাচের দিকের আরোহীদিগকে উপরে

উঠায়, উপরের আরোহীদিগকে নীচের দিকে নামায়। যে-মুহূর্ত্তে আমরা বাহাদিগকে উপরের দিকে দেখি সেই মুহূর্ত্তটুকুই জ্ঞান তাহাদিগকে ‘উচ্চ’ ‘বড়’, ‘ভাগ্যবান’, ‘পুণ্যবান’ প্রভৃতি বলি, আবার যে-মুহূর্ত্তে বাহাদিগকে নিম্নদিকে দেখি, সেই মুহূর্ত্তের জ্ঞান তাহাদিগকে ‘নীচ’, ‘ছোট’, ‘দুর্ভাগ্য’, ‘পাপী’ প্রভৃতি বলিয়া থাকি। যিনি যজ্ঞে প্রস্তুত করুন না কেন, এই কর্ম-দোলার আরোহীর কতকগুলি লোক এক সময়ে উর্দ্ধদিকে এবং কতকগুলি নিম্নদিকে থাকিবেই থাকিবে।

কর্মবাজের এইরূপ উচ্চাচ ভাব দেখিয়া কর্মফলদাতা বিষ্ণুর শক্তি অপেক্ষা—স্ব-স্ব-অস্তিত্বের মূল পুরুষ বিষ্ণুর বল অপেক্ষা হীংসার তাত্ক্ষণিক প্রত্যক্ষলব্ধ দৈহিক বশক্রেত অধিকতর বিবেচনা করেন, সেই সম্প্রদায় ‘সাম্যবাদ’ নামে এক প্রকার ভোগময় মতবাদের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যজগতের প্রায় সর্ক্সস্থানেই নূনান্বিক বিশিষ্ট আকার-প্রকারে এই মতবাদের আ-র্গণ্য হইয়াছে ও চলিতেছে।

এই সাম্যবাদি-সম্প্রদায়ের প্রস্তাবিত সৌম্য বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকাররূপ সিকতাসূত্রে উপর কল্পিত হইয়াছে। বিষ্ণুর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রত্বা এবং কর্ম-ফলের প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থাকে বলযুক্তির দ্বারা বিপর্যাস্ত কবিনার বুদ্ধি হইতে এইরূপ সাম্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি আধ্যাত্মিক সাম্যবাদী যেখানে প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থায় পক্ষপাত-দোষ দর্শন করিয়া বিষ্ণু অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত এবং তাহার প্রতিশোধ-গ্রহণ-কল্পে সাম্যবাদের প্রস্তাব লইয়া আবির্ভূত, সেই স্থানে সেবার বিচারকগণ,—

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো

কৃষ্ণান এবাত্মকতং বিপাকম।

সুদ্বাথপুণ্ড্রবিদধনমন্ত্রে জীবন্ত

যো নুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

—শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে সমুদয় বিষ্ণুর—স্বরাট্ ক্রমের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা-কামাগ্নির ইন্ধনরূপে ক্রমের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত। ক্রমের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত বলিয়াই কর্মের উচ্চাচ-বিচার-রূপ বৈষম্য-ভাব হইতে মুক্তি তাহাদের করতলগত। তাহারাই প্রকৃত সাম্যবাদের ভূমিকায় আরোহণ করিয়া পরা শাস্তির অধিকারী। তাহাদের পরা শাস্তি জড়সাম্যবাদের প্রস্তাবিত সাম্য বা শাস্তির আকাশকুসুম মাত্র নহে।

জগতে সাম্যবাদ সম্ভব নহে জড়ের ধর্ম্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। চেতনের ধর্ম্যে তাহা নাই। চেতন-রাজ্যে জড়ের হেয়তা নাই, কিন্তু তথায় কেবল জড়-বৈষমানিষেক সাম্যভাব বাস্তবীকৃত নিত্য সেবা-বিচিত্রতা ও সেবা-তারতম্য আছে। চেতন-রাজ্যের উপাদেয় ও অখণ্ড বাস্তবতার প্রতিফলনই জড়-রাজ্যে হেয় ও খণ্ডভাবে লক্ষিত হয়। সেবালতা বিরক্তির ত্রিগুণ-সাম্যভাব—ব্রহ্ম-লোকাকর্গত নির্বিশেষভাবে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধ গোলোকে স্বর্গাটের স্ব-শাস্ত্রস্বাময় পক্ষপাতিত্বের রাজ্যে আবিষ্কার করে। জড়-সাম্যবাদী কোন দিন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

দ্রিষ্টুর অস্তিত্ব অস্বীকারে যে সাম্যবাদের ভূমিকা-পত্তন হইয়াছে, সেই সাম্যবাদ উত্তর অধিকার-বহির্ভূত সেবারাজ্যে কখনও কখনও হস্তপ্রসারণের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। সকলেরই সমাবস্থা হইবে, একজনকে কেন উৎকৃষ্ট আসন, উৎকৃষ্ট বসন, উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান করা হইবে, আর একজন কেনই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন; সকলেরই সমান অধিকার, সকল ক্ষিনিষই সমষ্টিব মতো সমানভাবে বন্টন করিয়া দাও—এই জাগতিক নীতি ধর্ম্মরাজ্যেও প্রচলিত করিবার যত্ন সাম্যবাদী অদৈবগণের দ্বারা নূনাধিক সকল যুগেই সাধন হইয়াছে।

ভগবান ভক্তের পক্ষপাতিত্ব করিবেন কেন? যিনি পক্ষপাতিত্ব করেন, তাঁহাকে 'ভগবান' বলি যাইবে কেন? ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার থাকিবে কেন? অতীত তাহাকেই যামদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কাণ্ডখানায় 'ভগবান' বলিয়া গুণিতা হইল।—যিনি সাম্যবাদের সমর্থক হইবেন—যিনি ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—সকলই সমান বলিবেন—যিনি শুদ্ধ ও কন্মীকে সমচক্ষে দেখিবেন।

সাম্যবাদী ধর্ম্মরাজ্যে হস্তপ্রসারণের ধৃষ্টতা দেখাইয়া জীবের প্রাণা-স্থান-সম্পদেও নানা প্রকার ভোগময় যত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—শিব, শক্তি, গণেশ, স্বর্গা. (কর্ম্ম-চলনাবস্থা) দ্রিষ্টু, স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে যিনি যাহারই ভজন করুন না কেন, সকলেই একস্থানে যাইবেন। সাম্যবাদের বলসেবায় বিচারে সমতা প্রাপ্ত করাইতে হইলে কল্পিত শক্তি, শিব, গণেশ, স্বর্গা, কল্পিত বিষ্ণু—সকলকেই চরমে চূরনার করিয়া না ভাঙিলে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বৃত্তাং বিকৃত সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ—নির্বিশেষবাদ; অথবা নির্বিশেষবাদেই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা।

সাম্যবাদী এইরূপ সাম্যবাদ-ধর্মের ধ্বজা প্রদর্শন করিয়া অনেক সময় শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্তকে বিকৃত করিয়া থাকেন। সাম্যবাদী,—

যেহ পাণ্ডে দেবতাভক্য যজন্তে শুদ্ধয়াহিতাঃ।

তেহপি মামেব কোশ্চেষ্য যজন্তাদিধিপূর্বকম্ ॥

—শ্লোকে কৃষ্ণের স্বতন্ত্র-পুরুষোত্তমত্ব না দেখিয়া সাম্যবাদের আদর্শ দেখিতে পান। সাম্যবাদী বলেন,—যাঁহারা শুদ্ধাশ্রিত হইয়া অত্র দেবতার ভজন করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ভজন করেন, সুতরাং অত্যাশ্র দেবতার ভজন এবং কৃষ্ণের ভজন—সমান। তাঁহারা ‘অবিধি’ কথাটি ছাড়িয়া দেন : কারণ সাম্যবাদীর বিচারে ‘বিধি’, ‘অবিধি’—সবই সমান। ‘অবিধিপূর্বক’ কথাটি দ্বারা যে কৃষ্ণেরই স্বতন্ত্র পুরুষোত্তমত্ব প্রমাণিত হইতেছে, কৃষ্ণ-বাতীত যে অপরি দেবতার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই এবং স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ভজনই যে একমাত্র বিধিপূর্বক ভজন,—ইহা সাম্যবাদী বুঝিতে পারেন না।

সাম্যবাদী অনেক সময় বলেন, যখন—

যাস্তি দেবতাতা দেবান্ পিতৃন যাস্তি পিতৃত্বতাঃ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজা যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥

অর্থাৎ যাহারা দেবতাত, তাঁহারা দেবলোক, যাহারা পিতৃপূজক, তাঁহারা পিতৃলোক, যাহারা ভূতপূজক, তাঁহারা ভূতলোক, আর যাহারা ভগবৎসেবক, তাঁহারা ভগবৎলোক লাভ করেন, তখন সকলেই নিজ নিজ অধীকৃত প্রাপ্ত হওয়ার সকলেই সমভাবে স্থায়ী। সুতরাং সকল পূজাই সমান। জীবপূজা (৭) ও পরমেশ্বর-পূজা, উভয়ই—সমান।

সাম্যবাদী,—

“যে যথা নাং প্রপন্নন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্।”

শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলেন, যিনি ভগবানকে যেভাবেই উপাসনা করেন না কেন, ভগবান সমান ফলই দেন। যত মত, তত পথ। প্রাপ্য স্থান সকলেরই এক।

সাম্যবাদীর এইরূপ ভ্রান্ত বিচার ও বিকৃত ব্যাখ্যা তাহাকে সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ নির্দ্বিগুণ-প্রহেলিকায় প্রতীত করে। কিন্তু সেবার বিচারে এই সকল শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপিত হইলে সাম্যবাদ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যাস্ত হয়। ভগবান “যাস্তি দেবতাতা” শ্লোকে দেবপূজক, পিতৃপূজক ও ভূতপূজকগণের সহিত নিজ-সেবকগণের প্রাপ্য-লোকের অসাম্য বা বৈষম্যই

প্রদর্শন করিয়াছেন। “যে যথা মাং প্রপত্তন্তে” শ্লোকেও ভগবান্ আধার্মিকের সাম্যবাদ নিরাস করিয়াছেন। যিনি যেক্রপভাবে ভগবানে প্রপন্ন হন, ভগবান্ সেইরূপভাবেই প্রপন্নব্যক্তিকে ফল প্রদান করেন। যিনি ভোগের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে তাঁহার ভোগ-প্রদাত্তী জড়শক্তির দ্বারা জড়ভোগ প্রদান করেন, যিনি আত্মবিনাশের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে নিবিশেষপ্রাপ্তিরূপ আত্মবিনাশ প্রদান করেন, আর যিনি তাঁহার সেবার জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে সেবাসুখ প্রদান করেন। ন্যায়পরায়ণ বিচারক চৌর্য্যাপরাধীকে যেক্রপ ফল প্রদান করেন, সাধুকে সেইরূপভাবে ফল প্রদান করেন না। সাম্যবাদীর বিচারে ‘চোর’ ও ‘সাধু’, ‘ধার্মিক’ ও ‘অধার্মিক’, ‘কন্মী’ ও ‘ভক্ত’—সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা ধর্ম্মের ধ্বজা হস্তে লইয়া নাস্তিকতার নিবিশেষ-মাগরে আত্মহত্যা করেন।

আধুনিক তথা-কথিত সমন্বয়বাদ একটা প্রবাহ-বিশেষ। আধুনিক তথা-কথিত সমন্বয়বাদী মুখে যতই ‘সমন্বয়’ ‘সমন্বয়’ বলিয়া চীৎকার করুন না কেন, এদিকে তাঁহারা তাঁহাদের কল্লিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর (!), তাঁহাদের মতকে সর্বাপেক্ষা সমীচীন ও উদার, সেই মত প্রচারকারীকে সকল অবতারের সেরা-অবতার (!!), প্রভৃতি বলিয়া অবৈধ গোঁড়ানীর এভাবেষ্টে আরোহণের-যে দুঃসাহসিকতা দেখাইতেছেন, তাহা সাম্যবাদের ইন্দ্রজাল-বিজ্ঞায় প্রতারিত-নেত্র আ-নখ-কেশাগ্র বিক্ষুব্ধবিরোধী দুনিয়ার লোক বুঝিতে পারে না।

সাম্যবাদী নাস্তিকতার নীতিপুষ্ঠে মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধ হৃদয়ে বিচার করেন, কেন বৈষ্ণব বা গুরু ‘প্রভু’ হইবেন, আর আমরা তাঁহাদের ‘দাস’ হইতে যাইব ? একজনকে বা এক সম্প্রদায়কে কেন উচ্চ আসন দেওয়া হইবে, আর একজন বা এক সম্প্রদায় কেনই বা নিম্ন আসনে আসীন থাকিবেন ? জাগতিক নীতি-পরিপুষ্ট বিচারে সাম্যবাদীগণ সেবকসম্প্রদায়ের এইরূপ বৈষম্যবাদকে প্রাচীন রোমের পেট্রেসিয়ান ও প্লিবিয়ান্গণের অত্যাচারের ন্যায় বিচার বা ‘অটোক্রেসি’র সেচ্ছাচারিতা মনে করিয়া ‘ডেমোক্রটিক্’ বা সংখ্যাধিক্যের বিচারকেই সমীচীন মনে করেন। কেহ কেহ আবার ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া বলেন, সকলেই যখন ভগবানের সন্তান, অভক্তও সেইরূপই সন্তান, সুতরাং ভক্ত-সম্প্রদায় ‘প্রভু’ হইবেন, আর অভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাদের অধীন হইবেন—ইহা কিরূপ বিচার ? কৃষ্ণকে একমাত্র প্রভু স্বীকার-পূর্ব্বক বাদবাকী

সকলেই কৃষ্ণের দাস—এই নিত্য-স্বরূপ-সিদ্ধ বিচারের আবাহন করা সাম্যবাদীর মতে অর্থোক্তিক ও অন্যায হওয়ায় তাঁহারা সকলেই ‘ব্রহ্ম’ মনে করিয়া সাম্যবাদের নীতিপুট বিচারে প্রবিষ্ট হওয়াই সমীচীন পোষ করেন।

সাম্যবাদী মনে করেন,—ঈশ্বরও ত’ কম তোষামদপ্রিয় নন। ষাঁহারা অধিক ‘ধামাধরা’, তাঁহাদের জন্য তিনি নীতি-লজ্জ্বন করেন—‘দিনকে রাত করেন’; এইরূপ তোষামদপ্রিয় ব্যক্তিকে কেন পরমেশ্বর বলিব? এইরূপ বিচার করিয়া সাম্যবাদী পরমেশ্বরকে একেবারে ‘নাকচ’ করিয়া দেন, ‘কৃষ্ণ-ভক্তের আনুগত্য’ কথাটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কখনও কণ্টতা করিয়া মুখে না হাসিলেও আন্তরিক অস্বীকার করেন, কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত অনাবশ্যক মনে করেন, কখনও বা সাম্যবাদি-মতের কৃষ্ণি-সাধক কৰ্ম্মবাদকেই ভক্তি-ভানের অবগুষ্ঠনে আবৃত করিয়া হৃদয়রাজ্যে ভ্রমণ করেন। সাম্যবাদের জন্ম—নাস্তিকতায়, স্থিতি—নাস্তিকতায় ও ভঙ্গ—নাস্তিকতায়। জড়-স্ববিধাবাদ বা ভোগবাদরূপ নাস্তিকতা হইতে সাম্যবাদের জন্ম; সত্ত্বত্ব বিযুত নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা, বিযুতজ্ঞগণের সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা অস্বীকার-রূপ নাস্তিকতায়—সাম্যবাদের সাময়িক স্থিতি; আর নির্বিশেষবাদে—সাম্যবাদের লয়।

প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়েও সাম্যবাদের নৃনাস্তিক আদর লক্ষিত হয়। আচার্যের পৃথক্ আসন—আচার্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—আচার্যের অভিনন্দন—আচার্য্য-পূজা প্রভৃতি দর্শন প্রাকৃত-সাহজিকগণ মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধদয় হইয়া সাম্যবাদের নীতি উদ্ধার করেন। এইরূপ প্রকৃতির কোন প্রাকৃত-সহজিয়া একবার সমাজে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সাম্যবাদ-উদ্বেগিত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাপ্রভুতে প্রীতির গাঢ়তার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—“আমার স্ত্রীর জন্য যতটা বুকভরা প্রীতি, মহাপ্রভুর জন্য সেইরূপই প্রীতি, আমার স্ত্রীর জন্য যতটা চোখে জল আসে, মহাপ্রভুর জন্যও ততটাই চোখের জল বারো।” স্ত্রী ও মহাপ্রভুতে এইরূপ সাম্যভাবের আদর্শ প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে অভিনন্দিত হইলেও উহাকে ‘মহাপ্রভুর প্রীতি’ বলিবার পরিবর্তে প্রকৃত গৌরভজ্ঞগণ কামোচ্ছ্বাসই বলিবেন। প্রাকৃত-সহজিয়ার ঐ সাম্যবাদে ভক্তির লেশ ত’ নাই-ই, কেবল তাহাতে কাম্য-চারেরই পরিচয় পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০)

মোহনিদ্রাভিভূত জীবের ভাবনা

যখন আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় বহির্নিখতার শ্রোতমধ্যে সংসার-সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ-ভঞ্জে নানাবিধ উত্থান ও পতনের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া আমাদের কর্ণধার-বিহীন জীবনতরঙ্গীখানিকে ভাসাইয়া দেই, যখন আমরা বঞ্চনাপর ছায়া-চবিকে—অগ্রব, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল আবাস্তব-বস্তুকে—‘ব্রুব-নক্ষত্র’ মনে করিয়া পথহারা ভ্রান্ত পথিকের মত বিভীষিকাময়ী তামসী যামিনীতে কণ্টকাকীর্ণ সংসারাবর্তের মধ্য দিয়া চলিতে থাকি, যখন আমরা নিজের বিজ্ঞা, বুদ্ধি, চিন্তা, গবেষণা, জন্ম, ঐশ্বর্য, স্বাধায়, সৌন্দর্য প্রভৃতি বস্তুকে সম্বল করিয়া ও ঐকল বস্তুতে নিজেকে সু-প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া দম্ভভরে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ধুষ্টা-কামিনীর বাহুল্যায় আশ্রয় লইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ি, যখন আমরা কর্মবীরত্ব, ধর্মবীরত্ব দেশ-হিতৈষিতা, ফলুতাগ, কৃত্রিম তিতিক্ষা প্রভৃতির চলগর্বে গর্কান্বিত হইয়া প্রমত্ত হই এবং নিজদিগকে পরম-সুবিবেচক মনে করিয়া শ্রোতবাণীর নির্মূল্য প্রভাকে উপাধিরহিত সেবোন্মুখ নির্মূল চিত্তে ধারণ করিতে বিরত হইয়া অগ্নাশিলায়-যুক্ত সোপানিক মলিন মনে স্বরূপ বস্তুর ছায়াকেই বাস্তব বস্তু ভ্রমে গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হই, যখন আমরা ভ্রম, প্রমাণ, করণ-পাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষহুট মনুজনির্বাচিত ও নির্দিষ্ট পুরুষগণকে ‘মহাপুরুষ’ মনে করিয়া অগ্নায় গোঁড়ামি বা উচ্ছ্রাণতাকেই উদারতা মনে করি, তখন আমাদের সাধুশাস্ত্রের শ্রোতবাণী ভাবিবার অবসর হয় না। আমরা নিজদিগকে যতই কেন না ‘ভাবুক’, ‘চিন্তাশীল’, ‘বুদ্ধিমান’, ‘জ্ঞানবান্’, ‘প্রাজ্ঞ’, ‘সুবিবেচক’, ‘বিবেক’, ‘ধর্মপরায়ণ’, ‘সত্যাপিমান্’, মনে করি না কেন আমাদের ‘গোড়ায় গলদের’ কথা আমরা প্রমত্ত—উন্মত্ত—ক্ষিপ্ত, কিন্তু কেন বা কাহার জন্য আমাদের এইরূপ প্রমত্ততা, উন্মত্ততা, ক্ষিপ্ততা তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর হয়? আমরা মনে করি, ‘আমরা ভাবি’, ‘আমরা চিন্তা করি’, ‘আমরা গবেষণা করি’, কিন্তু আমাদের ঐ চিন্তা, ঐ ভাবুকতাও যে, একটা রোগলক্ষণ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অস্বস্থবাক্তি, উন্মত্তবাক্তি যাহা ভাবেন, যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তা করেন, যাহাকে তাঁহার গবেষণার ফল বলিয়া মনে করেন, তাহাও যে তাঁহার পরিবর্তনশীল মনেরই ধর্ম—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আমাদের অবস্থাও তাই। আমরা

আজ যাহাকে ভাল মনে করি, কাল তাহাকে মন্দ বলি, আজ যাহাকে ‘মহাপুরুষ’ বা ‘মহাত্মা’ বলি, কাল তাহাকেই আবার আমা অপেক্ষাও নির্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করি। ইহাই মনোধর্মের স্বভাব। বর্তমান মনোধর্মী জগতের ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও আমরা শ্রোতবাণী মধ্যে এই সকল কথা গুনিতে পাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহারাজকে একদিন মনোধর্মের পরিবর্তনশীলতা ও আত্মধর্মের নিত্যত্ব বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্বাভবনঃ কিয়ং ।

বাচোদিতং তদনুতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥

প্রায় পঞ্চশতাব্দি পূর্বে একদিন বাঙ্গালীর ঠাকুর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগদগুরু বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগতকে সেই শ্রোতবাণী শিক্ষা দিয়াছিলেন—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম ।

এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ) ।

আধুনিক বিধে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ পরমাব্যাস শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাহার রচিত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে জগতে দুই প্রকার প্রতীতিবিশিষ্ট লোকের কথা বলিয়াছেন—(১) অবিদ্বৎ প্রতীতিযুক্ত ও (২) বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত। অবিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই অদূরদর্শী, তন্মধ্যে কেহ কিঞ্চিদূরদর্শী। কিন্তু বিদ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন ব্যক্তি অদূরদর্শী। অবিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তি বর্তমানে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ-সুবিধাকে বহুমানন করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বিরত হইয়াও ভবিষ্যতে অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনায় নিজদিগকে পোষণ করিতে যত্নবান হইয়া জগতে নিকট মহাত্মা, মহাপুরুষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্ত উদ্যোগী হন। ইহাদের ধারণা পরিবর্তনশীল সমাজ বা দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য বিমোচন করাই মানবজীবনের মহান উদ্দেশ্য। জগতে সবল হইয়া বাস করা, স্বাবলম্বী হওয়া, অপরের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভ করা, স্বচ্ছন্দে, সুস্থশরীরে, মনের স্ফুর্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা, “আমি স্বাধীনদেশের লোক, আমার দেশে মানবের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সকল দেশ আমার দেশের নিকট ঋণী,” ইত্যাদি গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া

জগতে বাস করাই মানব-জীবনের পরাশাস্তি। এইরূপ সুখস্বপ্ন—এইরূপ আকাশকুসুম কল্পনা, মোহনিদ্রাগ্রস্ত--মায়াতন্ত্রাগ্রস্ত আমাদের অনেককেই অভিভূত করিয়াছে—এতদূর অভিভূত করিয়াছে যে, আমরা ‘স্বপ্নকে’ বাস্তবসত্য মনে করিয়া, ‘আকাশকুসুমকে’ পরম সত্য জ্ঞান করিয়া আলংকারের ন্যায় তন্ত্রা মধ্যে এক মিনিটেই একজন সামান্য বণিক হইতে ক্রোড়পতি শেঠ হইয়া পড়িতেছি। আবার অতিগর্বে গর্বান্বিত হইয়া আমাদের নগণ্য ভদ্রুর বানিজ্যোপকরণগুলিকে তন্ত্রার ঘোরে এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি! ভদ্রুর কাঁচ পাত্রগুলি আমারই পদাঘাতে আহত হইয়া যখন উহাদের অস্তিমদশার চীৎকার আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করায়, তখন কিছুকালের জন্য আমার মোহতন্ত্রাটী ভাঙ্গিলেও, নিদ্রার আবেশ আমাকে তখনও পরিত্যাগ করে না। আমি অবশেষে পুনরায় তন্ত্রা-দেবীর বাহু-লতায় আশ্রয় লইবার জন্ত বাস্তব হইয়া পড়ি। তাই মহামায়া আমাকে সত্যকথা গুনিবার বা ভাবিবার অবসর দেন না।

বর্তমান সময়ে এটা একটা বিশেষ ভাবিবার কথা। আমাদের পরিচালকগণ আমাদেরকে এই সকল কথা ভাবিবার অবসর দেন না। তাঁহারা বলেন, ‘সর্বপ্রাণে অভাব অসুবিধা বিদূরিত কর। পরে ধর্ম করিও। কেহ বা বলেন, জগতের অভাব অসুবিধা দূর করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই ধর্ম ও কর্তব্য। ইহা বাতীত অগ্র ধর্মের ধারণা চিত্ত-দৌর্বল্য বা দুর্বল-সম্প্রদায়বিশেষের গোড়ামী।

মোহনিদ্রাকামিনীর বাহু-লতাপ্রিত জীবের এইরূপ উক্তি কিছু অস্বাভাবিক নহে। শ্রীগীতোপনিষদ্ জীবের এইরূপ চিত্তবৃত্তির একটা চিত্র অতি সুন্দর শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (গী: ২।৬৯)—

“যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগত্তি সংযমী।

যস্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ॥”

সর্বভূতের চিত্তবৃত্তি একদিকে প্রধাবিত আর সমস্ত জীবের চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে একটা সংযমী অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির অগ্র দিকে উন্মুখী। জগতের নিখিল প্রাণীর নিকট যেটা মহানিশা, ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সেইটা জাগরণের কাল। আবার যেটা জগতের সমস্ত প্রাণীর জাগ্রদবস্থা অর্থাৎ বাস্তবতার সময়, দিব্যসূরির তাহাতেই উদাসীনতা। আত্মপ্রবণাবুদ্ধি—জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবকূলের পক্ষে রাজিবিশেষ। কিন্তু

স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতেই জাগরিত থাকিয়া অধোক্ষজ্ঞানন্দ অনুভব করেন। বিষয়-প্রবণাবুদ্ধিতে গুড়-মুগ্ধ-জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয় শোকমোহাদির অনুভব করেন। কিন্তু ইহা স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ।

মোহনিদ্রাভিভূত জীব কিছুতেই এই সকল কথা ভাবিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহার-রসে এতদূর প্রমত্ত যে নিজের দুর্দশার কথা অপরে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলেও, উহা আদর করা দূরে থাকুক তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়েন।

বর্তমান জগতের উচ্চহৃদয়, দেশহিতৈষী, সমাজনেতা, ধর্ম্মবীর, কর্ম্ম-বীরগণ অকিঞ্চন গোড়ীয়ের এই সকল কথা ভাবিবার অবসর পাইবেন কি? বহির্মুখ সমাজের যেকোন চিন্তাশ্রোত চলিতেছিল ও চলিতেছে তাহাতে বাস্তব সত্য-নিষ্ঠার কথা গোড়ীয়কে অতি সতর্কতার সহিত বলিতে হয়। কারণ গোড়ীয়ের আদি-কবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস—

“সকল সংসার মন্ত ব্যবহার-রসে।”

* * * *

বিষয়-স্বখেতে সব মজিল সংসার।

* * * *

জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে।

* * * *

দক্ষ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।

এবং গোড়ীয়ের শ্রীল কবিরাজ—

“কেহ পাপ, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।

কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে খণ্ডে বিষয়-রোগ ॥”

—প্রভৃতি যে-সকল পরমহিতকারিণী শোতবাণী অমরোজ্জ্বল-স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্তমান চিন্তাশীল আত্মসন্তোষিত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট আদরের সহিত গৃহীত হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে, অকিঞ্চন গোড়ীয় বর্তমান আত্মসন্তোষিত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট একরূপ উক্তিও শুনিতে পাইয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ যতক্ষণ হরিকথা-প্রচারে ব্যস্ত থাকেন, সেই সময়টী কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিলে ত’ দেশের উপকার সাধিত হয়! কেহ বা বলিয়াছেন, যতক্ষণ ভক্তিগ্রন্থরচনাদি কার্য্যে সময় নিযুক্ত সেই সময়টী চরকার স্ত্রীতা কাটিলে দেশের বস্ত্রাভাব বিদূরিত হইতে পারে! কেহ বা বলিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহ অর্চন না করিয়া তৎপরিবর্তে

চরকার পূজা করিলেই ত' ঈশ্বরপূজা হয়। কেহ বা বলিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহের অর্চনে বা ভজনাদিতে, কিম্বা হরিকথা-প্রচারে সময় নষ্ট না করিয়া সেই সময়টী রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় ব্যয়িত হইলে ত' সত্য সত্য কাজ হয়! ঠাকুরকে নৈবেদ্য না দিয়া উহা ভোগী রোগীর ভোগে দিলেই ত' যথার্থ ঈশ্বরপূজা হয়! কেহ বা বলিয়াছেন, তুলসীতে জল প্রদান না করিয়া ঐ জলটুকু বেগুন বা কুমড়াগাছের গোড়ায় দিলে ত' জলের ও সময়ের অপব্যবহার হয় না! মানুষ ঐ সকল লতাগুল্মের ফল খাইয়া বাঁচিতে পারে। অর্থাৎ নাস্তিক হইয়া বাঁচাই যেন মানব-জীবনের প্রয়োজন!

বর্তমানে যে গোড়ভূমি—যে ‘ধর্মক্ষেত্র’ ভারতবর্ষ—যে পুণ্যভূমির বাল-বৃদ্ধবনিতার অধিকাংশ সংখ্যা এইরূপ চিন্তাস্রোতে ভাসমান, যে দেশের বর্তমান সাহিত্য সুকুমার শিশুগণে—মাতৃজাতিতে এই সকল ধারণাই বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে, যে দেশের বর্তমান কর্মবীর ধর্মবীরগণ এই নীতিরই প্রচারক—সেই দেশ—সেই পৃথিবী—সেই “ব্যবহাররস-মত্ত জগৎ” কি সুদূরদর্শী বিদগ্ধপ্রজ্ঞীতি-সম্পন্ন পুরুষগণের শ্রৌতবাণী একবার ভাবিয়া দেখিবেন!

বর্তমানে ভগবান্ আমাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার অবসর ও সুযোগ প্রদান করিলেও আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সুযোগটী ধরিতে পারিতেছি না। অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস আমাদিগকে প্রতি পদে পদে শিক্ষা দিয়াছে ও দিতেছে যে, বহির্নিখতার চরম ভূমিকা প্রাপ্ত হইলেই জীব ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কর্তব্যের কল্পনা করে। বহির্নিখ স্বরূপবিস্মৃত জীব কিছুতেই স্বরূপ অবস্থান করিতে চায় না। স্বরূপের কর্তব্য—স্বরূপের নিত্যবৃত্তি—একমাত্র শুদ্ধভগবদ্ভক্তি। স্বরূপবিস্মৃত জীব উপাধির কর্তব্যগুলিকেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-জাত ধারণায় ‘পরম সত্য’ মনে করিয়া থাকে। হরিভজনকে কেহ কেহ একটা গৌণ কার্য্য, কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়তর্পণেরই একটা প্রকার-বিশেষ বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা তাহার প্রয়োজনীয়তা আদৌ স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বা স্কুল-পালান-ছেলের মত ভগবৎসেবায় গাঢ়াকা দিবার জন্য ‘সর্বোপায়ে আহার সংস্থান, দেশ ও সমাজের উন্নতি করিয়া পরে হরিভজন করিব’ এরূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ যদি তাহার কৃপাপূর্বক তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের চিন্তাবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন

যে, উহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐক্লপ বৃত্তি হরিবিমুখতা-জাত।

বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তারদ্বরে ইহাই কীর্তন করেন যে, সর্বাগ্রে হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্তব্য। জগতের অভাব-অসুবিধা ত্রিতাপের অন্তর্গত ব্যাপার। জগৎ হইতে উহা কখনও কেহ কোন কালেই বিতাড়িত করিতে পারিবেন না। কেহ কোন দিন পারেন নাই—ইতিহাসে একরূপ সাক্ষ্য নাই; বরং অভাব, অসুবিধা, বিপৎপাত প্রভৃতি অবস্থাগুলি আমাদের ভগবদ্ভজনের সহায়ক।—

“তত্তেইহুকম্পাং সুসমীক্ষামানো ভুজ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হ্রদাগবপুত্তিবিদধন্যমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

—ভাঃ ১০।১৪।৮

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানকে এই কথা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন যে, যিনি আপনার অনুকম্পালাভের আশায় স্বকর্মের মন্দ ফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি সর্ব-অর্থ হইতে নির্মুক্ত হইয়া নিত্য-ভগবৎসেবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

লোক-পিতামহ আদিগুরু-ব্রহ্মা কি সর্ব বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন? আমরা মানব; সকলেই ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেই। কিন্তু পিতামহের এই উক্তি কি আমাদের ভাবিব্যার বিষয় নহে? সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ছায়া শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক একদিন এই কথা সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমরা কি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া নিজেকে ধারণা করিয়া এই সকল কথা ভাবিব্যার অবসর পাই না? শ্রীতবাণী বলেন, আরোহবাদী, অক্ষজ্ঞানমুগ্ধ জগৎ যে শ্রোতে গড়লিকা প্রবাহের ছায়া গা' ঢালিয়া দিয়াছে, সেই শ্রোতে ভাসিয়া চলিলে তাহার অভাব, অসুবিধা, চির-অশান্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, পুরাণের পর নূতন বিপৎপাত আরও বাড়িয়া চলিবে। বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন, কষ্টকশরণ, নিষ্কিঞ্চন মহাজনের আনুগত্যে আত্মবৃত্তি—ভক্তি-যাজনের প্রযত্ন ব্যতীত অপর চেষ্টায় আমাদের কোন দিন মঙ্গল হইবে না। ইহাই বিশেষ আত্মস্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ ভাবিব্যার কথা।

প্রশ্নোত্তর-ভাষ্য

নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটির শাস্ত্রযুক্তি-মূলে মীমাংসা করিয়া দিতে
আজ্ঞা হয়,—

১। ঔষধ-সেবন করা বিধি কি না ?

২। মৎস্য প্রভৃতি জলজ প্রাণীর ‘জীবাত্মা’ আছে কি ?

৩। “ঔষধার্থে হরাং পিবেৎ”, তবে পথার্থে অমেধা-সেবন করা
যাইতে পারে কি না ?

নিবেদক—

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষাল

উত্তর— ১। পারমাথিকগণ হরিসেবার অঙ্গকূল সমস্ত বস্তুই স্বীকার করেন; আর্থিকের ন্যায় তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বা অস্বীকার করেন না। ‘বিলাস’ বা ‘বিরাগ’ পারমাথিকগণের লক্ষ্যভূত বস্তু নহে; কিন্তু কৃষ্ণের বিশাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট-রাগ তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন। যদি দেহ-দ্বারা হরিসেবা না হয়, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবন, এমন কি এককণা আহাৰ্য্য বস্তু গ্রহণেরও জীবের অধিকার নাই। হরি-ভজনের জন্যই কায়-মনোবাক্য নিযুক্ত হওয়া উচিত। হরি-ভজনের আশু-কূলোর জন্যই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যিক; কিন্তু তন্মধ্যে যদি নিজের ভোগাশারূপ-কণ্টকতা থাকে তাহা হইলে জীব হরি-ভজনের জন্য দেহ সূস্থ রাখিবার নামে ‘দেহারামী’ হইয়া পড়ে। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণব, “কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্তা” এইরূপ সঙ্কল্প-জ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তি-সামনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিলভের জন্মই নিরন্তর বাস্তব থাকেন। তাঁহারা গোঁণভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপ কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অঙ্গকূল। যুক্ত-বৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ। ভজন-পরিপাকের জন্মই তাঁহাদের জীবনের আশা। ঠিক জগতে জীবিত থাকা, সুস্থ থাকা, বলবান হওয়া বা মুক্তিলাভ করার বাসনা তাঁহাদের নাই। অশাস্ত ভুক্তি-মুক্তিকামীরাই ঐ সকল মনোবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎপ্রেরিত বস্তুজ্ঞানে ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। দেহরোগিণের ন্যায় কেবল শরীর-চিন্তায় অস্থির হইয়া শরীর-পুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া

বেড়ান না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শ্রীমুরারী গুপ্ত এইরূপ ভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাসের সুবিধার জন্য বা গুণ্ডামী করিবার জন্য মুহূর্তমাত্র বাঁচিয়া থাকা বা তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কার্য্য নহে ; তাই তিনি যাহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাহাকেই দেহ-রোগ ও ভব-রোগ উভয় ব্যাধির হস্ত হইতেই নির্যুক্ত করিতেন। তিনি লোক সমূহকে কেবল দেহ-রোগ হইতে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

“চিকিৎসা করেন যা’রে হইয়া সদয়।

দেহ রোগ, ভব-রোগ—তুই তার ক্ষয় ॥”

২। মৎস্য প্রভৃতি জলজ-প্রাণীর ‘জীবাত্মা’ না থাকিবার কোন কারণ নাই। অনাদি-হরিবিমুখতা-নিবন্ধন জীবাত্মা মায়িক জগতে বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন যোনিতে তদনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কখনও জলজ জন্তু, কখনও স্থাবর, কখনও কুমি, কখনও পক্ষী, কখনও পশু, কখনও মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই সকল দেহ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবাত্মার বিভিন্ন আবরণ মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষায় ইহাই বলিয়াছেন,—

“এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি’ অনন্ত জীবগণ।

চৌরাশীলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।

তার সম স্মৃষ্ণ জীবের স্বরূপ বিচারি ॥

তার মধ্যে ‘স্থাবর’, ‘জঙ্গম’ দুই ভেদ।

জঙ্গমে তিৰ্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥” (১৫: ৮: ম: .৯শ)

সমগ্র সনাতন-শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অসন্দ্বাভ নাই ; শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৩। এই প্রশ্নের উত্তরদানের পূর্বেই জিজ্ঞাস্য—ঔষধ ও পথ্য নির্বাচন করিবেন কে ? চিকিৎসক,—না রোগী ? যদি রোগী স্বয়ংই আপনার ঔষধ ও পথ্য নির্বাচন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি তাহার ‘শ্রেয়ঃ’ অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাহার রোগ বিনষ্ট হইবে, সেইরূপ ঔষধ ও পথ্য স্বীকার না করিয়া ‘প্রৈয়ঃ’ অর্থাৎ আপাত-রমণীয় পরিণামে সর্বনাশকর কোন বস্তু ঔষধ ও পথ্যের নামে গ্রহণ করিতে ধাবিত হইবেন। বিকারগ্রস্ত-রোগি-সম্প্রদায় যদি নিজে নিজেই ঔষধ ও পথ্য নির্বাচন করিবার ভার গ্রহণ

করেন, কিংবা তাঁহাদের সম-জাতীয় রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির উপর তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য নির্বাচনের ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঔষধের পরিবর্তে 'সুরা' অর্থাৎ 'আপাত প্রয়োবস্তু' ও কুপথ্যের পরিবর্তে কু-পথ্যকেই 'ঔষধ' ও 'পথ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। একরূপ বিজ্ঞ-কপটতা ও আত্মবঞ্চনা রোগি-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলেও অথবা বুঝিয়া না বুঝিলেও কিংবা অপরকে বুঝিতে না দিলেও সদ্বৈজ্ঞ-সম্প্রদায় তাহা ধরিয়া ফেলেন। অ-সংযমিগণ যেক্রপ ধর্মের আবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোভী-ব্যক্তিগণও কখনও পেট-ফাঁপা-রোগ সারাইবার নাম করিয়া তাম্রকূটকে 'ঔষধ' 'পথ্য' বলিয়া লোক-ভোগ্য দেয়, কখনও বা উদরাময় সারাইবার নাম করিয়া অহিফেন-সেবনের পক্ষপাতী হয়, কখনও বা সর্দি-জ্বর সারাইবার নাম করিয়া 'চা' ও তাম্বুলাদি সেবা করিবার জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা শরীর পুষ্ট করিবার নাম করিয়া 'ব্রাণ্ডি' ও অপর জন্তুর রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রোগীর কুপথ্যের প্রতিই অধিক লোভ; কাজেই রোগী-সম্প্রদায় স্বয়ং বা অপর-রোগীর দ্বারা কখনও আপন আপন ঔষধ বা পথ্যাদি নিরূপণ করিতে বা করাইতে পারে না। পারমাণ্বিক সদ্বৈজ্ঞগণ কৃষ্ণ-বহির্মুখতাকেই যাবতীয়-ব্যাধির কারণের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বহির্মুখতাই আমাদের যাবতীয়-ব্যাধির নিদান; সেই মূল-ব্যাধির ঔষধ—শুদ্ধ শ্রীনাং ও পথ্য—শ্রীনামানুশীলনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহ। ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ বা পথ্য নাই। ঔষধ ও পথ্যের নামে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বস্তু গ্রহণ করিলে উহা ঔষধ ও পথ্যরূপ কার্য্য করিবে অর্থাৎ তাহা-দ্বারা বিষয়-প্রমত্ততা ও পুষ্-রক্তাদি-ভোজন-লালসারূপ বিষয়-বিকার বন্ধিত হইবে। আর যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের যাবতীয় ব্যাধির নিদান দূর করিয়া পরম স্বাস্থ্য-লাভরূপ ভগবৎপ্রীতি তর্জ্জন করিতে চান, তাহা হইলে একান্তনামাশ্রিত সদ্বৈজ্ঞের নিকট হইতে শ্রীনামরূপ মহৌষধি প্রাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ তাহা সেবন এবং তদনুকূল জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্ত অর্থাৎ ভজন-পরিপাকের জন্য জীবন-ধারণ-কল্পে একমাত্র শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ পথ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। যাহারা ভজনের জন্য জীবন-রক্ষা করিতেছেন, তাহারা শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না; আর যেক্রপ প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, প্রসাদের

নামে সেইরূপ বস্তুও গ্রহণ করেন না। তাম্বুলাদি বিলাস-সহচর বস্তু বা উত্তমোত্তম-দ্রব্য একমাত্র ভগবানেরই গ্রহণের যোগ্য-বস্তু হইলেও আত্ম-মঙ্গলাকাজক্ষী-দাস ভোক্তৃত্বের বিলাস-সহচর-দ্রব্য আপনার অধিকারে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃষ্ণ বা গুরুর সহিত সমান প্রতিপন্ন করিবার দুর্বুদ্ধিযুক্ত হন না। যদি হরিভজনই না হইল, তাহা হইলে বৃথা শরীরের উপর পাঁচসের কি দশসের পরিমাণ একটা মুণ্ডের বোঝা বহিয়া লাভ কি? শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় অথবা দুইটা পদ-ধারণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? যদি কর্ণে সাধুগণের মুখ-বিগলিত হরিকথাই না প্রবিষ্ট হইল, তাহা হইলে তিদ্ভযুক্ত-কাণাকড়ির ন্যায় দুইটা কর্ণকে সতেজ রাখিয়াই বা লাভ কি? যদি নাসা শুকভক্তগণের চরণকমলের সুরভির আঘাণ না করিল, তাহা হইলে কেবল ভক্তার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসা রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সমগ্র শরীর যদি মহাভাগবত গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের রঞ্জে অভিষিক্ত অর্থাৎ সর্বতোভাবে বিক্রীত না হইল, তাহা হইলে গুণ্ডামী বা লাম্পটোর জন্ত কিংবা সংসারের দাবানলের অসহনীয় উত্তাপ জন্ম-জন্মান্তর সহ্য করিবার জন্য উহা অপর জীবদেহের পৃষ্ঠ-রক্ত-মাংসে বিবদ্ধিত করিয়াই বা লাভ কি? যাহারা আত্ম-রক্ষা ও পর-রক্ষা করিতে চান, সেই সকল কপট-সম্প্রদায়ই বলিয়া থাকেন, হরি-ভক্তনের জন্য শরীর-রক্ষাকল্পে যথেষ্ট আহার-বিহার করিতে আপত্তি নাই। কার্যকালে দেখা যায়, এই সকল কপটগণের হরিভজনটা ছাড়া আর বাদ-বাকী বস্তুগুলিই লাভ হয়। কনিষ্ঠা-ধিকারে অর্চন-পর্বে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্বারা আমাদের ভগবৎ-সেবানুকূল শরীর যাত্রা নির্বাহ হয়। মধ্যমাধিকারে সাধক তাঁহার ভজন-পরিপাকের জন্য দেহ-রক্ষাকল্পে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানুকূল-বিষয় গ্রহণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর উত্তম-অধিকারে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদাবস্থায় কোন প্রকার দেহ-স্মৃতি থাকে না। যেমন মহাপ্রভু কখনও গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে আছাড় খাইতেছেন, কখনও সমুদ্রে বাষ্প-প্রদান করিতেছেন, কখনও বা কুর্মা-কারে তেলচী গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, কোন বাহ্য-স্মৃতি নাই। মধ্যম অধিকারে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ যে বস্তু গ্রহণ করেন না, সেইরূপ কোন তাজা-বস্তু অর্থাৎ যাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা নহে, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি

জ্ঞানেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা না পাইলে মরিয়া যাওয়াই সহস্র গুণে ভাল। ভগদত্ত ঔষধাদিকেও অপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন না। শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসে (৯।১০৭) শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোষগল্পপানাদ্যমৌষধম্।

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্লিতম্॥”

—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন-পানাদি বা ঔষধ যে কিছু দ্রব্য নিজের গ্রহণের জন্য স্থিতিকৃত হয়, সমস্তই ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করা অকর্তব্য। অমেধাদি কখনও ভগবানকে নিবেদন করা যায় না, সুতরাং তাহা পথ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য-ভাস্কর পরমহংসকুলমুকুটমণি

চিহ্নিলাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী

শ্রীমদুক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১০ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রী ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক চিহ্নিলাস আচার্য্যর্ক বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীচৈতন্যগঠ ও গৌড়ীধর্মমঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ভগদত্ত নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীকৃপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম পরম প্রিয়পার্ষদ শ্রীচৈতন্যায় দশম অধস্তন আচার্য্যসিংহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দশম বর্ষপূর্তি তিরোভাব-মহোৎসব বিগত ৩০ পদুনাভ, ২২ আশ্বিন (ইং ১৬।১০।৭৮) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্রে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উদযাপন করা হয়।

এই বৎসর বঙ্গের প্রলরক্ষণী বন্যায় যদিও উক্ত উৎসব আড়ম্বরহীনভাবে উদযাপিত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিরহের স্মৃতি যেন আরও দেদীপ্যমান হইতেছিল। অনেক বন্যাক্রান্ত মাণুষ্য কখনও মঠের নিবির হইতে গৃহে

প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সুতরাং তখন যেন চারদিকেই একটা বিষাদের ছায়া আরও মূর্তমন্তরূপে দেখা দিতেছিল। অবশ্য ভক্তগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরহের রূপ এবং আত্মবিস্মৃত জীবগণের চক্ষে বেদনারূপ এক পর্যায়ভুক্ত নয়। জড়দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাথিতের বেদন নিরয় পথযাত্রীর একটা প্রবাহমাত্র; কিন্তু অপ্রাকৃত-লীলাসুরণের যে-বিরহ সঞ্জিবীত হইয়া উঠে উহা বৈশিষ্ট্যবহ এবং আতাত্তিক মঙ্গলের এক স্মরণীবিশেষ। ভজন-বিমুখ জনগণের জড়-কাজ্জলি অপূরণে বিষাদগ্রস্তের অবস্থা এবং স্বরূপপোলক ভগবদ্ভক্তগণের বিরহ-চিন্তা—এই দু'য়ের বাহ্যদর্শন দেখতে যদিও প্রায় এক ধরনের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—কিন্তু কার্যাত চিন্তাত্রোতের আকাশ-পাতালের ব্যবধানের জায়। কারণ বিরহে জীবকে ভগবদ্ সান্নিধ্যে আকর্ষণ করে—কিন্তু জড়-বিষাদ জীবকে অমাত্ম্য করিয়া তোলে। সুতরাং উভয়ের পরিণতি কখনই একবস্তু নহে। উক্ত দু'য়ের অন্তর্নিহিত অবস্থা অনুধাবন করিলে তবেই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব—নচেৎ অজ্ঞতার মাল-কাঠিতে একই বলিয়া মনে হয়। বিরহ ইচ্ছাশূন্য প্রতি ঐকান্তিকতা আনয়নপূর্বক সেবাময় জীবন দান করে; কিন্তু বিষাদযুক্ত হইলে অবসাদ এনে দেয়—উহা জড়তারই একটা আকরবিশেষ। ‘বিরহ’ ভক্তহৃদয়ে আন্দোলিত হইলে সেবোন্মুখতা নিদ্রিত হইতে নিবিরতার দিকে ধাবমান হয়, কিন্তু অনর্থনিপীড়িত জীব-হৃদয়ে ভোগপোকরণ অন্তর্নিহিত হইলে বিষাদের কালো ছায়া তাহাকে মুহমান করিয়া তোলে। বিরহের গতি আলোকের দিকে, কিন্তু বিষাদের গতি তমিস্রার ঘনাস্ককারমুখী। বিরহে চৈতন্যের স্ফূরণ এনে দেয়—কিন্তু বিষাদ হইল জীবের মোহাচ্ছন্ন অবস্থা। সুতরাং আত্মতত্ত্বদর্শিগণ বিরহ ও বিষাদের তত্ত্ব অবগত থাকায় সেখানে সাম্যভাব দর্শন করেন না। এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি ও পরিণতির সন্ধান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গৌরজনগণ চৈতন্যবাণী বিঘোষণাপূর্বক দৃশ্যমান জগতে মরণের যুগে অমৃতের বাণী পরিবেশনে নিযুক্ত। সুমেধগণই একমাত্র ইহার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাই এই দুর্দিনের মাঝেও জাগরণের মাল্লিকি বিতরণে ব্যস্ত।

উক্ত দিবসে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে বিশ্বে ভগবদ্ভক্তের দান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্তী মহারাজ সমবেত বন্যাকবলিত জনগণের নিকট ভাষণ দান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রী গুরুপাদপদ্মের অবদান সম্পর্কে, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভু গোড়ীয়ধারায় বিরহ এবং শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভু গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে বিরহভক্ত ও সমাজ-জীবনে ধর্মের অবদান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাবলীল গতিতে ভাষণ প্রদান করেন।

মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে শ্রী গুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে নিবেদিত বিবিধ প্রসাদাদি সহস্র সহস্র বন্যাকবলিত জনগণকে বিতরণ



নবদ্বীপে উজ্জ্বরতকালে শ্রীবেদান্ত-ব্যাখ্যারত

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

করেন। “এক কার্যে করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত”—শ্রীমদ্ভগবৎ গণের এই মহদনুষ্ঠান জগতের অভূত মঙ্গলকারণ-দায়ক। বৈষ্ণবগণের অমন্দোদয়-দয়ারই নিদর্শন—যাচা আজও প্রাণকে উদ্বলিত করে।

—শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী

পরলোকে শ্রীযুক্তা জ্ঞানদামুন্দরী দেবী

অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্তহৃদয়ে জানাইতেছি যে, আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম দানবীর শ্রীরামপুর (হুগলী) নিবাসী স্বধামগত শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্তবান্ধব প্রভুর ধর্মপত্নী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদামুন্দরী দেবী বিগত ১১ই কার্তিক (ইং ২৯:০৭:৭৮) রবিবার সমিতির মুখ্যকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উজ্জ্বলকালে দিবা ১২টা ২৫ মিনিটে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার নির্যাসকালে মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীহরিনাম উচ্চ কীর্তন



করিতেছিলেন এবং অপরাহ্নকালে কীর্তন-শোভাযাত্রা সহকারে সুরধুনীর তটে শ্মশানে নিধে দাহকার্য্য সমাধা করা হয়। সমিতির স্থানীয় অনেক গৃহস্থ ভক্তও ইহাতে যোগদান করেছিলেন। প্রায় ৯২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

শ্রীপাদ হরিপদপ্রভু তাঁহার শ্রীরামপুরস্থ নিজ বাসগৃহে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করার পর বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই আমাদের পূজনীয়া

সতীর্থী জ্ঞানদা দিদি তাঁহার ছেলে-নাতি প্রভৃতির স্নেহকেও উপেক্ষা করিয়া সুরধুনী-তটে শ্রীগৌরভূমিতে বাস করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় হঠাৎ একদিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে থাকিয়া শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন, শ্রীহরিনাম ও গৌরকথা শ্রবণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় এট যে, “আমার শেষ জীবনের হরি-ভজনের যে প্রয়াস উহা তাঁহারা অশ্রুতরে আমাকে সুযোগ দান করিবেন।” তাঁহার ঐকান্তিক ও নিষ্কণ্ট সেবাপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়াই সমিতির সেবকবৃন্দ তাঁহাকে মঠেরই পরিচালিত সন্নিকটস্থ তাঁহাদেরই দানে রচিত গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়েছিলেন।

ইনি বল্লভপুরস্থ স্বধামগত রাখাল ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। শ্রীরামপুর নিবাসী পরলোকগত হুঃখী রাম ঘোষের পুত্র হরিপদ ঘোষের সহিত ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন হয়। তদবধি স্বামীসাহচর্যে বহু হুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুজি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন হইতেই তাঁহাদের ধর্মজীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন সময়ে ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থই তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী ভ্রমণ করে-ছিলেন। স্বামীর জীবনের সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই তিনি যথার্থ সহধর্মিণীরূপে স্বামীকে সহযোগীতা করে এসেছেন। একসময় শ্রীপাদ হরিপদ প্রভু তাঁহার নিজস্ব বাসভবন (যাহার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা) সম্পূর্ণ সমিতির আশ্রুকুলো দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই পরম ধর্মপ্রাণা মহীয়সী নারী স্বামীকে আরও অল্পপ্রেরণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব উহা লইতে অস্বীকৃত হন। কারণ তাঁহাদের নিজ বাসভবন দান করিলে তাহার পুত্রাদি পৌত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহাতে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অশ্রদ্ধা মনতাব দেখা দিলে সন্তানের অকল্যাণই হইবে। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও ঐ বাড়ী গ্রহণ না করিয়া তিনি শুধু বলেছিলেন, “হরিবাবু—আপনারা দৃঢ়ভাবে হরিভজন করুন—ইহাই গুরু-দক্ষিণা জানিবেন। আমি প্রকৃত মানুষ চাই—যাঁহারা হরিভজন করিবেন তাঁহারাি আমার সকল সম্পদ। সেই সম্পদের জন্তই এই প্রতিষ্ঠানের

প্রতিষ্ঠা। শ্রীগৌরগত প্রাণ ষাঁহারাই তাঁহারাই আমার প্রাণস্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ মঠ-মন্দির বলিলে, চৈতন্যবাণীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জীবের স্বরূপ-চৈতন্য লাভ ঘটাইতে পারিলে—তবেই আমাদের সেবা-প্রচেষ্টা লাভবান হইবে। হরিজনগণের পদরেণু শিরে ধারণ করতঃ অপ্রাকৃত জগতের সংবাদ বিতরণই আমাদের মুখ্য কাজ। ‘ঘরের ছেলে ঘরে ফের’। মায়া-প্রহেলিকার মাঝে জাগরণ চাই—এ জাগরণ—আত্ম-জাগরণের। ইহাও এক বিপ্লব-বিশেষ—যে-বিপ্লবস্বরূপ বিভ্রান্তির পথে প্রবল করাঘাত আনে।”

পূজনীয়া জ্ঞানদা দিদি শ্রীবেদান্ত সমিতির কত যে সেবা করিয়াছেন—তাহা সমিতির স্মৃতিফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে ও থাকিবে। তদুপরি যে কোন সময়ে সমিতির যেকোনো তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে নিষ্কপটে যেরূপ সেবা-যত্ন করিয়াছিলেন—তাহা আদর্শস্থানীয়। তাঁহার সেবাভিমানী দীর্ঘ জীবন অন্তিমিত হওয়ায় গুণমুগ্ধ মিশনবাসী আজ তীব্র বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছেন।

গত ২৭ কার্তিক (ইং ১৪।১১।৭৮) মঙ্গলবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমিতির পক্ষ হইতে বিরাটভাবে বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন করেন। ঐ দিন ছিল উর্জ্জ্বতের-সমাপ্তি-দিবস। তিনি পবিত্র উর্জ্জ্বতকালে দেহরক্ষা করায় উহার সমাপ্তি দিবসেই তাঁহার বিরহ-মহোৎসবেরও অনুষ্ঠান করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউকে নানাবিধ চর্কা-চোয়া-লেখ্যপেয় ভোগসামগ্রী নিবেদিত হইলে বিগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক মহাপ্রসাদ উৎসর্গ করেন। তদনন্তর নিমন্ত্রিত ও আগত সকল ভক্তগণকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ কর হয়। শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকগণকে তিনি যেরূপ সেবা-যত্ন-স্নেহ করিতেন তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। তিনি পরজগৎ হইতে আমাদের গকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবকনিষ্ঠায় ব্রতী থাকিবার জন্য প্রচুর আশীর্বাদ করুন।

— জনৈক বিরহী

সাধুসঙ্গে দক্ষিণভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ সঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরব আমি অগণি-ভকত-সঙ্গে ॥”

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্ততম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । মহাজন-বাক্যে দেখিতে পাই—“যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ !”

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সভ্য নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল লাভ হয় না ।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

- ১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্বদা শ্রীহরিনাম, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ ।
- ২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ ।
- ৩। চলন্ত ট্রেনেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের পূজার্চন ও ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি দর্শনের সৌভাগ্য ।
- ৪। প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা ।
- ৬। রিজার্ভড্ গাড়ী-যোগে স্বচ্ছন্দ রেলভ্রমণ ।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নিয়মানুসারে ধর্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে এই পারমাণ্বিক সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি ।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানে চু ভক্তগণ সম্বল আসন সংরক্ষণ করিবেন ।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :-

- ১। শ্রীজিওড় নৃসিংহ (সিংহাচলম্), ২। মাদ্রাজ,
- ৩। শ্রীনটরাজ শিব (চিদাম্বরম্), ৪। কুন্তকোণম্, ৫।
- শ্রীবৃহদীশ্বর (তাঞ্জোর), ৬। শ্রীরামেশ্বর, ৭। শ্রীমিনাক্ষী-
- দেবী (মাদুরা), ৮। কন্যাকুমারী, ৯। শ্রীভনন্ত পদ্মনাভ
- (ত্রিভেন্দ্রাম্), ১০। শ্রীরঙ্গনাথ (শ্রীরঙ্গম্, ত্রিচিনাপল্লী),
- ১১। পক্ষীতীর্থ, ১২। শ্রীশিবকাক্ষী, ১৩। শ্রীবিষ্ণুকাক্ষী
- (কাক্ষীপুরম্), ১৪। শ্রীতিরুপতি বালাজী (ভেঙ্কটাচলম্),
- ১৫। শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্র (পুরী) প্রভৃতি।

—ঃ নিয়মাবলী :—

আগামী ১২ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।৭৯) সোমবার, রাত্র ৮টার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের ১৪নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রীগণ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাটফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৩/২৪ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৭৫৫'০০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা ভিক্ষা স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৫৫৫'০০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা ২৫শে মাঘ (ইং ৬।২।৭৯) মধ্যে অগ্রিম ৩৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা ২২শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।৭৯) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রীগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটি ও ঘটি সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১০/১২ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেস ও ট্রাঙ্ক সঙ্গে লইবেন না। শ্রীমন্দিরের পূজার্চনাদির খরচ যাত্রীগণ নিজে ব্যয় করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি—২৯শে কার্তিক, ইং ১৬।১১।৭৮।

শুদ্ধভক্তকুপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনিবার্য কারণ ও দৈব-দুর্ভাগ্যকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



ধর্মঃ সনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্লেদেন কথাশু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ

বাসুদেব, ৩ নারায়ণ, ৪২২ গৌরাঙ্গ
রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।১২।১৯৭৮

১০ম সংখ্যা

সানুবাদং পাণ্ডুনাট্যকৃতম্ শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

অত্রিকবাচ—

গোবিন্দেতি সদা স্মানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দকীর্তনম্ ॥৪৫॥
অক্ষরং হি পরং ব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষরত্রয়ম্ ।
তস্মাত্চরিতং যেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৪৬॥

অত্রি বলিলেন,—‘গোবিন্দ’-এই নামোচ্চারণদ্বারা সর্বদা মন্ত্রস্মান, জপ, ধ্যান ও কীর্তন মানবমাত্রেই কর্তব্য । কারণ ‘গোবিন্দ’-এই অক্ষরত্রয়বিশিষ্ট তত্ত্বই পরব্রহ্ম । অতএব যিনি গোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করেন, তিনি চিদাক্স-বোধে সমর্থ হন বা চিৎস্বরূপসিদ্ধিপ্রাপ্তির যোগ্য হন ॥৪৫-৪৬॥

শ্রীবাদরায়ণিকুবাচ—

অচ্যুতঃ কল্পবৃক্ষোহসাবনন্তুঃ কামধেনবঃ ।

চিন্তামণিচ্চ গোবিন্দস্মাত্তন্মাম চিন্তয়েৎ ॥৪৭॥

শ্রীবাদরায়ণি বলিলেন,— অচ্যুত-অনন্ত-গোবিন্দ কামধেনু, কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণিস্বরূপ । অতএব গোবিন্দের নাম চিন্তা করা কর্তব্য ॥৪৭॥

হবিরুবাচ—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং

জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।

জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো

জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥৪৮॥

হবি বলিলেন,—দেবকীনন্দন দেব, যদুবংশোজ্জলকারী কোমলাঙ্গ মেঘ-শ্যামল কৃষ্ণ ও পৃথিবীর ভারনাশন মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥৪৮॥

পিপ্পলায়ন উবাচ—

শ্রীমন্সিংহবিভবে গরুড়ধ্বজায়

তাপত্রয়ায়োপশমনায় ভবৌষধায় ।

কৃষ্ণায় বৃশ্চিকজলাগ্নিভুজঙ্গরোগ

ক্লেশব্যায় হরয়ে গুরুবে নমস্তে ॥৪৯॥

পিপ্পলায়ন বলিলেন,—শ্রীমন্সিংহবিভু ও গরুড়ধ্বজকে প্রণাম করি । তাপত্রয় নাশকারী ও ভবরোগের ঔষধস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার করি । বিছা-জল-অগ্নি-সর্প ও রোগের ক্লেশহারী হরি-গুরুকে প্রণাম জানাই ॥৪৯॥

আবিহোত্র উবাচ—

কৃষ্ণ ! ত্বদীয়-পদপঙ্কজ-পঙ্করাস্তু—

মঠৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ ।

প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ

কণ্ঠাবরোধন-বিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥৫০॥

আবিহোত্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তোমার পাদপদ্মমধ্যে আমার মানস-রাজহংস অটুই প্রবেশ করুক । কারণ প্রাণাবসানকালে কফবাতপিত্তদ্বারা কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইলে তোমার স্মরণের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥৫০॥

বিহুর উবাচ—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব মম জীবনম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্থথা ॥৫১॥

বিহুর বলিলেন,—হরিনাম-হরিনাম-হরিনামই আমার একমাত্র জীবন-
স্বরূপ । কলিকালে এই হরিনাম বিনা অন্য গতি নাই, গতি নাই,
গতি নাই ॥৫১॥

বশিষ্ঠ উবাচ—

কৃষ্ণোতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে ।

ভস্মীভবন্তি তস্মাশ্চ মহাপাতক-কোটয়ঃ ॥৫২॥

বশিষ্ঠে বলিলেন,—‘কৃষ্ণ’-এই মঙ্গলময় নাম যাহার বাক্যে বিদ্যমান থাকে,
তাহার কোটি-মহাপাতক শীঘ্রই ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥৫২॥

অরুন্ধত্যাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৫৩॥

অরুন্ধতি বলিলেন,—পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ, বাসুদেব, হরিকে প্রণাম । ক্লেশ-
নাশকারী গোবিন্দকে বার বার প্রণতি করি ॥৫৩॥

কশ্যপ উবাচ—

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপ-সংঘাত-পঙ্কজ ।

শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্রাহতো যথা ॥৫৪॥

কশ্যপ বলিলেন,—পর্কতের উপর বজ্রপাত হইলে যেমন পর্কত শতধা
বিদীর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনাম অনুস্মরণ করিলেই পাপহত দেহ শতধা
ভিন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহ হইতে পাপ দূরীভূত হইয়া যায় ॥৫৪॥

দুর্যোধন উবাচ—

জানামি ধর্ম্যং ন চ মে প্রবৃত্তি, জ্ঞানাম্যধর্ম্যং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥৫৫॥

যত্তস্ম্য গুণদোষো হি ক্ষম্যতাং মধুসূদনঃ ।

অহং যত্ত্বং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে ॥৫৬॥

দুর্যোধন বলিলেন,—ধর্ম্যবিষয়ে অবগত হইয়াও উহার আচরণে প্রবৃত্ত
হই না এং অধর্ম্য যে কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিয়াও উহার আচরণ হইতে

নিবৃত্ত হই না। হে হৃদিস্থিত হৃষীকেশ ! তুমি আমাকে যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিতে বাধ্য হইব ॥৫৫॥

হে ভগবান্, আপনি মধুসূদন, আপনি যন্ত্রী, আর আমি যন্ত্র ; আমার কোন দোষ নাই। যন্ত্রের গুণ-দোষ আপনি ক্রমা করুন ॥৫৬॥

ভৃগুবাচ—

নামৈব তব গোবিন্দ কলৌত্বতঃ শতাধিকম্।

দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাযোগতঃ ॥৫৭॥

ভৃগু বলিলেন,—হে গোবিন্দ ! তোমার বাচ্যস্বরূপ হইতে তোমার বাচকস্বরূপ যে নাম, উহা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ অষ্টাঙ্গযোগসাধন ব্যতীত তোমার নামোচ্চারণ উচ্চারককে মুক্তি দিতে পারেন ॥৫৭॥ (ক্রমশঃ)

দিব্যসূরি বা আনুবর্বর্গের জীবনী

(৬) শ্রীশ্রীশ্রীকোপ সূরি

(শ্রীশ্রীকোপ সূরির তামিল নাম নম্মানুবর্)

কর্ম ও জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির প্রাচীনত্ব

অনেকে মনে করেন যে, কলির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণা-ধর্মের অবনতির সহিত বৈদিক-বৈষ্ণবধর্মও বৌদ্ধ-বিপ্লবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ বৈদিক ধর্মের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সামাজিক ব্রাহ্মণা-ধর্মের দুর্বলতা সাধনে সমর্থ হইলেও বৈষ্ণবধর্ম চিরকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কন্মী কুমারিল ভট্ট ও জ্ঞানী শঙ্করাচার্যের বহু পূর্বে সনাতন-বৈষ্ণবধর্মের অমিয় গাথাসকল ভক্তগণের আনন্দ বর্ধন করিত। বেদের পারমাথিক অংশগুলির মর্যাদা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিষ্ণুচিন্তা, যোগীশ্বর প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা বৈদিক-গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্ত দ্রাবিড়-ভাষায় মন্ত্রগুলি অন্তরিত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার

আর্যাবর্ত-গগনে বৌদ্ধ-মেঘমালা পরিব্যাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্বার দক্ষিণগামী হইল। দক্ষিণাবর্ত অবলম্বনপূর্বক সুত্বর দক্ষিণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াও অন্তর্হিত হইল না। দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করতঃ সমুদ্রের পরপারে সিংহল-দ্বীপ বৌদ্ধ-বারিতে নিষিক্ত হইল।

শ্রীশঠকোপ সূরির কুপা-কণায় শ্রীরামানুজ-কর্তৃক বৌদ্ধ, কর্ম ও মায়াবাদ প্রতিহত

ভারতের এই বিষয় হৃদ্বিনে ভগবান্ কুপা-পরতন্ত্র হইয়া ভগবদ্ভক্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। জীবের সৌভাগ্যাতিশয়ো সেই সূত্র বৌদ্ধ-মত, সিদ্ধান্ত ও মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতের গুরুভারে বিচ্ছিন্ন হইবার পরিবর্তে সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ আর্য্যাবর্তের বিভিন্ন প্রদেশে লক্ষ্যমান হইল। এই অসময়ে বৌদ্ধজলদারূত তমিস্রাপিহিত নিশিতে দাক্ষিণাত্যের যাম্য-কোণে একটি তারকা উদিত হইল। উহারই ক্ষীণ ময়ূখে দাক্ষিণাত্য-শশাঙ্ক রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণব-জগতে প্রভূত উপকারে সমর্থ হইলেন। আমরা এক্ষণে এই অজ্ঞাত তারকার অনুসরণ করি।

শ্রীশঠকোপ সূরির কুল-পরিচয়

কাবেরীর দক্ষিণে তাম্রপর্ণী নাম্নীপুত-সলিলা শ্রোতসিনী পাণ্ড্যদেশের কল্মষ বিধৌত করতঃ সাগরে নিক্ষেপ করে। তাম্রপর্ণীর তটে কুরকা-নাম্নী পুরী। তথায় বিভূতিনাথেন্দ্র নামক এক সৌভাগ্যবান্ শূদ্র বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধনু। ধর্ম্মধনুর তনয় চক্রপাণি ও পৌত্র অচ্যুত। অচ্যুতের পুত্র স্মৃতি ও পৌত্র ফুংকার। ফুংকারের কারি-নামক তনয়ই শঠকোপ দাসের পিতা।

শ্রীশঠকোপ সূরির জন্মস্থান ও জন্ম

পাণ্ডোর পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল-স্থান কেরল-দেশ। বর্ত্তমান কালে কেরল-দেশ 'ত্রিবান্দুর রাজ্য' বলিয়া পরিচিত। কেরল ও পাণ্ড্যদেশের অন্তরালে মহেন্দ্র-পর্ব্বত। জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম মহেন্দ্র-পর্ব্বতে কিছুকাল বাস করেন। এই কাল হইতে এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাস দেখা যায়। কেরল-দেশে কোন বৈষ্ণব-গৃহে নাথ-নায়িকা জন্মগ্রহণ করেন। ফুংকার স্বীয় পুত্রের সহিত বৈষ্ণব-কন্যা নাথ-নায়িকার উদ্ধাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। নাথ-নায়িকার গর্ভে মহানুভব শঠকোপ জন্মগ্রহণ করেন। শঠকোপ দাস শঠারি, কারিমার, বকুলাভরণ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন।

আশৈশব মূক ও অন্ধ

শঠকোপ বাল্যকাল হইতে বাক্শক্তি-রহিত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিরও বিকাশ ছিল না। আশৈশব মূকান্নতা-নিবন্ধন চিঞ্চা-বৃক্ষের (তৈতুল) নিম্নে ষোড়শবর্ষ-কাল স্থানুর ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। পিতা-

মাতা পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সর্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। সাধারণ লোকে শঠকোপকে জড়দ্রব্য জ্ঞান করিত।

বিশ্বকসেনের অবতার শঠকোপের অনির্বচনীয় তেজ

শঠকোপের চেতন-ধর্ম্য সঙ্কচিত থাকিলেও তাহার এক অনির্বচনীয় জ্যোতি ছিল। সেই তেজ সামান্য প্রাকৃত-তেজের সহিত তুলনীয় নহে। দক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-সীমায় বাস করিয়াও জড়প্রায় শঠকোপের তেজোরাশি বিস্তা ভেদ করিয়া আর্য্যাবর্তে পরিদৃষ্ট হইত। কথিত আছে, বিশ্বকসেন শঠকোপ হইয়া জন্মগ্রহণ করায় অপ্রাকৃত জ্যোতি তাঁতাকে অনুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। প্রাকৃত জীবে এইপ্রকার জ্যোতি সম্ভবপর নয়।

মধুর নামক ব্রাহ্মণের জ্যোতি-দর্শন ও তাহার অনুসরণে

শঠকোপ সূরির প্রাপ্তি

মধুর নামক এক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ-তনয় আর্য্য-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন সমাপনানন্তর তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। একদা তিনি অযোধ্যানাথ-দর্শনে সাক্ষাত-পূরে উপস্থিত হন। তথায় অবস্থান-কালে দক্ষিণ-দিকে তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করতঃ পরম কোতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের অনুসন্ধানে দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হন। মধুর যতই দক্ষিণাভিমুখে গমন করুন না কেন, তেজও তাহার সহিত ক্রমশঃই দক্ষিণ-দিকে যাইতে থাকে। অবশেষে তিনি তাম্রপর্ণী-তটাবলম্বিনী কুরকানগরীতে উপনীত হইলেন। তথায় তেজের আকর চিহ্না-মূলাবস্থিত শঠকোপকে দর্শন করিলেন।

মধুর ব্রাহ্মণ-কর্তৃক মুকান্দতার পরীক্ষা ও

শঠকোপের নিয়ন্ত্র স্বীকার

শঠকোপকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ তাহার আশা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি শঠকোপের মুকান্দতা পরীক্ষা করিবার জন্য এক দৃঢ় প্রস্তর-খণ্ড তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রস্তর-পতন-শব্দ শ্রবণ করতঃ শঠকোপ সহসা দুইটি নেত্র প্রসারণপূর্ব্বক গ্রামস্ত প্রস্তর-খণ্ড দেখিতে পাইলেন। মধুর কবি এতদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

তাহার প্রজ্ঞা পরিমাণ করিবার মানসে মধুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“দেব! যদি জীব প্রকৃতির উদরে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কোথায় পুরুষ অবস্থান করেন?” শঠকোপ তাহার

বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “জীব তদন্ত ভক্ষণ করিয়া তথায় বাস করে।” এই প্রশ্নের মীমাংসা অবগত হইয়া ‘বকুলাভরণকে’ সর্বজ্ঞ-শিরোমণি বৃষ্টিতে পারিলেন এবং ‘কারিমারের’ চরণাশ্রয় করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিছুকাল গুরুর নিকট অবস্থান-কালে একদা গুরুডবাহন ভগবান্‌ হরি প্রতাপ-মূর্তিতে বকুলাভরণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শঠকোপের দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-রাশি

বিষ্ণুচিহ্ন যোগীন্দ্র ‘দ্রাবিড়-ভাষায়’ রচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ধর্মের বিশেষ সহায়তা করেন। এক্ষণে শঠকোপ বেদের উত্তরভাগ দ্রাবিড় ভাষায় প্রকটিত করিলেন। মধুর কবি কারিমার-রচিত বেদার্থ অবগত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে বেদ-চতুষ্টয়ে পারদ্রুত হইলেন। শঠকোপ-রচিত গাথার আদর ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। কারিমার দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত উপকার করতঃ পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমে ঐহিক-লীলা সমাপ্ত করেন।

শ্রীশঠকোপের শ্রীমূর্তি-পূজা ও তিনি

‘শ্রী’ সম্প্রদায়ের আদিগুরু

শঠকোপের দেহাবসানের পর তদীয় শিষ্য ‘মধুর’ গুরুর শ্রীমূর্তি নির্মাণ করাইলেন ও যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। শঠকোপের পাণ্ডিত্যে অচিরেই দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। অনেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া শঠকোপ-স্মৃতি নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শঠকোপ দাস শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আদি গুরু বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীশঠকোপ-কৃত বেদার্থ-চতুষ্টয় ও অর্থপঞ্চক

‘শ্রী’-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক আদর্শ

শঠকোপ-দাস-প্রণীত ঋগ্বেদার্থ—‘শ্রীব্রহ্মাখ্য’-নামে অভিহিত হইল। উহাতে একশত গাথার সন্নিবেশ ছিল। যজুর্বেদার্থ—সাতটি গাথার সম্পূর্ণ ও ‘অশির্ষাখ্য’ নাম ধারণ করিল। অথর্বার্থ—৮৭টি গাথা ও সামার্থ—সহস্র গাথায় সম্পূর্ণ। এই বেদার্থ-চতুষ্টয় দ্বারা শ্রীশঠকোপ দাস অর্থপঞ্চক উদাহৃত করিয়াছিলেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে

প্রশ্ন ও উত্তর

কৃষ্ণলীলার কোন্টি ঐতিহাসিক ও কোন্টি সমাধিলব্ধ ?

কোন জিজ্ঞাসুপ্রবর নিম্নলিখিত প্রশ্নটি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অনেকের একরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া সাধারণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।

‘শ্রীকৃষ্ণসংহিতা’-পাঠ করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, কৃষ্ণ-লীলা জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। ভাগবতে যে কৃষ্ণ-কথা আছে তাহা কি ঐতিহাসিক নয় ? মানবরূপধারী কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশদানে পূজনীয় ব্যাসদেব কি কোমলশ্রদ্ধগণকে তুষ্ট করিয়াছেন ? ভাগবতের বর্ণনামধ্যে কোন্ কোন্টি সমাধিলব্ধ-জ্ঞান ও কোন্ কোন্টি ঐতিহাসিক-বাক্ত্য তাহা জানিতে বাসনা করি।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত ও সমাধিলব্ধ—ঐতিহাসিক নহে

উত্তর—সমস্ত বেদ-সাররূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত কিছু বর্ণিত হইয়াছে সে-সমুদায়ই অপ্রাকৃত এবং সমাধিলব্ধ। তাহা কিছুই জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায়, জন্ম, কৰ্ম্ম, রূপ ও গুণ সমস্তই অপ্রাকৃত, ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনার কার্য্য নাই। ইহা নিত্যসত্য ও চিন্ময়। স্বাপর্য্যুগে সেই পরমতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে তাহার অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই নিত্যলীলা প্রপঞ্চমধ্যে প্রকটিত হয়। প্রপঞ্চে চিন্ময়তত্ত্বের বিচিত্র ব্যাপার উদয়ের কোন প্রাকৃত বিধি নাই। কিন্তু পরমতত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তি কোন বিধির অধীন নয় এবং সর্বদা স্বতন্ত্র। অতএব প্রকৃতির নিয়মসকলকে অতিক্রম করত সেই নিত্যলীলা জড়জগতে উদ্ভূত হয়।

কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি

উদ্ভূত হইলেও সেই প্রকটিত তত্ত্ব জীবগণের ত্রিবিধ অধিকার-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি বিস্তার করে। জীবের ত্রিবিধাধিকার এই,—(১) কৰ্ম্মাধিকার অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জড়াস্থলতা, (২) জ্ঞানাধিকার অর্থাৎ নিব্বিশেষ-লক্ষণ জড়শূন্যতা ও (৩) ভক্তাধিকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বাহুভব-যোগ্যতা।

ত্রিবিধ প্রতীতি এই,— (১) জড়প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তল্লীলাকে জড়বৎ উপলব্ধি হয়), (২) আধ্যাত্মিক প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মূলতত্ত্ব-বিচারে দুজ্জৈয় ব্রহ্মতা ও প্রকটলীলায় মায়া ও মায়িক বিষয়-রূপ দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হয়) এবং (৩) অপ্রাকৃত প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্ত্বা দীকার ও অচিন্তা-শক্তি-ক্রমে সমস্ত চিন্ময়-তত্ত্বের প্রপঞ্চ-বিজয় পরিলক্ষিত হয়)। লীলাতত্ত্বকে ঐতিহাসিক বলিলে তাহা দেশ-কালানীন মায়িক-তত্ত্ব হইয়া পড়ে। কাল্পনিক বলিলে তাহা আধ্যাত্মিক হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ তদ্ব্যংগের কোনটাই স্বীকার করেন না।

লীলাতত্ত্ব ‘আধ্যাত্মিক’ ও ‘সাক্ষাৎ’-ভেদে দ্বিবিধ সমাধি-লব্ধ

লীলাতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব সমাধিদ্বারা উপলব্ধি হয়। সমাধি দুই প্রকার— (১) আধ্যাত্মিক ও (২) সাক্ষাৎ। আধ্যাত্মিক সমাধি দ্বারা চিন্ময় বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে নিবিশেষ-প্রতিজ্ঞা প্রথম হইতেই চিন্ময়তার স্মৃতিকে খরচ করে। সাক্ষাৎ-সমাধি জীবের চিচ্চক্ষুর সাক্ষাৎ-ক্রিয়াবিশেষ। তাহা কেবল শুদ্ধভক্তদিগের শুদ্ধচিৎশেষ-দর্শন-প্রতিজ্ঞা হইতে লব্ধ হয়। ব্যাসদেব সাক্ষাৎ-সমাধিদ্বারা নিত্যধামগত এবং প্রপঞ্চ-প্রকটিত লীলাতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব এবং নিত্যবৈচিত্র্য দর্শন করত তাহা ব্রহ্মভাগবতে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

ভক্তিয়োগেন মনসি সমাকু প্রনিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ষ যদগাম্যাম্ ॥

যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিয়োগমধোকজে ।

লোকস্তাজানতো বিদ্বাংশচক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

যস্মাৎ বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।

ভক্তিরূপদ্বিতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা ॥ (ভাঃ ১।৭।৪-৭)

[ভক্তিয়োগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সমাকুরূপে সমাধিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গহিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন ॥৪॥ সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব, রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত

হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে ॥৫॥ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহতি ভক্তি অশ্রুতি হইলে সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হই দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ৬ ॥ যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয় ॥ ৭ ॥]

কর্মী-জ্ঞানীর অবিদ্বৎ-প্রতীতিতে ‘লীলার’ অথবা মায়িক কল্পনা
এবং বিদ্বৎ-প্রতীতিতে ‘লীলার’ অপ্রাকৃতত্ব অনুভব

এবস্থিৎ অপ্রাকৃত লীলাস্মৃতি কর্মীদিগের বিষয়-বিদূষিত অন্তঃকরণে অথবা জ্ঞানীদিগের নির্বিশেষ-প্রতিজ্ঞাহত চিত্তে কখনই সংগঠন হয় না। অবিদ্বৎ-প্রতীতিই তাহাদের উপলব্ধ হয়। চিন্ময়তত্ত্বে বিশেষ বৈচিত্র্য-জিজ্ঞাসু ওক্তদিগের মায়া-বিমুক্ত নির্মলচিত্ত-দর্পণেই কেবল বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা প্রপঞ্চে উদিত হইলেও ভক্তিহীন ব্যক্তিদের নিকট মায়িক লীলারূপে প্রতীত হয়। সূর্য্য উদিত হইলেও জন্মান্ধ, তথা পীড়াচ্ছন্ন-চক্ষুবিশিষ্ট এবং মেঘাবৃত গগনতলস্থ পুরুষদিগের নিকট তাহা পরিদৃশ্য হয় না অথবা বিপর্যায়রূপে লক্ষিত হয়। জগতের চক্ষু প্রপঞ্চে প্রকট-কৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ।

স্বরূপ-সমাধির ক্রম

কর্মজড়দিগের 'ত কথাই নাই, কেবল জ্ঞান-অন্বেষণকারীদিগের সম্বন্ধেও অপ্রাকৃতলীলা দুর্দৃশ্য। জীব যখন কর্ম-জ্ঞানকে অপার্থ জানিয়া ভক্তি-বিষয়িনী শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন সাধু-গুরু-পদাশ্রয় করত ততোপদেশ প্রাপ্ত হন। সেই উপদিষ্ট তত্ত্বের অনবরত অনুশীলনকে ভজন-ক্রিয়া বলা যায়। সাধন-দশায় যে-পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্মৃতি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভজন কেবল ভজনাত্মসরূপে থাকে। কিন্তু ফলভূতে চিত্তরসতত্ত্বে যখন গাঢ় আসক্তি সহকারে ভজন হয়, তখনই ভগবৎ-কৃপালব্ধ শক্তিসংস্কারক্রমে স্বরূপানুভূতিরূপ সাক্ষাৎ-সমাধি উদিত হয়। তাহা হইলে—

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্ত্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়েন্তে চাস্মা কৰ্ম্মাণি দৃষ্টে এবান্বনীশ্বরে ॥

এই প্রথাক্রমে জিজ্ঞাসুগণ সংশয়হীন হন। অতএব ভজনানুষ্ঠানের পূর্বে প্রশুজিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নোত্তর-প্রাপ্তিতে কখনই স্বরূপানুভব উদ্ভূত হয় না। স্বরূপপ্রাপ্তির ক্রম অবলম্বন করিলেই প্রাপ্য বিষয় লব্ধ হয়।

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা

শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সব লীলা বর্ণিত আছে সে-সমুদায়ই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী। অধিকারভেদে সেই সমস্ত লীলার স্ফুটিত-তারতম্য আছে, এইমাত্র। কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্যান্য রাজাদিগের যত চরিত্র বর্ণিত আছে সে-সমুদায় ঐতিহাসিক বার্তা বটে, কিন্তু কৃষ্ণলীলা সমুদায় অপ্ৰাকৃত; কখনই জ্ঞানীদিগের আধ্যাত্মিক কল্পনা বা কল্প্যাদিগের জড়ীয় বর্ণনারূপ ইতিহাস নয়। প্রপঞ্চ প্রকট হইয়াও কৃষ্ণলীলা স্থায়ী অপ্ৰাকৃত-ধর্ম কিছুমাত্র ছাড়ে নাই অর্থাৎ দেশ-কালাদির অধীন হয় নাই। তবে যে জড়ীয় দেশ-কালাদির অধীনরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তল্লীলা-দর্শক জীবগণের অধিকার-ভেদে সমল আবিষ্টিক প্রতিভীমাত্র।

অনেকে ‘কৃষ্ণসংহিতা’র অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। তাহা নিরর্থক। অপ্ৰাকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সেবাবিচার ও সাম্যবাদ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

যাহারা সাম্যবাদের বিদ্যালয় হইতে সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হন, এইরূপ অনেক প্রাথমিক প্রবেশার্থী অনেক সময় মনে করেন, ভগবানের সর্বোত্তম সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুদেব এবং সেই গুরুদেবের নিকট সেবক বৈষ্ণবগণকে কেনই বা তাহাদের (সমালোচনাকারিগণ) অপেক্ষা বা অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ, সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা হইবে? গুরুদেবের ভোগ কেন সর্বাগ্রে বা শ্রেষ্ঠ উপচারে হইবে? বৈষ্ণবগণের জন্য কেনই বা পৃথক আসন, পৃথক ভোজ্যের বন্দোবস্ত হইবে? আর

তাহাদের জন্মই বা কেন অন্তরূপ ব্যবস্থা হইবে? কোন উৎকৃষ্ট জিনিষের অগ্রভাগ কেন গুরু-বৈষ্যবকে অধিক পরিমাণে দেওয়া হইবে? আর অপরকে কেনই বা তদ্রূপভাবে প্রদত্ত হইবে না? সকল জিনিষই সমষ্টির মধ্যে সমভাবে বিতরিত হওয়া আবশ্যিক, নতুবা পক্ষপাতিত্ব-দোষ উপস্থিত হয়। ঐরূপ সাম্যবাদের বিদ্যালয়ের লোক সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হইবার অভিনয় দেখাইয়াও বলিবেন, যখন আমরা সকলেই হরিসেবা করিতে আসিয়াছি—সকলেই যখন মঠের সেবা করিতেছি, তখন একজন অধিক সেবা করিতে পারেন বলিয়া বা একজনের সেবার পরিমাণ অধিক-রূপে গুরুদেবের দ্বারা আদৃত হয় বলিয়া তাহাকে ভাল আসন, ভাল ভোজন প্রদান বা তাহার অধিক পরিচর্যা করা হইবে, আমাদের কেন তদ্রূপ করা হইবে না? তাহাকে বহুলোক কেন পরিচর্যা করিবে, আর আমার পরিচর্য্যার সময় কোন লোক পাওয়া যাইবে না কেন? ঐরূপ আত্ম-ভোগোন্মুখ ব্যক্তি নিজের ভোগ-বৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইতেছে না দেখিয়া তাহার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার ছলে নিজের বুকভরা ভোগময় মাংসর্য্যভাবটীর প্রতিশোধ হইবার জন্য—ব্যক্তিগত ভোগ-প্রবৃত্তি সমষ্টিগত সংখ্যাগতিকের বলে চরিতার্থ করিবার উত্তেজনায় সাম্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সেবা-পীঠের দ্বারে আসিবার সুযোগ পাইয়াও তাহাদের কপাল ধারাপ, তাহারা সর্বতন্ত্রস্ততন্ত্র ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তির রাজ্যেও ঐরূপ সাম্যবাদের প্রচার ও প্রচলন করিতে চাহেন এবং তথায় সাম্যবাদের অভাব দেখিলে তথা হইতে সরিয়া পড়েন অর্থাৎ নিরয়ের পথই পুনরায় লোভনীয় বলিয়া বরণ করেন। ঐরূপ কপালপোড়া সাম্যবাদী মনে করেন,—বৈষ্যবেরা একচোখো; কেহ বা বলেন—(কখনও মুখে কখনও বা অন্তরে বলিয়া থাকেন) ইহাদিগকে যিনি অধিক টাকা দেন, তাহাকেই ইহারা অধিক আদর করেন—যিনি ইহাদের অধিক কার্য্য করেন, ইহারা তাহাকেই অধিক সম্মান করেন। কেহ বা বলেন বা মনে করেন,—যখন আমি ইহাদিগকে অর্থ দিতে পারিতাম, ইহাদের অধিক কার্য্য করিতে পারিতাম, তখন ইহারা আমাকে অধিক আদর করিতেন, এখন সেইরূপ অর্থ দেই না বলিয়া বা সেইরূপ কার্য্য করি না বলিয়া ইহারা আমাকে আর আদর করেন না।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, সাম্যবাদের ভিত্তি—ভোগানুখতা ও নাস্তিকতা। সাম্যবাদীর ভক্তিমঠাদিতে প্রবেশের চলনা বা সেবাপীঠের কোনপ্রকার আনুকূল্য করিবার ভান শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে। অধিক সম্মান পাইব—আদর পাইব—দাতা বলিয়া প্রচারিত হইব কিম্বা কোন প্রকার সামাজিক ও সাংসারিক অপবাদ ঢাকা পড়িবার সুযোগ হইবে অথবা কোনপ্রকার দেহমনোগত সুখ-সুবিধা লাভ হইবে—এইরূপ ভোগোন্মুখ চিত্তবৃত্তি বা অন্যাভিলাষ লইয়া ভোগ-রাজ্যের ব্যক্তি সেবা-রাজ্যের দ্বারে আসিবার অভিনয় করেন। তাঁহারা ঐরূপ ভোগানুখতা বা অন্যাভিলাষ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে, যদি তিনি মনোযোগের সহিত—সেবা করিবার বুদ্ধির সহিত গুরু-বৈষ্ণবের মুখে সেবা-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। কিন্তু সাম্যবাদের বিচার তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলে সেখানে গুরু-বৈষ্ণবে জাতিসামান্যবাদ অর্থাৎ ইতরমহাত্ম্য-সামান্যবাদরূপ একটি ভীষণ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অপরাধের ফলে ভক্তিমঠাদির দ্বারে উপনীত ব্যক্তিও সেবা-বিচার হইতে বিচ্যুত হন, নির্ম্মলসর সাধুগণে তাঁহার মৎসরতা, অতিমর্জ্য শ্রীগুরুদেবে তাঁহার মর্জ্যবুদ্ধি প্রভৃতি অপরাধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি সাম্যবাদীর অসংস্রকেই অধিকতর নীতিপুষ্ট মনে করিয়া দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন এবং নাস্তিকতার অতল গহ্বরে প্রবেশ করেন। যেখানে সাম্যবাদী সেবা-ধর্মকে কর্ম-রাজ্যের নীতি বা দুর্নীতির ছায়াই বৃত্তি-বিশেষ এবং ভগবৎসেবককে কর্মকাণ্ডী নৈতিক বা অনৈতিক ব্যক্তির ন্যায় কল্পনা করেন, সেখানে কর্মরাজ্যের বিচার ভক্তিরাজ্যে চালনা করিবার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। সাম্যবাদী যেখানে মনে করেন,—সেবা, সেবাপীঠ বা সেবকগণের বিচার কর্মরাজ্যের নৈতিক বিচারের অনুগমন করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবে, সেবাপীঠে সেবকগণের অধিক আদর, অপরের তদ্রূপ অভিনন্দন-অপ্রাপ্তি—নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য, একান্ত আন্তিক ভগবৎসেবক বা সেবোন্মুখগণের বিচার সেখানে অনুরূপ। সেবোন্মুখগণের কৃষ্ণেইন্দ্রিয়তর্পণই মূলমন্ত্র হওয়ায় তাঁহারা জানেন, যিনি ভগবৎসেবার জন্য অধিক আনুকূল্য করেন—ভগবদ্ভক্তের অধিক কার্য্য করেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণসেবার অধিকতর সহায়কারী বলিয়া অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা করিতে হইবে, ইহাতে কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্যবাদী যাহাকে

প্রাকৃত নীতিবিরুদ্ধ মনে করেন—পক্ষপাত-দোষপুষ্ট মনে করেন, তাহা প্রকৃত সুসূক্ষ্ম বিচারকের নিকট কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কৃষ্ণসেবক কন্মীর ন্যায় তাঁহার ভোগের (৭) ইন্ধন প্রদানকারী বা তাঁহার ভোগ-নিরপেক্ষ কোন জীববিশেষের ইন্দ্রিয়সেবা করিবার জন্ত কাহারও আদর-অভ্যর্থনা বা সম্মান করেন না; যে-সকল জীব তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বৃত্তি বর্দ্ধন করিবার জন্যই তাঁহাদিগের অধিক আদর-অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কন্মী তাঁহার ভোগের ইন্ধনপ্রদানকারীকে যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা করেন, কন্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ তাহাদের ভোগ বা ত্যাগময় কন্ম বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনপ্রদানকারিগণের ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া জীবসেবার (৭) নাস্তিকতা প্রদর্শন করেন, ভগবৎসেবকগণ, বিশেষতঃ একমাত্র পার-মার্থিক-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেইপ্রকার নাস্তিকতার চিন্তাশ্রোতে ধাবিত হন না। শ্রীভগবৎসেবার আনুকূল্যকারিগণকেই অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা ও সেবা করায় এই পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের কৃষ্ণ সেবানুরক্তির পরাকাষ্ঠাই প্রমাণিত হয়। ইহারই নাম প্রকৃত-প্রস্তাবে আশ্রিততা—দৃষ্টে আত্মবুদ্ধি! আমার সর্বাপেক্ষা প্রীতির বস্তুকে যাহারা সেবা করিবেন বা কোন প্রকারে সেবার সহায়তা করিবেন, আমি তাঁহাদেরই আদর অভ্যর্থনা, সম্মান ও সেবা করিব।

সেবোন্মুখ ব্যক্তি সাম্যবাদীর আদর্শ-গ্রহণকারীর ন্যায় কখনই মনে করেন না,—“আমি যখন ভগবৎসেবকগণকে অর্থ দিতে পারিতাম বা সেবা করিতে পারিতাম, তখন ইঁহারা আমার অধিক আদর-যত্ন করিতেন, এখন তদ্রূপ করিতে পারি না বলিয়া তাঁহারা আমাকে পূর্ববৎ আদর-সম্মান করেন না; সুতরাং এইরূপ পক্ষপাতযুক্ত-ব্যক্তিগণের দল হইতে অপস্বার্থপর নীতি বা দুর্নীতিপুষ্ট কন্মীর দলে প্রবেশ বা নাস্তিকতায় প্রবেশই ভাল।” সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি সাধুগণের নিকট হইতে ঐরূপ প্রতিষ্ঠা বা ভোগমাত্র-প্রয়োজনপ্রার্থী ব্যক্তির আদর্শানুসরণের পরিবর্তে নিজ দুর্দৈবই স্মরণ করেন। তিনি বিচার করেন,—“আমার কি দুর্দৈব! আমি সেবা হইতে পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়াছি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ভগবৎসেবায় যতটুকু অধিকার পাইয়াছিলাম, বর্তমানে সেটুকু হইতেও বিচ্যুত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া এখনও যে আমার ন্যায় ভোগমাত্র-প্রয়োজন-প্রার্থী

বাক্তিকে তাঁহাদের সেবামন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট কৃপা। সেবা-শিথিল হইয়া আমি কেনই বা প্রাণধারণ করিতেছি ? আমি কি তাঁহাদের সম্ভাষণেরও যোগ্য ? আমার ন্যায় সেবা-বিমুখকে উপেক্ষা দেখাইয়া তাঁহারা আমার হৃদয়ে যে গ্লানি আনিয়া দিতেছেন, ইহাতে আমার অনুতপ্ত হইয়া ভগবৎসেবায় অধিকতর যত্ন করাই উচিত। ইহা তাঁহাদের অমন্দোদয়-দয়ারই নিদর্শন। আমার ভোগোন্মুখতা বা সেবাশিথিলতাকে কখনই তাঁহারা আদর করিতে পারেন না ; কেন না, তাঁহারা সেবাগতপ্রাণ। আমার সেবা-শিথিলতাকে আদর করিলে (আমার আপাতরুচিতে তাহা প্রেয়ঃ মনে হইলেও) উহা দ্বারা আমার প্রতি হিংসাই করা হইবে। নির্যাসের সাধুগণ সাম্যবাদী কন্মীর ন্যায় কখনই সেরূপ হিংসক হইতে পারেন না।—এইরূপ বিচার করিয়া সেবোন্মুখ বাক্তি সর্বদাই গুরুবৈষ্ণবের কৃপার সৌন্দর্য্য দেখিতে পান এবং এইরূপ বিচার থাকিলে তুর্দৈবক্রমে কাহারও সাময়িক সেবা-শিথিলতা আসিলেও তিনি আবার সেবারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সাম্যবাদের নীতি নাস্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে যত আন্তরিকতা, সেখানে তত অধিকতর পক্ষপাতিত্ব। স্বরাট পুরুষোত্তম তাঁহার সেবকের পক্ষপাতিত্ব নিত্যকালই করেন। ইহা ভগবানের পক্ষে দূষণ না হইয়া ভূষণস্বরূপই হইয়াছে। সেবকও তাঁহার অদ্বিতীয় সেবা ক্রমের সেবার জন্ত জগতের সাম্যবাদীগণের নিকট হইতে পক্ষপাত-দোষের কলঙ্ক সাদরে বরণ করিয়া থাকেন। এই কলঙ্কের অলঙ্কার সেবক-সম্প্রদায়ের অধিকতর সেবাসৌন্দর্য্যই প্রকাশ করে। সাম্যবাদীর জন্ত শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যাহম্ ॥

—আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। কিন্তু যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং তাহাতেও আমি অত্যাসক্ত থাকি।

[ক্রমশঃ]

পরমারাধ্য জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের
১০ম বর্ষ-পূর্তি বিরহ-মহোৎসবে
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

জয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ;
তব অপ্রকট-লীলা স্মরি' আজি কাঁদি মোরা অশ্রুক্ষণ ।
দশ বছর আগে এ হেন তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ-যোগে,
হরিনাম-নীরে ভাসিয়ে ধরণী, চলে গেছ ব্রজলোকে ।
সেদিন শ্রীমঠে রাধিকা তোমারে প্রসাদী মালিকা দানি',
জানালো ইঙ্গিতে...ব্রজে যেতে হবে তাজি' এ ধরণী-ভূমি ।
প্রসাদী-মালিকা লইয়া তখনি পশিলে হরির রাসে,
শ্যাম-সঙ্গিনী হ'য়ে আজও তুমি রাজিছ শ্যামের পাশে ।
আজি সেই তিথি সমাগত হেরি' হর্ব নাহি কারো মনে,
বাতাস ভরেছে বেদনার স্বাসে, শশী ম্লান নভ-কোণে ।
বিষাদ-আঁধার ঘনায় আজিকে বনে-পথে-মাঠে-ঘাটে,
ডাকে না বিহগ সুস্বরে আজি নদীয়ার তরু-শাখে ।
ময়ূর-ময়ূরী পাখা ছুলাইয়া নাচে না তেমন আর,
ভ্রমর-ভ্রমরী নাহি গুঞ্জরে, নীরব আজি চারিধার ।
এবার তোমার দশম বর্ষ-পূর্তি অপ্রকট-দিনে,
নদীয়া-সৌন্দর্য্য হয়েছে বিকৃত গঙ্গার ভরা বানে ।
প্লাবনে ডুবেও নদীয়াবাসীরা ভোলেনি তোমার বাণী,
অলক্ষ্যে যেন শুনিতেনি আজও তোমার 'মাইতঃ' ধ্বনি ।
এ জগতে হায়, তোমার বিহনে সকলি শূন্য দেখি,
নিতান্ত দুর্দিন আসিল ভাবিয়া হৃদয়ে জাগিছে ভীতি ।
এসেছিলে তুমি আমাদের লাগি' গুরুরূপে ধরা-মাঝে,
বহু পাতকীর চিত্ত শোধিয়া আশ্রয় দিলে তব কাছে ।
জানাইলে মোদেরে শাস্ত্র-প্রমাণে গৌর স্বয়ং ভগবান্,
গৌর-সকাশে পেয়েছে জগৎ সুনিত্য ধর্ম্মের সন্ধান ।

শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভুর শিক্ষামৃত-ধারা বেদ-শাস্ত্র-সম্মত,
 কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিমূল ভাগবতধর্ম নিত্যমঙ্গলপ্রদ ।
 নিরন্তরকুহক পরতত্ত্ব-সন্ধান প্রতি মানবের কৃত্য,
 শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ বাস্তববস্তু শ্রুতি-শাস্ত্র-প্রতিপাদ ।
 সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব যে-ধর্ম নাহি ভায়,
 সেই ধর্ম-পালনে সর্বার্থ সিদ্ধি মিলে না কভুও হয় ।
 দারিদ্র্যতা ঘুচি' ধনী হ'লে সবে, দেশে কি শান্তি আসে ?
 ধনী-রাজারাজ অশান্তি-অনলে দহিছে সর্বদেশে !
 ত্রিগুণাবদ্ধ মানুষের মনে চৈতন্য-প্রেমালোক জ্বলে,
 শ্রীনাম-ভজনে হৃদয় শোধিলে শাস্ত্রত শান্তি মিলে ।
 এই পৃথিবে সবই হয় লয়, থাকে শুধু হরি-পদ ;—
 তাইতো শ্রীহরি-ভজনের লাগি' কহে বেদ-ভাগবত ।
 রহদের প্রতি ভক্ত ভারতের উপদেশ ব্যাখ্যা করি',—
 বুঝালে মোদেরে গুরু-কৃপা ছাড়া মিলে না কভুও হরি ।
 গুরুদেব কভু অবতার নহে ;— শ্রীহরির প্রতিনিধি,
 পরমভক্ত শ্রীগুরুর প্রেমে বাঁধা হরি নিরবধি ।
 অবতার কেহ সাজিতে পারে না, ...লক্ষণে চেনা যায়,
 —না জানিয়া তাহা, সাধারণ নরে ভেঙ্কির পিছু ধায় ।
 “গৌর-প্রচারিত প্রেম-ধর্ম কভু ক্রীবের ধর্ম নহে,
 আত্মবল লাভের প্রকৃত পন্থা এই ধর্মমতেই রহে ।”
 আরো কত তব উপদেশ-বাণী মনে জাগে ধীরে ধীরে,
 লিখিতে সে' কথা ভাষা নাহি ফোটে, আঁখি ওঠে জলে ভরে ।
 মায়াবাদীদের মতবাদ খণ্ডি' গোড়ীয়-সিদ্ধান্ত স্থাপি',
 ‘বৈষ্ণব-বিজয়’-গ্রন্থ দিচিলে শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখি' ।
 শ্রীপ্রভুপাদেবের রক্ষিলে একদা তুচ্ছ করি' নিজপ্রাণ,—
 সানন্দে সহিলে কুচক্রীদের কাছে লাঞ্ছনা-অপমান ।
 যুক্তবৈরাগ্য আচরিলে তুমি শ্রীগুরুর সেবা-ব্রতে,
 নিঃশঙ্ক হৃদয়ে প্রভুপাদ-শিক্ষা প্রচারিলে দিকে দিকে ।

গুরুসেবা-বলে সেকালে শবরী পেল শ্রীরাম-লক্ষ্মণেরে,
 আরুণি ও উপমল্য শ্রীগুরুরে সেবি' কৃতার্থ অন্তরে ।
 একালে তুমিই দেখালে জগতে শ্রীগুরু-সেবা কত বড়,
 তোমার মতন গুরৈকনিষ্ঠা দেখিনি এ'-চক্ষু আর ।
 চিদ্বিলাসভূমির সুগোপ্য-কথা ব্যক্ত করেছ কত,
 স্মৃতি হ'য়ে আজ সে'সকল কথা জাগে মনে অবিরত ।
 তুমি যে মোদের সেব্যবস্তু, আমরা তোমারই দাস ;
 দেখা দিয়া এবে মোদের হৃদয়ে পুরাও সকল আশ ।
 বুঝি আমাদের হরি-ভজনের শৈথিল্য দর্শন করি'
 ভজনে উন্মুখ করিতে মোদেরে গিয়াছ এ'-ধরা ছাড়ি' !
 হেথা নির্দ্বারিত লীলা শেষ করি' চলে গেছ ব্রজলোকে,
 জানি না আবার কতকাল প'রে দেখা দিবে আমাদেরি !
 মৃত্যু তোমার হয়নি কভুও,—এ মৃত্যু-লীলা-অভিনয় ;
 মোদের প্রাকৃত চক্ষুর আড়ালে আজো তব লীলা হয় !
 সব আছে তব, শুধু তুমি নাই,—এ' কি কভু হ'তে পারে ?
 সমাধি-দেউলে বিগ্রহরূপ ধরি' আজো আছ কৃপা ক'রে ।
 সমাধি-দেউল সদা জীবন্ত, .. হরি-কথায় মুখরিত,
 সেথায় মায়ার স্থান নাই কভু,—সে' ভূমি অপ্রাকৃত ।
 ভক্তের হৃদি-দেউলেও তব আসন রয়েছে পাতা,
 ভক্ত-হৃদয়ে হেরি' তব লীলা অভিভূত আজো সদা ।
 মো' সম অধম বঞ্চিত হয়নি তব কৃপা-বারি পে'তে,
 তবু হায় মোর ভক্তি-লতাকে পারি নাই সিঞ্চিতে !
 তোমার অভাব নেহারি' আজিকে ভেঙ্গে যায় মোর মন,
 শক্তি দাও মোরে তোমার সেবায় গাতি যেন আজীবন ।
 কুসুমাজলি সহ আজি লহ ব্যথিত হিয়ার নতি,
 মোরে কৃতার্থ কর চিরতরে তব পদ-পাশে রাখি' ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব

শ্রীযুক্ত গোড়ীয়-পত্রিকা সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

নিত্য ত্রিসন্ধ্যা শতকোটিদণ্ডবৎপ্রণামপূর্বক-নিবেদনমিদম্—

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু, আমি গোড়ীয়-পত্রের গ্রাহক নই, কিন্তু একজন গোড়ীয়-পাঠিকা। ইতঃপূর্বে যে সকল অর্থকর ও মনোধর্মের সহায়ক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল ভগবদ্বহির্নুখতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে নামিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু পূর্বজন্মের কোন সঞ্চিত সুকৃতি ছিল, তাই আমার এক আত্মীয়-বন্ধুর অনুরোধে আপনাদের অমৃত-পত্র “গোড়ীয়-পত্রিকা” খানা পাঠ করিতে অধিকারিনী হইলাম! জানি না, এ রক্ত এতকাল কোন্ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল! শ্রীপত্রের এক একটা অক্ষর এক একটা উপদেশামৃত। প্রতি প্রশ্নোত্তরের প্রতি সিদ্ধান্ত-বাক্যই ধ্রুব-সত্য এবং প্রত্যেক বাক্যই আপনাদের মহানুভবতার পরিচয় প্রকৃষ্টরূপে দেখা যাইতেছে; তাহা আপনাদের অহৈতুকী-কৃপা বাতীত অত্ন আর কি হইতে পারে? নিম্নলিখিত প্রশ্ন-কয়টির উত্তর শ্রীপত্রিকায় স্থান পাইলে চিরানুগৃহীতা হইব। ইতি—

পদরজঃপ্রার্থিনী—
কুমারী উষারানী

প্রশ্ন

- ১। জীবের প্রকৃত ধর্ম ও কর্ম কি?
- ২। এই যে সংসার-চক্র, ইহাতে কি সুখ আছে?
- ৩। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ভোগ্য পদার্থ কি?
- ৪। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চে মরীচিকা জলের ন্যায় বিনিষ্ট হয় কেন?

উত্তর

১। জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম—জীব। জীবের চেতনতা আছে। চেতন-বস্তু-মাত্রই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্ট। জড়বস্তুর চেতনতা নাই, কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তিও নাই। দেহ ও মন অচেতন বস্তু; তবে দেহ ও মনে যে কখনও কখনও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্ম-দেহের উপর যখন চেতনের আভাস পতিত হয়, তখনই তাহা মনাকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যখন সূক্ষ্ম-দেহের উপর চেতনাভাসের ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়, তখনই তাহা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়। আত্মাই একমাত্র অবিমিশ্র চেতন; এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা পূর্ণ ও বিদুচেতন, তাহারই অংশ

আত্মা খণ্ড বা অণু-চেতন,—যেমন একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও তৎস্ফুলিঙ্গরাশি। পরমাত্মা অগ্নিকুণ্ড-স্থলীয়, জীবাত্মা—স্ফুলিঙ্গ-কণস্থলীয়। যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে বা যাহা ধারণ করিয়া কোন বস্তু অবহিত থাকে, তাহাই সেই বস্তুর ‘ধর্ম’। ধর্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক; নিত্যধর্ম তাহাই—যাহা সকল-সময়, সকল-স্থানে কোন বিশেষ-জাতীয় সকল বস্তুকে ধরিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌহ-খণ্ডের নিত্যধর্ম—কঠিনতা জলের নিত্যধর্ম—তরলতা। কঠিনতা ও তরলতা-ধর্মদ্বয় যথাক্রমে সকল লৌহপিণ্ড ও সমস্ত জলরাশিকে সকল সময়, সকল-স্থানে ধরিয়া রহিয়াছে; আর নৈমিত্তিক-ধর্ম তাহাই—যাহা কিছু-সময়ের জন্য কোন বিশেষ-স্থানে, কোন বিশেষ-পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত থাকে। যেমন লৌহখণ্ড যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়, বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতাক্রম যে ধর্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক-ধর্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক-ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উহা সর্বকালে, সর্বস্থানে ও সর্বপাত্রে অবস্থান করে না। উত্তপ্ত কোমল লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর বরফও কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক তারল্য-ধর্মে অবস্থিত হয়। অতএব যে-স্বভাব সর্বকালে, সর্বস্থানে, বিশেষ-জাতীয় সর্ব-পাত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্য-ধর্ম। “জীবের প্রকৃত ধর্ম ও কর্ম” বলিতে অণু-চৈতন্যের যাহা নিত্যধর্ম ও নিত্য কর্ম, তাহাই বুঝায়। জীব যখন অণুচেতন-বস্তু তখন পূর্ণ-চেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে,— ইহাই তাহার নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম;—অর্থাৎ অণুচেতন-জীব, আশ্রিত আর বিভূ-চেতন পরমেশ্বর—আশ্রয়। অণুচেতন—আকৃষ্ট, বিভূচেতন—আকর্ষক বা কৃষ্ণ। জীব—অণুচৈতন্য, আর পরমেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্য-স্বভাব, তাহাই তাহাদের “প্রকৃত অর্থাৎ নিত্যশুদ্ধধর্ম ও কর্ম” বড় ছোটকে আকর্ষণ করে, আর ছোট আকৃষ্ট হয়; সুতরাং আকৃষ্টি, প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি, সেবা বা প্রেম—ইহাই জীবের প্রকৃত-ধর্ম ও কর্ম। কাণের গহনা পায়ে পরার মত বর্তমানকালে বিভূ-চৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা অযথা স্থানে অর্থাৎ অচেতন-প্রকৃতিজাত

খণ্ডবস্তুরে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কানের গহনা কানে পরিতে শিখিলেই অর্থাৎ যেখানকার জিনিষ সেখানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই আমাদের যাহা নিতা-স্বভাব বা সহজাবস্থা, তাহা প্রকাশিত হইল। সুতরাং “জীবের প্রকৃত ধর্ম ও কর্ম”—ভগবৎপ্রীতি বা অনুরাগ; আর তদ্ব্যতীত দেহ-প্রীতি, গেহ-প্রীতি বা তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া অপর জীবের দেহ বা বহু জীবের দেহ, একটি ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্তে অনেকগুলি গৃহ অর্থাৎ বিরাট সমাজ বা দেশের প্রতি প্রীতি কিংবা বিরাট প্রকৃতির প্রতি যে-সকল প্রীতির দৃষ্টান্ত জগতে উদারতা, ধর্ম, কর্ম, লোক-হিতৈষিতা বা বিশ্বপ্রেমিকতা প্রভৃতির নামে পরিচিত হয়, তাহা কানের গহনা পায়ে পরারই বিভিন্ন উদাহরণ। ঐ সকল কর্ম—জীবের অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম-কর্ম মাত্র। যাহারা ভগবানে অহৈতুকী, নির্মলা প্রীতি করেন, সেইসকল প্রকৃত ধান্মিকগণ যে জগতের সর্বলোক, সর্বদেশ ও সর্বস্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা ভগবৎ-বহির্মুখগণের জড়লোক, জড়দেশ বা জড়স্থানের প্রতি হৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে; তাহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়,—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধেই স্বামীর পিতা, স্বামীর মাতা, স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগিনী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীর দেশ, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বসন-ভূষণ, এমন কি স্বামীর গৃহের কুকুর, ছাগ, মৃগাদি প্রভৃতির প্রতিও আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকেন এবং সকল-বস্তুকেই স্বামীর বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করাইতে চাহেন। পক্ষান্তরে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীতে সেরূপ পতি-প্রীতির অকৃত্রিম নিদর্শন নাই। জগতে কৃষ্ণ-প্রীতি রহিত যে-সকল ধান্মিক ও কর্মী শতজনের মধ্যে প্রায় শতজনই দৃষ্ট হয়, তাহাদের বাহ্য-জগতের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-নিষ্ঠাময়ী। বিভিন্নপ্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাই—জীবের বিক্রপের ধর্ম বা কর্ম; আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম ও কর্মই—অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

২। এই সংসার-চক্রে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু স্থখের বাস্তবতা নাই। যেমন মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত পথিক মরীচিকা দেখিয়া মনে করিলেন,—‘নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত, সুতরাং এইস্থানেই স্নান-পান করিয়া এখনই পরমতৃপ্তি লাভ করিব।’ কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে থাকিলেন,

ততই দেখেন,—তাঁহার আকাজ্জিত সুখের ভাণ্ডার তাঁহাকে ধরা দিতেছে না—কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতে সুখের ছবিও সেইরূপ! জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখেরই প্রস্তাবনা, উপোদ্রোহ বা মুখবন্ধ, কিংবা দস্যু বা গুণ্ডার দলের চরের ন্যায় বিষকুস্ত-পয়োমুখযুক্ত। গুণ্ডার বা দস্যুর-দলের চর যেক্রপ অনেক আদর-আপ্যায়ন-দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুলস্থানে লইয়া যায়, পরে তাহার সর্বস্বান্ত, এমন কি, তাহাকে প্রাণে পর্যাস্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, এ-জগতে দুঃখ-দস্যুর সুখরূপী চরও সেইরূপ গুণ্ডার দলের দালালের মত আমাদেরকে প্রথমমুখে আদর-আপ্যায়ন ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া স্ব-স্থানে লইয়া যায়, পরে আমাদেরকে সর্বস্বান্ত ও চিরদুঃখ-রাজ্যে পাত্তিত করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন-গোস্বামী প্রভু যেক্রপ পাতড়া-পর্বতের দস্যুদলপতির অত্যধিক আদর-যত্ন দেখিয়া দস্যুর অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিবার আদর্শ দেখাইয়া-ছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীসনাতন-গোস্বামীপ্রভুর দাসের সবুদ্ধিমান দাসগণও তদ্রূপ দুঃখ-দস্যুর দূতরূপী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিনাশ বরণ করেন না। শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে জানা যায়, পূর্বকালে দণ্ডদাতা দণ্ডযোগ্য অপরাধি-ব্যক্তিগণকে পুনঃপুনঃ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন—একবার ডুবাইতেন, আর একবার উঠাইতেন,—ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুক্ষণ বাসী করিবার জন্যই অপরাধীকে এক একবার করিয়া উঠাইতেন, আবার অপরাধী দম (প্রশ্বাস-বায়ু) লইতে না লইতেই তাহাকে জলের ভিতর পুনরায় চাপিয়া ধরিতেন। সংসার-চক্রে যে সুখ আছে, তাহাও ঐরূপ মুহূর্তকাল দম লইবার মত। সংসার-কারা-রক্ষয়িত্রী মহামায়া দুর্গা-দেবী ভগবদ্বহিন্মুখ আমাদেরকে দুঃখ-মাগরে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত করিয়া ক্লেশের পরিমাণ পরিবদ্ধিত ও বহুকাল-স্থায়ী করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরকে যে দম লইবার একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময়-টুকুকেই আমরা সুখের সময় বলিয়া মনে করি, কিন্তু তখন বুঝি না যে, ঐ দম লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু আমাদেরকে দুঃখের অনুভূতি অধিকতর-গাঢ়-তীব্র-ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই সংসার-চক্রে সুখও দুঃখেরই অগ্রদূত বা দুঃখেরই দালাল। এই সুখ প্রচ্ছন্ন-মূর্তিতে দুঃখের দূত;—দুঃখ হইতেও লোকের

অধিকতর অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আর্ন্ত বা ভগবচ্চরণে প্রণম হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্ন-শত্রু সুখের (জগতে যাহাকে ‘মহা-সৌভাগ্য’ বলা হয়) মোহন-বেশে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগের কণ্ঠ-ভোগ যে কত বেশী, তাহা সাধুগণই দিব্য-চক্ষে দেখিতে পারেন।

৩। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ জীবের স্বরূপ-গঠনেই ভোক্ত-ধর্ম নাই। জীব স্বয়ংই ভোগ্য—ভোক্তা নহেন। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, জীবও ভগবানের ভোগ্য—

“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ”। (গীঃ ৯।২৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,—একমাত্র আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। বেদ বলিয়াছেন—

“ঈশাবাস্তামিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন তাক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিক্রমম্॥”

এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে যাহা কিছু ভোগ্য পদার্থ (জগৎ) তাহা সমস্তই লক্ষ্মী-পতি বিষ্ণুর (ঈ—লক্ষ্মী, তাহার শাসন-কর্তা, পালক বা পতির) আবাস-যোগ্য অর্থাৎ তাহারই ভোগ্য। অতএব বিষ্ণুর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াই বিষ্ণু-সেবার্থে অর্থাৎ বিষ্ণুর ভোগ্যপদার্থরূপে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত জীবের জীবনধারণ করা উচিত। যখন এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন বিষ্ণুর ধনে কাহারও ভোগ-বুদ্ধি-সহকারে আকাজক্ষা অর্থাৎ ভোক্তাভিমান করা উচিত নহে।

এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের ভোগ্য পদার্থ কিছুই থাকিতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ ভোগ্যতত্ত্ব জীবের স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব-ধর্মের অভাব-নিবন্ধন এই বিশ্বে জীব যে কিছু ভোগ করিবার আশা করে, কার্যতঃ তাহা ভোগ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই আপন ভোগার্থে অভিলষিত বস্তুর ভোগ্য হইয়া পড়ে। এ জগতে মাতা-পিতা পুত্রকে ভোগ অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা সেবা করিয়া লইবার আশা পোষণ করেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহারা স্বয়ংই পুত্র-কন্যার ভোগ্য হইয়া পড়েন অর্থাৎ পুত্র-কন্যার লালন-পালনাদি সেবা ও তাহাদের সুখ-দুঃখাদির চিন্তায় বাস্তব হইয়া পড়েন। পুত্র-কন্যাও

আবার পিতা-মাতার দ্বারা সুখ-শান্তি পাইবার আশা পোষণ করিয়া তাঁহাদের ভোগা হইয়া পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেও তাহাই। মহারাজ-চক্রবর্তী রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার আশা করিয়া রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের গোলাম হইয়া পড়েন। বিলাসী শ্রকু-চন্দন-বনিতা ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া উহাদের ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। নেশাখোর-ব্যক্তি মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি নেশা ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐসকল নেশার গোলাম হইয়া পড়েন। কারণ, অবিকৃত-বিশ্বে যাহা, বিকৃত প্রতিফলনেও তাহাই থাকে। জীবের এই স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ “আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্তা নহি, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ”—এই দিব্য-জ্ঞান উপস্থিত হইলেই জীব বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিজ-ভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সর্বত্রই “ঈশাবাস্য” অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু দর্শন করেন—সর্বত্রই কৃষ্ণের বিচরণ-ভূমিকা অর্থাৎ ব্রহ্মাবন দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনই মহাভাগবতের দর্শন—তুষ্ক ব্রহ্ম বা প্রকৃত বিদ্যুৎ দর্শন।

৪। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ জীবের ভোগ্য পদার্থ নহে বলিয়াই মায়া জীবকুলকে মরীচিকার দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত করে। ধীবর যেরূপ মৎস্যকে ‘টোপ’ ফেলিয়া প্রলুব্ধ ও তৎপরে বস্ত্রিশব্দ-করিয়া থাকে এবং কিছুকাল জলমধ্যে খেলিতে দিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে, যৎসু অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া অনন্তোপায়-হেতু উক্ত ধীবরের নিকট অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ-জীবও নানাবিধ অভিমানে আবৃত হইয়া যখন কিছুতেই ভগবানের শরণাগত হইতে চাহে না, তখন বদ্ধজীবের কারা-রক্ষয়িত্রী মহা-মায়াদেবী বিমুখ জীবকুলকে এই জগৎ-প্রপঞ্চের নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া এবং এই প্রপঞ্চ-মধ্যে কিছুকাল যথেষ্ট খেলিতে দিয়া জীবকুলকে পরিশ্রান্ত করে; অবশেষে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জীব অনন্যগতি হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ মরীচিকার জলের ন্যায় বিনষ্ট না হইলে আমরা এই জগৎকেই ‘নিত্য’ বলিয়া বিচার করিতাম। পরম-করুণাময় ভগবান্ আমাদের মোহ-মত্ততা বিনষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ বিধান করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার অত্যন্ত করুণার পরিচয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণবিধি

পারায়ণের বিধি ২টি পুরাণে ২টি ধারা প্রচলিত

১। প্রথমদিনে হিরণ্যাক্ষবধ (ভাঃ ৩।১৯) পর্য্যন্ত পঠনীয়। শরতের চরিত্র (৫।১৪) পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দিনে, সমুদ্রমন্তন (৮।৭) পর্য্যন্ত তৃতীয় দিনে, দশমের হরিভক্ত (১০।৩) পর্য্যন্ত চতুর্থ দিনে, কৃষ্ণাণীহরণ (১০।৫৩) পর্য্যন্ত পঞ্চমদিনে, উদ্ধব-সংবাদ (১১।৬) পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিনে, আর সমাপ্তি (১২।১৩) পর্য্যন্ত সপ্তম দিনে পাঠ করিবেন। ইহাতে ১ম দিবসে—৪৮টি, ২য়—৫৯, ৩য়—৫৩, ৪র্থ—৪৪, ৫ম—৫০, ৬ষ্ঠ—৪৩, ৭ম দিবসে—৩৮টি অধ্যায় হয়।

১ম দিবসের মধ্যাহ্নে বিরাম দিবেন—

১ম দিন পূর্বাঙ্কে—১।১ হইতে ২য় স্কন্ধ শেষ, মধ্যাহ্নে—৩।১ হইতে ৩।১৯ পর্য্যন্ত

২য়	"	—৩।২০	"	৪।১৯	"	"	—৪।২০	"	৫।১৪	"
৩য়	"	—৫।১৫	"	৬।১৯	"	"	—৭।১	"	৮।৭	"
৪র্থ	"	—৮।৮	"	৯।১৩	"	"	—৯।১৪	"	১০।৩	"
৫ম	"	—১০।৪	"	১০।৩৭	"	"	—১০।৩৮	"	১০।৫৩	"
৬ষ্ঠ	"	—১০।৫৪	"	১০।৮২	"	"	—১০।৮৩	"	১১।৬	"
৭ম	"	—১১।৭	"	১১।৩১	"	"	—১২।১	"	১২।১৩	"

২। মনু-কর্দম-সংবাদ পর্য্যন্ত (৩।২২) প্রথমদিনে, ঋষভাখ্যান পর্য্যন্ত (৫।৬) দ্বিতীয়দিনে, সপ্তমস্কন্ধ পর্য্যন্ত তৃতীয়দিনে, শ্রীকৃষ্ণবিভাব পর্য্যন্ত (১০।৩) চতুর্থ দিনে, কৃষ্ণাণীবিবাহ পর্য্যন্ত (১০।৫৪) পঞ্চমদিনে, হংসাখ্যান পর্য্যন্ত (১১।১৩) ষষ্ঠদিনে, শ্রীভাগবতপুরাণ (১২।১৩) সপ্তমদিনে করিবেন।

১ম স্কন্ধ—৫১ শ্লোকে, ২য়—৪৮, ৩য়—৫৪, ৪র্থ—৫১, ৫ম—৫১, ৬ষ্ঠ—৪৯, ৭ম—৩১ অধ্যায়।

২য় চীর মধ্যাহ্নেও বিরাম দিবেন।

$$১।১—২।০—৩।১—৩।২২=২৯+২২$$

$$৩।২৩—৪।১৯—৪।২০—৫।৬=৩০+১৮$$

$$৫।৭—৬।১৪—৬।১৫—৭।০=৩৪+২০$$

$$৮।১—৯।১২—৯।১৩—১০।৩=৩৪+১৭$$

$$১০।৪—১০।৩৭—১০।৩৮—১০।৫৪=৩৪+১৭$$

$$১০।৫৫—১০।৮৫—১০।৮৬—১১।১৩=৩১+১৮$$

$$১১।১৪—১১।০—১২।১—১২।০=১৮+১৩$$

উক্ত দুইটি মত প্রচলিত আছে।

শ্রীভাগবতপাঠ-বিধি

স্নানান্তে শুচি হইয়া প্রাণায়াম, আচমন, মঙ্গলাচরণপাঠপূর্বক প্রণাম করিয়া ষোড়শোপচারে বা মানসোপচারে শ্রীব্যাস-শুক-বাসুদেব ও গ্রন্থকে সাদরে পূজা করিয়া পাঠের পূর্বে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও গোপালমন্ত্র ১০৮বার জপ করিবেন। তারপর শান্তিপাঠ ও স্থাপন—

“ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমান্ভির্ঘজত্ৰাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তৃণু-
বাংসস্তনুভির্বাশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥” ততো ভাগবতং স্থাপয়েৎ—ও তদন্ত
মিলাবক্ৰণাঃ তদগ্রে, শংযোহস্মভ্যমিদমন্ত শস্তম্। অশীমহি গাধমুতপ্রতিষ্ঠাং,
নমো দিবে বৃহতে সাদনায় ॥ ইতি সংস্থাপ্য কামনানুরূপং সঙ্কল্পং কৃত্বা করাজ-
ন্যাসো কুর্যাৎ।—করন্যাসঃ। ওঁ ওঁ ওঁ নমো দক্ষিণতর্জ্জন্য়াম্, ওঁ নং ওঁ নমো-
দক্ষিণ মধ্যমায়াম্, ওঁ মো ওঁ নমো দক্ষিণানামিকায়াম্, ওঁ ভং ওঁ নমো দক্ষিণ-
কনিষ্ঠায়াম্, ওঁ গং ওঁ নমো বামকনিষ্ঠায়াম্, ওঁ বং ওঁ নমো বামানামিকায়াম্,
ওঁ তে ওঁ নমো বামমধ্যমায়াম্, ওঁ বাং ওঁ নমো বামতর্জ্জন্য়াম্, ওঁ জং ওঁ নমঃ ওঁ
দেওঁ নমো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপর্বণোঃ, ওঁ বাং ওঁ নমঃ ওঁ যং ওঁ নমো বামাঙ্গুষ্ঠপর্বণোঃ ॥

অঙ্গন্যাসঃ। ওঁ ওঁ নমো নমো হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভগবতে নমঃ শিরসে স্বাহা,
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ওঁ নমো নমঃ কবচায় হুম্, ওঁ ভগবতে
নমো নেত্রজয়ায় বৌষট্, ওঁ বাসুদেবায় নমোহস্ত্রায়ফট্। ততো বিনিয়োগপাঠঃ—
ওঁ অস্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যস্য স্তোত্রমন্ত্রস্ত নারদ ঋষিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মা
দেবতা ব্রহ্মবীজং ভক্তিঃ শক্তিঃ জ্ঞানবৈরাগ্যে কীলকং মম শ্রীমদ্ভগবৎপ্রসাদ-
সিদ্ধার্থপাঠে (অথবা-অমুকস্মারোগ্যার্থং শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালপাদপদ্মে
প্রার্থনাকর্ম্মণিপাঠে) বিনিয়োগঃ ॥ শিরসি ওঁ নারদর্ষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ
বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি-ওঁ শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ, গুহে ওঁ ব্রহ্মবীজায়
নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ ভক্তিশক্তয়ে নমঃ, নাভৌ ওঁ জ্ঞানবৈরাগ্যকীলকায় নমঃ,
সর্ব্বাঙ্গে ওঁ বিনিয়োগায় নমঃ ॥ ততো ধ্যানম্,—ওঁ পাদৌ যদীযৌ প্রথম-
দ্বিতীযৌ, তৃতীয়তুর্থৌ কথিতৌ যদূরু। নাভিস্তথা পঞ্চম এব যষ্ঠৌ, ভুজান্তরং
দোষুর্গলং তথান্যৌ ॥ কণ্ঠস্ত রাজনবমো যদীযৌ মুখাববিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং, শিরোপি যদ্বাদশ এব ভাতি ॥ তমাদিদেবং করুণা
নিধানং, তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্। অপারসংসারসমুজ্জসেতুং, তজ্জামহে
ভাগবতম্বরূপম্ ॥১) ওঁ কল্পরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তভং,
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কনম্। সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং

সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী, গোপস্বী পরিবেষ্টিতা বিজয়তে গোপালচূড়া-
মণিঃ ॥২॥ ওঁ কিরীটকেয়ুরমহর্নির্কৈর্মণ্যাস্তমালঙ্কৃতসর্বগাত্রম্ । পীতাস্বরং
কাঞ্চনচিত্রনকং মালাধরং কেশবমভ্যাপৈমি ॥৩॥ ততঃ পুরুষসূক্ত ষোড়শমষ্টৈঃ
ষোড়শোপচারং তদশক্তৌ 'ওঁ ক্লীং শ্রীমদ্ভাগবতায় নমঃ' ইত্যনেন যথাশক্য-
পচারং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-বাস-শুকদেবান্ সংপূজ্য প্রদক্ষিণ কুৰ্য্যাৎ । ওঁ ধাতা
পুরস্তাচ্যমুদাজহার, শকঃপ্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ । তমেব বিদ্বানমৃত ইহ
ভবতি, নানাঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে ॥

ততঃ সাক্ষীগুণং প্রণমেৎ ।

ওঁ বন্দে শ্রীকৃষ্ণদেবংমুরনরকভিদং বেদ-বেদান্ত বেদ্যং,

লোকেভক্তিপ্রসিদ্ধং যদুকুলজলধৌ প্রাদুরাসীদপারে ।

যস্যাসীদ্রূপমেবং ত্রিভুবনতরণে ভক্তিবচ্চ স্বতন্ত্রং,

শাস্ত্রং রূপঞ্চলোকে প্রকটয়তিমুদায়ঃসনৌ ভূতিহেতুঃ ॥১॥

—ওঁ নমঃ কৃষ্ণপদাঙ্কায় ভক্তাভীষ্ট প্রদায়িণে ।

আরক্তং যোচয়েচ্ছশ্যামকে হৃদয়াশ্রুজে ॥২॥

ওঁ বন্দে বৃন্দাবনগুরু কৃষ্ণং কমললোচনম্ ।

পীতাস্বরং ঘনশ্যামং বনমালা-বিভূষিতম্ ।

শ্রীদামদামসুবলন্তোককৃষ্ণার্জুনাবৃতম্ ।

গোপীমণ্ডলমধাস্থং রাধিকাপ্রাণবল্লভম্ ॥৩॥

ইতি প্রণম্য গ্রন্থমুচ্য গুর্বাদীন্ প্রণম্য পাঠমারভেৎ—

১ । ওঁ অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত-জ্ঞানাজ্ঞেনেত্যাদি ।

২ । ওঁ বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলমিত্যাди ।

৩ । ওঁ অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ট ইত্যাদি ।

৪ । অনপিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ইত্যাদি ।

৫ । বর্হীপীড়াভিরামং যুগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত—

৬ । জয়তাং সূরতো পঙ্কজর্মম মন্দমতের্গতী—

৭ । দিব্যহৃন্দারণ্যকল্লক্রমাধঃ শ্রীমদ্ভাগার—

৮ । শ্রীমান্ রাসরসারত্তী বংশীবটতটস্থিতঃ—

৯ । ধোয়ং সদাপরিভবন্নমস্তীষ্টদোহং—

১০ । তাক্ষা স্তুস্তাজহরেপ্সিতরাজলক্ষ্মীং—

১১ । যং ব্রহ্মাবণেকজরুদ্রমকৃতস্তম্ভস্তি—

- ১২। বন্দে নন্দ-গোপস্বীনাং পাদরেণুমভিক্ষণঃ—
- ১৩। মুকং ধরোতি বাচালং পঙ্খং লজ্জয়তে গিরিম্—
- ১৪। মধুরং মধুরমেতন্মুগ্ধলং মধুলানাং—
- ১৫। যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক, মধ্যাত্ম—
- ১৬। নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে—
- ১৭। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্—
- ১৮। তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্যবনানি চ—
- ১৯। বাঞ্ছাকল্লতরুভ্যশ্চ কৃপাসিকুভ্য এ বচ—
- ২০। জয় রূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ—

ন্যাস—ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যস্তোত্রমন্ত্রস্য নারদঋষিঃ, বৃহতীচ্ছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-
পরমাত্মা দেবতা, ব্রহ্মগীজম্ ভক্তি-শক্তিঃ জ্ঞানবৈরাগ্যকীলকং মম শ্রীমদ্ভাগবৎ-
প্রসাদ সিদ্ধার্থং পাঠেবিনিয়োগঃ। পাঠ করিয়া ঋগ্ভাদিন্যাস—নারদঋষয়ে নমঃ
শিরসি, বৃহতীচ্ছন্দসে মুখে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মদেবতায় হৃদি, ব্রহ্মবীজায়—ওঁহে —
ভক্তিশক্তাদয়ে...পাদয়োঃ জ্ঞানবৈরাগ্য কীলকায় নাভৌ শ্রীমদ্ভাগবত...
বিনিয়োগায় সর্বাঙ্গে নমঃ সহ পাঠ করিবেন। দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্রে অঙ্গন্যাস,
করণ্যাস অথবা বীজমন্ত্রে অঙ্গন্যাস, করণ্যাস করণান্তে ধ্যান করিবেন।

ততঃ পুরুষসূক্ত ষোড়শমন্ত্রে: ষোড়শোপচারং তদশক্তৌ 'ওঁ ক্লীং শ্রীমদ্ভাগ-
বতায় নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ যথাসক্ত্যুপচারং দত্ত্বাশ্রীকৃষ্ণ-বাস-শুকদেবান্
সংপূজ্যপ্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ। মন্ত্র—

ওঁ ধাতা পুরস্তাচ্চমুদাজহার, শকঃ প্রবিদ্বান্ প্রদিশচ্চতস্রঃ।

তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পস্থা অয়নয় বিদ্বতে ॥

প্রণামঃ—ওঁ বন্দে শ্রীকৃষ্ণংদেবং মুরলরকভিদং বেদবেদান্ত বেদং

লোকে ভক্তিপ্রসিদ্ধং যত্কুলসিদ্ধৌপ্রাপ্তুরাসীদপারে।

যস্যাসীদ্রূপমেবং ত্রিভুবনতরণে ভক্তিবচ স্বতন্ত্রং,

শাস্ত্রং রূপঞ্চ লোকে প্রকটয়তি মুদা যঃ স নো ভূতি হেতুঃ॥

ওঁ নমঃ কৃষ্ণ পদাজায় ভক্তাভীষ্ট প্রদায়িনে।

আরক্তং রোচয়েচ্ছশ্চান্মাকে হৃদয়ান্মুজে ॥

প্রতাহং পাঠাদৌ অন্তে চ ষষ্ঠস্কন্ধস্য (৬।৯।৩১-৪৫ শ্লোক) দেবস্তুতিঃ
পাঠকমবশ্য করণীয়ম্।

—শ্রীমুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ, (অন্যাস)

জরুরী অবস্থাকালীন সরকারী পদস্থ কর্মচারীর

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ পরিদর্শন

তখন জরুরী অবস্থা, দেশের মানুষ যেমন একটিকে থম্‌থমে, তেমনি যেন কর্মব্যস্ততাও কম নয়। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভয়ে বা জীবন-যাত্রার তাগিদেই যেন একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জন-জীবনের কার্য এগিয়ে চলিতেছিল। সেইসময় বিভিন্ন সংস্থাটির প্রতিও সরকারী কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য না পরে থাকে নাই। এমন এক সময়ের সন্ধিক্ষণে Deputy Magistrate বা Deputy Collector মহোদয় হঠাৎ কয়েকজনকে লইয়া নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে উপনীত হন। তাঁহারা প্রথমতঃ সাধারণ দর্শকের ল্যায়ই মঠে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও অন্যান্য কার্যাবলী সন্তুর্পণে লক্ষ্য করেন। মঠের বিভিন্ন সাধু-সন্তগণ তখন নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত। এমন সময় আমার পরিচিত শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখতে পেলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমাদের Deputy Collector মহাশয়কে সৌজন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—হঠাৎ আপনাদের আগমন, কি ব্যাপার? তিনিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দেখি, একবার আপনাদের মঠ ঘুরিয়া যাই। তখন আমরা মঠে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখিতেছিলাম এবং তার মধ্যেই আরও অনেকেই এসে সন্নিবেশিত হইতেছিলেন। Deputy সাহেব একে একে অনেক কিছুই খুঁটনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছিলেন এবং ব্রহ্মচারীজীও সাবলীল গতিতে যথাযথ উত্তর দিয়া চলিতেছিলেন। এমন সময় এক স্তম্ভপুষ্ট দেহধারী সৌম্যমুখি স্বামীজী এসে হাজির হন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সেখানকার সকল মঠবাসীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সহিত Deputy Magistrate সাহেবকে নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহারাজ পরিচয় করাইয়া জানাইলেন যে, “ইনিই আমাদের সমিতির সাধারণ সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং Deputy Collector-কে দেখাইয়া তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপনপূর্বক বলিলেন, “মহারাজ ইনিই মৈত্র সাহেব”—তিনি আমাদের মঠের বিভিন্ন activities জানতে চান। তখন পর্য্যন্ত আমাদের প্রায় বিভাগগুলিই ঘুরে দেখা হইয়াছে জানিতে পেরে তিনি Visitors' waiting Chamber-এ যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন। তথায় উপনীত হইলে সকলের বসার ব্যবস্থা হয়।

বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের যুগে ধর্মীয় সংস্থাগুলি সমাজ-জীবনের প্রতি তাঁদের কতটুকু অবদান দিয়ে চলছেন এবং এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু সেই সূত্র লইয়াই আলোচনা শুরু হয়।

মৈত্র সাহেব বলেন,—“স্বামীজী! আপনারা এখানে কতজন থাকেন?”

—তা, গড়ে এখানে প্রায় ৫০ জন।

আপনাদের এখানে বিভিন্ন বিভাগ দেখে মনে হয় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত। আচ্ছা, এনাদের পারিশ্রমিক হিসাবে কাহাকেও কিছু দিতে হয় কি?

—না, মঠবাসী সকলেই ত্যাগী জীবন যাপন করেন। অর্থের বিনিময় তাঁহারা সেবার নিয়োজিত নহেন। অথচ প্রত্যেকের জীবনই সেবাময়। সাংসারিক গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া জীবকে আধ্যাত্মিক ধারায় শিক্ষিত করিবার প্রয়াসী হইয়াই এই প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে আছেন।

মৈত্র সাহেব একটু হাল্কা গলায় বলিলেন,—তবে বেশ তো, বিনা পরসায় আপনারা অনেক কর্ম্ম পেয়েছেন বা পেয়ে থাকেন। হাঁ, একে দাসত্ব প্রথার অনুরূপ কি বলা চলে?

স্বামীজী তখন একটু স্মিত হেসে গম্ভীরভাবে বলিলেন,—“সেবা কাহাকে বলে এবং দাসত্বই বা কি” উহা সম্পর্কে আগে আমাদের ধারণাটা স্বচ্ছ (clear) হওয়া উচিত, তবেই তাৎপর্য ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা সম্ভব, নচেৎ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া নিজকে বঞ্চিত করা হইবে।

আচ্ছা, এ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গী কী, তাহা আমাদের বলুন।

স্বামীজী মহারাজ বলতে গিয়ে যেন ধিক্কারের স্বরে বলেন,—“বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সমাজ-জীবনের কাঠামো যেভাবে এগিয়ে চলছে তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে দুর্দিন আরও ঘনিষে আসছে। শিক্ষার কথা বলতে গেলে তো আমরা যে আত্মবিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলছি—উহাই প্রতিপন্ন হয়। যে-শিক্ষায় আদর্শের বালাই নেই বলেও অত্যাতি হয় না—উহা দ্বারা জাতির জীবনে কিধরণের মহৎ সমাজ গড়ে উঠতে পারে তাহা অবশ্যই ভাববার বিষয়। ভারতের বহুমুখী কৃষ্টির মধ্যে স্মরণীয় আত্মতত্ত্ব-বোধ আমরা আজ সত্যিই কি অনুধাবন করি? কেমন যেন একটা গডালিকা প্রবাহের জায় আমাদের ভারতবাসীর একটা অবস্থা হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে স্বাধীন-স্বাধীন বলিয়া চীৎকার করিতে চাই—
এই স্বাধীনতার তাৎপর্য কি? উশৃঙ্খলতা রূপায়ণ বা যথেষ্টাচারিতা নিশ্চয়ই
স্বাধীনতার রূপ নহে। যে-স্বাধীনতার নামে আমরা মায়ার নফর সাজিতে
উদগ্রীব—উগ্র মনুষ্যিক বিকাশের পরিপন্থা। আহা—নিদ্রা-ভয়-লোভ-মোহ-
মাংসর্ষ্য প্রভৃতির তো নিমিত্তই দাস হইয়া চলছি। সুতরাং আমরা ‘স্বাধীন’
—ইহা বলা প্রকৃততে স্বাধীন বলার স্বার্থকতা হয় না। আমরাও স্বাধীনতার
বিপ্লবী—কিন্তু কোন্ স্বাধীনতা? মায়ার নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ
করিয়া স্বরূপধর্ম প্রাপ্তি হওয়াটাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

অনেকের হয়তো ধারণা যে, আশ্রমে কতিপয় অল্পসংখ্যক ব্যক্তির সুবিধা
ভোগ করিয়া কতগুলি সরল-প্রাণ ব্যক্তিদিগকে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথার ন্যায়
বোকাধরণের লোকদিগকে দিয়া কার্য চালাইয়া নিজেদের সুযোগ-সুবিধা
আদায় করিয়া চলিয়াছে।

এই ধারণার অপনোদনের জন্য মূল লক্ষ্য বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী কি তা
অনুধাবন করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। যে-স্থানে দাসপ্রথা (Slavery) বিচ-
মান হইয়া দেখা যায় সে-স্থলে দাস-ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রভু-নামধারীদিগের
স্বার্থই বিজরিত থাকে। সেখানে ‘দাস’ চিরকালই দাস-পর্যায়ভুক্ত আর প্রভু
বা মনিব চিরকালেই শোষক। অর্থাৎ শোষিত ও শোষণকারীর আদান-
প্রদান মাত্র; কিন্তু আশ্রম-জীবনের পট প্রকৃত গণতন্ত্রমুখী। কেননা
যোগাচলনসমূহ পন্যোকেই প্রত্যেকের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন এবং
অযোগাচলনকে যতদূর সম্ভব উন্নত যোগ্যতায় কি করিয়া সমাধীন
করা যায় ততদূর প্রচেষ্টাও চলিয়া থাকে। এই পরিস্থিতিতে অধাবসায়ের
গুণে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাপ্য লাভ করিতে কোনও অসুবিধা হয় না—
প্রয়োজন শুধু নিরলস প্রচেষ্টা ও আদর্শময় জীবন-মাধ্যম। আজ হয়তো
যাহাকে একটা সাধারণ সেবকরূপে দেখা যাইতেছে—তিনিই হয়তো
অধাবসায়ের গুণে এরই পরিচালক বা কর্ণধাররূপে বৃত্ত হইবেন বা হন। কিন্তু
দাসপ্রথায় কি ঐরূপ নজির আছে? দ্বিতীয়তঃ এস্থানের সকলের সঙ্গে একটা
সৌহার্দ্যবিরাজমান। যদি তাই না হইত তবে তো পিতা-মাতা-ভ্রাতা-
ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন এমনকি অনেকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকেও পরিত্যাগ
করিয়া সানন্দে এখানে অবস্থান করিতে কোন দ্বিধা আসে না। যখনই দ্বিধার
আগমন ঘটে—তখনই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমনাগমন ঘটে। সে-

অবস্থায়ও প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে। অর্থাৎ মৌলিক অধিকারে কখনই হস্তক্ষেপ ঘটে না বা ঘটতে পারে না। এখানে এমনই শ্রদ্ধা, স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন যে—যাহাকে সহজে মানুষ উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহা না হইলে বিভিন্ন জাতির, সমাজের, বিভিন্ন ভাষাভাষীর ব্যক্তিগণ এক আত্মকেন্দ্রিক হইয়া নিরলস সেবকসূত্রে জীবন-যাত্রী হইতে পারিতেন না। এই বৈচিত্র্যময় জগতে বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা থাকলেও মূলতঃ একই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ আত্যন্তিক (নিত্য) মঙ্গল-প্রয়াসী। ইহা যেন Unity in diversity.

আধ্যাত্মিক ভারতের কথা বাদ দিয়া যদি আমরা ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার করি তখনও দেখতে পাই, এই ভারত উপমহাদেশ Diversity of unity. ভারতীয় চিন্তাধারার তাৎপর্য্যই অভিনব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং স্থূলচিন্তা গর্হণপূর্ব্বক সূক্ষ্মচিন্তা অনুধাবনই ভারতীয় চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধনা। Indian are philosopher by birth, শুধু খাওয়া-খাকার চিন্তায় যথার্থ মনুষ্যগণ ব্যস্ত থাকেন না। যাহারা শুধু খাওয়া-খাকা নিয়াই ব্যস্ত তাহারা মনুষ্য-মধ্যে ক্ষুদ্রবিশেষ বল্লই বা অত্যন্ত কোথায়?

একের পর এক এক জিজ্ঞাস্তা ও তৎসহ উত্তরও সঙ্গতি রেখে ক্ষিপ্রগতিতেই প্রত্যুত্তর হওয়ায় উপস্থিত সকলকেই চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। পরিশেষে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কে এবং তিনি বর্ত্তমানে এখানে আছেন কিনা জানার ইচ্ছা করিলে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের কক্ষে রত হন। তাঁহাদিগের আগমন দেখিয়া প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বাগত জানাইলে সম্পাদক মহারাজ তাঁহাকে পরিচয় করিয়া দিয়া বলেন, ইনিই আমাদের সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদিবস্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তবেদান্ত বামন মহারাজ; এবং মৈত্র সাহেবকেও পরিচয় করাইয়া দেন।

সভাপতি মহারাজ বিনয় ও নম্রভাবে প্রতি-অভিনন্দন জানাইয়া বলেন,— “বেশ তো আপনারা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আসিবেন। আমাদের খোজ-খবর লইবেন। জনসাধারণের অবসাদময় জীবন মাঝে আলোকবর্ত্তিকারূপে প্রতিয়মান করার জন্তই তো আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের প্রচেষ্টা—এই প্রতিষ্ঠান-মাধ্যমে। যাহা কিছু বৈভব সবই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—আমরা ভৃত্যানুভূতারূপে সেবকসূত্রে আছি মাত্র।

সরকার বহু টাকা-পয়সার ব্যয় স্বীকার করিয়া শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করিতেছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও এক-একটা শিক্ষাকেন্দ্র-বিশেষ। সরকারের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্র বা ছাত্রীগণ সরকারকে চাকরী বা কর্মনিয়োগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করেন—এমনকি বিভিন্ন সময় অপ্রীতিকর ঘটনার কথাও শুনা যায়। কিন্তু আমাদের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণ সরকারকে তো ব্যতিব্যস্ত করেনই না—উপরন্তু অনেক সময় ঔর্ধ্ব-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেও পর্যাপ্ত শাস্ত তথা সমাজের আদর্শস্থানীয়রূপে গড়িয়া তোলেন। সুতরাং এদিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক উন্নতি কামনা করা আপনাদের বা সরকারের অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেন কোন রাজনৈতিক ধান্দাবাজের লেজুর না হন—ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

দীর্ঘসময় আশ্রমে অতিবাহিত হওয়ায় Magistrate সাহেব আর বিলম্ব না করিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উপস্থিত সকলকেই পূজারী একটু একটু প্রসাদ দিলে তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করেন।

এই সমিতির তরফ হইতে দ্বারকা তথা পশ্চিম ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনের জন্য ট্রেনের কামরা সংরক্ষিত করে ছিলেন; ঐ যাত্রার আর মাত্র যথো একদিন বাকী, তাই বিভিন্ন প্রকার প্রস্তুতির জন্য কতৃপক্ষগণ ব্যস্ত পরে চাই নভেম্বর হাওড়া স্টেশন হইতে নির্দিষ্ট ট্রেনে যাত্রা করিয়াছিলেন। Deputy Magistrate সাহেব উক্ত সমিতি পরিদর্শন করিয়া স্বেচ্ছায় যে মানপত্রখানি দিয়াছিলেন তাহা শেষ পর্যন্ত আমার নিকটেই ছিল। দুর্দৈব-বশতঃ উহা পাইতেছিলাম না। কিন্তু আমার বাস-ঘরের সংস্কার-কার্য্য করিতে গিয়া দৈবাৎ ঐ কাগজটি পাইয়া সমিতির প্রকাশনী-বিভাগের অধিকর্তাকে আমার নিজের লেখনিটির সহিত উহা প্রদান করি ও ইহা যাহাতে তাঁহাদের সমিতির মুখপত্র “শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা” প্রকাশিত হয় তজ্জন্য অনুরোধ জানাই। মানপত্রটি দিতে বিলম্বহেতু আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। আমার অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

— শ্রীনীলমণি মুখার্জী

কলকাত্তনগর (নদীয়া)।

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রী শ্রী ব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
(গভঃ-রেজিষ্টার্ড) তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

৩০শে আগষ্ট/১৩৮৫ ; ১৭-১৮/১২/৭৮

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যানকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য-বেদান্তবিজ্ঞাপিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯২ শ্রীগৌরাদ ; ২রা ফাল্গুন, ১৩৮৫ সাল (ইং ১৫/২/৭৯) বৃহস্পতিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্বদবর নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণ-তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণ-পঞ্চমী ৫ই গোবিন্দ, ৪ঠা ফাল্গুন (ইং ১৭/২/৭৯) শনিবার পর্যান্ত দিবসত্রয়া শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা শুব-পাঠ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুভভক্তানুষ্ঠানে সবাঙ্গুর যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসকানুগত্যাভিলাষী—

সভাবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

জ্যৈষ্ঠব্য—২রা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমূর্ত্তে যথারীতি সঙ্গসারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমামূঢ়ক-বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্তন এবং প্রাক্কাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

৩রা ফাল্গুন, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা।

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL
COLLECTORATE OF NADIA
KRISHNAGAR**



From :

Shri B. C. Maitra,
Deputy Magistrate &
Deputy Collector, Nadia.

Dated, Krishnagar
the 6th Nov., 1975

I visited **Shri Devananda Goudiya Math, Nabadwip** to-day. This is a religious organisation with a big temple of Shri Radha Krishna inside under the supervision of Swami B. V. Baman Maharaj. About fifty disciples from different States of India serve the duties everyday. Though this is a religious organisation, I find the organisation is also seriously engaged in social work and I am glad to see that this religious organisation is following the real philosophy of the Hindu Religion.

I feel myself very proud in mentioning the daily activities of the organisation.—

- 1) Dedication to God by the inmates.
- 2) Renders medical aid to about 4/500 patients through the Goudiya Charitable Dispensary (Annual expenditure about four thousand rupees).
- 3) Free Library facility to fifty local people through a library.
- 4) Free Sanskrit teaching to twenty two students coming from different places of India through a well organised Chatuspathi.
- 5) Free Primary training to 150 students through a Primary School under three qualified teachers (waiting for Govt. grants).
- 6) Free Hostel service to the students for higher studies.
- 7) Agricultural development by employing the disciples of the Math in agricultural work.

I am also glad in finding that this organisation is also interested in industrial work for the employment and engagement of the local people and disciples which the organisation takes as part and parcel of the religious work (যত জীব তত শিব, শিবজ্ঞানে জীবদেব). My humble suggestion in this connection is that the organisation first approach Social Welfare Dept. for Govt. help and gradually proceed to different aspects suggested by the Directorate.

Lastly, I express my heartfelt thanks to my friends Shri Nabajogendra Brahmachari Maharaj and Shri Nilmani Mukherjee who very kindly showed me the different activities of the organisation. I also express my thanks to the President & the Secretary of the organisation under whose guidance and direction the organisation is running smoothly with great prospect for imparting real philosophy of Hindu Religion to the people of India and abroad.

Sd./—Illegible, 06/11/75

(**Shri B. C. Maitra**)

Deputy Magistrate & Deputy Collector,
Krishnagar, Nadia.

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরনন্দ ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরলনন্দ ।

অন্য ধর্ম সূত্বরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ।

৩০শ বর্ষ } বাসুদেব, ১ মাঘ, ৪৯২ গৌরাক
রবিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৮৫; ইং ১৪।১।১৯৭৯ { ১১শ সংখ্যা।

সানুনাচং পাণ্ডুনাচিকৃতম্

শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

লোমশ উবাচ—

নমামি নারায়ণ-পাদপঙ্কজং, করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা ।

বদামি নারায়ণ-নাম নির্মলং, স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

লোমশ বলিলেন,—শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম আমি প্রণাম করি, সর্বদা
তাহার পূজা করি, তাহার পবিত্র নাম কীর্তন করি এবং তাহার অব্যয় তত্ত্বের
স্মরণও করিয়া থাকি ॥৫৬॥

শৌনক উবাচ—

শ্রুতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে ।

পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥৫৭॥

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুব্ধন্তি বৈষ্ণবাঃ ।

যোহসৌ বিশ্বন্তরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥৬০॥

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপেধনাঃ ।

কীর্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভূম্ ॥৬১॥

শৌনক বলিলেন,—যাঁহার স্মরণে সকল কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়, সেই অর্জু, নিত্য পুরুষ হরির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥৬০॥

বৈষ্ণবগণ খাওয়া ও পরিধেয় বস্ত্রের বৃথা চিন্তা করেন । যিনি বিশ্বন্তর দেব, বিশ্বকে ভরণ-পোষণ করেন, তিনি কি তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিতে পারেন ? ৬০ ॥

ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতাগণ এবং তপোধন ঋষিবৃন্দ এইরূপভাবে বিভূ, সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ দেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন ॥৬১॥

গর্গ উবাচ—

নারায়ণেতি মন্ত্রোহস্তি বাগস্তি বশবন্তিনী ।

তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যোতদদ্ভুতম্ ॥৬২॥

গর্গ বলিলেন,—‘নারায়ণ’ এই মন্ত্র বিদ্যমান আছে এবং বাক্যও মানবের বশীভূত, তথাপি মানব নরকে পতিত হইতেছে ইহা বড়ই অদ্ভুত বিষয় ॥৬২॥

দাল্ভ্য উবাচ—

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্ৰৈর্ভক্তির্যস্য জনাৰ্দ্দনে ।

নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥৬৩॥

দাল্ভ্য বলিলেন,—ভগবান্ জনাৰ্দ্দনে যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার বহু-মন্ত্রের কি প্রয়োজন ? ‘নমো নারায়ণায়’—এই মন্ত্র সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিক্ষ্রবা নীতির্মতির্মম ॥৬৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্ধর পার্থ (অর্জুন), সেইখানেই শ্রী (রাজলক্ষ্মী), বিজয়, ভূতি (সম্পদবৃদ্ধি) ও নীতি (ন্যায়) প্রতিষ্ঠিত—ইহাই আমার অভিমত ॥৬৪॥

অঙ্গিরা উবাচ—

হরিহরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ ॥৬৫॥

অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥৬৫॥

অঙ্গিরা বলিলেন,—হরি দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে পাপ হরণ করেন—
ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি কেহ অগ্নিকে স্পর্শ করে,
তবে সে অগ্নিদগ্ধ হইবেই ॥৬৫॥

পরাশর উবাচ—

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।

বদ্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রাপ্তি ॥৬৬॥

পরাশর বলিলেন,—যিনি নিরপরাধে ‘হরি’ এই অক্ষরদ্বয় একবারও
উচ্চারণ করেন, তিনি কখনও বিপথগামী হন না, বিমুক্তির পথানুসরণেই
বদ্ধপরিকর ॥৬৬॥

পুলস্ত উবাচ—

রে জিহ্বে রসসারজ্জে সর্বদা মধুরপ্রিয়ে ।

নারাণাখ্যপীযুষং পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ ॥৬৭॥

পুলস্ত বলিলেন,—ওহে রসসারগ্রাহিনি মধুরপ্রিয়ে জিহ্বে ! তুমি নিরন্তর
নারায়ণ-নামামৃত পান কর ॥৬৭॥

বাস উবাচ—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভুজমুখাপ্য চোচ্যতে ।

ন বেদাচ্চ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥৬৮॥

বাস বলিলেন,—বেদ হইতে আর কোন শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ নহে এবং কেশব
হইতে অস্ত্র কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ নহে—ইহা সত্য-সত্য, পুনরায় বাহ উদ্ধে
ধরিয়া সত্য বলিতেছি ॥৬৮॥

ধন্বন্তরিকুবাচ—

অচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভেষজাৎ ।

নশ্যান্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৬৯॥

ধন্বন্তরি বলিলেন,—অচ্যুত-অনন্ত-গোবিন্দের নামরূপ ঔষধ সর্বোৎকৃষ্ট ।
নামোচ্চারণকারীর সকল রোগ বিনষ্ট হয়—ইহা সত্য আমি শপথ করিয়া
বলিতেছি ॥৬৯॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্নাত্থমুনি

শ্রীনাথের জন্ম ও কাল, এবং শ্রীরাজগোপালদেবের
কৃপাদেশ-লাভ

দাক্ষিণাত্যের তাম্রপার ও চোল দেশের মধ্যে 'মধ্যদেশ' অবস্থিত।
তথায় 'বীরনারায়ণ'-নামক গ্রামে ঈশ্বরভট্ট নামক জনৈক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ
বাস করিতেন; তথায় অনন্তাচার্য্য-প্রণীত 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থের মতে
৪৫ শকাব্দায় বিশ্বকসেনের অংশে জৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় ঈশ্বরভট্টের একটি পুত্র
জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীমন্নাত্থ-মুনি বলিয়া বিখ্যাত হন। বয়োবৃদ্ধির
সহিত নাত্থ-মুনি অশের শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গ্রামস্থ রাজগোপালদেবের
সেবা প্রাপ্ত হন। যথাবিহিত সংস্কারসকল সম্পন্ন করিয়া বহুকাল গার্হস্থ্য-
ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা প্রভৃতি উত্তর-দেশ-দর্শন
ও সেবালাভ-বাসনায় শ্রীবিষ্ণুহের নিকট প্রার্থনা করিলে শ্রীরাজগোপাল-
দেব তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

নাত্থমুনির বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ

নাত্থমুনি এবম্প্রকার অনুজ্ঞা লাভ করতঃ পরিবার ও কুটুম্ববর্গ
সমভিব্যাহারে উত্তর-দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্য পুষ্কর-তটে
বরাহদেব দর্শনান্তর গোপপু্র পৌঁছিলেন। তথা হইতে বামন-তীর্থে
অবগাহনপূর্বক ত্রিবিক্রম দেখিয়া ঘটিকাচল গমন করিলেন। ঘটিকাচল
হইতে বেঙ্কটাচলে রমাপতির পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ গরুড়-পর্বতে
অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ-প্রদেশে বিঠল-দেব
ও কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মদেবকে প্রণামপূর্বক মথুরায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর
মায়াতীর্থে মধুসূদন দেখিয়া গোমন্ত পর্বতাতিমুখে গমন করিলেন।
চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্বক গঙ্গাসাগর-তীর্থে
উপস্থিত হইলেন। গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান-দর্শনে
নিতান্ত আনন্দ লাভ করিলেন। গোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ
হইয়া কৃষ্ণসেবায় অহনিশ যাপন করিতে লাগিলেন।

গোপালদেবের স্বপ্নাদেশে মুনির সগোষ্ঠী

বীরনারায়ণ গ্রামে প্রত্যাবর্তন

এক দিবস রজনীতে নাত্থমুনি গোবর্দ্ধন-শিখরে কৃষ্ণসেবা-সুখে মগ্ন হইয়া
নিদ্রিত হইলে অষুপ্তি-কালে দেখিলেন যে, রাজগোপালদেব তাঁহাকে
গোবর্দ্ধন ত্যাগ করতঃ বীরনারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ

করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোপাল-কিষ্কর নাথমুনি স্বদেশ যাইতে বাসনা করিয়া গোবর্দ্ধনাধিপতির অমুজ্ঞা লইয়া স্বজন-সহ স্বদেশাভিমুখে চলিলেন।

প্রত্যাবর্তন-পথে বিভিন্ন তীর্থ দর্শন

পথিমধ্যে বেদাস্তিগণের অধুষিত বারাণসী ক্ষেত্র হইয়া নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করতঃ পুনরায় সিংহাচলে অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের যথোচিত বন্দনা করিয়া বেক্সটাচল-পতিকে প্রণতিপূর্বক ঘটিকাচলে পুনরায় শ্রীনৃসিংহের চরণার্চন করিলেন। গৃধ্র-সরোবরে আগমনপূর্বক যোগীরাটের অভিবাদনপূর্বক কাঞ্চী-নগরে উপনীত হইলেন। তথায় বরদরাজের স্তুতি করিয়া নানা তীর্থ ও দেব-প্রণতিপূর্বক মহীসার দেখিতে ইচ্ছা প্রবল হইলে, মহীসারে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গজস্থলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কৈয়বিনী-তীরে পার্থ-সারথি, রঞ্জেশ, রাঘব প্রভৃতি দেবতা নমস্কার করতঃ ময়ূরনগরে পৌঁছিলেন। ময়ূরনগরে কেশব দর্শন করতঃ ভোয়-পর্বত, পুণ্ডরীক-সরোবর, মহাবলীপুর, চোলদেশ ও কুন্তকোণ প্রভৃতি স্থানের শ্রীমূর্তি-নিচয়ের যথাযথ অভিবাদনপূর্বক বীরনারায়ণ-নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ তীর্থযাত্রা সমাপনপূর্বক নাথমুনি বীরনারায়ণপুরে পুরোঁগত বৈষ্ণবগণকে নানা তীর্থ হইতে আনিত প্রসাদাদি প্রদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন।

নাথমুনি কর্তৃক কারিসার-কৃত গ্রন্থের অন্বেষণ ও

তৎসম্বন্ধে তাঁহার ঐশ্বর্যাদেশ প্রাপ্তি

কিয়ৎকাল গত হইলে একদা শ্রীমন্নাথমুনি, কয়েকজন বৈষ্ণবকে 'কারিসার'-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গাথা' পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গাথাটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া স্বয়ং গ্রন্থান্বেষণে কুন্তকোণ যাত্রা করিলেন।

কুন্তকোণে পৌঁছিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগানুশীলনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল যোগসাধন করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া নাথমুনিকে বলিলেন,—“বৎস! তুমি সত্ত্বর তাত্ত্বপর্ণী নদীতীরে কুরকানগরীতে গমন কর। তথায় আমার পরম ভক্ত শঠকোপ দিবা-শরীরে

বাস করিতেছে। সেই শঠকোপ-দাসই এই গাথা রচনা করিয়াছিল। তথা হইতে অভীষিত গ্রন্থ গ্রহণ কর।”

কারিসাসের (শঠকোপের) গ্রন্থ ধ্বংসের পর

পুনরুদ্ধারের ইতিহাস

ভগবানের আদেশ-মত নাথমুনি কুরকা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আদিনাথের চরণ-বন্দনপূর্বক চিঞ্চামূলে শঠকোপ এবং তদীয় শিষ্যাগণা মধুর কবির মূর্তি ও তাঁহার শিষ্য শ্রীপরাক্রুশ দাসকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীনাথমুনি পরাক্রুশ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনি কি শঠকোপ-দাসের বিরচিত ‘সূক্তি’ দেখিয়াছেন? ঐ সূক্তি কি এক্ষণে গ্রন্থাগারে আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে কোথায় উহা পাওয়া যাইবে?” উত্তরে পরাক্রুশদাস বলিলেন,—“কারিসার পূর্বে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহা-প্রবন্ধ এক্ষণে কোথাও নাই। যেহেতু পুরাকালে ভগবান্ শঠকোপ বেদসকলের সার সংগ্রহ করতঃ দ্রাবিড়-ভাষায় চারিটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। শঠকোপ ‘সহস্র-গীতি’ নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য মধুর কবিকে উপদেশ করতঃ নিতাধামে গমন করেন। সেই সময়ে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে পাপ-বিমুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিতে লাগিল। এইজন্য এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মৃত্যু হয়,—অজ্ঞলোক এইরূপ বিশ্বাস করিত। তদবধি দ্রাবিড়-আয়ায়-পাঠ জগতে দুর্লভ হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির এই গ্রন্থ নষ্ট করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়া একদিন তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে পুস্তকখানি নিক্ষেপ করে। এই পুস্তকের একখানি মাত্র পত্র রক্ষা পাইয়াছিল। এই পত্রে দশটি মাত্র শ্লোক পুনরুদ্ধার হয়। শঠকোপের রচনার মধ্যে উহাই এক্ষণে আছে। শঠকোপের শিষ্য মধুর কবি ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে ঐ প্রবন্ধ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্বক দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা স্তব পাঠ কর। তাহা হইলে শঠকোপের তোমার প্রতি কৃপা হইবে।”

শ্রীনাথের অভিলেখ গ্রন্থ-প্রাপ্তি ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ-

প্রাপ্তির ইতিহাস

পরাক্রুশের উপদেশ-মতে শ্রীনাথ স্তব-পাঠে ব্রতী হইলেন। পাঠের ফলে অচিরেই অভিলেখ-গ্রন্থ “তত্ত্বত্রয়” ও “রহস্যত্রয়” পাইলেন। কুরকা-নগরে

অবস্থান-সময়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট অপ্রাকৃত বিগ্রহ-প্রাপ্তির ইতিহাস ও ভবিষ্যদাচার্য্যের বিবরণ জানিবার বাসনা হয়। তদুত্তরে শ্রীনাথ জানিতে পারিলেন যে,—ভগবান্ কোন শিল্পীর নিকট স্বপ্নে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ-রূপানুসারে বিগ্রহ-গঠনের আদেশ করেন এবং শ্রীমূর্তি গঠন সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রীনাথকে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে ভাস্কর প্রাতঃকালে শয্যাখান করিয়া আদেশ-মত শ্রীমূর্তি নির্মাণপূর্ব্বক শ্রীমন্নাথ-মুনিকে প্রদান করিল।

অপ্রাকৃত সিদ্ধ-মূর্তি অন্তর-ক্রমে পূজিত এবং
রামানুজের নিকট অদৃশ্য

শ্রীনাথ দেহাবসানে পদ্মান্ধ-নামক তদীয় শিষ্যকে অর্পণ করেন। পদ্মান্ধ সিদ্ধমূর্তি রামমিশ্রকে দিলেন। রামমিশ্র হঠাৎ যামুনাচার্য্য বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। যামুন-মুনি তদীয় শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণকে অর্চামূর্তি প্রদান করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তদীয় কন্যাকে শ্রীমূর্তি-সেবা প্রদান করিলে রামানুজের মন্ত্র-গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছিল।

গোস্থামী-গ্রন্থে শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা

শ্রীনাথ কুরকা-নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পরে গোপাল-দেবেরে ইচ্ছাক্রমে পুনরায় বীরনারায়ণপুরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীনাথের শিষ্য-সংখ্যা দশটী, তন্মধ্যে পদ্মান্ধই প্রধান। গোস্থামী-গ্রন্থেও শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনাথ রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্ন ও উত্তর

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি ?

শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় আমাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেই প্রশ্নটী উত্তর-সহিত প্রকাশ করিতেছি—

প্রশ্ন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা নিগুণ ও ভগবান্ সগুণ অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ভগবান্ নিগুণ, ব্রহ্ম তাঁহার ‘অঙ্গকান্তি’ ও পরমাত্মা ‘অংশ’ বলিয়া উক্তি করেন। ইহার বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি, আপনার পরা পত্নী সজ্জন-তোষণীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব।

শাক্ত-বেদান্তই বেদান্ত নহে

উত্তর—প্রশ্নকর্তা উক্ত প্রশ্নের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের নাম 'বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত'। 'বেদান্ত' কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্ত-মত পরস্পর পৃথক্। সাধারণে এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন। পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্রবিশেষ। তাহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই 'বৈদান্তিক মত'। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক। আমরা প্রথমেই সেই ভ্রম দূর করিতে যত্ন পাইব।

উপনিষদ্ বা বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই বেদান্ত,

তাহা জানা সাধারণের দুঃসাধ্য

বেদের শিরোভাগকে 'উপনিষৎ' বলে। উপনিষৎ অনেক। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাস্বতর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি দশটি 'উপনিষদ্' বলিয়া সর্বকালে স্বীকৃত আছে। সেই 'উপনিষদ্'-বাক্যের নামই 'বেদান্ত'। 'বেদান্ত' শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

'উপনিষদ্'-বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। 'উপনিষদ্'-গ্রন্থে বিষয় বিভাগপূর্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন অল্প মেধাবী ব্যক্তির পক্ষে 'উপনিষদ্'-বাক্যে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-বাক্য

পরম-দয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমত বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ 'উপনিষদ্'-বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ সংগ্রহ করতঃ প্রায় সাড়ে পঁচাত্তর সূত্র নির্মাণ করিয়া 'বেদান্ত-সূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' বলিয়া নামকরণ করিলেন। তাহার শিষ্যগণ এই সূত্রসকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস-সংহিতারূপ 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ' নির্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং

ভাষ্যকার হন। তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবত-রূপ 'ভাষ্যই' জীবের পক্ষে 'বেদান্ত-বাক্য' বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও

ভগবান্ সমস্তই নিগূর্ণ

আমাদের প্রশ্নকার জিজ্ঞাস্তা বিষয়ে বেদান্তসূত্র-ভাষ্য-স্বরূপ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং বজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

[যাহা—অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সম্ভায়ে সঞ্চিত অর্থাৎ কথিত হন।]

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়-তত্ত্বই সমস্ত সিদ্ধান্তের চরম বিশ্বাসস্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যখন সেই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সঙ্গু ন'ন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই 'নিগূর্ণ'।

অদ্বয়-জ্ঞান বলিতে অভেদ-বাদ নহে ; অভেদবাদ বেদবিরুদ্ধ

'অদ্বয়জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, 'কেবল অভেদ-বাদ'কে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলে। তাহা নয়। 'কেবল অভেদ-বাদ' সমস্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে 'নিত্যভেদ' উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই।

অদ্বয়-তত্ত্বের অর্থ—যুগপৎ ভেদ ও অভেদ এবং তাহা অচিন্ত্য

বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাহা হইতে অভেদ। 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্ম-তত্ত্বের পার্থক্য আছে। এই 'ভেদা-ভেদ-তত্ত্ব' যিনি জানিতে পারেন, তাহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অদ্বয়জ্ঞানের ১ম 'ব্রহ্ম', ২য় 'পরমাত্মা' এবং ৩য় বিকাশ নিগুণ 'ভগবান্'

দ্রষ্টৃস্বরূপ জীব সেই পরম-তত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাহার 'কেবল ভেদ' দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্‌রূপে ভাসমান হয়। ইহারই নাম "দ্বৈতজ্ঞান"। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র স্বভাৱ বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানময়। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনই ঐ অদ্বয়-জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের 'দ্বিতীয় প্রতীতি'। পরমাত্ম-তত্ত্বে দৃঢ়ীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম-চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম 'ভগবান্'। ভগবদ্-দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরম বস্তু আর পরা আর অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায়, তাহার স্বরূপ প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব ভগবানই অদ্বয়তত্ত্বের চরম প্রকাশ, পরম নিগুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাহারা ভগবানকে 'সগুণ' ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে 'নিগুণ' বলিয়া থাকেন, তাহারা যথার্থ বেদান্ত-বিচারে পটু ন'ন, অদ্বয়তত্ত্বের যথার্থ লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্র (১২।২।৩) সূত্রের শঙ্করভাষ্য অসার এবং

ভাগবত-সিদ্ধান্তই সার

পাঠক মহাশয় যদি 'ব্রহ্মসূত্রের' তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, দ্বাদশ সূত্রটি বিচার করিয়া দেখেন, তবে আমাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। সূত্রটি এই,—'ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেক-মতদ্বচনাৎ।'

—এই সূত্রের 'কেবল অদ্বৈতভাষ্যে' কোন প্রকার ভুল সিদ্ধান্ত নাই। রামানুজাদি পরমপণ্ডিতগণ এই সূত্রটির ভাষ্যবিচারে যে সূত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমুদায় বিচার করিলে স্থানান্তাব হয়। অতএব আমরা কেবল এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইবো।—

মণির্ঘথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযুতঃ ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদান্তথাচ্যুতঃ ॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন)

[বৈভূষামণি যেক্রপ দ্রব্যাস্তর-সম্বন্ধ-স্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইক্রপ ভক্ত-ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের পৃথক পৃথক অবস্থা লক্ষিত হয়]

সেই অদ্বয়-জ্ঞানরূপ অচ্যুত-তত্ত্ব স্বরূপতঃ একমাত্র ভগবান্ । জীব দৃষ্টি-ভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন । ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই ‘বৈভূষামণি’ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে । তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ ‘তত্ত্বমণি’ জীবের অধিকারভেদে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান হয় । এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের অধিকার ভেদ কত প্রকার ?

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিভেদে জীবের ত্রিবিধ অধিকার

জীবের বুদ্ধি, দক্ষতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার । সেই অধিকারসমূহ সুলবিচার দ্বারা তিনপ্রকারে বিভক্ত হয় । সেই তিনটি অধিকারের নাম—‘জ্ঞান’, ‘যোগ’ ও ‘ভক্তি’ । জ্ঞানাদিকারে অবস্থিত পুরুষ সেই ‘তত্ত্বমণি’কে ‘ব্রহ্মস্বরূপে’ দৃষ্টি করেন । যোগাদিকারে অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে ‘পরমাত্মাস্বরূপে’ দৃষ্টি করেন । ভক্ত্যাদিকারে অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির ‘ভগবৎস্বরূপ’ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন ।

সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ছিল না ; সৃষ্টির পর ‘ব্রহ্ম’ অঙ্গকান্তি এবং

‘পরমাত্মা’ অংশবিশেষ-রূপে প্রতিভাত

ভগবৎস্বরূপই ‘পূর্ণস্বরূপ’, যেহেতু তাহাই ‘বিশেষ্য তত্ত্ব’ । ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই ‘বিশেষ্য’র ‘বিশেষণদ্বয়’ । যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না । তখন ব্রহ্ম ছিল না । অগৎ সৃষ্টি হইলে “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” এইভাবে ভগবানের একটি বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয় । ‘ব্রহ্ম’ সম্বন্ধে দুইটি ভাব আছে । একটি “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” । দ্বিতীয়টি সমস্ত সৃষ্ট বা স্বগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তাবিশেষ । উভয় ভাবই বিশ্বসম্বন্ধীয় ভাব । অতএব ‘ব্রহ্ম’ই ভগবানের “জ্যোতিঃ-স্বরূপ” বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত । এস্থলে ‘ব্রহ্ম’কে ভগবানের ‘অঙ্গকান্তি’ বলিলে যথার্থ্যের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে । ‘পরমাত্মাকে’ ভগবানের ‘অংশ’ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না । জীব-সৃষ্টির সহিত ভগবানের যে অংশাবির্ভাব, তাহা ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে ।—

অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো ! যষেদং ধার্ষাতে জগৎ ॥ (গী: ৭।৭)

[একদ্ব্যতীত আমার একটি তটস্থ প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায় । সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা ; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে । আমার অন্তরঙ্গ-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গ-শক্তি-নিঃসৃত এই জড়জগৎ, —উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থ শক্তি' বলা হয় ।

বেধ হয়, অমৃত বাবুর আর কোন সন্দেহ থাকিবে না । যদি কোন সন্দেহ হয়, তবে লিখিবেন ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

লয় ও বিক্ষেপ

শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সময় লয় ও বিক্ষেপ—এই দুইটী হরিভক্তনের—মঙ্গল-বরণের প্রধান বাধা । হরিকথার প্রতি, হরিজন শ্রীগুরুপাদপদের প্রতি, হরিক্ষেত্র শ্রীধামের প্রতি ও শ্রীহরিনামের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত পরবুদ্ধি, আকর্ষণীয়তা বা অপরাধ হইতেই এইরূপ মহাভয়ঙ্কর ব্যাধিস্বরূপ লয় ও বিক্ষেপ অনর্থযুক্ত জীবকে আক্রমণ করে । আমি সর্বদা ভাগ করিয়া সংসজ্জা-রামের আশ্রয়গ্রহণপূর্বক, সজ্জপতি শ্রীগুরুপাদপদের শিষ্যাভিমান শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী ও শ্রীহরিকথা—এই সদ্বস্তুগুলির সুদুর্লভ সঙ্গ ও রূপালাভের সৌভাগ্য শ্রীগুরুপাদপদকর্তৃক অর্পিত হইয়াছি । কিন্তু হায় ! আমার কি দুর্দৈব যে, সেই বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াও এত বড় সৌভাগ্যের মূল্য না জানিয়া ছেলায়, নিশ্চিন্তে সেই সৌভাগ্যের অপব্যবহার করিতেছি ; আমার যত্নকোপরি সন্নিহিত শ্রীগুরুপাদপদের রূপাভ্যন্তকে হেচ্ছায় সজোরে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছি । শ্রীগুরুপাদপদ সেবক ভগবান্ । তিনি পরম রূপা প্রকাশ করিয়া আমার অকৃতি-সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেবক-বাৎসল্যাগুণে আমার নিকট নিতামঙ্গলের কথা কীৰ্ত্তন করিতেছেন । শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীনাম রূপাপূর্বক আমার সম্মুখে সবিগ্রহে বিদ্যমান রহিয়াছেন । কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি কত বড় অমর্যাদা দেখাইতেছি, তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া নিদ্রাভিভূত অনামন হইয়া অন্তরে কতবড় বেয়াদপি করিতেছি, তাহা আমি একবারও চিন্তা

করি কি ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীতুলসী, শ্রীবিগ্রহ—সকলেই প্রভুবস্ত। কিন্তু আমার হৃদয় এত কঠিন, নির্মম হইয়া গিয়াছে যে, সেই সাক্ষাৎ প্রভুবস্তসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াও তাহাদের প্রভুত্ব উপলব্ধি করিতেছি না। তাহারা অচেতনকেও চেতনবিশিষ্ট করিয়া তাহার উপর নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন—তাহাকে নিজ প্রভুত্ব উপলব্ধি করাইয়া তাহার সমস্ত জড়তা স্তব্ধ করাইয়া দিতে পারেন ; কিন্তু আমি অন্তরে তাহাদিগের প্রতি এত অমর্যাদা—পরবুদ্ধি পোষণ করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহারা তাহাদের সন্মুখে আমার নিদ্রাভিভূততা, অন্তমনস্কতা ইত্যাদি দেখিয়া বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিতেছেন ; জোর করিয়া আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন না। তবুও শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাহার অমায়িক কৃপা করিয়া আমার প্রতি স্নেহ ব্যবহার ও মৃদু শাসন, আবার কখনও বা কঠোর বাণীবাদ-প্রয়োগ-দ্বারা আমাকে নিজ দুরাবস্থা-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন। কিন্তু তাহার সেই জীবদুঃখকাতরতার কথা আমি ত' একবারও চিন্তা করিলাম না। তাহাদের প্রতি অন্তরে অমর্যাদাভাবরূপ ভীষণ পাষাণতা পোষণ করিয়াও তদ্বিষয়ে এক-মুহূর্তের জন্যও সাবহিত হইতেছি না ! শ্রীগুরুবর্গ বলেন,—যাহারা হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনের সময় বা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীতুলসীর সন্মুখে অন্তমনস্ক বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের মহতের প্রতি কঠিন অপরাধ সঞ্চিত আছে। তাহাদের মঙ্গল লাভ হওয়া সুদূরপর্যন্ত। কৈ, আমি গুরুবর্গের এই সতর্ক-বাণী মঠবাস করার প্রথম হইতে অসংখ্যবার শ্রবণ করিলেও তজ্জন্য একটুকুও সাবধান ত' হইতেছি না, নিজের দুর্দ্দেবের জন্য মুহূর্তের জন্যও আমার নিজেকে বিষ্কার দিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না ? একথা আদৌ চিন্তা করি কি ? কিজন্য মঠে আসিয়াছিলাম, এতগুলি বৎসর কিভাবেই বা কাটিয়া গেল, এই মুহূর্তটী কিভাবে বা যাইতেছে এবং আমার ভবিষ্যতে কি হইবে ? যাহার জন্য মঠে আসিলাম, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধের লেশও হয় নাই, হরি-ভক্তের কোন স্পন্দনই হৃদয়ে পাই নাই, অথচ এতগুলি বৎসর বা দিবস বৃথা কাটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য একটুকুও অনুশোচনা হয় না ! শ্রীগুরুবর্গ কোথায় হরিভক্তের পরমচমৎকারিতাময় নিত্যনবনবায়মান সেবারহস্য, স্বংকর্ণরমায়ন কথা কীর্তন করিবেন, তাহা না হইয়া আমাদের লয় ও বিক্ষেপ দূরকরণের জন্য লগুড়াঘাত করিতে করিতেই তাহাদের সময়

অতিবাহিত হইয়া গেল। হরিভজন-বৈশিষ্ট্যময়ী কথা কীর্তনের সুযোগ কি আমি তাঁহাদিগকে দিব না? তাঁহারা ত' চিরদিন এই জগতে বসিয়া থাকিবেন না, গোলোকের বস্তু গোলোকেই চলিয়া যাইবেন! আমি বা কি স্বর্ণসনন্দ পাইয়াছি যে, আমি এখানে অমর হইয়া থাকিব এবং তাঁহাদের সুদুর্লভ সঙ্গ-সুযোগের পুনঃ পুনঃ অপব্যবহার করিয়াও আবার তাহা পাইতে থাকিব? লয় ও বিক্ষেপ-দ্বারা অভিভূত হওয়া ত' আশ্রয়-হীনতার লক্ষণ। আমি এতদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-গ্রহণের অভিনয় করিতেছি, কিন্তু এখনও আমার মধো যে অনাশ্রিতের লক্ষণগুলি পুরা-পুরি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমার আশ্রয়গ্রহণ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ কপটই প্রমাণিত হয় না কি? এসব কথা আমি একবারও চিন্তা করি কি? এইরূপ ভয়ানক চিন্তাহীনতা আমাকে নিশ্চয়ভাবে গ্রাস করার দরুণ আমি হেলায় শুভমুহূর্তগুলি কাটাইতেছি; প্রভু-বস্তুগণের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহাদের প্রভুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না অথবা তাঁহাদের প্রতি অন্তরে এইরূপ পরভাব পোষণ করিয়াছি যে, রাজার নিকট দরিদ্র ব্যক্তি ধনাদি-প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে তাহার কখনও ঘুম আসিতে পারে না অথবা কোন ব্যক্তির তাহার অপর প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সেখানে কখনও তাহার নিদ্রাভিভূততা আসে না। এই উভয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে অত্যন্ত সন্ত্রম ও আপনবুদ্ধিই কার্যকরী হইয়া থাকে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের প্রতি আপন-জ্ঞান ত' দূরের কথা, তাঁহারা যে কত বড়-বস্তু, কত মহান—এই চিন্তা হইতে জাত যে সন্ত্রমবুদ্ধি, সেটুকু পর্য্যাপ্ত হৃদয়ে নাই। কারণ এই সন্ত্রমটুকুও যদি থাকিত, তাহা হইলেও আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীতুলসী বা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কখনই লয় বা বিক্ষেপ আসিত না। এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্বেব আমার হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছে। এখন উপায় হইতেছে ক্রন্দন। নিজের দুষ্ট মনকে প্রতি-মুহূর্তে শত শত ধিক্কার প্রদানপূর্বক শ্রীগুরুবর্গের কৃপা-প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় নাই। এইরূপ ভীষণতম দুরাবস্থা হইলেও তাঁহাদের কৃপা ছাড়া ত' অন্য আশ্রয় নাই; যত অপরাধী, দোষী, দুর্দ্বেবগ্রস্ত হইলেও আমি তাঁহাদেরই অযোগ্য সেবকাধম। ভালমন্দ সকল অবস্থাতে তাঁহাদের কৃপাই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র ভরসা।

পরমাধ্যাতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মে
আমার কাতর প্রার্থনা

কাঁহা মোর গুরুদেব পতিত-পাবন ।
তোমা লাগি সদা মোর কাঁদিতেছে মন ॥
অশান্তির চিতাবাহি সদা ধূ ধূ জ্বলে ।
গুরুদেব ! শান্তি-বারি দাও তুমি ঢেলে ॥
সংসার শ্মশান হয় পিশাচের স্থান ।
তুমি এসে কর মোরে এবি পরিব্রাণ ॥
সংসার-জ্বালায় আমি সদা প্রপীড়িত ।
শান্তিবারি দিয়ে কর জ্বালা নির্বাপিত ॥
বিষয়ের বিষকীট সদা দংশে মোরে ।
তোমা বিনা এ বিপদে কেবা রক্ষা করে ?
আত্মীয়-স্বজন সব কালসর্প সম ।
গ্রাসিবারে আসিতেছে হৃদি কাঁপে মম ॥
ভবাটবী মধ্যে আমি পড়েছি ফাঁপরে ।
তুমি বিনা এ সঙ্কটে কেবা রক্ষা করে ॥
এ ভব-সমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাই ।
তব কৃপা বিনা মোর অন্ম গতি নাই ॥
ভবের কাণ্ডারী তুমি ওগো দয়াময় ।
শ্রীচরণ-তরী দিয়ে উদ্ধার আমায় ॥
দয়ালের শিরমণি হও তুমি প্রভু ।
পাতকী বলিয়া ঘৃণা না করিবে কভু ॥
যদি তুমি এ' অধমে না কর উদ্ধার ।
দয়াল নামেতে হবে কলঙ্ক অপার ॥
ত্রিতাপ জ্বালায় আমি পুড়িয়া মরিবু ।
ভজন-পূজন সব ভুলিয়া যে গেবু ॥
কেমনে করিব আমি গৌরঙ্গ-ভজন ।
কেমনে বা করি ওগো যুগলের সেবন ॥

কেমনে পাইব আমি ভক্তসঙ্গে বাসি
 কেমনে হইব আমি বৈষ্ণবের দাস ॥
 মোহে অন্ধ হ'য়ে আছি পাগলের প্রায় ।
 ঘুরিতেছি সদা, প্রভু কি হবে উপায় ॥
 তুমি যদি নাহি কর এ' অধমে দয়া ।
 অতল তলেতে তবে যাইব ডুবিয়া ॥
 কৃপা-রজ্জু দিয়ে যদি বাঁধহ আমায় ।
 তবে ত হইতে পারে যেকোন উপায় ॥
 আর কতদিনে প্রভু করুণা করিবে ।
 অভাগীর অশ্রুজল কবে মুছাইবে ॥
 মোরে উদ্ধার করিবে তুমি ভরসা দিয়া ।
 আশা দিয়ে কেন তুমি গেলোগো চলিয়া ॥
 পুনঃ এসে কর তুমি প্রতিজ্ঞা পালন ।
 তবে ত জানিব তুমি পতিত-পারন ॥
 বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি জানি সর্বক্ষণ ।
 সদয় হইয়া তুমি দাও দরশন ॥
 দেখা দিয়ে কর মোরে এবে কৃপা দান ।
 জনমের মত পাব তবে পরিত্রাণ ॥
 জগাই মাধাই ছিল, শুনি যে পাতকী ।
 তাহ'তে অধিক আমি হই যে নারকী ॥
 মোরে যদি উদ্ধারহ তুমি দয়াময় ।
 জগতে ঘুষিবে তব মহিমা নিশ্চয় ॥
 এসব যাতনা আর সহিতে না পারি ।
 ছুরা করি এসো প্রভু ভবের কাণ্ডারী ॥
 কোথা আছ দয়াময়, সঙ্গে লও তুমি
 জনমে জনমে তব দাসী হব আমি ॥
 তোমার প্রসাদে পাব গৌরান্ধ-ভজন
 তব কৃপাবলে পাব নিতাই-চরণ ॥

আর পাব সর্বোত্তম যুগলের সেবা ।
 এ সবার অধিকার আর দিবে কেবা ॥
 নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হও তুমি এবে ।
 নিত্যানন্দে মাতি তুমি ভুলিলে কি মোরে ॥
 ভুলিলে ত চলিবে না তুমি নিত্যপ্রভু ।
 তব পাদপদ্ম আমি ছাড়িব না কভু ॥
 আসিব যাইব আর চরণ সেবিব ।
 আজ্ঞাবাহী হয়ে আমি দাসী হয়ে রব ॥
 নাম গ্রহণের শক্তি দিবে মোরে তুমি ।
 অবিরত হরিনাম করি যেন আমি ॥
 নামের প্রভাবে মোর চিত্ত শুদ্ধ হবে ।
 হৃদয়ের মলসব দূরীভূত হবে ॥
 অপরাধ শূন্য হয়ে লব হরিনাম ।
 তবে ত পূরিবে মোর সব মনস্কাম ॥
 কৃপা কর মোরে প্রভু ওগো দয়াময় ।
 সেবা অপরাধ যেন মোর নাহি হয় ॥
 বিপথে কভু বা যদি মম মন যায় ।
 কৃপা-রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখহ আমায় ॥
 গালে চড় মারি আর কেশগুচ্ছ ধরি ।
 ফিরাইয়া আন যদি তুমি কৃপা করি ॥
 তবে ত জানিব তুমি নিত্যপ্রভু মোর ।
 নিত্যদাসী হই তবে ভাগ্য সে প্রচুর ॥
 ওগো প্রভু দয়াময় লহ তব কাছে ।
 কভু যেন আমি নাহি যাই ভুলপথে ॥
 অস্তিমতে যেন পাই ও রাজ্যচরণ ।
 অবশ্য আমার আশা করিও পূরণ ॥
 সেই আশাপথ চেয়ে আছিগো বসিয়া ।
 উদ্ধার করিও প্রভু কৃপা-বিন্দু দিয়া ॥

—শ্রীমতী উষারানী ভক্তিপ্রভা

মানহানি ও মানদান

পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর পৈতৃভ্রূণপীড়িত মৎসর সমাজের কল্যাণোদ্দেশে তদাশ্রিত জনগণকে পাপ-প্রবৃত্তিতাড়িত আত্মবঞ্চিত জন-গণেরও প্রতি সম্মান প্রদান করিবার আদেশ করিয়াছেন। আর আশ্রিত-জনগণকে সর্বদা হরিকীর্তন করিবার জন্য স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অমিত-সহিষ্ণুতা ও দৈন্তের পরাকাষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে বিচার এই যে, জগতের সকলকে সম্মান দিতে হইবে, এই কথার সুবিধা লইয়া সম্মান প্রদানকারী নিষ্কিঞ্চন পরোপকারব্রত মহাভাগবতের প্রতি অসুহাপর জনগণ দৌরাভ্য এবং অত্যাচার উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ প্রকার যুক্তিহীন পাপ প্রথা দ্বারা প্রতারকগণ সুবিধা করিয়া লইয়া পারমার্থিককে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিবেন এবং এই দুই ক্লেশ প্রদান-ফলে মহাভাগবত অসীম সহ-গুণের দ্বারা তাঁহার অসমোদ্ধ মহত্ত্ব যতই স্থগিত করিবেন, ততই পাপ-প্রবৃত্তি-প্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং পাপপ্রবৃত্তিকেই ‘ধর্ম’ নামে প্রচার করিয়া বিচাররহিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন। স্মরণ্য পাপচিত্ত জনগণ স্বীয় দুঃখভিসন্ধিমূলে ‘বৈষ্ণবের মান নাই’ এই উক্তিবশে মানবজাতির সর্বোচ্চ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসিবে। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্ররূপী মহাভাগবত প্রহ্লাদের শীচরণকমলে পিতৃত্বা-ভিমানের কতই না কদর্যা ব্যবহার করিয়াছিল। রাবণ বিষ্ণুশক্তি সীতাকে পরমসহিষ্ণু অমানী জানিয়া তাঁহার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছিল! অশ্বরীশ মহারাজের প্রতি দুর্কাসার ব্যবহার, শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রতি জগাই-মাধাইর ব্যবহার অর্কাচীন জনসাধারণের বিচারে বৈষ্ণবগণের ‘সর্বাধমতা’ এবং ‘সর্বসহিষ্ণুতা’ এই অপরিহার্য গুণদ্বয় ঐসকল অমানুষিক অত্যাচার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু প্রহ্লাদের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাহার উদ্ধাম চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সীতার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দগ্ধিত করিয়াছিলেন, স্মদর্শন দুর্কাসাকে বৈষ্ণব-সম্মান শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, শ্রীবাসাদির প্রার্থনায় শ্রীহরিদাসের নিখাতনকারীকে শ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ যদিও বৈষ্ণব-বিরোধীর চক্ষে প্রথম মুখে সমপক্ষীয় বিচারিত

হন, তথাপি বৈষ্ণব-গুরুবিদ্রোহী যখন বুদ্ধিতে পারেন যে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে শ্রীতি-সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বৈনিষ্ঠ্য আছে, তখন তাঁহার বিদ্রোহ ও কপটতা ছাড়িয়া দিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আত্মগত্য প্রভাবেই তাঁহাদেও পরস্পরের মধ্যে ভেদাবস্থিতি লক্ষ্য করেন। এই বৈনিষ্ঠ্যের মধ্যে অভেদবাদীর দর্শনের হেয়তা নাই, পরন্তু উপাদেয়তা বর্তমান। ইহারই নাম—‘সম্বন্ধজ্ঞান’ বা ‘দিব্য-জ্ঞানলাভ’ বা ‘দীক্ষা’। তাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান বা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ ঘটে নাই, তাঁহারা ইন্দ্ৰভেদের হেয়ত্ব অপ্রাকৃত সমাজে ও উপাদেয় রাজ্যে বলপূর্বক সংশ্লিষ্ট করিতে যত্ন করেন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তির উদয় হইলেই পাপের সম্যাকরূপ ক্ষয় হয় এবং দিব্য-জ্ঞান ও জড়জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বৈনিষ্ঠ্য নয়ন-পথে পতিত হয়। অর্কাচীনের ন্যায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, মূর্খের অনুভূতিতে ‘অমানী’, ‘মানদ’, ‘সহিষ্ণু’ প্রভৃতি শব্দার্থ স্বীকার করেন না। তিনি লব্ধজ্ঞান হইয়া মূর্খের অর্কাচীন ধারণা পরিবর্তন করিতে সমর্থ। অনভিজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ শব্দের অর্থ যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অভিজ্ঞ বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিত বৈষ্ণব সেইরূপ বিচার করেন না। স্মরণ্য অনভিজ্ঞ জনসাধারণ আপনাদিগকে ‘অভিজ্ঞ’ মনে করিয়া যেকোন ‘সহিষ্ণু’, ‘মানদ’ প্রভৃতি শব্দের কদর্থ করেন, তাহা বিদ্বজ্জনানুমোদিত নহে।

ভগবদ্বিমুখ প্রাকৃত জ্ঞানমদোন্মত্ত জনগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উপলব্ধির অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের ‘সকলকে সম্মান প্রদান কর’ এবং ‘আপনি নিরভিমানী হও’—এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া মনে করেন যে, অবৈষ্ণব ও গুরু-বৈষ্ণব বিদ্রোহীকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করাই বৈষ্ণব গুরু-বর্গের একমাত্র কার্য্য এবং বৈষ্ণবগুরুবর্গ এই সকল উদ্ধাম বৈষ্ণববিদ্বেষী-দিগের দ্বারা অসম্মানিত হইয়া শ্রীভগবানের সর্বৈশ্বর্য্যে অনাস্থাবান হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভগবদ্ ও ভক্তবিদ্বেষ সফলতা লাভ করিবে এবং পৈশুণ্যব্রণপীড়িত হইয়া হিংসামূলে আত্মষ্ঠানিক কণ্ডুনের দ্বারা সুখলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞান-লব্ধ বৈষ্ণব স্বয়ং সহিষ্ণু হইয়া অবৈষ্ণবকে মানবোচিত বহু সম্মান প্রদানপূর্বক তাঁহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষ-জনিত অনুষ্ঠানের আদর করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন, সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব স্বীয় গুরু-দেবের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাস্থিত শুদ্ধবৈষ্ণবের অসম্মান সহ্য করিবেন না। তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন, পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কর্ণে হস্ত

প্রদান করিতে পারেন, তথাপি গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের সর্বতোভাবে সেবা করা। যদি কোন ব্যক্তির কল্লিত গুরুদেব বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, তাহা হইলে লঘুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মবিস্মৃত গুরু অভিমানী কুযোগীকে কখনই কেহ 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ন্যায়রহিত আদেশকারীর গুরুর উৎপথ প্রতিপন্নতা, শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষকে শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনই গুরুর আদেশ বলিয়া জানেন না। এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনই 'গুরু' বলেন না। প্রকৃত গুরুর চরণাশ্রয় ছাড়িয়া আমরা বলপূর্বক আমাদের মনগড়া ব্যক্তিকে 'গুরু'পদে বরণ করিলে যথেষ্টাচার আনয়ন করিব। প্রকৃত গুরুকে অসম্মান করা আর মনগড়া গুরুকে অসম্মান করা সমজাতীয় নহে। যাহারা মুড়ি-মিশ্রি, আসল-মেকী প্রভৃতি বিচার না করিয়া সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাহারাই 'অমানী' ও 'সহিষ্ণু' শব্দের অর্থে গুরু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আমরা ইহাদের অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাই না। মানবোচিত মাংসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও বৈষ্ণবোচিত মান্য সমজাতীয় নহে। যাহারা জ্ঞান করেন, তাহারাই ভক্তি-পথান্বিত নহেন, জানিতে হইবে। বিষ্ণু অপ্রাকৃত বস্তু; দিব্যজ্ঞানলব্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাকৃত অভিমানের জন্য ব্যস্ত নহেন বলিয়াই জড়-প্রতিষ্ঠাশাকেই 'শৌকরীবিষ্ঠা' বলিয়া জানেন। তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে শৌকরীবিষ্ঠার প্রাপ্তিলোভে ব্যস্ত নহেন বটে, কিন্তু জগতের সর্বনাশ কামনা না করায় তাঁহার গুরুবর্গকে অর্থাৎ গুরুবর্গ বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিষ্ঠার বাহক না জানিলেও তাদৃশ বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি বন্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদৃশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৈষ্ণবের নাট, কিন্তু প্রাকৃত জগতে বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া যে অজ্ঞান বালকের ছায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অন্তরে বাসনা এবং তদুদ্দেশে গোপভাবে অপর গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান চেষ্টা দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রভৃতি কামপরবশ হওয়া বুদ্ধি-মানের কার্য্য নহে, একথা জানেন। ব্রহ্মচারীকে ঈর্ষামূলে ব্রহ্মচর্য্যরহিত বলা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঈর্ষামূলে মূর্খের ন্যায় ব্রাহ্মণেতর বলা, ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীরও 'গুরু' সাজিয়া তাঁহাকে ঈর্ষামূলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইতে পতিত বলা মানদ ধর্ম্ম নহে।

দাত, পান, স্ত্রী, সূন্য ও নিজেদ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থার্জন পরমার্থ-
জীবনের হানিকর। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কিঞ্চন
ভজনকারীর বিষয় ও বিষয়ি-সঙ্গ পরিত্যাগের আদেশবাণী কখনই পরচর্চা
নহে, কিন্তু ঐ আদেশবাণীর বিরোধী জনগণ বৈষ্ণবগুরু হইতে পারেন না
বলিলে ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া মৎসরতামূলে যে-সকল চেষ্টা দেখা যায়,
তাহা স্তব্ধ করিবার জন্য ভাগবতগণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণের সাধু-
চেষ্টাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস ধর্মসঙ্গত নহে। অধর্মের প্রায়শ্চিত্ত ও
দণ্ডাদিবিধান সাধুদিগের সাহায্য করে। সাধুগণ জীবের বিষয়-পিপাসা
উক্তিদ্বারাই খণ্ডিত করেন। তাহাতে বাধা দেওয়া অসাধু চেষ্টা। তাহার
লৌকিক প্রতীকার সাধুর উপলক্ষণে ভগবানই করাইয়া থাকেন। তজ্জন্ম
সধুতে দোষারোপ করিতে নাই। আমরা যদি জগৎ হইতে সাধুর চেষ্টা
তুলিয়া দিবার যত্ন করি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলতা-
ময় অসাধুতায় পরিণত হইবে। সাধুদিগেরই প্রকৃত সন্মান আছে।
অবৈধভাবে তাঁহাদের মৌনধর্মের সুবিধা লইয়া তাঁহাদের কখনই বিপন্ন
হইতে দেওয়া উচিত নহে। অসাধুগণের মানহানি হইতে পারে না সত্য,
যেহেতু অসাধুগণ অসাধু উপায়েই স্ব-স্ব মান স্থাপন করেন। অসাধুর
তাদৃশ স্থাপিত মান পরমার্থ জগতের কোন উপকার করে না।
কিন্তু সাধুকে অসাধু বলিলে দোষাত্মক করা হয়। সাধুগণ অসাধু কর্তৃক
প্রহৃত হইবেন এবং প্রহৃত জনগণ ধর্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হওয়ার
অনেকে এক্রপ ধারণা করেন যে, সাধুদেরই প্রকৃত দোষ থাকে বলিয়া তাঁহারা
অসন্মানিত হইলেও রাজদ্বারে প্রতীকারের প্রার্থনা করেন না। বিশেষতঃ
সাধুদিগের অনুগত দাসগণ স্ব-স্ব প্রভুর সন্মান নষ্ট করিবার জন্যই গোপভাবে
চেষ্টাব্বিত হইয়া সেবার ভান করেন না। গুরুসেবা ও সাধুসেবা সাধুর একমাত্র
কর্তব্য। অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ যত্নের সহিত কর্তব্য। ইহা শাস্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে
গান করিতেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ জনগণের বিচারপ্রণালীদ্বারা অসাধুতা-দ্বারা
সাধুগণ চিরদিনই আক্রান্ত। এই প্রকার অসাধু চেষ্টা হইতেই জগতে ধর্মের
নামে পাপ ও অপরাধ বৃদ্ধি হইতেছে।

সাম্যবাদ ও সেবাবিচার

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭১ পৃষ্ঠার পর)

সাম্যবাদী যাহাকে বৈষম্যভাব বা পক্ষপাত-দোষ মনে করেন, একান্ত আশ্চর্যকণ্ঠের অর্থাৎ কুসংগীতি বা ইষ্টানুরাগের বিচারে অবস্থিত জন-গণের তাহাই বর্ণনীয়। গীতায় যেক্রপ সাম্যবাদ নিরস্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই অধিকতর বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্যবাদী দুর্কাসা যখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত অশ্বরীষ মহা-রাজের চরণে অপরাধ-পূর্বক ব্রহ্ম-শিবাदि-দেবতাগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া সর্বশেষে ভগবান্ নারায়ণের নিকট আত্মরক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীহরি দুর্কাসাকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,—

অহং ভক্তপরাধিনো হৃষতত্ত্ব ইব দ্বিজ।

সাধুভির্গ্ৰাস্তৃহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।

হে দ্বিজ ! হে মূনে ! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেক্রপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) সুতরাং অশ্বতত্ত্বের ন্যায়। মুক্তি-পর্যন্ত-বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে ; ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্য জনসমূহও আমার প্রিয়।

যে দারাগারপুল্লাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।

হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুংসহে ॥

যে-সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়-জন, ধন, প্রাণ, ইহ-পরলোকের যাবতীয় আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ?

ময়ি নিক্ষেপ্তহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।

বশে কুর্কান্তি মাং ভক্ত্যা সংজিয়ঃ সংপতিং যথা ॥

সতী স্ত্রী যেক্রপে সংপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্ত-চিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তি-প্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।

মদন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাহারা আমা-
বাচীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাহাদের ছাড়া আর কিছু
জানি না।

সাম্যবাদীর হৃদয়ে ভগবানের এইরূপ বৈষম্য-বিচার শেল বিদ্ধ করে
বলিয়া সাম্যবাদী (তাহাদের মতানুযায়ী) এইরূপ অবিচারক ভগবানকে
কখনও মুখে, কখনও বা অন্তরে অস্বীকার-পূর্বক নাস্তিক হইয়া পড়েন।
কিন্তু যেখানে আস্তিকতার চরম সীমা, সেখানে সাম্যবাদের নাস্তিকতা
সম্পূর্ণভাবে তিরস্কৃত। যে-ধর্ম্মে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের প্রচার যতটা
অধিক, সেই ধর্ম্ম ততটা নাস্তিকতাময়। আর যে-ধর্ম্মে সাম্যবাদ যতটা
শিথিল, সেই ধর্ম্ম ততটা আস্তিকতার অভিমুখে অভিগামী। একান্ত
আস্তিকতায় আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ রহিত হইয়া প্রীতির পাত্র পক্ষ-পাতিত্বের
পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ কাহাদের প্রতি কিরূপ পক্ষ-
পাতিত্বের বিচার করেন, তাহার একটি তালিকা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু
শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত ও উপদেশামৃতে প্রদান করিয়াছেন,—

কন্মিতাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং যযুক্তানিন-
তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠান্ততঃ।

তেভ্যন্তাঃ পশুপালপক্ষজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা

প্রেষ্ঠা তদ্বদীয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

যথেষ্টাচার-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সন্তুনিষ্ঠ স্নকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয় ;
কন্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জিত ব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয় ; জ্ঞানী অপেক্ষা
শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয় ; শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ;
প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা
শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের
যে রূপ প্রিয়তমা, তাহার কুণ্ডল কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক
সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডল আশ্রয় করিবেন।

পরম-মুক্ত সুধীগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে সেবার বিচার রহিয়াছে,
তাহাতে সাম্যবাদের পরিবর্তে কিরূপ বৈষম্য-বিচারের আদর্শ দৃষ্ট হয়।
যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, রাসলীলায় সাধারণী, সমজ্ঞসী ও সমর্থী গোপী-
গণের সহিত একত্রে প্রিয়তমা রাধিকার নিরপেক্ষ প্রেম প্রকটিত হইতে
পারে না—অন্যাপেক্ষা-বশতঃ প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্তি হন না, তখন তিনি

রাধিকাকে রাসমণ্ডলী হইতে চুরি করিয়া অথ গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমমূলভ মমতা-দর্শনে কোটিল্য-বামতা-প্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধিকার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ খিন্নমনা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—

রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।

তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ ॥

* * * *

গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।

রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥

* * * *

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।

তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধাপাশ ॥

* * * *

সাধারণ-প্রেমে দেখি সর্বত্র 'সমতা'।

রাধার কুটিল-প্রেম হইল 'বামতা' ॥

ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।

তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি ॥

* * * *

তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে।

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ (—চৈঃ চঃ)

পরম মুক্তগণের সেবার বিচারে আমরা ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য বিচার দেখিতে পাই। সাম্যবাদের নীতি দেবীধামের নাস্তিকতার আবর্তে পড়িয়া থাকে, আর এইরূপ সেবার বিচার—সেবক ও সেব্যের পক্ষপাতিত্বের বিচার দেবীধাম, সাম্যভাবের আদর্শ-লোক বিরজা, নির্বিশেষধাম ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ এবং তত্পরি গোলোক-বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত সাম্যের মধ্যে যুগপৎ অপ্রাকৃত বৈষম্যভাবের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করে।



আদর্শ

অসম্পূর্ণতা পরিবেষ্টিত মনুষ্য আদর্শ ব্যতীত কোন কার্যই করিতে পারে না। আদর্শ অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার সোপানাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করে। অক্ষজ আদর্শানুশীলন অনেকটা এইরূপ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহ-পথে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অধোক্ষজ আদর্শানুশীলন তদ্রূপ নহে। একলবোর আদর্শানুশীলন ঐরূপ অক্ষজ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহ-চেষ্টার আদর্শ। দ্রোণাচার্য্য একলবাকে শিষ্যত্বের যোগ্যতা প্রকাশ না করিলেও একলবা দ্রোণাচার্য্যের কৃত্রিম আদর্শ নিম্মাণ করিয়া সেই আদর্শের অনুকরণে আরোহ-পথে যে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে শ্রীগুরু বা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি হয় না—একলবোর ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা তাহার মনগড়া কৃত্রিম আদর্শের অনুকরণ হইয়াছিল। একলবোর এইরূপ আদর্শানুকরণ নিখিল অক্ষজ-আরোহপথের পথিকগণের অনুকরণীয় আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সেবা-রাজ্যে এইরূপ আদর্শানুকরণ স্বীকৃত হয় না। শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য, শিক্ষক, উপদেষ্টা ইচ্ছা করেন, আর নাই করেন, আমরা জোর করিয়া—(বলপূর্ব্বক প্রহার-দ্বারা) তাঁহাকে আমাদের নিকট আদর্শ-প্রকাশ করিতে বাধ্য করাইব (১)।— এইরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বা নূনাধিক জগতের যাবতীয় কৃষ্ণ-বহিন্মুখ সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে গুরু-গোস্থামীকে এইরূপভাবে “দোরস্ত” করিয়া কৃত্রিম আদর্শের পূজা (১) করিতে করিতে কৃত্রিম সিদ্ধির যে সকল কথা শুনা যায়, তাহা একলব্য-মনোভাবের নূনাধিক পুনরাবৃত্তি।

আদর্শ-প্রদর্শন বা প্রকটন—আদর্শ-প্রদর্শনকারী গুরু-বস্তুর অহৈতুক-কৃপা-সম্ভূত ব্যাপার। যিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন, তিনি গুরু; তাঁহার ওজন খুব বেশী, তাঁহাতে অসম্পূর্ণতা নাই, লঘু নাই; আর যাহার নিকট তাহা প্রদর্শিত হয় বা যিনি সেই আদর্শের অনুসরণ করেন, তিনি ‘লঘু’ অর্থাৎ তাঁহার ওজন কম, তিনি দুর্ব্বল, তিনি অসম্পূর্ণতায় আচ্ছন্ন, ভ্রম-প্রমাদাদিতে বশ-যোগ্য। লঘু গুরুকে নিয়মিত করিতে পারে না; যাহার ওজন কম তিনি যাহার ওজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারেন না। কিন্তু ভারী জিনিষ পাতলা জিনিষকে মাপিতে পারে—নিয়মিত করিতে পারে। যেখানে লঘু গুরুকে মাপিতে যায়, লঘু গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পনমূলে

আদর্শ প্রদর্শন করিতে বাধা করে বা গুরুর কৃত্রিম-আদর্শ নির্মাণ করিয়া ফেলে, সেখানে জানিতে হইবে, সেই একলব্য-মনোভাব নানাধিক লঘুতে সংক্রামিত হইয়াছে। তবে যে-সবল গুরু দুর্বল লঘুর নিকট আদর্শ-প্রদর্শন করেন, তাহা গুরুর সেই অহৈতুকী অসামান্য কৃপা। এইরূপ অহৈতুকী কৃপা বাতীত দুর্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। লঘু গুরুর সেই অহৈতুকী অযাচিত কৃপার জন্য নিম্নপটে অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গুরুকে বাধা করাইয়া বা গুরুর উপর যষ্টি প্রয়োগ করিয়া সেই কৃপা আদায় করিতে পারে না কিংবা “তুমি যদি কৃপা নাই কর, তাহাতেই বা কি? তোমাকে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শ করিয়া গড়িবার সামর্থ্য কি আমার নাই? আমি কৃত্রিম আদর্শ সৃষ্টি করিয়াও তোমাকে “দোরস্ত” করিব।” —এরূপ মনোভাবে গুরুর কৃপাদর্শানুসরণ নাই, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসরণ মাত্র আছে; উহা গুরুসেবা—আচার্য্য-সেবা বা আদর্শানুসরণ নহে, উহা গুরু-বিরোধ, আচার্য্য-বিরোধ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ। কিন্তু জগতে এইরূপ কপটতাই সর্বাপেক্ষা অতীব গুরুভক্তি বা গুরুর আদর্শ-অনুকরণ-চেষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য পরম কারুণিক—জীবে অহৈতুক দয়াময়। তাই কৃপা-পূর্বক লঘু ও দুর্বলের জন্য সর্বদাই আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। আচার্য্যালীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবের জন্য নিখিল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্বদগণের নিখিল জীবন-চরিত্র দুর্বল জীবের জন্য যাবতীয় মঙ্গলময় আদর্শের ধনি। শ্রীগৌরসুন্দর ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলায় “ভজনোন্মুখ ব্যক্তির স্ত্রীগন্তাষণাদি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য” এই উপদেশের কঠোর ও পূর্ণ-নিরপেক্ষ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরুষোত্তমে প্রভু অর্দ্ধ বাহু দশায় প্রেমাবেশে অশাক্ত কৃষ্ণসেবাবুদ্ধিতে দেবদামীর গান শ্রবণে তৎসহ মিলনার্থ ধাবিত হইয়া গোবিন্দ কর্তৃক রক্ষিত এবং বাহু দশা প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে আচার্য্যের আদর্শের বিষয়ে বলিয়াছিলেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিখিল আচারে “অসংসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্ত আর ॥” —এই উপদেশ-আদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন আবার ব্রহ্মচারী পণ্ডিত দামোদর (জীবকুলের শিফার জন্ত অর্থাৎ লঘু যেন কখনও গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়-রোচক আচরণ বা আদর্শ প্রকাশ করিতে বাধা করাইয়া নিষিদ্ধ করিতে

না চাহেন, এই শিক্ষা স্থাপন-কল্পে) শ্রীমদ্রামপ্রভুকে কোন বিষয় বা আশঙ্কীর একটি সুন্দর পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া রামপ্রভুর এই আচরণ বা আদর্শের সমালোচনাপূর্বক বলিয়াছিলেন,—

অন্তোপদেশে পণ্ডিত (কহে) গোসাঁত্রির ঠাঞি ।

‘গোসাঁত্রি’ ‘গোসাঁত্রি’ এবে জানিমু গোসাঁত্রি ॥

এবে গোসাঁত্রির গুণ সব লোকে গাইবে ।

গোসাঁত্রি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥

* * * * *

স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে ?

মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

তখন রামপ্রভু ব্রহ্মচারী দামোদরের ঐক্য অতি নিরপেক্ষতা এবং আচার্য্যালীল রামপ্রভুর নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত আচরণের সুস্থতা দাবীরূপ আদর্শ পাছে জগতে বিস্তারিত হইলে জগতের অক্ষয়-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্ত-মূলক আদর্শই আচার্য্যের আচরণ বা আদর্শ বলিয়া কল্পিত হয়, শিষ্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আদর্শই পাছে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি পাছে নীতি-বিগঠিত বাপার বা আচার্য্যভাব বলিয়া বিচারিত হয়, কিংবা মুখর জগতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি নিয়মিত, মুখর জগতের মতামত বা উপদেশানুসারে আচার্য্যের আচরণের আদর্শ নিরূপিত করিতে হয়—এই বিপদ আশঙ্কা করিয়া পণ্ডিত দামোদরকে বাজ-স্তম্ভি-মুখে শিক্ষাপ্রদান-পূর্বক শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতার চলে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন,—

প্রভু কহে,—“দামোদর, চলহ নদীয়া ।

মাতার সমীপে তুমি রহি তাই যাঞা ॥

তোমা-বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন ।

আমাকেহ যা’তে তুমি কৈলা সাবধান ॥

তোমা সম ‘নিরপেক্ষ’ নাহি মোর গণে ।

‘নিরপেক্ষ’ নহিলে ‘ধর্ম্ম’ না যায় রক্ষণে ॥

আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হইতে হয় ।

আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

আচার্য্য-লীল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষালীলা-দ্বারাও জানা যায় যে, আচার্য্যকৃ পা-পূর্ব্বক দুর্ব্বল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে দুর্ব্বল জীবের যোগ্যতার অনুসরণোপযোগী আচরণ প্রকাশ করেন বলিয়া সাধারণ জীব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য্য বা বৈষ্ণবকে কাহারও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়তর্পণানুযায়ী আচরণ বা কাহারও মনঃকল্লিত আদর্শ প্রকাশার্থ বাধ্য করিতে পারে না। গুরু কখনও লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিচারের দ্বারা নিয়মিত হন না। ইহাই গুরুর গুরুত্ব।

আচার্য্য আচরণ-দ্বারা শিক্ষা দেন বলিয়া তিনি ‘আচার্য্য’ পদবাচ্য,—

“আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারেস্থাপয়তাপি।

স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যাস্তেন কীর্ত্তিতঃ।” (বায়ুপুরাণ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের “অনুভাষ্যে” বলিয়াছেন,—
“আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের স্মৃষ্ট আচরণেও ঈর্ষা করেন।” (অনুভাষ্য, আদি ১ম পঃ ৪৬ সংখ্যা।)

যদ্যদাচারিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ (গীঃ ৩২১)

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন,—শ্রেষ্ঠ লোক যেক্রপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও তাহাই আচরণ করেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পাই, প্রচার-মুখে আচারই জগদাচার্য্যত্ব,—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥

‘আচার’, ‘প্রচার’, নামে করহ দুই কার্য্য।

তুমি—সর্ব্ব গুরু, তুমি—জগতের আর্ঘ্য ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

প্রচার জিনিষই—আচার। প্রচার ও আচার যেখানে পৃথক্, তাহা প্রচারও নহে, আচারেরও স্মৃষ্টতা নহে। আচারকে সৃষ্ট, সৃষ্ট ও সুবিস্তৃত করিবার জন্তই প্রচার। (ক্রমশঃ)

শ্রীমেন্দালয় গোড়ীয় মঠে
 শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব ও
 পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত
 বামন মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে
 শ্রীশ্রীব্র্যাসপুজা

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিয়ারী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত তুরাসহরে শ্রীমেন্দালয় গোড়ীয় মঠে বিগত ১লা পৌষ (ইং ১৭।১২।৭৮) রবিবার দিবসে মদলবলে শুভবিজয় করেন।

তৎপরদিবস জগদগুরু পরমহংসস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিমিত্তান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষ্যে বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত মঠে শুভবিজয় করায় আমরা যেন আরও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাঁহার দাক্ষাৎ আদেশ-নির্দেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন বিপুল-ভাবে করা হয়।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুরুচক, প্রভুপাদ-দশকম্, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব-বন্দনা ও “যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর” প্রভৃতি বিরহ-স্মচক বিভিন্ন আতি-কীর্তনাদি করা হয়। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পাঠমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্তা চরিত্র প্রাজ্ঞল-ভাষ্য বর্ণনা করেন। তদনন্তর মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে পরমগুরুদেব আচার্য্যকুলসিংহ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলোকচিত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব পুষ্পমালা-চন্দনাদি অর্পণ করেন এবং তাঁহার সতীর্থ বৈষ্ণববৃন্দকেও মালাদি-দ্বারা ভূষিত করেন। তদনন্তর বিবিধ উপকরণাদি কীর্তনমুখে নিবেদিত হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐদিন গোধূলি-লগ্নে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথির স্মৃতি-উদ্দেশ্যে এক মহতী সন্তার আয়োজন হয়। উক্ত সভায়

শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সদাশিব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র ও তাঁহার অবদান সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপুত্র তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় আধুনিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জল-ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করান। পরিশেষে কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

৭ই পৌষ (ইং ২৩।১২।৭৮) শনিবার দিন শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠরক্ষক পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্তুজিবেন্দ্রান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী প্রভু ও আরও উক্ত মঠদ্বয় হইতে কয়েক ব্রহ্মচারী প্রভুও এই দিন তুরাস্থ মঠে উপনীত হন। এতদ্ব্যতীত রায়গঞ্জ, বহরমপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মাপটগ্রাম, ফকিরাগ্রাম, ধুবরী, গোহাটি, শিলং, কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীবাসপূজা উপলক্ষে আগমন করেন। এই দিন সন্ধ্যায় আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীমঠের উন্নতিকল্পে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দকে লইয়া এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়। সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত মঠের সংলগ্নে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক ও ক্রমান্বয়ে উচ্চ উচ্চবিদ্যালয় পর্যায় উন্নিত করণের ব্যবস্থার জন্য আহ্বান জানান। এই বিদ্যালয় মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে—যার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীগণ বাল্যকাল হইতে আদর্শ-শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায় তজ্জন্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকিবে। শিক্ষা-জগতে বর্তমানে যে রূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে—গ্রাহ্য যাহাতে আবির্ভাব ঘটে না পারে উহার প্রতি-রোধের ব্যবস্থাও অবশ্যই রাখিতে হইবে। সুতরাং কোন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী না রেখে দল-মত নির্কিংশেষে আদর্শ শিক্ষাকে কেন্দ্ররূপে যাহাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং উহার সুব্যবস্থা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কর্ম-সূচী এগিরে নিতে হইবে,—এই আবেদন জানান। উক্ত সভায় স্থানীয় এম, এল, এ, শ্রীমুকুল দাস, সর্বশ্রী শঙ্করলাল বুদবুদওয়াল, আনন্দকিশোর ঘোষ (মেঘা বাবু), সুখবীর রাই, নিশিকান্ত দেব, নিমটাদ শর্মা, ননী-গোপাল দে, অনিলচন্দ্র দে ও কিশোরীলাল জাজোউয়া প্রভৃতি মহাশয়গণ ও আরও অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

তদুপরি এখানে বর্তমানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির দ্বারা পরিচালিত কৃতিরত্ন দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে উহার আরও সর্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহায়ভূতি কামনা করেন। তৎসহ জনসাধারণের অবসর সময়ে বিভিন্নমুখী শিক্ষার জন্য যে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত রয়েছে তাহার প্রসারের ব্যবস্থাও যাহাতে লওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে শ্রীল সন্তাপতি মহারাজ সজ্জনমণ্ডলীকে এই সভায় উপস্থিত হওয়া হেতু সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছাবাণী জ্ঞাপন করেন এবং একটি আবেদন করেন যে, “আগামীকলা আমার জন্ম-তিথি উপলক্ষে আমি আমার ত্রাণকর্তা পরমারাধ্যাতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু নিত্যানীলা-প্রবীষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ সর্বোজ্জ্বল বিশেষভাবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ উদ্দেশ্যে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্রতী হইয়াছি। এই অনুষ্ঠানে আমি আমার প্রভুকে ভক্ত্যঞ্জলি অর্পণ করা বাতীতও আমার পরমহিতাকাঙ্ক্ষী সতীর্থ পূজাপাদ বৈষ্ণববৃন্দকেও প্রভুরের নির্মালাদ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করিব তজ্জন্য সকলকেই উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে সেবার সুযোগ দান করিতে প্রার্থনা জানাইতেছি।”—প্রভৃতি ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে আবেদন জানাইয়া সভার কার্য সমাপ্ত করেন।

৮ই পৌষ (ইং ২৪।১২।৭৮), রবিবার ব্রাহ্মমূহুর্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে একদিকে শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজার আয়োজন এবং অন্যদিকে শ্রী গুরুষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীপঞ্চতন্ত্র তথা বিভিন্ন আভিষুচক মহাজন-পদাবলী গীতিমালা কীর্তন হইতে থাকে। শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্যদেব তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের সু-সজ্জিত আলোকচিত্রে পুষ্পাঞ্জলি তথা মালা-চন্দনাদি অর্পণ করেন এবং উপস্থিত তাঁহার গুরুভ্রাতাবর্গকেও পুষ্প-মালা-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করেন। তদনন্তর বিশিষ্ট গণ্যমান্য সজ্জনগণকেও মালাদ্বারা আপ্যায়িত করেন। ইত্যবসরে তাঁহার আশ্রিত আমার গুরুভ্রাতাগণ শ্রীব্যাসাশ্রিত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পুষ্প, চন্দন, মালাদি অর্পণ করেন। উচ্চ-কীর্তনরোগে তখন উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হওয়ায় সেবা-সেবকের অপরূপ মিলনতীর্থরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। যথাক্রমে আলোকবস্ত্রিকায় কীর্তনমুখে চর্ক্যা, চুয়া, লেহু, পের প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণাদি শ্রীগুরুগোবিন্দ-রাধাবিনোদবিহারীজীউকে নিবেদিত হইলে

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তথা সজ্জন-সুদীক্ষকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত আগত সকলকেই অকাতরে প্রসাদ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

এই দিন সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তনাদি সমাপ্ত হইলে এক সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় শ্রীল শ্রীচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ., শ্রীপাদ শ্রীদামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেবদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীব্যাসপূজা সম্পর্কে জানান যে, ‘শ্রীগুরুপূজাই ব্যাসপূজা।’ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি অথবা নিজের জন্ম-তিথিতে বিশেষভাবে শ্রীগুরুপূজা করা কর্তব্য। শ্রীগুরুপূজার দিন—এক বৎসরের হিসাব-নিকাশ দেওয়ার দিন। জীবনকে কতটুকু সেবাময় করে গড়ে তোলা সম্ভব হইয়াছে তার হিসাব-নিকাশের সোপান। অনর্থ-নিপীড়িত জীবনে হিসাব না রাখিলে আমরা আরও অনর্থ-ক্রিষ্ট হইয়া পড়িব। তাই আমাদের জীবনের সংপথের অন্তর প্রহরী যিনি—সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিত হইয়া জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই এক একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া সেবায় ত্রুটি থাকিতে হইবে। জীবনের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দেওয়ার জন্য আমরা সকলে সর্বদা প্রস্তুতির মাধ্যমে জীবনকে উদ্দীপনাময় করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। তাই প্রত্যহ শ্রীগুরুপূজার বিধান থাকিলেও বর্ষান্তে নিখুঁতভাবে উহাতে আরও দৃঢ়তা আনিবার জন্য বর্ষান্তে বিশেষভাবে ব্যাসপূজার আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।—এতে নিষ্ঠা, ঐকান্তিক আর্তি সঞ্চারিত হইবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা বা দত্ত যেন স্থান করিয়া লইতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আত্মশোধন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা এবং তাঁহাদের প্রীতি-বিধানই, এই অমুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।”

পরিশেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহযোগে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

— শ্রীত্রেলোক্যনাথ দাস

নবদ্বীপের রা সমাজকালে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয়মঠের জনসেবা

প্রায় পাঁচ-শতাব্দী ধরিয়া গঙ্গার বিগলীত ধারায় শ্রীগৌরসুন্দরের
করুণারামি নব নবায়মানরূপে আজও যেন কালের কুটিল-গ্রাসকে অবলীলা-
ক্রমে প্রতিহত করিয়া বয়ে চলেছে নবদ্বীপের বক্ষ দিয়ে। সময়ের ব্যবধানে
অনেক উত্থান-পতনের ইতিহাসও রচিত হয়েছে এখানে। কিন্তু সারগ্রাহী
ভক্তজন হৃদয়ে আজও শ্রীগৌর-গঙ্গা সমাদৃত।

প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্বমুহূর্তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে নবদ্বীপের
ইতিকথায় রাসোৎসব স্থান করে নিয়েছিল। কালের চলন্ত গতিতে উহা
ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে আজকের দিনে জন-মানসে কম একটা
আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। তাই তো রাস-পূর্ণিমায় নবদ্বীপের এত
জৌলস।

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই ভারত
বৈচিত্র্যময়। অথচ বৈচিত্র্যের মধ্যেও সাদৃশ্যতা দেখতে পাওয়া যায়—
মিলন-তীর্থরূপে ভারতকে। সত্যি মনে হয় ইহা যেন এক অভিনব—
অলৌকিক। ভারতাত্মার অঙ্গসলিলার নৈতিক-প্রবাহ জগতকে যেমন
বিস্মিত না করে থাকে নাই; তদ্রূপ আজ যেন সেই বিশ্ববিমোহনকারী
ভারত সে নিজেই যেন বিস্মিত—নবদ্বীপের উদ্বেল-প্রবাহে। শাক্ত-স্মার্ত্ত-
গণের দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমবন্যায় ভাসমান হইয়া নবদ্বীপ
এক মিলন-তীর্থরূপে পরিণত হয়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে বটে, কিন্তু
সংঘাতের অবকাশ স্থিতিত। তাই প্রীতি-প্রেমের পূণাবাধনে নবদ্বীপ আজ
এত প্রিয়—নমস্কৃত। রাসোৎসবে বিভিন্ন প্রাক্তর হইতে সকল-সম্প্রদায়ের মানব-
গণ ছুটে আসেন এই পরম পবিত্রভূমি-সকাশে। শরতের আগমনে আৰ্য্য-
ঋষিকুল যেমন সাধনায় বিভোর হইবার সুযোগ-লাভে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক
হেমন্তের আগমনে নবদ্বীপে যেন বিপরীত একটা জাগরণ সৃষ্টি করে
রাসোৎসবের নিনাদিত সমীরণে। বসন্তের আগমনে বৈষ্ণব-সমাজ নবদ্বীপকে
কম্পোলিত করেন শ্রীগৌরবাণীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠমালায়; আর শাক্ত-স্মার্ত্তের
বিবোধিত নিনাদে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করেন হেমন্তের
পূর্ণিমায়।

এই হৈমন্তিক-পূর্ণিমায় রাসরসিকশেখর লীলাময় ঘরাট-স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম বৃন্দাবন-বিহারী পূর্ণব্রজ সনাতন সর্বকারণের কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অচিন্ত্য লীলামাধুরিমায় গোপীজনদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন ব্রজের নিধুবনে ও নিকুঞ্জকাননে। এই লীলা, অনর্থ-নিপীড়িত জীবনচর্য কোনপ্রকারেই ইহার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারে না। তবুও অঘরমুখী সাধকগণ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইবার জন্ত এই লীলা সন্তুর্ণনে স্মরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাতিরেকপন্থী তথাকথিত সাধকক্রম এই লীলার সূক্ষ্মধারা অনুধাবন করিতে না পারিয়া জড়ীয়-রসাস্বাদনে বাস্ত। তাই তেহত দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ঔদার্য্যমুরতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহা-বদান্ততা উপলব্ধির অবকাশ থাকবে না, ততদিন পর্য্যন্ত এর অনুষ্ঠানে হেয়তা দৃষ্টিগোচর হইবে। আর মাধুর্য্যতা স্পষ্ট থেকে তামসিকতার প্রশ্রয় পাবে। এই তামসী গতি যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তবে নিশ্চয় ইহা পরিতাপের বিষয়।

যাত্রা হউক, নবদ্বীপের বাসযাত্রায় সকলশ্রেণী লোকের আগমন ঘটে। ধর্ম্মীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বাতীতও বাণিজ্যিক, কৌতুহলপ্রিয়, ভ্রমণ-বিলাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লোকজন ঐসময় নবদ্বীপকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। এর একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য যে, এতে কোন আত্মায়ক নাই—সবই রবাহৃত—জনশ্রুতিতে আমন্ত্রক।

এই রাসের এক সন্ধিক্ষণে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বহু যাত্রী আসার মধ্যে রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন হইতে উহার সচিব-সদস্য ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উক্ত মঠে থাকিবার সুযোগ লাভ করেন। রাস উপলক্ষেও বহু জনসাধারণকে মঠ-কর্তৃপক্ষ প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এষ্ট দুদিনের বাজারেও উহার কোন বাতিক্রম ঘটে নাই—ইহা অবশ্যই সুখের ও আনন্দের বিষয়।

মাননীয় শ্রীঅনাদিরঞ্জন ঘোষ মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান। কলিকাতার সুবিখ্যাত বেলভেডিয়ার পার্ক ক্লাবের সহিতও তিনি সংযুক্ত এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীতে মুখ্য সচিবরূপে সম্মানীন আছেন। তাঁহার সহধর্ম্মীও বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ। শ্রীঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার সহকারী সচিব শ্রীঅরীন্দ্রমোহন রায়ও এসেছিলেন। শ্রীরায় মহাশয় শান্তিপুরের দত্তপাড়ার বিখ্যাত রায় পরিবারের সুসন্তান।

শ্রীযোষ মহাশয় মন্দির পরিদর্শন করিয়া বলেন, যে-ভাবে সাধক-কর্মীগণ সেবা-শিক্ষা ও শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করিতেছেন তাহা শীঘ্রই বিশ্বে আরও প্রসার লাভ করিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রশ্ন করেন এবং তাহার মতামত উত্তর পাইয়া খুবই খুসী হন। শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারিত সর্বদেশীয় তীর্থ তথা ভারতীয় দর্শন-চর্চাস্থানগুলি ছায়াচিত্র দর্শন করিয়া বিশেষভাবে অভিভূত হন। ইনি ভারত সরকারের অধীনে রেলওয়ে বোর্ডে কাজ করিলেও শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা ভুলিতে পারেন নাই; যার জন্য নগ্নপদে পদব্রজে গোড়ীয় মঠের কয়েকজন সাধুর সঙ্গে নবদ্বীপস্থ বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করেন এবং তিনি পুনঃ যেন এখানে আসিতে পারেন—উহাও কামনা করেন। তিনি একথাও মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই মহৎ প্রতিষ্ঠানকে সরকার পক্ষের সাহায্য করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একাধারে দরিদ্র জনসাধারণ যেমন বিভিন্ন দিক দিয়া উপকৃত হইতেছেন—ঠিক মানসিক ও আত্মিক উন্নতিও লাভ করার সুযোগ সুধীগণ পাইতেছেন; সমাজজীবন তাই যে বিভিন্নমুখী লাভবান হইতেছেন—এতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা এই প্রতিষ্ঠানটি শুদ্ধ (purely) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার সংস্পর্শে মানুষের নৈতিক-চরিত্র বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। আমরা জানতে পাঠি—Wealth is lost—nothing is lost, Health is lost—something is lost, but character is lost—everything is lost.” সুতরাং সমাজ-জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রয়োজনীয়তা বর্তমান।

পাঠক-পাঠিকাগণ! সচিব মহাশয়ের মানপত্রখানি পাঠ করিলে উক্ত মঠের সেবাদর্শ অবশ্যই অমুমান করিতে পারিবেন। তাই আমিও সর্বাস্তবকরণে ঐ মহৎ প্রতিষ্ঠানটির সর্বতোভাবে সাফল্য কামনা করি। সচিব-সদস্য মহাশয়ের পত্রখানি ইহার সহিত সন্নিবেশিত করিতে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশনী বিভাগের সেবা-সচিবকে অনুরোধ জানাইতেছি।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

[পত্রের অনুলিপি]

GOVERNMENT OF INDIA

BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS
RAIL MANTRALAYA
Railway Board.

Telegrams : SERCOMON

Telephone : 22-9592

Mackinnon Mackenzie Building,
4th. Floor, 16, Strand Road,
Calcutta-1

Dated, 7th. Jan. 1979

গত বঙ্গের ২৫শে নভেম্বর সামলোলা উৎসবে
অপরিবারে আমার প্রিয় নবদ্বীপ পরিগ্রহের
শ্রীলঙ্কা হ'য়েছিল। এই উৎসবের প্রাথমিক বৈদ্য
অর্থের মেসার্স কাম্বুদেব ও প্রদেবানন্দ শ্রীলঙ্কা
মঠের ওয়া-অধ্যক্ষদের অনুগ্রহ লাভ করে আমরা
বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি ও মানব-
হিতৈষী কার্যের পরিচয় পেয়ে আমরা সকলে মোহিত
হ'য়েছি। পরিচালনা-দলে অত্রমণি একটি অপর্যায়-
রূপ গ্রহণ ক'রেছিল,—যাতে আমাদের লুকানো ওক্তি
ওবর্টি ভেগে উঠেছিল মহাপ্রভুর কৃপায়।

(স্বাঃ) অনাদিরঞ্জন ঘোষ

সদস্য-সচিব,

বেলভেডিয়া কমিশন, কল'কাতা

ও

সম্পাদক,

বেলভেডিয়ার পার্কলাব (সংলগ্ন),

কল'কাতা।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্সা স্প্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্রশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩০শ বর্ষ } ২৬ মাঘ, কারণোদশায়ী, ৪৯২ গৌরাক্ষ
২৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫ ; ইং ৮/৩/১৯৭৯ } ২২শ সংখ্যা

সানুবাদং পাণ্ডবাদিকৃতম্ শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সা. হানিস্তন্নহাচ্ছিদ্রং, সা চান্ধক্ৰডমূঢ়তা ।

যনুহুর্ন্তঃ ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥৭০॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যে-ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবকে এক নিমেষ বা এক-মুহূর্ত্তও চিন্তা না করে, সে অন্ধ, জড় ও মূর্থসদৃশ এবং তাহার জীবন ক্ষতিপূর্ণ ও শূন্য ॥৭০॥

অগস্ত্য উবাচ—

নিমিষং নিমিষাৰ্দ্ধং বা প্রাণীনাং বিষ্ণুচিন্তনম্ ।

ক্রতু-কোটিসহস্রানাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে ॥৭১॥

মনসা কৰ্ম্মণা বাচা যে স্মরন্তি জনাৰ্দ্দিনম্ ।

তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্ ॥৭২॥

অগস্ত্য বলিলেন,—প্রাণীদিগের পক্ষে সহস্র সহস্র কোটি যজ্ঞ করা অপেক্ষা এক নিমিষ বা অর্দ্ধ নিমিষকাল বিষ্ণুধ্যান শ্রেষ্ঠ ॥৭১॥

যে-স্থানে যাহারা কায়-মনোবাক্যে জনার্দনের নাম স্মরণ করেন,
সেখানে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও নৈমাষারণ্য তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন ॥৭২॥

শুক উবাচ—

আলোড়্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ।

ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥৭৩॥

শুক বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিবার
পর ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নারায়ণই সর্বদা ধ্যেয় অর্থাৎ
নারায়ণকেই একমাত্র ধ্যান করিতে হইবে ॥৭৩॥

মহাদেব উবাচ—

শরীরং চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং নিরন্তরম্ ।

ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্রো নারায়ণো हरिः ॥৭৪॥

মহাদেব বলিলেন,—নবচ্ছিদ্রযুক্ত শরীর সর্বদাই রোগাক্রান্ত হইয়া
থাকে । এই রোগের ঔষধ একমাত্র গজাজল এবং চিকিৎসক নারায়ণ
হরিই ॥৭৪॥

সনৎকুমার উবাচ—

যশ্চ হস্তে গদা-চক্রং গরুড়ো যশ্চ বাহনম্ ।

শঙ্খাঃ করতলে যশ্চ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥৭৫॥

সনৎকুমার বলিলেন,—যাহার হস্তে গদা ও করতলে শঙ্খ এবং গরুড়
যাহার বাহন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রদত্ত হউন ॥৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

জলং ভিত্তা যথা পদ্মং নরকাতুষ্কারাম্যহম্ ॥৭৬॥

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মুর্দ্ধবাহ-

র্যো মাং মুকুন্দ-নরসিংহ-জনার্দনেতি ।

জীবো জপতানুদিনং মরণে রণে বা

পাষণকাষ্ঠসদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্ ॥৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যে ব্যক্তি ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া নিত্য নিত্য
আমাকে স্মরণ করে, জলকে ভেদ করিয়া যেমন পদ্মপুষ্প জলোপরি উত্থিত
হয়, তদ্রূপ আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করি ॥৭৬॥

হে মানবগণ! যে উর্দ্ধবাহু হইয়া আমার যুকুন্দ, নরসিংহ ও জনার্দন নাম প্রত্যাহ জপ করে, যুদ্ধে বা মৃত্যুসময়ে পাষণকাষ্ঠসদৃশ জীবকেও তাহার অভীষ্ট প্রদান করি ॥৭৭॥

ফলশ্রুতিঃ—

ইদং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্বপাপপ্রণাশম্ ।

স্তোত্রং পাণ্ডবগীতাখ্যং ঋষিণা পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥৭৮॥

যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

তস্য পুণ্যফলং কিঞ্চিং বক্তুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥৭৯॥

গয়ায়াং গোসহস্রাণি দানতঃ পিণ্ডদানতঃ ।

যৎফলং লাভতে মর্ত্যঃ কলাং নাইতি ষোড়শীম্ ॥৮০॥

যৎফলং মথুরাং গত্বা দৃষ্ট্বা যোগেশ্বরং হরিম্ ।

তৎফলং সম্যগাপ্নোতি সত্যমেতন্ম সংশয়ঃ ॥৮১॥

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্ ।

সর্বদেব-নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥৮২॥

ফলশ্রুতি,—এই পবিত্র, আয়ুষ্কর, পাপবিনাশকারী পাণ্ডবগীতানামক স্তোত্র ঋষিকর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৭৮॥

যে-ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন বা যিনি উক্ত শ্রবণ করেন, তাহার পুণ্যফল কিঞ্চিন্নাত্র বলিতে কেহই সমর্থ নহেন ॥৭৯॥

মরণশীল মানব এই স্তোত্রপাঠে যে-ফল লাভ করেন, গয়ায় পিণ্ড বা সহস্র গোদান করিলেও ইহার ষোড়শাংশের সমান নহে ॥৮০॥

মথুরায় গমন করিয়া যোগেশ্বর হরিকে দর্শন করিলে যে-ফল লাভ হয়, এই স্তোত্র পাঠে সম্যগ্রূপে সেই ফলপ্রাপ্তি হয়, ইহা সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥৮১॥

আকাশ হইতে পতিত জল যেমন সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ সর্বদেবের প্রতি নমস্কার শ্রীকেশবের নিকট যায় ॥৮২॥ (সমাপ্ত)

পারমাথিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি

সাধুর-সন্তোষ-বিধানই পারমাথিক পত্রের বৃত্তি ও জীবন

সাধুদিগের সন্তোষ বিধান করাই পারমাথিক পত্রিকার বৃত্তি। যদি সাধুগণ তুষ্ট না হন, তাহা হইলে পারমাথিক পত্রের সজীবতা লক্ষিত হইবে না। সাধুগণের তুষ্টি বিধান করিতে অসাধু-বৃত্তি তাগ করিবার প্রার্থনা-সমূহে পারমাথিক পত্রিকা অলঙ্কৃত থাকেন। অন্যাভিলাষ-দ্বারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাহারা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারমাথিক পত্র অসমর্থ। সাধুর বেশে অনেকে সাধু-বৃত্তি তাগ করিয়া নিজ নিজ হরি-বিমুখ বিষয়ের পুষ্টি সাধন করেন। এতাদৃশী নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত গুণসমূহকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন করেন। কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য বস্তু। সেই সত্য বস্তুর সেবা হইতে বিমুখ হইলে জীবের অমঙ্গল হয়। যিনি নশ্বর প্রাকৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকেন এবং মিথ্যায়ুক্তি দ্বারা বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করেন, তিনি সজ্জন-তোষণীর বৃত্তিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী ও অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে হরিবিমুখ করে। তাদৃশ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয় না।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আনন্দপ্রকাশই সাধুর লক্ষণ

শ্রীপত্রিকা শুদ্ধভক্তিপ্রচার লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের আনন্দ বিধান করেন। ভক্ত-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা তাগ করা বা শুদ্ধ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরিবৈমুখ্য প্রচার হউক, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পারমাথিক সাময়িক-পত্র এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে পারেন। তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইলেই যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে নিরস্ত হইবেন, এটরূপ নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহারা রাগদ্বেষের বশবর্তী, তাহারা কৃষ্ণাশ্রিত জনকেও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি তাদৃশ নহেন। পারমাথিকপত্র মহাজনবর্গের পথের অনুগমনই “পরমধর্ম” বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন,— ‘কালঃ কলিঃ’ অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ

বিপদসঙ্কুল করেন। তাঁহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রবৃত্ত লোকসংগ্রহের জন্য বা প্রাকৃত ইঞ্জিয়তর্পণ-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের পরবর্ত্তীকালে অপসম্প্রদায়ের প্রভাব

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পর হইতে আমরা একটি প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ ভক্ত সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোস্বামীগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিভক্তনকে প্রাকৃত-বিষয়-জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুগোরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া পড়েন।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে উপযুক্ত শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। অতিবাড়ী শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলীয়া মুকুন্দ দাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না।

বিষয়-মিশ্রিত চেষ্টা ভক্তি নহে, পরন্তু ভব-বন্ধের কারণ

অবাস্তব লক্ষ্যসমূহ অন্তরে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপোপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিরতির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্রা চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অজ্ঞাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এসকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড়ভোগময় স্বার্থে আবৃত হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অন্য গোণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে। যেখানে বিষয়-ব্যাপার, সেখানেই হিংসা-দ্বेष প্রভৃতি ধর্ম্ম। কৃষ্ণেতর বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাহারা কৃষ্ণেতর অসদ্বস্ত-সেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সাম্য জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহারা যতই কেননা আপনাকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্মবিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন। (চৈঃ চঃ অঃ ৬ষ্ঠ ১৯৯ সংখ্যা।)

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।

সেই কর্ম্ম করার যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥

প্রাকৃত অর্থ-লাভাদি চতুর্বর্গের চেষ্টা আদরণীয় নহে

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাঁহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতিবাদী হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ ফলোদ্দেশ্যে কৃষ্ণের বিষয়কে দ্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাঁহাদের মন্দ চেষ্টা আমরা আদর করিতে পারি না। প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধ-কারক প্রাকৃত দ্রবির, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অন্ধ-শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

অন্যাভিলাষী, কন্য়ী ও জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের তালিকা

অন্যাভিলাষী, কন্য়ী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অগ্র উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধভক্তগণ মিছাভক্ত বলেন। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, মিছাভক্ত—মেকী। নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণের সেবায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোক-বঞ্চনার জন্ত কপটতা প্রদর্শনপূর্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুকুর উদাহরণ-স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুড়ুকু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্ট, শ্রীমন্নুহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন-পথপ্রাপ্ত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগ্য সেবক-প্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদ-সঙ্কুল, তাঁহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-পূর্বাহ্নচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামী অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাঁহারা তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমন্নুহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে ভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ শুদ্ধভক্তপদাসীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবতপ্রভুর অপ্রাকৃত কথা-প্রচারই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

শ্রীসজ্জনতোষণী বিচার-রস-বাহিনী সাময়িক-পত্রিকা নন। শ্রীগৌর-সুন্দরের দয়িতবর শ্রীমদ্ভক্তিবিদ্যোদ ঠাকুর, তাঁহার একমাত্র উপাস্য বস্তুর অপ্রাকৃত কথা মলিনচিত্ত জীবের স্নকৃতিলাভের জন্য দয়াপরবশ হইয়া কীর্তনোদ্দেশ্যে ‘তোষণী’ প্রকট করিয়াছিলেন। বচনসর্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিদ্যোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূল আচরণ করেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীনাম-ভজনের ব্যাঞ্জে নাগাপরাধ করিয়া থাকেন। যাহাতে অপ্রাকৃত-চিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত-চিত্ত কৃষ্ণানুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছাভক্তগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণ-মালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের সর্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্তুষ্ট হন। শুদ্ধহরিকথা-প্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃতশব্দ-তাৎপর্যাপন্ন হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

দুঃসঙ্গ-বর্জিত ও সংসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশই শ্রীপত্রিকার ধর্ম

সজ্জনের ধর্ম সজ্জনকেই তৃষ্টি করিতে সমর্থ। কপট সাধুর কাপটা সংরক্ষণের জন্য সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) নহেন। “যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্বালীকং” শ্লোক ; “কস্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত কপটবৈষ্ণব-বেশে” প্রভৃতি পদ্য ; “বাহ্যভাস্তরয়োঃ সমং বত্ কদা-বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্”—এই মহাপ্রভু-বাক্য অবশ্যই কপটিগণের বজ্রসদৃশ, কিন্তু অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তিপ্রতিকূল-চেষ্টা-নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাহারা বলেন,—শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন, হরিবিমুখগণের সঙ্গকে বর্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না ; কেননা তাহাতে পরচর্চা হয়, তদ্বত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসজ্জা সংস্ৰ সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

সন্ত এবাস্য ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

প্রতিকূল বা দুঃসঙ্গ-বর্জনের পরামর্শ পরচর্চা নহে

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রতিকূল-অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূলজ্ঞানে কৰ্ম্মকাণ্ড

ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা অসাধুদিগের বিচারে “পরচর্চা” বলিয়া স্থির হইলেও অসংনিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিতে পারিবে না। দুঃসঙ্গ বর্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না। সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসংনিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসেবার কথা বলেন, অনর্থময় মায়িক কথামাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না। কপটি-দল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি মুখে স্বীকার করিয়া অনর্থ প্রবৃত্তি ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন। কপটি-দল বলেন,—অনর্থবিশিষ্ট মানব অনর্থ-ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ-সমৃদ্ধি-কল্পে ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্ত কৃত্রিম হরিভজন করিলেও বস্তুধর্ম-প্রভাবে তাহার অনর্থ যাইবে; কিন্তু যাহার অর্থরূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে হরিভজন-সংজ্ঞামাত্রা দিয়াছে, সেই অনর্থময় চেষ্টাকে ভজন বলিয়া জাহির করিলে, কপটতা-আশ্রয়ে পিচ্ছিল-চক্ষু জাতভাব প্রভৃতি জানিলে কি-প্রকারে বস্তুধর্ম প্রকাশ হইবে, বুঝা যায় না। ব্যবধানযুক্ত কপটতাময় ভজনে কোন ফল হয় না, ইহাই ত’ শাস্ত্রের বা গোস্থামিগণের ও গৌরহরির বাণী।

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তি সহজিয়ার পোষিকা নহেন

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাহারা অপ্রাকৃত পত্রিকা-পাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাহাদের প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তির পোষিকা সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন না। উহা তাহাদের প্রাকৃত দুষ্কৃতির ফল মাত্র। শুদ্ধভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা অনুক্ষণ পাঠ করুন এবং প্রাকৃত-সহজিয়াদিগকে ভক্তিবিরোধী জানুন—ইহাই আমাদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা। প্রাকৃত দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিশ্বাস ছাড়িয়া প্রাকৃত সাময়িক পত্র প্রচার ও পাঠ করুন। বিষয়িগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক, তথাপি শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তিপথ ভুলিয়াও কখনই ছাড়েন না।

বৈষ্ণবগুরুর অবমাননায় শ্রীপত্রিকার ক্রোধ ও তীব্র প্রতিবাদ

“নীচ যদি উচ্চ ভাষে স্তুতি উড়ায় হেসে”—একথা পরম সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের বিশ্রু-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়। ভাগবতমাত্রেরই পরম সহিষ্ণু,

কিন্তু গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে কোন ভগবদ্ভক্ত কখনই সেই দুঃসঙ্গ-কারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—“ক্রোধ ভক্তদ্বৈষজনে।” ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বৈষজনেই কর্তব্য। এই ক্রতা-বিমুখতাই বর্তমান প্রাকৃত-সাহাজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। বৈষ্ণবের ভৃত্য-স্বত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাত-কারক অপরাধ। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্তির স্বরূপ-বিবেক

যুগপদ্ভাজতে যস্মিন্ ভেদাভেদবিচিহ্নতা।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং পঞ্চতত্ত্বাস্থিতং স্বতঃ ॥

প্রণম্য গৌরচন্দ্রশ্চ সেবকান্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্।

ভক্তিতত্ত্ববিবেকাখ্যং শাস্ত্রং বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥

বিশ্ববৈষ্ণবদাসস্য ক্ষুদ্রস্যাকিঞ্চনস্য মে।

এতস্মিন্মুখ্যমে হ্যেকং বলং ভাগবতী ক্ষমা ॥

হে অন্তঃরঙ্গ বৈষ্ণবমহোদয়গণ !

বিশুদ্ধ-হরিভক্তি আশ্বাদন ও বিশুদ্ধ-হরিভক্তি প্রচারই আমাদের এই স্ভার উদ্দেশ্য। অতএব বিশুদ্ধ-হরিভক্তি যে কি, তাহা আমাদের সর্বদাগ্রহে আলোচনা করা কর্তব্য। এই পবিত্র আলোচনার দ্বারা আমাদের দুইটি ফললাভ হইবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ-হরিভক্তি বুদ্ধিতে পারিলে আর আমাদের কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না; আমরা অমিশ্রভাবে তাহা আশ্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইব। দ্বিতীয়তঃ জীবের চূর্ভাগাক্রমে নানাপ্রকার মিশ্র মত আসিয়া আমাদের বুদ্ধিকে এত দূষিত করে যে, পবিত্র হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া আমরা মিশ্র মতকেই আদর করিতে থাকি। শুদ্ধা ভক্তি জ্ঞানিলে সেইরূপ মিশ্র মত হইতে রক্ষা পাইব। মিশ্র মত অপেক্ষা আমাদের শত্রু আর নাই। যাহারা বলেন যে, ভক্তি কিছু নয়, ঈশ্বর

একটা ভাণমাত্র, কল্পনাশক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আমরাই ভক্তিরূপ একটা চিত্তবোধিকে বরণ করিয়াছি, তাহার। আমাদের প্রতিপক্ষ হইলেও ততদূর অনিষ্ট করিতে সক্ষম হ'ন না, যেহেতু আমরা সহসা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি এবং আমাদের সহজ রুচিদ্বারা উচ্ছালিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যাহারা বলেন যে, ঈশভক্তির বিপরীত সিদ্ধান্ত ও আচারকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর অনিষ্ট করেন। ভক্তিচ্ছলে বিপরীত তত্ত্বে নীত করিয়া আমাদের অংশে ঈশভক্তি হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইজন্য আমাদের পূর্বাচার্যগণ অনেক যত্নসহকারে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করতঃ আমাদের মিশ্র মত হইতে ভূয়োভূয়ঃ সতর্ক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উপদেশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে থাকিব। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার উদ্দেশে তাঁহারা ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীভক্তিরসামুদ্রসিদ্ধি গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী শুদ্ধভক্তির সামান্য লক্ষণে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন,—

অন্যাত্তিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্যাদানারতম্।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥

অন্যাত্তিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্ম্যাদি দ্বারা অনারত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলি। এই শ্লোকটির এক একটি শব্দের বিশেষ আলোচনা না করিলে ভক্তির লক্ষণ বুঝা যাইবে না। ঐ শ্লোকে যে উত্তমা ভক্তি বলা হইয়াছে তাহার অর্থ কি? উত্তমা ভক্তি এই শব্দের দ্বারা কি আর একটা অধমা ভক্তি আছে ইহা বুঝিতে হইবে, কি আর কিছু? উত্তমা ভক্তির অর্থ এই যে, শুদ্ধা বা অমিশ্রা অবস্থায় যখন ভক্তিলতিকা হন তখন তাঁহাকে উত্তমা ভক্তি বলি। উত্তম জল বলিলে যে রূপ নির্মল জলকে বুঝিতে হয় অর্থাৎ জলে কোনপ্রকার অন্য দ্রব্য, ঘ্রাণ বা বর্ণ মিশ্রিত নাই, একরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ উত্তমা ভক্তি-শব্দে নির্মলা, নিগুণা, অমিশ্রা, কেবলা ও অকিঞ্চনা ভক্তি বুঝিতে হইবে। এই সকল বিশেষণদ্বারা ভক্তির অন্যথা বুঝিতে হইবে না, বরং ভক্তির অন্যথাভাব বজ্জিত হইলে শুদ্ধস্বভাবই লক্ষিত হইবে। কেবল ভক্তি-শব্দটি ব্যবহার করিলে যে-অর্থ হয়, ঐ সমস্ত বিশেষণদ্বারা সেই অর্থই হইবে। তবে কি ভক্তিরসার্চাধ্য শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী অকারণ উত্তমা বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছেন?

উত্তর—না। যেমত অনেক স্থলে সমল জল দেখিতে পাওয়ায় জল-পানকর্তা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পানীয় জল কি নির্মল (filtered) ? সেইরূপ অনেক স্থলে মিশ্রা ভক্তি লক্ষিত হওয়ায় উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করা আচার্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ রসাতীর্থা মহাশয় কেবল ভক্তিরই লক্ষণ করিয়াছেন। চল-ভক্তি, প্রতিবিম্ব-ভক্তি, চায়া-ভক্তি, কৰ্ম্মমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি প্রভৃতি ভাবসকল যে ভক্তি নয় তাহা ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইল যে, আনুকূল্য-ময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। এই শ্লোকে অনুশীলন শব্দটির অর্থবিচারে ‘দুর্গমসঙ্গমণী’ টীকাকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, অনুশীলন শব্দের অর্থ বিবিধ। আদৌ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিস্বরূপ কায়বাঙ্মানস-চেষ্টারূপ। দ্বিতীয়তঃ প্রীতিবিষয়াত্মক মনের ভাবরূপ। দ্বিবিধ হইলেও ভাবরূপ অনুশীলন চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত। অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়ই পরস্পর উপমর্দন করতঃ চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের লক্ষণরূপে পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণসম্বন্ধে কায়বাচ্মানসীয় চেষ্টা আনুকূল্যাত্মিকা হইলেও ভক্তি-নাম লাভ করে। কৃষ্ণের প্রতি কংস-শিশুপালাদির ন্যায় অহরহঃ প্রতিকূল চেষ্টা থাকিলেও সে চেষ্টা ভক্তি-নাম প্রাপ্ত হয় না। আনুকূল্য চেষ্টাই ভক্তির ভজ্ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ সাধিত হয়। অতএব গুরুড়-পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ

সেবায়াং পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

তস্মাৎ সেবা বৃধিঃ প্রোক্তা

ভক্তিসাধনে ভূয়সী ॥

এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণসেবাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। জীব ও কৃষ্ণের সেবক-সেবাভাবই নিত্য।

মূলে এক কৃষ্ণানুশীলন-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ভক্তিশব্দের একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই চরম বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণরূপ ও শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি অস্তান্য রূপেও ভক্তির ক্রিয়া হয় ; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তির যতদূর পূর্ণ ক্রিয়া হয়, অস্তান্যরূপে তদপেক্ষা ন্যূনতা লক্ষিত হয়। এই বিষয়টী ভক্তির বিষয়বিচারে পরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইবে। সম্প্রতি এই

পর্যাপ্ত জ্ঞাতব্য যে, ভগবন্তত্ত্ব বাতীত ভক্তির বিষয়ান্তর নাই। তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবন্তত্ত্ব। স্বরূপতঃ তত্ত্ব এক ও অখণ্ড হইলেও জীবের তত্ত্বালোচনার অধিকার-তারতম্যক্রমে ঐ তত্ত্ব ত্রিবিধাকারে লক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গে যাহারা তত্ত্ব দর্শন করিতে যত্ন করেন, তাহারা ব্রহ্ম বই আর চরমে কিছুই দেখিতে পান না। তাহারা এই মায়িক জগতের গুণ-গণকে বাতিরেকভাবে চিন্তা করিতে করিতে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে আধ্যাত্মিক চেষ্টা করেন, তদ্বারা সমস্ত মায়ার বিপরীত গুণগণকে সজ্জীভূত করত একটি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিরবয়ব, নিরাকার, নির্বিকার ব্রহ্মতে অবস্থিত হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি এইরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ মায়িক গুণগণের অভাব হইলেই যে বস্তু লাভ হয় ইহার প্রমাণ কি? আধ্যাত্মিক তাত্ত্বিকগণ নিগূঢ় শ্রুতিগণকে প্রমাণ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। তাহার চক্ষু নাই, তিনি অবাঙ্ মনসোগোচর; তাহার শ্রোত্র নাই, তাহার অবয়ব নাই, এইরূপ নির্বিশেষ শ্রুতিবাক্য অনেক আছে বটে; কিন্তু শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-ধৃত শ্রীমৎ প্রভুপাদ-বাক্য দৃষ্টি করিলে ঐ তর্কের সম্পূর্ণ নিরসন হয়।

যা যা শ্রুতির্জলতি নির্বিশেষং সা

সাভিধন্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং

প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

যে যে শ্রুতিবাক্য নির্বিশেষ-তত্ত্বের জল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই সবিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ভালরূপে শ্রুতিসমূহের সমন্বয় করিতে পারিলে সবিশেষ-তত্ত্বই বলবান হইয়া পড়ে। যথা,—কোনস্থলে শ্রুতি বলিলেন যে, তাহার কর, চরণ, শ্রোত্র নাই, কিন্তু তাহাতেই দৃষ্টি হইবে যে, তিনি সকলই করেন, সর্বত্র গমন করেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। ইহার শুদ্ধ মীমাংসা এই যে, বদ্ধজীবগণের ন্যায় তাহার প্রাকৃত করচরণাদি নাই, তাহার যে নিত্য বিগ্রহ আছে, তাহা বিস্তৃত চন্দ্র, প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।

ফলতঃ কেবল জ্ঞানমার্গে আলোচনা করিতে গেলে নিরাকার ব্রহ্মকেই চরম বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম এই যে, কেবল জ্ঞান প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ হইতে আমরা যে বোধ লাভ করি, তাহাকে যে সিদ্ধান্তই করা যাইবে তাহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে অর্থাৎ হয় ভূদীয় সিদ্ধান্ত

হইবে নতুবা ব্যতিরেক সিদ্ধান্তদ্বারা জড়ের একটি বিপরীত তত্ত্ব গঠিত হইবে ;
চিন্ময় পরমতত্ত্ব তাহাতে স্থলভ । শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসম্পর্কে আধ্যাত্মিক
জ্ঞানবাদীদিগের প্রাপ্য তত্ত্ব এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন,—

“প্রথমতঃ শ্রোতৃনামের বিবেকস্থাবানের যাবতা জগদতিরিক্তং চিন্মাত্রং
বস্তুপস্থিতং ভবতি । তস্মিন্চিন্মাত্রেপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধাঃ
ভগবত্বাদিরূপা বর্তন্তে তাংস্ত তে বিবেকজ্ঞং ন ক্ষমন্তে । যথা রজনী শিশুণী
জ্যোতির্মাত্রত্রেপি যে মণ্ডলাস্তর্বহিষ্চ দিব্যবিমানাদি-পরম্পর-পৃথগ্-ভূতরশ্মি-
পরমাণুরূপা বিশেষা স্তাংশ্চক্ষুঃসুপ্তহং । পূর্ববচ্চ যদি মহতঃ রূপাবিশেষণ
দিব্যদৃষ্টিত্বা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিচ্চ ভবেৎ ন চ নির্বিশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানু-
ভবেন তল্লীন এব ভবতি । ইদমেব স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ইতানেন শ্রীগীতা-
শ্লোকম্ স্বস্মা শুদ্ধম্ আত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মনাধিকৃত্য বর্তমানত্বাৎ অধ্যাত্ম-
শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ।”

শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অতল্লিরসনবৃত্তিদ্বারা যখন
আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, তখন মায়াতিরিক্ত চিন্মাত্র বস্তুর দিগ্‌দর্শন হয় মাত্র,
কিন্তু তদুগত যে চিহ্নিশেষ আছে তাহা দর্শন হয় না । তৎকালে যদি সবিশেষ-
তত্ত্ববিদ বৈষ্ণবগুরু লাভ হয় তবেই ব্রহ্মলয়রূপ অনর্থ হইতে রক্ষা হয় ।

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভীম ও জরাসন্ধ

পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম মধ্যমপাণ্ডব ভীম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ । শ্রীভীম—
আশ্রয়-বিগ্রহ ; তিনি আমাদের গুরু । তিনি আশ্রয়-জাতীয় শ্রীকৃষ্ণ । তিনি
জগদগুরু । শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণকে দিতে পারেন । গুরু—কৃষ্ণ । তিনি কৃষ্ণ
দিতে পারেন । জীব ও মায়া কৃষ্ণ নহে । জীব চেতন হইলেও কৃষ্ণ নয় ।
শ্রীগুরুদেব বাহিরে দেখিতে মানুষের মত কিন্তু মানুষ নন, তিনি কপট-
মানব । কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন ; জীব কৃষ্ণকে জানিতে পারে না, গুরু
রূপা করিয়া জানাইলে জানিতে পারে । শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ—কৃষ্ণের
দ্বিতীয় মূর্ত্তি । গুরু কৃষ্ণ হইলেও গোপীনাথ বা রাধানাথ নহেন । গুরু
কৃষ্ণকে সুখ দেন, নিজে সুখ চান না । গুরু জীবজাতীয় নহেন । শ্রীমাধ্ব-
গণ অর্জুন অপেক্ষা ভীমকেই গুরু বলিয়া জানেন । এই ভীমই ত্রেতাযুগে

হুম্মদরূপে রাবণ বধ করিয়া সীতার সহিত রামের বিলাসের সহায়তা করিয়াছেন। শিষ্ণোর কাজ—গুরুর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন করান। শ্রীহনুমান্জী অদ্বিতীয় বীর, তাঁহার মত বীর কেহ নাই। শ্রীভীম কলিযুগে শ্রীমন্মথ্য-চাৰ্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রোণদী ও কুন্তী—ইঁহারা সকলেই মহাভাগবত। ইঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সুখের জন্য বাস্তব। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভোগবুদ্দি বা পুরুষাভিমান নাই। ইঁহাদের শ্রীনাম-স্মরণে বা কৃপায় জীবের পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণভক্ত। ইঁহারা নিত্য দ্বারকাবাসী। শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ কৰ্ম্মকাণ্ড নহে। তিনি দ্বারকার দ্বায় সমান ঐশ্বর্য্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কুম্বাদেশে এই রাজসূয়-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই ভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাক্ষাৎ ভক্তিও যদি নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কৃত হন, তবে তাহাকেও ভক্তি বলা যায় না। যাহাতে ভগবানের সুখ নাই, তাহা ভক্তি নহে।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে রাজসূয়-যজ্ঞ স্থলানে ভদীর অভিপ্রায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—“হে গোবিন্দ! আমি রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই যজ্ঞকাৰ্য্য সমাধা করুন। যাহারা নিরন্তর আপনার অশুভনাশন পদযুগল দেহদ্বারা পরিচর্যা, বিগুহ চিত্তদ্বারা ধ্যান ও বাক্যদ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভববন্ধন হঠতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি কোনরূপ কাম্য বিষয়ের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তিগণেরও অলভ্য বিষয়সমূহও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দেব-দেব! এই রাজসূয়-যজ্ঞে লোকসমূহ আপনার পাদপদ্ম-ভজনপ্রভাব দর্শন করুক এবং বিমুখ জনগণ ভক্ত ও অভক্তের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখুক। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, হে মহারাজ, আপনার সঙ্কল্প অতি উত্তম। এতদ্বারা আপনার কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে এবং উহা নিখিল ভূতগণের বাঞ্ছনীয়। আপনি যাবতীয় নৃপগণকে পরাভূত ও পৃথিবীকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞের দ্রব্যসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক সহায়জ্ঞ সম্পাদন করুন। আপনার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশজাত এবং আপনি নিজে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া আমিও আপনার বশীভূত। আমার প্রতি যিনি আনুকূল্যচিহ্ন, একগতে কোন দেবতাও তাঁহাকে তেজঃ, যশঃ, সৌন্দর্য্য

বা ঐশ্বর্যদ্বারা অভিভূত করিতে পারে না, মহুগ্নের কথা আর কি বলিব। জগবন্ধাক্রমেণে প্রীত হইয়া মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির সৃজয়বীরগণের সহিত সহদেবকে দক্ষিণ, মৎস্যদেবীষ বীরগণ-সহ নকুলকে পশ্চিম, কেকয় বীরগণের সহিত অজ্জুনকে উত্তরে এবং মদ্রবীরগণের সহিত ভীমসেনকে পূর্বদিক বিজয়ের জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীসহদেবাদি সবলে নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় করতঃ প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন। দিগ্বিজয়ান্তে রাজা শ্রীযুধিষ্ঠির জরাসন্ধকে অপরাজিত শ্রবণ করিয়া তাহার পরাজয়ের অন্য উপায় চিন্তা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকথিত উপায় প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভীম, অজ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনজন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের নিবাসে গমনপূর্বক ব্রাহ্মণভক্ত রাজার নিকট আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং অতিথি-সেবার প্রভূত প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের প্রার্থনীয় বস্তু প্রদানের জন্ত জরাসন্ধকে অহরোধ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদের অঙ্গে ধনুজ্যাঘাত-চিহ্ন-দর্শনে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ও নিজদেহের বিনিময়েও তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—“আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধাভিলাষে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত আমরা অন্য কোন বিষয় কামনা করি না। অতএব যদি আমাদের প্রার্থনা-পূরণ সম্ভব মনে হয়, তাহা হইল দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। ইনি কুল্যাপুত্র ভীমসেন, ইনি তদীয় ভ্রাতা অজ্জুন এবং আমি তোমার শত্রু কৃষ্ণ। শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ উচ্চবাচ্য করতঃ বলিতে লাগিলেন,—“হে মূঢ়গণ, যদি যুদ্ধই তোমাদের প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে আমি তাহাই প্রদান করিব। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরাপুরী পরিত্যাগপূর্বক আমার ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। সুতরাং তোমার ন্যায় যুদ্ধ-কাতর ও ভীকু ব্যক্তির সহিত আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। এই অজ্জুনও অল্পবলশালী এবং বয়স ও শরীরে আমার তুল্য নহে। অতএব ইহাকেও যুদ্ধক্ষম মনে করি না। একমাত্র ভীমসেনই আমার তুল্য বলশালী যোদ্ধা বলিয়া মনে হইতেছে।” জরাসন্ধ এইরূপ বলিয়া ভীমসেনকে একটী গদা প্রদানপূর্বক স্বয়ং অপর গদা গ্রহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে গমন করিল। তথায় পরস্পরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাহু, কটি ও পাদদেশের আঘাতে গদাছয় বিনষ্ট হইল। তখন বীরদ্বয় মুষ্টিদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরস্পরকে তুল্য

বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটা বৃক্ষশাখা চিরিয়া ভীমকে জরাসন্ধ-বধের উপায় প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝিয়া জরাসন্ধকে পদদ্বয় ধারণপূর্বক ভূপাতিত করিলেন এবং নিজ পদদ্বারা একপদে আক্রমণপূর্বক বাহুযুগলের দ্বারা অন্য পদ ধারণ করিয়া উরুদেশ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে বিদারিত করিলেন। এইরূপে জরাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া পূজা করিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়া জরাসন্ধকর্তৃক আবদ্ধ রাজগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের নিধন-বার্তা অধগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিলেন যে, ত্রিলোকগুরুবৃন্দ ও লোকপালগণের সহিত নিখিল লোকসমূহ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অবনতমস্তকে বহন করিয়া থাকেন। তাদৃশ পরমেশ্বরের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের আদেশ পালন অত্যন্ত বিসদৃশ; তবে পরানুগ্রহ-নিমিত্ত সর্বনিয়ন্তা তাঁহার প্রভাবের বুদ্ধি বা হ্রাস পায় না। এই বলিয়া তিনি ভরদ্বাজ, গোতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদ-নিপুণ স্রযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে স্বজ্ঞের হোত্বরূপে বরণ করিলেন। তখন নপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধর্নের লোক যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত হইল। সভ্যগণের মধ্যে অগ্রে পূজালাভের যোগ্য কে—এই বিচার উপস্থিত হইলে শ্রীসহদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূজ্যশ্রেষ্ঠ; যেহেতু তিনিই সর্বদেবময়। তিনি অস্তর্যামিত্রে নিখিল জগতের স্রষ্টাদি কার্য্য নিজমায়াবলে সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহবলেই মানবগণ বিবিধ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্বক অশেষ শুভফললাভ করেন এবং তাঁহার পূজা করিলেই নিখিল ভূতগণের পূজাও সাধিত হয়। সভাস্থ সকলে শ্রীসহদেবের এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে প্রীতিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনবারি ভার্ঘ্যা, অনুজ, অমাত্য ও আত্মীয়গণের সহিত মস্তকে ধারণ করিলেন।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না, কিন্তু সভ্যগণ কর্ণাচ্ছাদনপূর্বক সভা ত্যাগ করিলেন; যেহেতু ভগবান্ অথবা তদন্তর্য্যক নিন্দা শ্রবণ করিলে নিন্দাকারী ও শ্রোতা উভয়েই নরক হয়।

কৃষ্ণ-নিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য রাজগণ শিশুপালের বিরুদ্ধে
অস্ত্রধারণ করিলে শিশুপালও যুদ্ধার্থ যজ্ঞা ধারণ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও
তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া বীরগণকে নিবারিত করিয়া সুদর্শন-
চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। এই শিশুপাল পর-পর তিনজন
ভগবদ্বিদ্বেষ-দ্বারা অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করায় দেহাবসানে তন্ময়তা—সাক্ষ্য-
প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাজা যুধিষ্ঠির সদস্ত্র ও ঋত্বিকুগণকে প্রচুর দক্ষিণাদানপূর্বক প্রায়শ্চিত্তাদি
হোম সমাধা করিলেন। ভগবান্ শ্রীদেবকী-নন্দন রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপনান্তে
মহিষীগণসহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সদাচার

দেহাঙ্গ-বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবগণের মনোবর্ষ বিচার-প্রসূত দেহবর্ষ, কুল-
বর্ষ, জাতিবর্ষ প্রভৃতি বহু অনিত্য বর্ষের প্রকাশ পায়। কিন্তু সনাতন বর্ষ
বা আত্মবর্ষ অন্ত্যাত্ম বর্ষের দ্বায় ধ্বংসশীল বা পরিবর্তনশীল নহে—ইহা শুদ্ধ
নিত্য সনাতন। দেহমন হইতে আসা পৃথক বস্তু। ভাগ্যবানজন বহু স্মৃতি-
বলে সদৃশরূপ পদাশ্রয়ে তন্ময়-নিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে এবং
তাহারই কৃপাবলে জড়দেহ ও আত্মার পৃথকত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

জীব নিত্য কৃষ্ণদান, কিন্তু মায়াবশতঃ সেই শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত
হইয়াছে। ভোগবাসনায় অনাদিকাল হইতে মায়াদেবীর কারাগারে আবদ্ধ
হইয়া ত্রিতাপজনিত ক্লেশ অবিরত ভোগ করিতেছে। সাধু গুরুর কৃপায়
পুনরায় জীব তাহার বন্ধন-দণ্ডা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীভগবানের
সেবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। “স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে দ্বিভি”
—ইহাষ্ট যতাজন-বাক্য। শ্রীল প্রভুপদ জগদ্বাসীকে আশ্বাস দিয়া উপদেশ
বাণী জানাইয়াছেন, “Back to God & back to home.” বদ্ধ জীবগণ
বাস্তহারার দ্বায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সাধক-সাধিকা যখন পরমার্থ
লাভের জন্ত সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন অন্ত্যাত্ম ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের মধ্যে
সদাচার পালনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সদাচার ব্যতীত কাহারও
ভজন-কার্য্য সিদ্ধ হয় না—সকল কার্য্যেই সদাচারের প্রয়োজন। “ন কিঞ্চিৎ
কশ্চিৎ সিদ্ধ্যং সদাচারং বিনা যতঃ। তস্মাদ বশ্যং সর্বত্র সদাচারো
হপেক্ষাতে ॥” (শ্রীহরিভক্তিবিলাস)।

সাধুগুরুনৈষ্কংগণ জীবন্ত শাস্ত্র-স্বরূপ—তাহাদের সমস্ত কিছু আচার-বিচার শাস্ত্রানুসারে। তাহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার দোষ নাই। সুতরাং সচ্ছন্দ তাহাদের সময়ে প্রযোজ্য হইয়া থাকে, শ্রীগুরুনৈষ্কংগণের আচার-আচরণই সদাচার। শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস-বৃত্ত বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখিত হইয়াছে, সাধবঃ ক্রী-দোষান্তঃ সচ্ছন্দঃ সাধুবাচকঃ। তেযামাচরণং যত্ত্বং সদাচারঃ স উচ্যতে।”

নানাবিধ সদাচার পালনের মধ্যে আচার্য্য গ্রহণ-বিষয় সদাচার অন্তর্ভুক্ত। বন্ধাবস্থায় জীবের স্বভাব বিকৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং স্বভাবানুযায়ী সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের দ্বারা ভেদ স্বভাব হইয়া থাকে। ক্রম-পন্থানুসারে মায়ার ত্রিগুণকে অতিক্রম করা সম্ভব হইয়া থাকে। যিনি সেরূপ প্রদ্বাবিশিষ্ট, সেইরূপ আহার্য্যের প্রতি রুচি জন্মে। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিগণ বালিয়া থাকেন, আহারের সহিত ধর্ম্মের কি সম্পর্ক? শরীর ভাঙ্গা রেখেও তবে ধর্ম্মাদি পালন—শরীর রক্ষা সমস্ত ধর্ম্ম সাধনের মূল। কিন্তু এজগতে যাহারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-তর্পণ এবং বিষয়-ভোগই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া ‘খাও, পিও, মজা লুঠ’ এই আশুরিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়-রসনার তৃপ্তির জন্ত সেই প্রকার অমেধ্য উগ্র প্রকৃতির অখাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে শূক্ৰতিবান ভাগ্য বলে জানিতে পারেন এইসব বিষয় ভোগ প্রবৃত্তি তাহাদের মায়াবদ্ধ করাইয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নানাবিধ দুঃখ-ক্লেশাদি ভোগ করাইতেছে—এই সকল ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্ত বিষয় ভোগ বর্জনের বিশেষ প্রয়োজন।

যেস্থলে আহার্য্য গ্রহণের সঙ্গে মনের বৃত্তি ভেদ প্রকাশ করে সেইস্থলে আহার্য্য গ্রহণের বিষয় বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। দেহের সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধ থাকায় পবিত্র আহার গ্রহণে মন পবিত্র হয়। “আহার শুদ্ধো সত্ত্ব শুদ্ধিঃ”—ইহা দ্বারা জানা যায়, আহার শুদ্ধিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইচ্ছামত ভোজন করেন তাহাদিগকে শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে আশুর-প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে।

কিছু কিছু শাস্ত্রাদিতে দেবদেবীর পূজায় মন্ত্রমাংসাদির ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহা মূল্যবিধি নহে, পরন্তু প্রবৃত্তিমাগীষ লোকদিগকে

নিবৃত্তিগার্গে আনিবার জন্তই ঐ ব্যবস্থাপত্র। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বাভাবিক রুচি ইন্দ্রিয় তর্পণ ও বিষয়ভোগে ; সুতরাং শাস্ত্র পুনরাথ তাহাদের বিষয়ভোগে উৎসাহ দিবার জন্ত বিধি দিবেন কেন ? পরন্তু উহা বিষয়ভোগ হইতে ধীরে ধীরে নিবৃত্তি হইবার জন্য কৌশলক্রমে সাময়িক ব্যবস্থাপত্র মাত্র।

সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে দেহ-মন নীরোগ, আয়ু-সুখ-ধর্ম হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ শরীর মন নীরোগ রাখিবার জন্ত যত্নেব সহিত এইরূপ খাদ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন। ভুক্তগণ তাঁহারা যে-বস্তু গ্রহণ করেন তাহা নিগূণ বস্তু। নিরামিষ আহারজনিত যে পাপ, শ্রীভগবানে নিবেদিত হইলে উহার হিংসাজনিত পাপ সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়। পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলেন, “অন্ন বিষ্ঠা, ওলং মূত্রং যদ্ বিস্তার নিবেদনং।” ভুক্তগণের বিচার যথাযোগ্য ভোগ নাহি তথা রোগ। এই বিচারে শ্রীভগবানের নিবেদিত বস্তুসকল আদরের সহিত গ্রহণ করেন।

সদাচারের প্রত্যেকটি অঙ্গসুষ্ঠুরূপে পালন করিলেই শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে ইহার নিশ্চয়তা নাই। শ্রীভক্তিদেবী স্বতন্ত্রা ভক্তি মহাধন প্রদান করা বা না করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। দ্বৈতভুক্ত-ভাগবতে বর্ণিত আছে, শ্রীমহাপ্রভু এক নিষ্ঠাপরায়ণ এবং কেবলমাত্র দুই আহার করিত এইরূপ ব্রাহ্মণকে তাঁহার কীর্তনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দান করেন নাই, কারণ তাহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির অভাব ছিল। সদাচার অঙ্গগুলি পালন করিতে করিতে নিষ্কণ্ট চিত্তে শুদ্ধভক্তির জন্ত প্রার্থনার প্রয়োজন। সদাচার অঙ্গ পালনের দ্বারা শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে এবং শুদ্ধভক্তি যত প্রবল হইবে সাধুসঙ্গ ততই হইবে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বদ্ধনীবের হৃদয় শুদ্ধ হইবে এবং শ্রীমহাবৈষ্ণবগণের মুখনিঃসৃত বীর্ষাবতী শ্রীভগবানের অমৃতময়ী লীলারূপ-গুণগাথা শ্রবণে রুচি হইবে এবং শ্রীভগবানে সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক প্রেমের সহিত তাঁহার সেবানন্দ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগ-প্রভুর উপদেশ “অনাচার ছাড়ি লহ কৃষ্ণ নাম”— এই বাক্যে অত্যন্ত আদর করিয়া সাধক-সাধিকা পরমার্থ লাভের জন্য যত্নবান হইবেন।

—শ্রীমতী উমারাগী দে

চুঁচুড়া (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
 আচার্য্যকেশরী ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
 শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
 ১০ম বার্ষিক তিরোভাব-তিথিতে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভক্তি-প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত কেশব মহারাজ ।
 ব্রজধাম-লীলাক্ষেত্রে করেন বিরাজ ॥
 জীবের কল্যাণ-ব্রতে তাঁর আগমন ।
 গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বিশ্বে অপূর্ব মহান ॥
 ধ্যানে, জ্ঞানে, শিক্ষাদানে কর্তব্য-পালনে ।
 তেজস্বী পুরুষসম নাহি ত্রিভুবনে ॥
 উজ্জল আলোকে তাহা মহাজ্যোতির্ময় ।
 ভক্ত-বাঞ্ছা-পূরণেতে নিয়ত সদয় ॥
 প্রভুপাদ-কৃপাধন্য মহাজ্ঞানীবর ।
 করুণার সাগর যিনি মহা শক্তিধর ॥
 মায়াবন্ধ জড়জীবে করিতে উদ্ধার ।
 শ্রীচৈতন্য-মহামুক্ত দেন বার বার ॥
 আবির্ভাবে তিরোভাবে তিনি সর্বদাই—
 সমভাবে বিরাজিত, লীন তাঁর নাই ॥

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ, বিদ্যাবৃষণ
 (সাংবাদিক, পি, টি, আই)

আদর্শ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণের গোরাবতারের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণ নিজ
 মুখে বলিয়াছেন,—

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।

আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ।

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ।

এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আদর্শ ব্যতীত কখনও দুর্বল জীব-কোটি শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। কি কন্মরাজ্য, কি ভক্তিরাজ্য—উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শ আবশ্যক। জগতে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও আদর্শের দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়। কন্মী পুণ্যকার্য্য করিতে গিয়া যেকোন কোনও না কোনও আদর্শ নিজ সম্মুখে স্থাপন করে, তদ্রূপ পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও একটা আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়া থাকে। পাপী ব্যক্তিও আদর্শ-ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে পাপকার্য্য করিতে পারে না। পৃথিবীস্থ বারবানিতাগণ স্বর্বেশাগণকে তাহাদিগের আদর্শ করিয়া অধিকতর পাপ-কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে। নরেন্দ্রগণ দেবেন্দ্রগণকে আদর্শে স্থাপন করেন। চার্ব্বাকপন্থীর যেকোন আদর্শ আছে, জৈমিনীর অন্তঃ-গণেরও তেমনি আদর্শ আছে। শিশু আদর্শ না পাইলে কোনও শিক্ষাই লাভ করিতে পারিত না—শিশু আদর্শ অনুকরণ করিয়াই বাক্যোচ্চারণ ও আহার-বিহারাদি করিতে শিক্ষা করে। নর-শিশুকে তাহার জন্মাবধি ব্যাভ্রাদি জন্তুর আদর্শের মধ্যে পালিত হইবার দৃষ্টান্তে ব্যাভ্র-শাবকের ছায় তাহাতে হিংস্র স্বভাব, শব্দানুসরণ, আহার-বিহার-প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে। শিশুকে শব্দশাস্ত্রে বা লিপি-শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইলে আদর্শ-শব্দ বা আদর্শ-লিপির আবশ্যক হয়; নতুবা শিশু শিক্ষা করিতে পারে না। যখন আমরা সন্তরণ শিক্ষা করি, তখন আমাদের জলে নামিতে বা নদীর প্রবাহে বহু দূর গমন করিতে হয়; কিন্তু যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে বা বহু ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত বা আমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিতে দেখি, তখন আমাদের সাহসের সঞ্চার হয় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সন্তরণ-বিদ্যায় সুনিপুণ হইতে পারি। আমরা অক্ষজ রাজ্যে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“বৈষ্ণবগণকে ‘জগদগুরু’ বলা যায়। বৈষ্ণবগণ যেকোন উচ্চপদস্থ, তাহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে, অন্যান্য দুর্বল জীব কিরূপে সচরিত্রতা শিক্ষা করিবে? শ্রীমন্ন্যহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,— গুরু বস্ত্রে মণিবিন্দু যৈছে না লুকায়।

নয়্যামীর অঙ্গ ছিদ্ৰ সর্বলোকে গায় ॥

প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে তুফের কলস।

সুয়াবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২শ পঃ)

সাধু-শিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্র-দ্বারা
অপরকে সাধু-চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই উপদেশটি
পাওয়া যায়,—“তুমি ভাল করিয়াচ শিক্ষাও অজ্ঞেবে।

এই মত ভাল কর্ম সেও যেন করে ॥

শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছেন,—“হে বৈষ্ণবগণ, তোমাদের
সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য করিতেছ, উত্তম।
কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ তাহাদের অসৎ কার্যের দ্বারা পতন
হইতেছে। তোমার কর্তব্য এই যে, তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া
তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও। তুমি যদি গৃহত্যাগী
বৈষ্ণব হও, তবে ত্যাগী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি,
তাহা আচরণপূর্বক অল্প গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে শিক্ষা দেও। তুমি যদি
বৈষ্ণবগৃহস্থ হও, তবে গৃহী বৈষ্ণবকে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি ও
স্বীয় চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা আচরণ কর এবং অল্প গৃহীদিগকে
শিক্ষা দেও। বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ। তাহার কোন অংশ গোপন করিবার
যোগ নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্বত্র প্রকাশপূর্বক
শিক্ষা দেও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে কেহ ‘বৈষ্ণব’ পদবী পাঠিবার যোগ্য
হন না। তোমরা শুদ্ধ চরিত্র, অতএব সর্বদা ভাল আচরণ করিয়া থাক।
তাহা জগৎকে শিক্ষা দেও। সকল বৈষ্ণবই জগতের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।
কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না। চরিত্র-দ্বারা
শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য। দেখ, আমার জ্ঞান কোন বিধি নাই।
আমি স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাষ্ট করিতে পারি। তথাপি
আমি দুরন্ত কলিকালে জীবন চরিত্র শোধন করিবার জন্য শ্রীপতীদেবীর
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিতেছি। আমার বালাচরিত্রের দ্বারা বালক-
দিগকে শিক্ষা দিয়াছি, গৃহস্থচরিত্রের দ্বারা গৃহিণকে শিক্ষা দিয়াছি।
সন্ন্যাস-চরিত্রের দ্বারা গৃহত্যাগী জনগণকে শিক্ষা দিয়াছি। তোমরা আমার
চরিত্র অনুকরণ-পূর্বক অল্প জীবগণকে শিক্ষা দেও। যখন যে-বিষয়ে
কিছুমান সন্দেহ হয়, তখন আমার চরিত্র আলোচনা করিয়া স্বীয় চরিত্র
গঠন কর।” শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ এই উপদেশটি সকল বৈষ্ণবের পালন করা
উচিত। যিনি এই উপদেশ পালন করিতে চান না, তিনি মহা-
প্রভুর বিরোধী।” (শ্রীমদ্ভক্ততোষণী ৫ম খণ্ড, ১২৬-১২৮ পৃষ্ঠা)

পরমার্থ শিক্ষামন্দিরের শিষ্ঠগণের জন্ম পরমার্থ-প্রবীণগণ কৃপাপূর্বক আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। শ্রী গুরুদেব নিখিল সেবাদর্শের মূর্তিবিগ্রহ-স্বরূপ। অসৎগুরু বা গুরুক্রুর উপদেশ হইতে তাহার আচরণ ও আদর্শ পৃথক বলিয়া তাহার উপদেশ কার্যাত্মক হয় না—নিষ্ফল মঙ্গলের জন্ম সাধিত হয় না। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী সৎগুরুর উপদেশ ও আদর্শ, প্রচার ও আচার সম্পূর্ণ একতাপর্যাপন্ন বলিয়া দুর্বল জীবের পক্ষে তাহা পরম মঙ্গল-দায়ক অনুসরণ-যোগ্য হয়। দুর্বল জীব ও সৎগুরুর সেই আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করিতে পারে না—যখন উপেক্ষা করিবার কোন দুশ্চরিত্রি উদ্ভিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে আর শ্রীগুরুদেবের মহান্ আদর্শ থাকে না। জীব তখন আর একটী পতনোন্মুখের বা পতিতের আদর্শকে নিজ সম্মুখে স্থাপনপূর্বক তবে পতিতপাবন সৎগুরুর পরম পাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অসৎগুরুর আদর্শে সর্বদাই পতনোন্মুখতা থাকে বলিয়া জীব সহজেই তাহার পতনোন্মুখতা-প্রবৃত্তির মধ্যে আদর্শকে প্রেমঃ বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ পিচ্ছিল অকতিমিরে পতিত হয়। পাশ্চাত্যদেশীয় একটী লৌকিক নীতিপূর্ণ পুস্তকে লিখিত আছে যে, কোনও বালকের গৃহে একটী আদর্শ পুরুষের মূর্তি এবং কতকগুলি পাপীর ছবি স্থাপিত ছিল। বালক যখন তাহার সেই গৃহাভ্যন্তরে কোন কুবর্মে বস্তু হইত, তখন সে প্রথমে সেই আদর্শ পুরুষের মূর্তিটিকে আবরণ করিয়া রাখিত, তবে সে ঐরূপ কার্যে লিপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু পাপী ব্যক্তিগণের ছবি উন্মুক্ত থাকিত, তাহাতে সে পাপকার্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর প্রেরণাই লাভ করিত। লৌকিক আদর্শেরই এইরূপ প্রভাব! অতিমর্ত্য আদর্শের যে কত প্রভাব, তাহা ইচ্ছাই করা যায় না। সৎগুরুপাদপদ্মের সেবাময় আদর্শ ও অসৎগুরু বা গুরুক্রুর অসদাদর্শের রীতিও কতকটা উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা দুর্বল জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সৎগুরুপাদপদ্মের আদর্শ দেখিয়াও যখন আমরা কোনও অপরাধময় কার্যে লিপ্ত হইতে যাই, তখন আমরা ঐরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শকে আবরণ করিয়া আমাদের সম্মুখে অস্ত্র অসদ-ব্যক্তির অসদাদর্শ স্থাপন-পূর্বক ঐ সকল অসদাদর্শের সাময়িক প্রেরণা ও উত্তেজনায় ঐরূপ অপরাধময় কার্য করিয়া থাকি। ঐরূপ কার্যে আমাদের সৎগুরুপাদপদ্মের আদর্শ পরিহারই লক্ষিত হয়। সুতরাং সৎগুরুপাদপদ্মের

আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও যদি কোন কোন দুর্বল জীব বা অপরাধ-প্রবণ জীবের অন্যদিকে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তবে তাহা কখনই সদগুরু-আদর্শানু-সরণ বা তাহাতে গুরুদেবের দোষ আরোপিত হইতে পারে না। উহা সদগুরুর আদর্শ পরিত্যাগ-পূর্বক অসদাদর্শ বরণের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। সুতরাং আদর্শ মাত্রেরই অসামান্য প্রভাব; সদাদর্শের যেকোন প্রভাব, অসদাদর্শেরও তদ্রূপ প্রভাব। তবে অসদাদর্শ আমাদের বর্তমান বিকৃত স্বভাবের অধিকতর রূচিশ্রদ বলিয়া উহার প্রভাব আমাদের বর্তমান অবস্থার উপর অধিকতর বিক্রম-প্রকাশে সমর্থ।

সাধক ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্ত যে আদর্শের অত্যাৱশ্যকতা যৌক্তিক, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে সাধকগণ ‘আদর্শ’কে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা ব্যক্তিগত অনর্থের দ্বারা নিয়মিত বা মর্ত্য-বুদ্ধিতে আদর্শের প্রতি অসুখা প্রকাশ করিলে আদর্শ সেই স্থানে আত্মগোপন করিয়া বঞ্চনার আদর্শ প্রকাশ করিবেন। নিত্যসিদ্ধগণের কোনও বাহ্য আদর্শের অপেক্ষা নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণের বাহ্যে কোনও প্রকার আদর্শের প্রয়োজন প্রকাশিত হয় নাই। লৌকিক আচার্য্যকরণগণ তাঁহাদের আদর্শে এই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনকে অদৃষ্টভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনের আদর্শ দেখিয়া চমৎকৃত ও কেহ কেহ ধস্ত হইয়াছেন। সেই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত সকল পাত্রের মধ্যেই তাঁহাদের নিজাভীষ্টের আদর্শ দেখিতে পাঠিতে নিত্য অভীষ্ট সেবার নিযুক্ত। এই সকল স্বরূপ-রূপানুগবর আদর্শ-শিরোমণি শ্রীষ্যভানু-নন্দিনীর আদর্শেই নিত্য অনুপ্রাণিত। বাহ্যের অন্তর এইরূপ আদর্শে নিত্য অন্তরঞ্জিত, তাঁহাদের বৈধ অহংসানরূপ বাহ্য আদর্শের আবশ্যকতা কি? নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের কথা দূরে থাকুক, বাহ্যের রাগাত্মক ব্রজ-জনের আদর্শে লুক্ক, সেই সৌভাগ্যবন্ত সাধকগণেরও আদর্শানুসরণ এইরূপ,—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেম পাঠিত’ লাগিয়া।

নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মুখ হঞা ॥

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২শ পঃ)

বোমাসুর ও কেশীদৈত্য

একদিন কংসানুচর কেশীদৈত্য বৃহৎকায় অশ্বরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে গমন-পূর্বক বিকট চীৎকারে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে ভ্রাসের সঞ্চার করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসদভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। কেশী শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্তী হইয়া পাদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহার পদদ্বয় ধারণপূর্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাকে চারিশত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ পর মূচ্ছিত কেশী চৈতন্য লাভ করিয়া মুখ বাদানপূর্বক সক্রোধে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও হাসিতে হাসিতে তাহার মুখবিবরে স্বীয় বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কেশী উহা চর্কণ করিতে উদ্ভত হইলে উত্তপ্ত লৌহের তাপ অনুভব করিল। হস্ত ক্রমে ক্রমে স্কুলাকার হইয়া উহার মুখমধ্যে বায়ুর গমনাগমন বন্ধ করিলে ঐ দুঃস্থ দানব অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিনাশার্থ কোনপ্রকার গর্ভ প্রদর্শন না করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদ তথায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভাবী লীলাসমূহ কীৰ্ত্তনের দ্বারা তাহার বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন,—“হে কৃষ্ণ, কাষ্ঠ-সমূহের সম্বাস্তিত অগ্নির ন্যায় আপনি সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মস্বরূপ। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত; অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্। অসাধুগণের বিনাশ ও সাধুগণের রক্ষার জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে প্রভো! আপনি নরকাসুর ও মুরাসুরের বধ, স্বর্গ হইতে সবলে পারিজাত-রক্ষা করণ, ইন্দ্রকে পরাজয়, নৃগরাজের উদ্ধার, জাম্ববতীসহ শ্রমন্তকমনি গ্রহণ, যমপুর হইতে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন, পৌণ্ড্রকাসুর-বধ, দত্তবক্র-বধ, শিশুপাল-বধ এবং দ্বারকার অবস্থিত থাকিয়া আপনি যে সকল হৃদুত-কর্ম সম্পাদন করিবেন, তাহা আমি দর্শন করিব।” শ্রীনারদ এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

ভগবান্ গোবিন্দও কেশী-দৈত্যাকে বধ করিয়া সানন্দে গোপাল বালক-গণের সহিত পশুপালন করিতে লাগিলেন। এক সময় গোপালগণ পর্বতের তটভাগে গোচারণ করিতে করিতে চোর ও রক্ষকের অভিনয়-সহকারে চৌর্য্যবস্তুর সংগোপনরূপ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ ক্রীড়ায় কতিপয় গোপাল চোররূপে ও কতিপয় রক্ষকরূপে এবং অন্যান্য কতিপয়

মেঘরূপে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেইসময় ময়-নামক দৈত্যের পুত্র অতিশয় মায়া-নিপুণ গোপাল-বেশধারী বোমাসুর স্বয়ং চৌরলীলার অভিনয় করিয়া মেঘলীলার আচরণকারী অনেক গোপালকে দূরে লইয়া ঘাইতে লাগিল। ঐ মহাদৈত্য অপহৃত গোপালগণকে পর্বত-গহ্বরে নিষ্ক্ষেপ করিয়া শিলাখণ্ডে তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। এইরূপে ক্রীড়া-স্থলে কেবলমাত্র ৪৫টি গোপাল অবশিষ্ট রহিল। সর্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া গোপালহরণকারী অসুরকে সবলে গ্রহণ করিলেন। বোমাসুর বহুচেঁচা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া দর্শক দেবগণের সমক্ষে তাহাকে পশুর আয় নিশ্বাস রোধ করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর পর্বত-গহ্বরে আবদ্ধ গোপালগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ করলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যশ্রমী মহারাজের নির্য্যণ

জগদ্গুরু নিত্যানীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদের নিকট শ্রীনামও দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিবেক মহোদয় বহুকাল অবিভক্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনে থাকিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বিগত ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার (ইং ২৩/১৯৩৪) দিবস শ্রীচৈতন্যমঠস্থ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে “সংস্কার-দীপিকা”রূপে ত্রিদণ্ড-সন্মাস গ্রহণকরিয়া ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যশ্রমী মহারাজ-নামে পরিচিত হন। সারস্বত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ তাহার সহজ সরল অমায়িক ব্যবহারে চিরদিন মুগ্ধ ছিলেন। তিনি কখনও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সহিত, আবার কখনও পৃথকভাবে ভারতের বিভিন্নস্থানে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের তদানীন্তন মঠরক্ষক অজাতশত্রু শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ, গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সেবা-সচিব শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী,

কৃতিবত্ত্ব (শ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ) এবং শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুশল (শ্রীমদুক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ) প্রভুবর্গের সহিত বিশেষভাবে স্নেহস্বত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভুই মহারাজকে মঠে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া চিরদিনই তাঁহাকে শিক্ষাগুরু ও বহু-প্রদর্শক গুরু বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ভগবদিচ্ছাক্রমে দৈবদুর্বিপাকবশতঃ মিশনে বিভিন্ন গুণ্ণগোল উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্যভাব ও পত্রাদির-আদান-প্রদান অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্বজীবনেও ইঁহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতি শ্রীল তুর্ঘ্যাস্রমী মহারাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তাঁহার লেখনীই প্রমাণ করিবে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ ইং ১৯৪৯ সালে শ্রীগৌরপূর্ণিমা-দিবসে পারমাণ্বিক মাসিক “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রকাশ করেন। তাহার ১ম সংখ্যা পাঠিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা-সহকারে যে-পত্র ও শ্রীপত্রিকা-প্রশস্তি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হৃদয়গ্রাহী ;

“কেশব মহারাজ ! নববর্ষের দশুর্ভব গ্রহণ করুন। আপনার নব নব উদ্ভাবনী-শক্তি প্রচারকার্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় সুবন্দোবস্তের কথা শ্রীমান্ বিপিন ও সুবোধের পত্রে জ্ঞাত হইয়াছি। প্রথিতযশা আপনি, আপনার কৃতিত্বের কথা কেইবা কীর্তন না করেন ? বাঙা না করিলেও অবাপ্তিত ভাবে প্রতিষ্ঠা আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বিরত নহে। এতাদৃশ মহিমাম্বিত হইয়াও মাদৃশ বরাকের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি দুর্লভ হইলেও স্থলভ দেখিতেছি।”

“পরমারাধা প্রভুপাদ পতিত-পাবন। প্রচ্ছদপটে পাঠকের দুর্লভ দর্শন।
শিরোভাগে শ্রীশের আয়ুধ সকল। কলি-কলুষ বিনাশিতে ধরে সর্ববল ॥
পদ-গদা-শঙ্খ-চক্রে পত্নী সুশোভিত। মধুর মৃদঙ্গ অঙ্কে গৌড়ীয় অঙ্কিত ॥
প্রবন্ধে নিবন্ধে পত্নী হয়ে সুসজ্জিত। প্রতিষ্ঠাতার প্রজ্ঞান করে বিঘোষিত ॥
হেন পত্নী পাঠাইয়াছি অনুগ্রহ করি। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাহা সদা যেন স্মরি ॥”

শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্যাদেবের একটুকালীন শ্রীল তুর্ঘ্যাস্রমী মহারাজ সশিষ্য কয়েকবারই নবদ্বীপে স্তভাগমন করিয়াছেন। শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে নবদ্বীপ মঠেই অবস্থানপূর্বক অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। তাঁহার

অবর্তমানে সমিতির অন্যান্য সেবকগণও অনুরূপ অনুরোধ জানাইতে থাকেন। কিন্তু অকিঞ্চন, কষ্টকশরণ, অমানী মানদ-ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত উক্ত ত্রিদণ্ডী-যতি নিরপেক্ষ-নীতিরই আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাঁহার অপ্রকটের কিছুকাল পূর্বে সমিতির সেবকবৃন্দ অর্থানুকূলের দ্বারা তাঁহার কিছু সেবাসুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীপাদ শ্রীবিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুবোধকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর পত্রদ্বয় আমাদিগকে যুগপৎ বাখিত ও বিবহে মুহূমান করিয়াছে। পরিব্রাজক-আচার্য্য ত্রিদণ্ডীশ্রামী শ্রীমদুক্তিসম্বন্ধ তুর্বাশ্রমী মহারাজ আর ইহ জগতে নাই। তিনি আমাদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞান করিয়া মরজগৎ পরিত্যাগপূর্বক গোলোকধামে শুভবিজয় করিয়াছেন, ইহা যেন বিশ্বাসযোগ্য নহে। মাননীয় পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহেই (পূর্ব আনন্দপুরী, কবি রবীন্দ্র রোড, বাণাকপুর, ২৪ পরগণা) স্বামিজী-মহারাজ গত ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, (২১ নভেম্বর, ১৯৭৮) মঙ্গলবার দিবা ১২।১৫ মিঃ সঙ্ক্রান্তে শ্রীহরিস্মরণ-মুখে নিতালীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার অনুরাগী অসংখ্য ভক্তবৃন্দ বাণাকপুরে উক্ত গৃহে ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, শুক্রবার-দিবসে এই উপলক্ষে পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতামুখে ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি-সহ বিবহ-উৎসব সুসম্পন্ন করেন। ভিন্ন প্রদেশে প্রচারে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার বিবহোৎসবে যোগদান করিতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত।

স্বামিজী বহু পূর্বেই বাংলাদেশের যশোহরের অন্তর্গত বড়দিয়া নামক স্থানে এক সুরমা মঠ বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার প্রাচীন সেবক ও নিভাসঙ্গী শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুসহ ঐ আশ্রমেই ভজন-সাধনে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার জায় শ্রীনাম-ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব সতাই দুর্লভ। তাঁহার অপ্রাকৃত স্মৃতিশক্তি ও কবিত্ব-প্রতিভা দারদ্র্য গোড়ীয়-সমাজে চিরপরিচিত ও সমাদৃত। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় তাঁহার গৌরব ও মহিমা বিস্তৃতরূপে বিঘোষিত আছে। স্বামিজী-মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ও অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সহিত আমরাও আজ সমভাবে স্নেহ-বঞ্চিত ও তাঁহার বিশেষ অভাব বোধ করিতেছি। তিনি নিত্যধাম হইতে আমাদিগকে প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে আমরা তাঁহার আদর্শ-অনুযায়ী সাধন-ভজনে উৎসাহ লাভ করি ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

—জনকৈ বিরহী

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ :

পরমহংসস্বামী ও বিষ্ণুপাদ

জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৮৫ (ইং ৮ মার্চ, ১৯৭৯) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪ মার্চ) বৃধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রতাহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সঙ্কীর্তন-মুখে যোলকোশ ধাম পরিক্রমা হইবে।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্তুলুখী শ্রুতি অজ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-সঙ্গী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৭/১/৮৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।১৯৭২), বৃহস্পতিবার ;—(১) শ্রীগোবিন্দ-দ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুরবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটভাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।৭২), শুক্রবার ;—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—পদখালির কোল, ভৈরবির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, টাণাহাটি ; এবং (৪) শ্রীখাতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর ।

৩। ২৫শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৭২), শনিবার ;—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (সার্কভৌম ভট্টাচার্যের পাট) এবং (৬) শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ (দাস্যখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বন্দাবন-দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৪। ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৭২), রবিবার ;—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গজেরডাঙ্গা এবং (৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা ।

৫। ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৭২), সোমবার ;—(৯) শ্রীঅন্তদ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং মুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাছির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।

৬। ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৭২), মঙ্গলবার ;—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব ।

৭। ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৭২), বুধবার ;—সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ) ।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

জ্ঞাতব্য—যাত্রিগণ হাক খালা ও ঘটি এবং বাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশায়ীসহ বিহানা অবস্থাই সঙ্গে আনিবেন ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার মডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৭.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.৭৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি.-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ” অথবা ‘প্রকাশক’ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) — ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

- ১। সিদ্ধান্তরত্নম (ভাষ্য-পীঠকম্) — ২০-০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক — ভিক্ষা — ৬-০০, ৩। শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ — ৪-০০, ৪। সাংখ্য-বাণী — ০০-২৫, ৫। মায়াবাদের জীবনী — ৩-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ — ২-৫০, ৭। প্রবন্ধাবলী — ২-০০, ৮। শরণাগতি — ০০-৭৫, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ — ০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পটিক্রমা — ১-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণপঞ্চক) — ২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ — ১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর শিক্ষা — ২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম (বাংলা) — ১০-০০, ১৬। জৈ (হিন্দী) — ১৫-০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সরানী — ১-০০, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা — ৩-০০, ১৯। শ্রীদামোদরচন্দ্রিকম্ — ১-০০, ২০। অর্চন-দীপিকা — ১-৫০, ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — ১-৫০, ২২। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর দ্বীপ — ১৮-০০, ২৩। Shri Chaitanya Mahaprabhu — 1.00.

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

ভুক্তভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিজ্ঞান মহারাজ।
- ৩। শ্রীকেশবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, যথুরা পোঃ, (যথুরা), ঠেউ, পি।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।
- ৫। শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঙ্গা পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।
- ৬। শ্রীনিহলদা গৌড়ীয় মঠ ও লাঙ্গলীঠ—আন্ততিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
রক্ষক—শ্রীমদ্ রামবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ।
- ৭। শ্রীসিকবাটি গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩/২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)।
রক্ষক—শ্রীদীনদয়্যার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, বান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।
- ১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ (দার্জিলিং)।
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।
- ১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
রক্ষক—শ্রীবিশ্বকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ।
- ১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (গারো পাহাড়) মেঘালয়।
রক্ষক—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী।
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—পণ্ডিত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ।
- ১৪। শ্রীত্রিভুবাতিত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রহ্মচারী।